সংখ্যা-১৫, অংশ্যা-১-১২.
১৩১১
CUL-H0.4370-14-25855

'পান কর—পান কর, পুনঃ কর পান'
কি দেবভাষায় ভক্ত করিছে আহ্বান !
এই তীব্র-অহঙ্কার—ছিন্নবাস ফেলি'
এক পোষে চন্দ্রাঙ্গনা, বল অবহেলি।

১৩

যত যত তিক্ত-পাত্র—একমাত্র রস ! —
তিক্ত হোক—মিষ্ট হোক, চেতনা অবশ
পাড়বে ঘুমুষ্ট কার, বিলম্ব ক'রো না,
ঢালো ঢালো ঝরুক, নয়ন অচেতন।

১৪

এ বিলম্ব—মরীচিকা, মরণ নক্কর,
পলে পলে ঝরে পাতা জীবন-তরুর ;
দিবানিশি-দুই-পক্ষ বিস্তারি'—ছুটিছে
ঐরকে রোদন দূর যমন-গহ্বর।

১৫

রজনীর ইন্দ্রজালে ছিন্নিছ প্রভাতে,
কবে কুটিবে না কভু শত বর্ণপাতে !
অঙ্কুর সভত ক্রুর, ফলে লয় হরি'
বৃন্দাবন শূন্য করি বৃন্দাবন-নাথে।

১৬

কবে যাবে ভবে স্বর্গ, কিম্বা রসাতল,
মর্ত্যলোকে বিস্তারিবে চির কোলাহল।
যে যাহার ভেরী ভরি বাজায় প্রাণপণে—
সঙ্গীতে সন্তুষ্ট আমি, ধারে কিবা কাজ !

১৭

নগ্ন-প্রান্তরে চরি, যেথা মরুভূমি—
উদাসে বাতাসে কত করে কানাকানি !
যে চরিত্রে চিত্রিতে ছায়ান
[illegible]

১৮

নদী-কূলে তরুতলে দুর্ব্বাদলে বসি
তুমি বাজাইবে বীণা সুধীরে, রূপসী !
আমি মধু চেয়ে তব মদিরা-আলসে—
সেই স্বর্গ—উঠে যাহে দেবত্ব বিকশি' !

১৯

সবে চায়। কেহ পায়, কেহ বা হারায় ;
কারো জ্বলে, কারো হাসে, আশা-বহ্নিধায় ;
বর্ষাশেষে সমভাগ তৃপাছু কৃষক
শেষ গাছকুলমূলে আগুন লাগায় ;

২০

প্রভাতে কুটীর-দ্বারে—স্বরম্য গলিয়া
সর্ব্বস্ব তাহার দেয় নবীরে ঢালিয়া।
আত্মহীন মধুকর অমি আহরণ—
পড়ে থাকে মধুচক্রে সে মধু চুলিয়া।

২১

ধনী যায় শ্মশানেতে—বাজে ঢাক ঢোল,
চড়ায় সুবর্ণ, কত ক্রন্দনকল্লোল !
সেই অনির্দ্দেশ দেশে দগ্ধশেষে চড়ি
দুঃখী রঙ্কে —সেও পায় ধরণীর কোল !

২২

এক আসে আর যায়, বিধা তায় বেদ !
ক্রমশঃ হ'তেছে গাঢ় নেহিনীর মেদ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে চলিছে গোপাল,
পাণ্ডবে কৌরবে আজ কিবা অবিভেদ !

২৩

কে বলিবে সত্য নয়—এ পলাশমূলে
অর্জ্জুনের তপ্তরক্ত নাহি আজ ফুলে
কে বলিবে সত্য নয়—কদ
সীতার সে পদ

২৪

দাও প্রিয়ে! মাধবীটি তুলিয়া শিরীষে,
কে মানিনী লুটে ভূমে অভিমান-বিষে!
সরে এস, ঝরণাটি যাক—বহে যাক,
কত বিরহীর অশ্রু আছে আহা মিশে!

২৫

পানপাত্র পূর্ণ কর, বিলম্ব না সয়!
ঘুচুক অতীত দুঃখ ভবিষ্যত-ভয়।
আছে হাতে এ মুহূর্ত্ত—এ শুভ মুহূর্ত্ত,
এ মুহূর্ত্ত পরে কিছু নাহিক নিশ্চয়।

২৬

এই মুহূর্ত্তের পরে—কোন্ গ্রহদূরে
হয় তো কাঁদিব আমি কি করুণ সুরে!
কত যুগ কত কল্পে সে কাতরধ্বনি
কে জানে পৌঁছিবে কি না তব পুষ্পপুরে!

২৭

কল্য, অহো, গত কল্য ক'রেছে প্রস্থান—
লইয়া বঙ্কিম মধু বিহারী ঈশান!
আজ আমি আছি যবে, জগত-চষকে
প্রাণপণে প্রাণ ভরি' করি সুধাপান।

২৮

কল্য, হা আগামী কল্য—দক্ষ বাজিকর,
বিছাবে শ্মশানে মম কুসুম-আস্তর,
হবে কত নৃত্যগান! আর আমি—আমি—
কাঁপিবে না টলিবে না এ বক্ষ-পঞ্জর!

২৯

যাক তবে—দূরে যাক ভূত ভবিষ্যৎ!
শূন্যে—মহাশূন্যে ঘুরে এ দৃঢ় জগৎ।
সত্য শুধু বর্ত্তমান, অসত্য সকলি,
সুধু সুরা—সুধু গান—সুধু তুমি সখি!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কবিকল্পদ্রুম।

পাশ্চাত্য সুধীসমাজের যত্নে যে সকল হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকের বিবরণী সংকলিত হইয়াছে, তাহাতে বোপদেব-বিরচিত মুগ্ধবোধ, কবিকল্পদ্রুম, মুক্তাফল, হরিলীলাবিবরণসংগ্রহ, চতুর্বর্গচিন্তামণি ও শতশ্লোকী নামক গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে মুগ্ধবোধ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। অন্যান্য গ্রন্থ সেরূপ সুপরিচিত নহে।

শতশ্লোকী বৈদ্যক গ্রন্থ। চতুর্বর্গচিন্তামণি স্মার্ত্ত গ্রন্থ। মুক্তাফল ও হরিলীলা-বিবরণসংগ্রহ ভক্তিগ্রন্থ। কবিকল্পদ্রুম ব্যাকরণোক্ত ধাতুপাঠ। বোপদেব কবিকল্পদ্রুমের একখানি টীকাও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম—কাব্যকামধেনু। কবিকল্পদ্রুম ও কাব্যকামধেনু ব্যাকরণ শাস্ত্রের গ্রন্থ হইলেও, তাহাতে নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দৌলতাবাদের নিকটবর্ত্তী দেবগিরি পর্ব্বতে বোপদেবের জন্ম হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে মুগ্ধবোধ এক্ষণে দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা বঙ্গদেশেই সমধিক প্রচলিত। কোন সময়ে কি সূত্রে দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থ বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা একটি কৌতূহলাত্মক ঐতিহাসিক প্রশ্ন। তাহা মীমাংসা করিতে হইলে, বোপদেবের আবির্ভাবকালের নির্ণয় আবশ্যক।

সংস্কৃত গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা সহসা সফল হয় না। যাহা বহু পুরাতন, তাহার রচনাকাল ক্রমে অজ্ঞেয় হইয়া উঠিয়াছে; যাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহার রচনাকালও দুর্জ্ঞেয়। বোপদেব কোন গ্রন্থেই রচনাকালের নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। সুতরাং সহজে তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কবিকল্পদ্রুম ও কাব্যকামধেনু গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল পূর্ব্বতন গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদবলম্বনে কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

বোপদেবের পূর্ব্বে ও পরে ভারতবর্ষে যে সকল সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, তাহার সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। যাহা কালকে পরাজিত করিয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে, পাণিনীয় ব্যাকরণ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত। পাণিনির পূর্ব্বকালবর্ত্তী বৈয়াকরণগণের নামমাত্র চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাদের গ্রন্থের আদ্যন্ত প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। পাণিনি-সূত্র রচিত হইবার পর

হার সহিত কাত্যায়নের বার্ত্তিক সংযুক্ত হয়। কালক্রমে পতঞ্জলির মহাভাষ্য লিত হইয়া, তাহাকে ত্রিমুনিব্যাকরণ নামে পরিচিত করিয়াছিল। পতঞ্জলি-রচিত মহাভাষ্য অবলম্বন করিয়া ত্রিমুনিব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা সাধিত ইত। জৈয়টের পুত্র কৈয়ট মহাভাষ্যের প্রদীপ নামক টীকার রচনা করায়, াহার অধ্যাপনাও প্রচলিত হইয়াছিল। প্রদীপেরও টীকা ছিল; তাহা মে বিলুপ্ত হইয়াছে। ত্রিমুনিব্যাকরণ এইরূপে ভাষ্য ও টীকার সংযোগে পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইবার পর, সংক্ষিপ্ত বৃত্তিরচনার চেষ্টা হইয়াছিল। ই চেষ্টার ফল, বামনজয়াদিত্যের কাশিকাবৃত্তি। কাশিকার সংক্ষিপ্ত বৃত্তির খ্যা করিবার জন্য ন্যাস নামক টীকা প্রচলিত হয়। ন্যাসের টীকা রশ্মিত, দন ইত্যাদি পুনরায় কাশিকাবৃত্তির অধ্যয়ন অধ্যাপনায় সময়ক্ষয়ের সূত্রপাত করিয়াছিল।

পাণিনি-সূত্রে বৈদিক ও লৌকিক উভয় ভাষার ব্যাকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য স্বরসূত্রের ব্যবস্থা আছে। স্বরসূত্র ও বৈদিকসূত্র পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ভাষাসূত্র শিক্ষা দিবার জন্য নানা ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল ব্যাকরণের মধ্যে কলাপ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার আর একটি নাম—কাতন্ত্র, অর্থাৎ ঈষৎ তন্ত্র। কলাপ ব্যাকরণের বর্ত্তমান সূত্র সর্ব্ববর্ম্মা-দেবের নামে পরিচিত। দুর্গসিংহ তাহারই ব্যাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। লোচনদাস তাহা বিশদ করিবার জন্য পঞ্জী নামক টীকার রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পঞ্জী প্রচলিত আছে; বররুচি-কৃত চিত্রকূটী বৃত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পঞ্জীর পর সুষেণ কবিরাজের টীকা ও শ্রীপতির কলাপোত্তর শিষ্ট প্রচলিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কলাপের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হইয়া ব্যাকরণশিক্ষার সহজ উপায় কৃত হইলেও, সহসা পাণিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা লুপ্ত হয় নাই। ই শিক্ষা প্রচলিত থাকিতে পাণিনিব্যাকরণ পরিত্যাগ করা অসম্ভব। কিন্তু নি ব্যাকরণকেও সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য উত্তরকালে নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত ছিল। বিষয়-বিভাগে সূত্র সংকলন করিবার জন্য রামচন্দ্রাচার্য্য প্রক্রিয়া-দীপিকা রচনা করিয়া পথপ্রদর্শন করেন। ভট্টোজী দীক্ষিত সেই পথে অধিক অগ্রসর হইয়া, সিদ্ধান্তকৌমুদীর অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই গৌড়দেশে বৈদিক সূত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল সূত্র-সংকলনের জন্য লক্ষ্মণ সেন দেবের আজ্ঞায় পুরুষোত্তম দেবের ভাষাবৃত্তি

রচিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতে বৈদিক সূত্র পরিত্যক্ত হয় নাই!

প্রাচীন বৈয়াকরণগণের সমাদরক্ষার্থ বোপদেব স্বকৃত কবিকল্পদ্রুমের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে আট জন খ্যাতনামা শাব্দিকের বিজয়ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম,—ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, অপিশালি, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র যথা :—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নোঽপিশালিঃ শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাধিশাব্দিকাঃ॥"

অমর ও জৈনেন্দ্র পাণিনির পরবর্ত্তী, আর সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী। সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া জৈনেন্দ্রের নাম সকলের শেষে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু জৈনেন্দ্র বলিতে কাহাকে বুঝিব? জৈনেন্দ্র নামে কোনও শাব্দিকের অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কাশিকাবৃত্তির "ন্যাস"-রচয়িতা জিনেন্দ্র এক জন প্রসিদ্ধ শাব্দিক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পুত্রকে জৈনেন্দ্র বলা যাইতে পারে। পুত্রের প্রকৃত নাম জয়ন্ত। তিনি তন্ত্রচন্দ্র নামে এক ব্যাকরণটীকার রচনা করিলেও, পিতার ন্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং জিনেন্দ্র ন্যাসকারকে বোপদেব কর্ত্তৃক প্রশংসিত শাব্দিকবর্গের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়। তদনুসারে বোপদেবকে কাশিকাবৃত্তির পরবর্ত্তী সময়ের বৈয়াকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কাশিকা কোন্ সময়ে গ্রন্থ, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিবার উপায় না থাকিলেও, উদাহরণ প্রত্যুদাহরণ বিচার করিয়া সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তার পরবর্ত্তী সময়ে কাশিকাবৃত্তি রচিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কারণ, কাশিকাবৃত্তিতে উদাহরণস্বরূপ বাসবদত্তার উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী সমস্ত ব্যাকরণের টীকায় কাশিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশিকা যে এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই!

খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাণিনিসূত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ হিয়ুঙ্গথ্‌সঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্যে মহাভাষ্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ কলহণের রাজতরঙ্গিণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় পর্য্যন্ত পাণিনিসূত্র ভিন্ন অন্য কোনও ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ নাই। সমুন্নত সাহিত্যযুগ বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবের পর পূর্ব্ব-গৌরব হইতে স্খ

ইয়া পড়ায় সুবন্ধু রাসবদত্তার আরম্ভে তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া
থিয়াছিলেন :—

"দগ্ধে রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কংকঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥"

বন্ধু যে পুরাতন রসবত্তার অন্তর্দ্ধান লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকরচনা করেন, সে রস-
জ্ঞা আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সংক্ষিপ্তানুরাগ ক্রমে প্রবল হইয়াছে।
হার পরিচয় সাহিত্যের ন্যায় ব্যাকরণেও পরিস্ফুট হইয়াছিল। কাশিকার সংক্ষিপ্ত
ত্তি তাহার প্রথম ফল। ক্রমে ঈষৎতন্ত্র নামক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের প্রাদুর্ভাবে
সংখ্য অভিনব বৈয়াকরণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই সংক্ষিপ্তানুরাগের
গে বোপদেব আবির্ভূত হইয়া সংক্ষিপ্ততন্ত্রের চরম সীমায় আবিষ্কার করিয়া
গিয়াছেন।

কবিকল্পদ্রুমে ইহার অধিক আর কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই;
কিন্তু কাব্যকামধেনু টীকায় বোপদেব বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়া,
তাঁহার আবির্ভাবকালনির্ণয়ের পথপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কামধেনুগাঠে
যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র
মহোদয় এসিয়াটিক সোসাইটীকে তাহার এক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।
গাহাতে দেখা যায়,—বোপদেব উক্ত টীকায় পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি,
র্ত্তৃহরি, দুর্গসিংহ, ত্রিলোচন দাস, বর্দ্ধমান মিশ্র, হেম সূরি, অভিনব শাকটায়ন,
ন্দ্রেন্দ্র, বামন, ভোজদেব, ব্যাঘ্রপাদ, কুশল ও সর্ব্ববর্ম্মার নামোল্লেখ করিয়া গিয়া-
ছেন। তন্মধ্যে ত্রিমুনিব্যাকরণ ভিন্ন আর সকল লেখকের গ্রন্থই সংক্ষিপ্ত তন্ত্রের
রিচয় প্রদান করে।

দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃতশাস্ত্রালোচনা প্রবর্ত্তিত হইলে, তদ্দেশে পাণিনীয় ব্যাকরণের
ভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমান শাসন প্রচলিত হইবার পর
ছুকাল আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেই শাস্ত্রালোচনার অধিক প্রাদুর্ভাব হয়।
ৎকালে মুগ্ধবোধের প্রভাবে পাণিনীয় ব্যাকরণেরও সংস্কারসাধনের চেষ্টা আরব্ধ
ইয়াছিল। রামচন্দ্রাচার্য্য তাহারই পথপ্রদর্শক। তাহার পূর্ব্বে বিষয়ানুসারে
পাণিনিসূত্র সংকলিত হয় নাই। অষ্টাধ্যায়ীর চিরপরিচিত পুরাতন পদ্ধতিই সর্ব্বত্র
প্রচলিত ছিল।

কৃষ্ণাচার্য্যের পুত্র ঋগ্বেদী কৌণ্ডিন্যগোত্রসম্ভূত রামচন্দ্র অন্ধ্র দেশের অদ্বিতীয়
পণ্ডিত। তিনি ব্যাকরণ, বেদান্ত ও জ্যোতিষে পারদর্শী ছিলেন। "প্রক্রিয়া-

কৌমুদী" নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়া, রামচন্দ্র পাণিনীয় সূত্রগুলি বিষয়ানুসারে মুগ্ধবোধের প্রণালীমতে নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র বিঠ্ঠলাচার্য্য "প্রসাদ" নামক টীকা রচনা করিয়া "প্রক্রিয়াকৌমুদী"র অধ্যয়ন অধ্যাপনায় মুগ্ধবোধের গতিরোধের চেষ্টা করেন। বোপদেবের কত দিন পরে রামচন্দ্র আবির্ভূত হন, তাহার প্রমাণ না থাকিলেও, বোপদেবের অব্যবহিত পরেই রামচন্দ্রের অভ্যুদয়কাল ধরিয়া লইলে, বিশেষ ভ্রান্তি ঘটিবার আশঙ্কা নাই। বিঠ্ঠলাচার্য্য টীকা-রচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র মুগ্ধবোধের উল্লেখ করায়, মুগ্ধবোধের রচনাকাল অনুমান করাও সহজ হইয়াছে। তদ্দ্বারা যে কাল নির্ণীত হয়, তাহা সংক্ষিপ্তানুরাগের চরম-যুগ।

"শাকে পঞ্চসমুদ্রবহ্নিকুমিতে সংবৎসরে শোভনে
সংজ্ঞে ফাল্গুনিকে চ মাসি বিশদে পক্ষে দশম্যাস্তিথৌ।
গুরুপাদনিরতরামচন্দ্রবিদুষঃ শ্রীবিঠ্ঠলে রাগিণঃ
সুব্রহ্মা লিখতি প্রযত্নত ইমং গ্রন্থং *সিংহাভিধম্॥"

প্রসাদ-টীকার এই শ্লোক-অনুসারে খৃষ্টীয় ১৪৫৩ অব্দে শ্রীবিঠ্ঠলাচার্য্যের টীকা-রচনার কালনির্দ্দেশ করিতে হইবে। বোপদেবের আবির্ভাবকালনির্ণয়ের একটি পুরাতন শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে জানা যায়, কাশিকাবৃত্তি-কার বামনের প্রভাব বোপদেব কর্ত্তৃক নিরস্ত হইলে, মাধবসায়ন তাহা পুনঃসংস্থাপিত করেন। যথা :—

"বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।
কীর্ত্তিরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ॥"

বেদভাষ্যকার চিরস্মরণীয় সায়নাচার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া সুধীসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার মাধবীয়ধাতুবৃত্তি রচিত না হইলে, বোপদেবের কবিকল্পদ্রুম সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইত। তাহাতে কাশিকাবৃত্তির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইয়া, মুগ্ধবোধের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইত। বোপদেব-কৃত সরলপদ্যনিবদ্ধ কবিকল্পদ্রুমাখ্য ধাতুপাঠই যে মুগ্ধবোধের বিজয়সাধনের প্রধান উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাধবসায়ন পাণিনীয়মতানুসারে ধাতুবৃত্তি রচনা করায়, বোপদেবের ধাতুপাঠ পরাস্ত হইয়াছিল। এই শ্লোকের সহিত প্রসাদ-টীকার শ্লোক একত্র বিচার করিলে, বলিতে হইবে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বোপদেবের প্রাদুর্ভাব। তাহা ক্রমে দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশেও প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে বৈদিক শিক্ষা বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সায়নাচার্য্য তাহার গতিরোধের চেষ্টায় ভাষ্যরচনা করিয়াছিলেন, এবং পাণিনি-ব্যাকরণের উদ্ধারসাধনার্থ ধাতুবৃত্তিরচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। সায়নাচার্য্যের সাধু উদ্দেশ্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে; কিন্তু অধঃপতনের গতি অবরুদ্ধ হয় নাই। বৈদিক শিক্ষা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঠিক কোন্ সময়ে মুগ্ধবোধ বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিবার উপায় না থাকিলেও, মুগ্ধবোধের বঙ্গীয় টীকাকারগণের চতুর্থ ব্যক্তির আবির্ভাবকাল নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহার নাম দুর্গাদাস। তাঁহার সুবোধিনী টীকা বিশ্ববিখ্যাত। এই টীকা খৃষ্টীয় ১৬১৫ অব্দে গৌড় নগরে রচিত হইবার প্রমাণপরম্পরা পাশ্চাত্য সুধীসমাজে সুপরিচিত। দুর্গাদাস, সম্রাট শাহজাঁহার শাসনসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার টীকা-পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বে রামানন্দ, কাশীশ্বর ও রাম তর্কবাগীশের টীকা প্রচলিত ছিল। মুগ্ধবোধের অন্যান্য টীকা তাঁহার পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে।

দুর্গাদাস মুগ্ধবোধের ন্যায় কবিকল্পদ্রুমেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শর্ম্মা, ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগে ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্গাদাস-বিরচিত কবিকল্পদ্রুমের টীকা ক্রমে লুপ্ত হইতেছে বলিয়া, তাঁহার সুবোধিনী টীকায় জাতিনির্ণায়ক শব্দের অভাব দেখিয়া অধ্যাপক ওয়েবরপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে অম্বষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গাদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী রাম তর্কবাগীশ এক জন সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বলিয়া পরিচিত। তিনি মুগ্ধবোধের যে টীকার রচনা করেন, তাহা বিচারবাহুল্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিলেও, ছাত্রগণের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। তর্কবাগীশ মহাশয় পাণিন্যাদি অন্যান্য বৈয়াকরণের মতালোচনা করিয়া মুগ্ধবোধের পক্ষসমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়েও বঙ্গদেশে পাণিনি ও কলাপের প্রাধান্য ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

"পরেহত্র পাণিনীয়জ্ঞাঃ কেচিৎ কলাপকোবিদাঃ।
একে বিস্তানিবাসাঃ স্যুরন্যে সাংক্ষিপ্তসারকাঃ॥"

মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পাল ও সেনরাজবংশের অভ্যুদয়দিনে গৌড়-রাজ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রালোচনার অভাব ছিল না। তৎকালে পাণিনি ও কাতন্ত্র ব্যাকরণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। জয়দেব, মুরারি, উমাপতি প্রভৃতি এই যুগের কবিকুলচূড়ামণিগণ সকলেই বৈয়াকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিলোচনদাস-বিরচিত কলাপ-টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়, জয়দেব একখানি কাতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। * উনাপতির কারিকা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। কাতন্ত্র ব্যাকরণে বৈদিকসূত্র স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; তাহা লৌকিক ভাষার ব্যাকরণ। তাহাও আবার সংক্ষিপ্ত বলিয়া নিতান্ত অসম্পূর্ণ। কাতন্ত্র ব্যাকরণের এই অভাব দূর করিবার জন্য শ্রীপতি দত্ত পরিশিষ্ট রচনা করেন। তাহা দুর্গাদাসের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও বৈদিকসূত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। বোপদেবের সময়ে শ্রীপতির পরিশিষ্ট রচিত হয় নাই। তাঁহার সময় পর্য্যন্ত কাতন্ত্র-ব্যাকরণের ত্রিলোচনের পঞ্জীই প্রচলিত ছিল।

মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গৌড়রাজ্যে বৈদিক সাহিত্যালোচনা বিলুপ্ত হইতে থাকে। লক্ষ্মণসেন দেব তজ্জন্য বৈদিক সূত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কালক্ষয় করা অনাবশ্যক বলিয়া, ভাষাসূত্রসংকলনার্থ পুরুষোত্তম দেবকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ভাষাবৃত্তি রচিত হইয়া বৈদিক সূত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালী তাহার জন্য আর সময়ক্ষয় করিত না। বৈদিকসূত্র পরিত্যাগ করিলে পাণিনিসূত্র অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ভাষাশিক্ষার জন্য যে কোন সরল সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের অনুসরণ করিলেই চলিতে পারে। তজ্জন্য বঙ্গদেশে কাতন্ত্রের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতেছিল। জয়দেবাদি সেই পথে সংস্কৃত শিক্ষা জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন দেব পাণিনিব্যাকরণকে রক্ষা করিবার আশায় লঘুবৃত্তি রচনা করাইয়াছিলেন। এই সকল চেষ্টার পর নব্য ন্যায়ের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গভূমি প্রাচীন সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া অভিনব সাহিত্যসৃষ্টির সূচনা করায়, প্রাচীন ব্যাকরণের সমধিক চর্চ্চায় সময়ক্ষয় করা অনাবশ্যক বলিয়া ছাত্রগণ সংক্ষিপ্ত পথের পথিক হইয়াছিল। তজ্জন্য মুগ্ধবোধ সহজেই বঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বঙ্গভূমি ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশে এখন আর মুগ্ধবোধের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধের প্রচলন বাঙ্গালীর সংস্কৃতশাস্ত্রালোচনার পূর্ব্বগৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তাহা স্মরণ করিয়া দুঃখপ্রকাশার্থ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"কথঞ্চিন্মুগ্ধবোধস্য পাঠমাত্রমবোদ্ধৃতেঃ।
কাব্যমাত্রসমালোকাৎ ব্যুৎপত্তের্দর্শনং কথম্॥

---

* নন্থ কিমর্থময়ং কাতন্ত্রমিতি। জয়দেবাদিপ্রোক্তমস্তীত্যাহ সার্ব্ববর্ম্মিকম্।

উক্তশাস্ত্রৈকশরণাঃ সূরিসৌরভলোভতঃ।
কুমারাশ্চেৎ প্রবর্ত্তেরন্ প্রবর্ত্তন্তাং হটান্বিতাঃ॥
তদাক্যোদ্বাদরকৃতঃ শোচনীয়াঃ পরংজনাঃ।
দৌর্ভাগ্যাৎ বত বঙ্গানাং বালবাক্যে সমাদরঃ॥"

তর্কবাগীশপাদ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রতি যেরূপ তাচ্ছীল্যের ভাব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তৎপ্রতি তত দূর তাচ্ছীল্যপ্রদর্শন করা অসঙ্গত। এ জগতে প্রয়োজন বুঝিয়া দ্রব্য সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এমন যুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যে যুগের প্রয়োজনসাধনের জন্যই মুগ্ধবোধ বিরচিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বকাল হইতেই সংস্কৃতশিক্ষার্থিগণ নানা কারণে বৈদিক অপেক্ষা লৌকিক সাহিত্যের অধিকতর অনুরক্ত হইয়া, বিস্তৃত অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। কাশিকাবৃত্তি কিছুকাল সংক্ষেপে বৈদিক লৌকিক উভয় ভাষার শিক্ষাদান করিয়াছিল। কাতন্ত্র ব্যাকরণ বৈদিকসংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, সংক্ষেপে লৌকিক ভাষা শিক্ষা দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মুগ্ধবোধ সেই চেষ্টার পরিণত ফল। প্রয়োজনের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, যে প্রয়োজনে মুগ্ধবোধের অভ্যুদয়, তাহা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইয়াছে।

তথাপি মুগ্ধবোধে প্রাচীনসাহিত্যালোচনার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য পাণিনির সেবা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ কি ছিল, কি হইয়াছে, তাহা বুঝিবার সময়ে, পাণিনীয় ব্যাকরণ কিরূপে ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হইয়া মুগ্ধবোধের প্রভাব বিস্তার করিল, তাহার বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক হয়। সে চিন্তা নবাবঙ্গের গৌরববোষণা করিতে অসমর্থ।

এই সকল ঐতিহাসিক কার্য্যকারণপরম্পরার বিচার করিয়া দেখিলে, কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধ প্রচলিত হইয়াছিল, কোন্ সূত্রে এ দেশে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোনও প্রদেশে মুগ্ধবোধ এত প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই কেন, তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়।

মুগ্ধবোধ বৈদ্য বোপদেব গোস্বামীর অক্ষয়কীর্ত্তি। তাহা পুরাতন শিলালিপির ন্যায় এই সকল প্রত্নতত্ত্ব বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গভূমির জ্ঞানালোচনার ইতিহাস জীবিত রাখিয়াছে। কবিকল্পদ্রুমে এই চিরস্মরণীয় বৈয়াকরণের আত্মপরিচয় প্রাপ্ত ওয়া যায়। সে পরিচয় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও, উল্লেখযোগ্য। যথা :—

"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা।
তেনে বেদপদস্থেন বোপদেবদ্বিজন্মনা॥"

সুপণ্ডিত ধনেশের শিষ্য, ভিষক্ কেশবের পুত্র "বেদপদস্থ" বোপদেব আপনাকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিলেও, তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। "বেদপদস্থ" শব্দে কি বুঝিব? "বেদপদে স্থিত" বলিতে "বেদব্যবসায়ে নিযুক্ত" বুঝাইতেছে। সুতরাং বোপদেব এই শ্লোকে পিতার ব্যবসায়ে—আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ে—নিযুক্ত থাকার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার পক্ষে মুগ্ধবোধ কীর্ত্তিকিরীট হইয়া রহিয়াছে। নবদ্বীপের নব্যন্যায়ানুরক্ত সুবিখ্যাত অধ্যাপকবর্গ তাঁহার ব্যাকরণের সমাদর করায়, তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তাঁহার "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং" বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত।—কিন্তু কবিকল্পদ্রুমের কাব্যকামধেনুর মঙ্গলাচরণে বোপদেব গোস্বামী আদিত্যকে নমস্কার করিয়া গিয়াছেন। কবিকল্পদ্রুমের শ্লোকটি এইরূপ :—

"শর্ব্বাকরকরগ্রামমর্থমণ্ডলমণ্ডনং।
জ্ঞানাধ্বানমনাদ্যন্তমাদিত্যং তমুপাস্মহে॥"

ইহাতে জ্ঞানস্বরূপ অনাদি অনন্ত আদিত্যদেবের উপাসনা করিবার কথাই অভিব্যক্ত। কাব্যকামধেনুর মঙ্গলাচরণ শ্লোকে এই ভাব প্রকারান্তরে পুনরুক্ত হইয়াছে। যথা:—

"যেন দ্বিষদ্বিকরনৈরাখ্যাতধাতুলোহিতৈঃ।
প্রকাশৈঃ সংপ্রকাশ্যন্তে ক্রিয়াস্তং নৌমি গোপতিম্॥"

গোপতি শব্দে হরিহরাদিত্য দেবতাত্রয় তুল্যভাবে সূচিত হইলেও, এই শ্লোকের গোপতিশব্দ আদিত্যদেবকেই সূচিত করিতেছে। পুরাকালের গ্রন্থকারগণের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাসবদত্তা ও বেণীসংহারে শৈব বৈষ্ণব উভয় মতেরই মঙ্গলাচরণ শ্লোক বর্ত্তমান আছে।

বোপদেব বৈষ্ণবধর্ম্মানুরক্ত হইলেও, শৈবধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে ইহার নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্য বোপদেব যে ব্যাকরণ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সে প্রতিভা সর্ব্বথা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসার্হ।

নব্যন্যায়ানুরক্ত নবদ্বীপ প্রথমে পাণিনীয় ব্যাকরণেরই অনুরক্ত ছিল। অনাম-খ্যাত জগদীশ তর্কালঙ্কার-কৃত শব্দশক্তি-প্রকাশিকার তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হও-

স্তনের ব্যবধানেও স্ত্রী পুরুষে ভিন্নতা আছে। স্তনের শক্ততা চিত্রকরের আদর্শ। কেহ কাহারও পানে চাহিবে না; দক্ষিণ স্তন দক্ষিণপার্শ্বে, বাম স্তন বাম-মুখে অবস্থিত রহিবে। দুইটি চুচুকের ব্যবধান স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের অধিক। স্ত্রীলোকের স্তনের বৃদ্ধির আধিক্যহেতু স্ত্রীলোকের বুক অধিক চর্ব্বিযুক্ত প্রয়োজন হয়। দুই পার্শ্বের চর্ম্ম যত, দুই স্তনের ব্যবহিত চর্ম্ম তত স্থিতিস্থাপক নহে। এ জন্য দুই পার্শ্বের চর্ম্ম টানিয়া লইয়া বর্দ্ধমান স্তনযুগল আবৃত করিতে হয়। এ জন্য স্ত্রীলোকের দুই স্তনের ব্যবধান কম হইয়া পড়ে। এই ব্যবধান যত কম, স্তনের ব্যাবৃত্তি তত অধিক।

বানর ও বর্ব্বরের বাহু খুব দীর্ঘ। স্ত্রীলোকের বাহু পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, শিশুর বাহুও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণদিগের বাহু ক্ষুদ্রতর, সর্ব্বাপেক্ষা পীতবর্ণদিগের বাহু দীর্ঘতম। জাপানী রমণীর দীর্ঘ বাহুর ভঙ্গী নাচিবার সময় অতি সুন্দর দেখায়।

অঙ্গুলী সম্বন্ধেও ভিন্নতা দেখা যায়। বানর ও বর্ব্বরের তর্জ্জনী অনামিকা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, স্ত্রীলোকের দীর্ঘতর। এ জন্য স্ত্রীলোকের অঙ্গুলী-সমাবেশ সুন্দর। পুরুষের তর্জ্জনী স্ত্রীলোকের তর্জ্জনী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, স্ত্রীলোকের বৃদ্ধাঙ্গুলি পুরুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্র। বৃদ্ধাঙ্গুলির দীর্ঘতা অব্যাবৃত্তির লক্ষণ। গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিবার জন্য বানরে বৃদ্ধাঙ্গুলির দীর্ঘতা ব্যাবৃত হইয়াছিল। তাড়না ও বাক্‌ভঙ্গীর সহকারিতা করিবার জন্য স্ত্রীলোকে তর্জ্জনী অধিকপরিমাণে ব্যবহার করে, এ জন্য তাহাদের তর্জ্জনীর অধিকতর ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকিবে।

পায়ের বৃদ্ধি সমানভাবে হয় না। এক বয়সে অধিক বৃদ্ধি, অন্য বয়সে অল্প বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিশুদিগের পা ক্ষুদ্র, কিন্তু বর্ব্বরদিগের পা দীর্ঘ। বয়স্ক পুরুষের পা দেহের তুলনায় শিশুদিগের অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। দীর্ঘতায় স্ত্রীলোকের জানু পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু স্থূলতায় অধিক, এবং মেহের সঞ্চিত জানুর সংযোগে কোণেরও ভিন্নতা আছে। কিন্তু পায়ের নিম্নভাগের ভিন্নতা অতি সামান্য। স্ত্রীলোকের পা পুরুষের অপেক্ষা অতি সামান্য দীর্ঘ। পুরুষের চরণ স্ত্রীলোকের চরণ অপেক্ষা দীর্ঘতর। এক স্কন্ধ হইতে অপর স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি পুরুষের অধিক, এক জানু হইতে অপর জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃতি স্ত্রীলোকের অধিক। নিতম্বের বৃদ্ধি বর্ব্বর রমণী অপেক্ষা সভ্য রমণীর অধিক—স্থূল ও গোল—প্রসবকার্য্যে উৎকৃষ্টতার নিদর্শন। বস্তুতঃ দেহের উপরিভাগ ও অধোভাগ লক্ষ্য করিলে সাঙ্কেতিক হইতে স্ত্রীপুরুষের বিভিন্নতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

দেহের ঋজুতা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষে ভিন্নতা আছে। বানর ও বর্ব্বর অর্দ্ধব্যাবৃত্ত দ্বিপদ, শিশুও এইরূপ। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকে উচ্চশ্রেণীর লোকের মত লম্বমান হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। লম্বমানতা শ্রেষ্ঠ বর্ণের নিদর্শন। বৃষস্কন্ধ পুরুষকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করে, নিতম্বের প্রশস্ততা রমণীকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য করে। চলিবার সময় স্ত্রীলোকের মস্তক সম্মুখভাগে, পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে হেলিয়া পড়ে, একটিতে দর্প, অন্যটিতে নম্রতার, একটিতে আবলম্বন, অন্যটিতে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়।

যে দিন হইতে মনুষ্য সোজা হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতে মনুষ্যের জীবরাজ্যে রাজত্বের আরম্ভ। দাঁড়াইলে মস্তক সুস্থ থাকে, মস্তিষ্কের ব্যাবৃত্তি আশু সম্পাদিত হয়। কিন্তু চতুষ্পদে অবস্থানসময়ে যন্ত্র সকল যে ভাবে অবস্থিত ছিল, দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহা বিপর্য্যস্ত হইল। অন্ত্র, শ্বাসনালী প্রভৃতির সহস্র রোগ,—পাথুরী, হার্ণিয়া, যকৃৎ, ক্ষয়কাশের সেই দিন হইতে মনুষ্যদেহে সূচনা হইয়াছে। স্ত্রীলোকে পুরুষের সহিত এই দুর্ভাগ্যের ভাগী হইয়াছে। কিন্তু দাঁড়াইবার জন্য কোষবৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি রোগ ভিন্ন পুরুষের জননযন্ত্রের বিশেষ অপকার হয় নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রসবকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দাঁড়াইবার হেতু শিশুর মস্তক দিন দিন বৃহৎ হইয়াছে; পক্ষান্তরে দাঁড়াইবার জন্য প্রসবযন্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। চতুষ্পদ অবস্থায় ভ্রূণ যত সহজে বহিষ্কৃত হয়, দ্বিপদ অবস্থায় তত হয় না। এ জন্য এখনও প্রসবকালে স্ত্রীলোককে চতুষ্পদভাব অবলম্বন করিতে হয়। ব্যাবৃত্তি উপলক্ষে স্ত্রীলোককে যত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, পুরুষকে তত হয় নাই। প্রসবযাতনায় যাহাদের মৃত্যু হয়, ব্যাবৃত্তির উন্নতিপথে আরোহণ করিতে তাহারা অক্ষম। জীবন-সংগ্রামে যে সকল স্ত্রীলোক বাঁচিয়া যাইতেছে, তাহাদের কন্যাগণ নূতন অবস্থার তত উপযোগী হইতেছে; লাইকার্গাসের আইনে পঙ্গু অন্ধ দুর্ব্বল শিশুকে জন্মমুহূর্ত্তে হত্যা করা হইত, স্পার্টার সামরিক জীবনের তাহারা উপযোগী হইত না। জীবন-সংগ্রামের যাহারা উপযোগী নহে, উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে যাহারা অক্ষম, লাইকার্গাস অপেক্ষা কঠোর হস্তে বিধাতা তাহাদিকে উৎপাটিত করিয়া পৃথিবী হইতে অপসারিত করেন। সুস্থ সবল পুত্রকন্যা এ ধূলিকর্দ্দমময় পৃথিবীর অপেক্ষা উচ্চতর স্থানের অধিকারী, তাই ভগবান স্বর্গে সরাইয়া রাখেন, এই বলিয়া যাহারা হৃদয়কে সান্ত্বনা দেন, বিজ্ঞানের এ কঠোর মীমাংসা তাঁহাদিগকে হতাশ্বাস করে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

অপেক্ষা।

১

কয় বৎসর পনের টাকা বেতনে নানা স্থানে ব্রাঞ্চ পোষ্ট-আফিসে পোষ্ট-মাষ্টারী করিয়া আমি উন্নতির প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলাম; কুড়ি টাকা বেতনে মধুপুর পোষ্ট-আফিসে ঠিকা পোষ্ট-মাষ্টার নিযুক্ত হইলাম। মধুপুর অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। স্বাস্থ্য ও বেতন উভয়েরই উন্নতির আশায় আমার কল্পনা মধুপুরকে মধুপুরই দেখিতে লাগিল।

রাত্রির গাড়ীতে মধুপুরে উপনীত হইলাম। পরদিন কার্য্যভার লইব। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্ট-মাষ্টারের সহিত ডাক কাটিলাম, চিঠি বাছিলাম। হরকরারা বিলি করিতে বাহির হইবে, এমন সময় সহসা আফিসঘরের বারান্দায় যেন মৃত্যু ও জীবন একত্র উপনীত দেখিলাম। দুই জন ইংরাজমহিলা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন; প্রথমা বৃদ্ধা—বিষণ্ণাননা; দ্বিতীয়া যুবতী, অনিন্দ্যসুন্দরী—সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের নিটোল সৌন্দর্য্য, কিন্তু নয়নে ও আননে চাঞ্চল্যচিহ্নমাত্র নাই—গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। উভয়েরই বেশ সাদাসিদা।

আমি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমার কোনও পত্র আছে?"

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্ট-মাষ্টার নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "না।"

বৃদ্ধা ও যুবতী এই সংবাদের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

পূর্ব্ববর্ত্তী পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "আমি এ আফিসে আপনাকে যে সকল জিনিস বুঝাইয়া দিয়া যাইব, তাহার একটি এই।" 25, 855

আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, "চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই আফিসে আসি, তখন আমার পূর্ব্ববর্ত্তীও আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর এই আফিসে ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীও তাঁহাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম, "আসল ব্যাপারটা কি?"

তিনি বলিলেন, "বৃদ্ধা কোন নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্রের আশায় প্রতিদিন পোষ্ট-

আফিসে সন্ধান লইয়া থাকেন। সে পত্র আইসে না। মধ্যে মধ্যে কচিৎ কোন পত্র আসে, তাহাতে বৃদ্ধার মন উঠে না।"

"যুবতী কি বৃদ্ধার কন্যা?"

"না—আত্মীয়া। বৃদ্ধার মস্তিষ্ক বোধ হয় বিকৃত।"—এই বলিয়া তিনি হাস্য করিলেন।

নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য মাতৃহৃদয়ের বেদনাময় ব্যাকুলতায় এ উপহাস আমার ভাল লাগিল না। আমি বাল্যে মাতৃহীন। মৃত্যুশয্যায় মা আমার মুখে চাহিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছিলেন—এ অসহায় বালককে কে দেখিবে? তাঁহার মৃত্যুর পর পিতা আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতার ব্যবহারে আমি যাতনা পাইয়াছি, আমার জন্য পিতাও কেবল কাঁদিয়াছেন। তখনও বড় যাতনায় কাঁদিয়া ডাকিয়াছি,—"মা আমার, তুমি কোথায়?" আজও সংসারের স্রোতে লঘু তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে যখন দুঃখাবর্ত্তে আর উদ্ধারের উপায় দেখি না, তখন কাঁদিয়া ডাকি,—"মা আমার, তুমি কোথায়?" উদ্ধার পাইলে মনে করি, সেই স্নেহময়ীর পুণ্যবলেই আমি—অধম সন্তান—উদ্ধার পাইলাম। আজ নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য জননীর ব্যাকুলতায় আমার হৃদয়ে সেই কথা জাগিয়া উঠিল; আমি কথা কহিতে পারিলাম না।

স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, আমার এ ভাব আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয়ের ভাল লাগিল না।

২

জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত দুঃখ ও কঠোর কর্ত্তব্যের দারুণ যন্ত্রণায় একটি বৎসর কাটিয়া গেল। বৃদ্ধা প্রতিদিন প্রাতে যুবতীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন, জিজ্ঞাসা করিতেন, "মহাশয়, আমার কোনও পত্র আছে?" আমি উত্তর করিলে তাঁহারা ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিতেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার নামে দুই তিনখানি পত্র আসিয়াছিল। আমি সাগ্রহে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম, তিনি আসিলে সে পত্র দিতাম। কিন্তু পত্র দেখিয়া বৃদ্ধা বিষণ্ণভাবে মস্তক-সঞ্চালন করিতেন, "এ পত্র নহে।" সে পত্র তিনি স্বয়ং পাঠও করিতেন না, যুবতীকে ডাকিয়া দিতেন, "মড, এই লও।" রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই—বৃদ্ধা যুবতীকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ পুত্রের পত্রের সন্ধানে আসিতেন। হায় মাতৃহৃদয়!

আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম, আমি তাঁহাকে যে শ্রদ্ধার ভাব দেখাইতাম,

তাহাতে বৃদ্ধা আমাকে ধন্যবাদ দিতে ব্যগ্র হইতেন। বুঝিতে পারিলাম, এ সামান্য প্রত্যুপকার তিনি আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিকট প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ক্রমে এমনই হইল যে, ডাক আসিলে আমি সাগ্রহে তাঁহারই পত্রের সন্ধান করিতাম, সে পত্র না পাইয়া হতাশ হইতাম। যদি এক দিন নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্র দিয়া মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা নিবারিত করিতে পারিতাম! কিন্তু আমার দুর্দ্দশা-দাবানল-দগ্ধ জীবনের কোন আশা—কোন বাসনা পূর্ণ হইয়াছে?—দীর্ঘ এক বৎসর বহিয়া গেল—আমার সে আশা পূর্ণ হইল না—সে পত্র আসিল না।

বৃদ্ধা প্রতিদিন আসিয়া পত্রের সন্ধান লইতেন—জিজ্ঞাসাকালে আশায় ও উদ্বেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইত; সে পত্র আসিল না দেখিয়া ফিরিবার সময় তাঁহার বিষণ্ণ মুখে বিষাদের ছায়া যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিত।

এই মহিলাদ্বয়ের পরিচয় জানিবার জন্য মনে কৌতূহল জন্মিত; কিন্তু ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম না। হরকরারা স্থানীয় লোক। কিন্তু তাহারা, বা অন্য কেহই তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় বা অবস্থার বিষয় বিশেষ কিছু বলিতে পারিত না। তাঁহারা যেন চারি দিকের সকল হইতে স্বতন্ত্র; সকলের মধ্যে থাকিয়াও স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত। আর যে কয় ঘর য়ুরোপীয় মধুপুরে ছিলেন, তাঁহাদের গৃহে কোনও কর্ম্মোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইলে ইহারা অতি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেন—পারিবারিক কারণে নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অক্ষমতা জানাইতেন। ক্রমে তাঁহারা ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। সকলেই ইহাদিগকে প্রহেলিকার মত মনে করিত।

যাহা হউক, এক বৎসর পরে তাঁহাদিগের পরিচয় জানিবার সুযোগ অপ্রত্যাশিতরূপে উপস্থিত হইল।

৩

শীত কেবল গিয়াছে। বাতাস নাতিশীতোষ্ণ—মধুরস্পর্শ। পিক-কণ্ঠে বঙ্গের স্বরায় বসন্তের সাড়া পড়িয়াছে; পলিতপত্র রিক্তশাখ তরুর সর্ব্বাঙ্গে নবীন পল্লব-শ্রী কেবল বিকশিত হইয়া উঠিতেছে—তখনও নবপল্লবে তরুলতার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। মাঠে শিমুলগাছগুলি উজ্জ্বল লোহিত কোমল পুষ্পে পূর্ণ—দূর হইতে এক একটি বৃক্ষ এক একটি লোহিত পুষ্পস্তূপ বলিয়াই অনুমিত হয়। অন্যান্য বৃক্ষেও কেবল দুই চারিটি ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। মধুপুরে উদ্যানে উদ্যানে গোলাপের আর অন্ত নাই। আমি আফিসের প্রাঙ্গণে যে কয়টি গোলাপগাছ লাগাইয়াছিলাম, তাহাদের নবীন শাখাও ফুলভরে নত হইয়া পড়িয়াছে।

অপরাহ্নে আর আফিসঘরে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না, ভ্রমণে বাহির হইলাম।

বেড়াইতে বেড়াইতে গ্রামের যে দিকে উপনীত হইলাম, সে দিক অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সে দিকে কয় ঘর য়ুরোপীয়ের বাস। রাজপথ পরিচ্ছন্ন—উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ-সংরক্ষিত উদ্যানমধ্যে সুদৃশ্য গৃহ—নয়নারাম। উদ্যানে কুসুম-শোভা। কোথাও বা তাহারই মধ্যে স্বাস্থ্য-লাবণ্য-শ্রী-সম্পন্ন সুন্দর বালকবালিকারা খেলা করিতেছে,—প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে; কোথাও বা শ্যামশষ্পাস্তৃত ভূমিখণ্ডে পুরুষ ও মহিলারা ক্রীড়ারত, অথবা বেঞ্চে বা চেয়ারে বসিয়া হাস্যবহুল আলাপে নিযুক্ত। আমি সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম।

কয়টি গৃহ অতিক্রম করিয়া একটি কোলাহলহীন গৃহের দ্বারে উপনীত হইলাম। বৃদ্ধা সেই গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে অভিবাদন করিলেন, এবং আমি প্রত্যভিবাদন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বুঝি আপনার গৃহ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "এই আমার কুটীর।"

প্রাঙ্গণে উপবনে রাশি রাশি গোলাপ ফুটিয়াছিল। আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "কি সুন্দর ফুল!"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আপনি ফুল ভালবাসেন? হাঁ, তাই ত। মড আমাকে বলিতেছিল, আপনি ডাকঘরের প্রাঙ্গণে উদ্যান রচনা করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া ভিতরে আসুন। গুটিকতক ফুল লইবেন।"

আমি উদ্যানে প্রবেশ করিলাম।

এক জন মালী উদ্যানে গোলাপফুল কাটিয়া বাক্স পূর্ণ করিতেছিল। বৃদ্ধা তাহাকে আমার জন্য একটি তোড়া বাঁধিতে বলিলেন।

নিকটে একখানি বেঞ্চ ছিল। বৃদ্ধা আমাকে তাহাতে বসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং স্বয়ং উপবেশন করিলেন। আমিও বসিলাম।

দুই একটি কথার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে মহিলাটিকে আপনার সঙ্গে দেখিতে পাই, তিনি কি আপনার দুহিতা?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "মড আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে আমার দুহিতার অধিক।"

"আপনার সংসারভুক্তা?"

হাঁ। সে নহিলে আমি মুহূর্ত্ত থাকিতে পারি না। সহস্র দুঃখে সে আমার সুখ। তাহার উপর অন্য নাই।"

"আপনি কত দিন এখানে আসিয়াছেন?"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "সে অনেক দিন—নয় বৎসর হইল। ভগবান আমাদের দুই জনের দুঃখের জীবন এক পথে প্রবাহিত করিবার পরই আমরা এই স্থানে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর দুঃখ-বিগলিত।

তিনি পুনরায় বলিলেন, "বাবু মত ও আমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, আপনি এই দুঃখিনী রমণীদ্বয়ের প্রতি বিশেষ দয়া দেখাইতেছেন। আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব!"

আমি বলিলাম, "আমি শুনিয়াছি, আপনি আপনার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পথের আশায় পথ চাহিয়া আছেন। আমি অল্প বয়সে মাতৃহীন। মাতৃস্নেহের সুখময় অধিকার আমার পক্ষে জননীর বেদনা বড় দুঃসহ।"

বলিতে বলিতে আমার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধা কাতরস্বরে বলিলেন, "বৎস, সুখদুঃখ ভগবানের দান দুঃখ করিয়া কি করিবে? তবে মন বুঝে না। শান্ত হও। আমার দুঃখ-কাহিনী শুনিলে তুমি হয় ত তোমার দুঃখ সহনীয় বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমার সান্ত্বনা হইবে।"

৪

বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন :—

"আমার স্বামী সেনাবিভাগে কর্ম্মচারী ছিলেন। একটি যুদ্ধে অসাধারণ সাহস ও রণনিপুণতা দেখাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর আমার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমার স্বামী সেনাদলে ছিলেন; উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সে আজ পঁচিশ বৎসরের কথা।

"বিবাহের তিন বৎসর পরে আমার পুত্র এরিক জন্মগ্রহণ করে। সে-ই আমার সুখ সুখ—সে-ই আমার সব দুঃখ।

"পাঁচ বৎসর পরে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার মাতৃহীন, কন্যা ভাতে আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তখন ভাতের বয়স এক বৎসর মাত্র। আমি তাহাকে সন্তানেরই মত পালন করিতে লাগিলাম। আমার আর কোনও সন্তান হয় নাই। কিন্তু আমি এক দিনও কখনও অভাব অনুভব

[illegible] মতও আমাদের [illegible] অনিচ্ছা। [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible]

করিতাম, ইহাদের বিবাহ হইলে আমরা আর কেমন সুখ পাই না, তাহাই মনে মনে বলিয়াছি, তাহাই আমাদের একান্ত কামনা।

"সে কামনা পূর্ণ হইবার পূর্বেই স্বামী চলিয়া গেলেন। সে শোক অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলে দেখিলাম, এরিকের আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে। গৃহে তাহার যে প্রবল আকর্ষণ ছিল, তাহার হ্রাস হইয়াছে। নানা বয়গৃহে নানা, সমিতি প্রভৃতি ক্রমেই তাহাকে গৃহ হইতে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল।

"শেষে একদিন আমি এরিককে স্পষ্ট বলিলাম, 'এরিক, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, পৌত্রপৌত্রীর মুখ দেখিয়া মরিতে ইচ্ছা করি।'

"এরিক বলিল, 'মা, কাজ কেন?'

"আমি বলিলাম, 'বৎস, তুমি মনের বিবাহ করিলেই আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়।'

"এরিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, 'সে কি?'

"আমি বলিলাম, 'তোমার পিতারও এই ইচ্ছা ছিল। মনে আলোকে ভূষিতাই মনে।'

'আমি না, কেন সহসা কেন এরিকের দৌর্বল্যবৃত্তি হইল। সে নিশ্চয় অন্য তাহাদেরও বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। সে বলিল, 'তোমার তাহার অর্থের জন্য ও বিবাহে এত অভিলাষী।'

"মনের প্রবল অর্থ ছিল সত্য, কিন্তু কৈ, সে কথা ত আমাদের মনেও হয় নাই। পুত্র এরিকের এ কথায় আমি বড় ব্যথা পাইলাম, বলিলাম, 'এরিক! এতদূর অধঃপতিত না হইলে তুমি তোমার জনক জননীকে এত নীচ মনে করিতে পারিতে না।'

"এরিক নির্বাক হইয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'তুমি জান, মন আমার কন্যার অধিক, তোমা হইতেও অধিক প্রিয়।'

"এরিক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'ভালই, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।'

"ক্রোধে আমি সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

"ইহার পর দুই দিন আমি এরিকের সহিত কথা কহিলাম না; এরিকও আমার সঙ্গে কথা কহিল না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম,—সে গম্ভীর—চিন্তিত।

"তৃতীয় দিবস সে কার্যালয়ে আফিসে গেল; কিন্তু আর ফিরিল না। আমি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, রাত্রি হইল, সে আসিল না। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া আফিসের বড় কেরাণি মিঃ ডে

পত্র লিখিলাম। তাঁহার উত্তর পাঠ করিয়া আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে তাহার ব্যবসায়ের অংশ বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছে! সমস্ত রাত্রি আমরা দুই জন পরিয়া অশ্রুবিসর্জন করিলাম।

বারুণ দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল; ক্রমে বীর্য দুই মাস কাটিল। এদিকের সংবাদ আসিল না। মডের দশা দেখিয়া আমি আমার দুঃখ চাপিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মডের মলিন মুখে আমি আর হাসি দেখি নাই।

"খ্রাডকলীয় কেমিলোহ্নর সমাজ আমাদের মত দুঃখিনী রমণীর জন্য নহে। অনন্দ আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক। দুই মাস পরে আমরা কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এক জন বন্ধু আমাদের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এই কুটীর কিনিয়া দিলেন। আমি আমার স্বামীর বহুমূল্যের যন্ত্র পুস্তকগুলি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছি। মড কিছুতেই তাহা করিতে দিল না। কলিকাতার সেণ্ট-আন্ড্রুসে ঠিকানা রাখিয়া আমরা এই স্থানে আসিয়াছি। সেই সব পুস্তক পুস্তকে অর্ধাংশ মুড়িয়া আছে। মড সর্বদা সেই সব পুস্তক নাড়ে, চাড়ে, ওল্টায়। ঐ দেখ।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম,—একটি ফলের বাতায়ন মুক্ত, কক্ষমধ্যে টেবিলে আলোক জ্বলিতেছে; মত টেবিলের উপর পুস্তক ওল্টাইতেছে।

বৃদ্ধা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"মডের আকৃতিগত সাদৃশ্যেও আমি তাহার অর্ধেক সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি নাই। তবে আমাদের অভাব অল্প। উদ্যানে যে শাক হয়, তাহাতেই আমাদের অভাবমোচন হয়। আমি স্বদেশ হইতে মত আলুকে সাদা রোগ—এরক নিশ্চয় লিখিয়া জানিব। কিন্তু আমি শত দিন দেখিয়াছি, এদিকের জলবায়ু তাহাদিগকে সাদা রোগ হইবার সময় যে নীরোগ পরিবর্তন করিতেছে।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বৃদ্ধাও চক্ষু শুষ্ক রাখিতে পারিলাম না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছে।

অনেক পরে আমি বিদায় লইলাম। বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আপনাকে রাখিয়া আসুক।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "রাত্রি নাই। চন্দ্রালোক আছে। আমি একাকী ভ্রমণ করিতে ভালবাসি।"

বালী স্টেশন উপস্থিত হইয়া বিদায় লইলাম। আমি আসিবার সময় তাহা

লক্ষ্য করি নাই। বৃদ্ধা আমাকে ডাকিয়া সেটি দিলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম। জননীর স্নেহসিঞ্চিত ব্যাকুলতা ও যুবতীর সভক্তি প্রেমের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি আমার নির্জ্জন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

৫

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রযুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিল। মুষ্টিমেয় কৃষক স্বাধীনতা ও স্বদেশের জন্য সলিলের মত দেহের শোণিত ব্যয় করিয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিতে লাগিল। একদিন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বৃদ্ধার নামে একটি টেলিগ্রাম কলিকাতা ঘুরিয়া আসিল।—"এরিকের শেষ প্রার্থনা, মা ও মড ক্ষমা কর।"

পড়িয়া আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলাম। একবার ইচ্ছা হইল, এ সংবাদ পাঠাইব না। কিন্তু হায়, সংবাদ গোপন করি কেমন করিয়া? অগত্যা পাঠাইয়া দিলাম।

অপরাহ্নে স্বয়ং যাইয়া মালীর নিকট সংবাদ পাইলাম, টেলিগ্রাম পাইয়া বৃদ্ধা ও মড উভয়েই অধীরা। আমি ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর বৃদ্ধা আর ডাকঘরে আসিতেন না। আমি মধ্যে মধ্যে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসিতাম। আমার গমনবার্ত্তা পাইলে বৃদ্ধা ও মড আমাকে ডাকিতেন। বৃদ্ধার জীবনীশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। মড শান্ত হইয়া অক্লান্তভাবে বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তৃতীয় সপ্তাহের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বৃদ্ধার নামে পত্র কলিকাতা ঘুরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ডাক বাছিয়া আমি স্বয়ং সেই পত্র লইয়া বৃদ্ধার গৃহে উপনীত হইলাম। কয় দিন পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধা শয্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমার গমনবার্ত্তা পাইয়া মড পার্শ্বের কক্ষে আসিলেন। তিনি কম্পিতকরে পত্রখানি খুলিলেন, কিছু দূর পাঠ করিয়া নিকটবর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে বৃদ্ধা ডাকিলেন,—"মড!" যুবতী ত্রস্তে আত্মসংবরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন, পত্রখানি পকেটে রাখিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি দ্বার হইতে আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

যুবতীকে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "মড! তুমি কাঁদিয়াছ।"

যুবতী নীরব রহিলেন।

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমাকে কিছু লুকাইও না। কি হইয়াছে?"

নত-বদন হইয়া যুবতী বলিলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পত্র আসিয়াছে।"

বৃদ্ধা সাগ্রহে বলিলেন, "পাঠ কর।"

এরিক সেনাদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে গিয়াছিলেন। সেনাপতি জননীকে তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ জানাইয়াছেন। যুবতী পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিতে লাগিল; বৃদ্ধার পাণ্ডুর আনন আরও পাণ্ডুর হইয়া গেল।

পত্রের শেষাংশে আসিয়া যুবতী বলিলেন, "আমাদের এরিক যোদ্ধার মত বীরের মত মরিয়াছে; অপরের প্রাণরক্ষার্থ অসাধারণ সাহস দেখাইয়া আহত হইয়াছে। সেনাপতি লিখিতেছেন, তিনি তাহাকে সৈনিকের অত্যুচ্চ পুরস্কার ভিক্টোরিয়া ক্রস দিবার জন্য লিখিয়াছিলেন।"

এই কথা শুনিয়া সৈনিক-সীমন্তিনীর পাণ্ডুগণ্ডে ও কপালে মুহূর্ত্তের জন্য রক্ত সঞ্চারিত হইল,—অশ্রু-সজল নয়নে আলোক ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"ভগবানকে ধন্যবাদ।"

পরদিবস ইয়র্কশেষ্টর আসিলেন। আমার আর বৃদ্ধার সংবাদ লইতে যাওয়া হইল না। তাহার পরদিবস সংবাদ লইবার জন্য যাইয়া উদ্যানের দ্বার হইতে দেখিতে পাইলাম, বিকশিত উদ্যানের এক পার্শ্বে বিধবাবেশধারিণী মড একটি সদ্যঃসমাপ্ত সমাধির শিয়রে দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

উপেক্ষিত।

জগৎ কাব্যের মাঝে যত আছে শ্রেষ্ঠ গান,
বিপুল ধরার বুকে যত আছে রম্যস্থান,—
সবই সে চরণে তব ঢেলে দিয়ে মুগ্ধ কবি
আঁকিয়া গিয়াছে তব মনোজ্ঞ মধুর ছবি!
কোথায় তমসা-তীরে, চিত্রকূট-গিরি-শিরে,
মালিনীর স্বচ্ছনীরে চিরাঙ্কিত উপাখ্যান!
সাগরিকা, মালবিকা, বকুলিকা, নিপুণিকা,
প্রিয়ম্বদা, মাধবিকা,—শত নামে পূর্ণ প্রাণ।
জানিনাক কোন ভ্রমে ভুলে গিয়ে অন্ধ কবি
আঁকেনিক বন্ধুতার মহান্ সরল ছবি;
কোন দোষে উপেক্ষিত হে মিত্রতা, হে মহান্,
কোন গুণে তোমা হ'তে প্রেম উচ্চ গরীয়ান!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ভবানন্দের 'হরিবংশ'।

হরিবংশ একখানি সুবৃহৎ প্রাচীন গ্রন্থ। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত ৯৮ পত্রে ইহা সমাপ্ত। ইহার লিপিকাল ১১৯২ মঘীর ২রা ফাল্গুন। সে আজ ৭৩ বৎসরের কথা। আমাদের নিকট এতদপেক্ষাও প্রাচীন ইহার আরও কয়েকখানি খণ্ডিত প্রতিলিপি সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে কোন কোনখানি সার্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কালের লিখিত বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রণেতার নাম দ্বিজ ভবানন্দ। গ্রন্থের সর্ব্বত্র ভণিতা এইরূপ,—

"পরাশরসুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ। সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্য শ্লোক হরিবংশ॥ লোকে বুঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে॥"

গ্রন্থ-মধ্যে কবির যে সামান্য পরিচয়টুকু আছে, তাহা এই,—

"সত্যবতীসুত ব্যাস করিলেক প্রকাশ সর্ব্বলোকে বুঝিবারে পয়ার রচিল তাঁরে
হরিবংশ শ্লোক পদবন্ধে। শিবানন্দ-সুত ভবানন্দে॥"

কবির পিতার নাম শিবানন্দ। আমরা ভবানন্দের গ্রন্থ হইতে তাঁহার আর কোনও পরিচয়ই পাই নাই। অন্য উপায়েও তাঁহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যে বঙ্গীয় কবি-কুল নিতান্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন। যে কয় জন প্রাচীন কবির বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। পুরাকালে যে সকল বঙ্গীয় কবি বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কীর্ত্তিকলাপও অদ্যাপি আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, বঙ্গের সর্ব্বত্র এখনও বিলুপ্তপ্রায় পুঁথিগুলির উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে না।

এই গ্রন্থের রচয়িতা কোন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, যদিও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দুর্লভ, তথাপি আমরা অনুমান করি, তিনি চট্টগ্রাম-বাসী ছিলেন। গ্রন্থের ভাষায় অনেক স্থলে চট্টগ্রামী বিভক্তি ও শব্দাদির প্রয়োগ দেখিয়াই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

ভবানন্দের রচিত আর কোনও গ্রন্থ আছে কি না, বলিতে পারি না। এত দিন আমরা তাঁহার রচিত বহুল বৈষ্ণব পদাবলী নানা পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেছিলাম; তাহার অধিকাংশ পদই এই 'হরিবংশে'র অন্তর্গত। চট্টগ্রামের প্রাচীন

রাগ-তাল-সম্বন্ধীয় পুঁথিতে ভবানন্দের এইরূপ অসংখ্য গীত পরিদৃষ্ট হয়। তাহার সবগুলিই যে 'হরিবংশে' আছে, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, তিনি 'হরিবংশ' ব্যতীত বহুসংখ্যক বৈষ্ণব গীতেরও রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রীরাধার লীন হইবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা সংক্ষিপ্ত নহে। ভবানন্দের কাব্য সংস্কৃত মূল হরিবংশের অবি-কল অনুবাদ নহে। সে কালের অনুবাদে অনেক স্থলে নূতন সৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভবানন্দ কবিত্বসম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ কবিত্ব-হিসাবে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। ভাষা অনুগতা দাসীর ন্যায় তাঁহার লেখনীর অনুসরণ করিয়াছে। অশ্লীলতারও অভাব নাই। এই রুচি-বিকৃতির কথা ছাড়িয়া দিলে হরিবংশের কবিত্বের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। কবির রচনায় লালিত্য ও মাধুর্য্য কর্ণে মধুবর্ষণ করে। কবি এই কাব্যে বিবিধ রাগ রাগিণীতে গেয় বহুবিধ মধুর সঙ্গীত বা 'পদে'র রচনা করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, কবি যদি রাধাকৃষ্ণের বিহারবর্ণনায় একটু সংযত হইতেন, তাহা হইলে হরিবংশ বঙ্গ-সাহিত্যে গণনীয় ও নিত্যপঠনীয় পুঁথি হইতে পারিত। বীভৎস আদিরসের এমন ছড়াছড়ি বাঙ্গালায় আর কোনও গ্রন্থে আছে কি না, বলিতে পারি না। এই 'হরিবংশ' হিন্দুর পবিত্র গ্রন্থ। প্রসিদ্ধি আছে, না বুঝিয়া হরিবংশ পাঠ করিলে নির্ব্বংশ হইতে হয়। লোকে প্রকৃতই 'হরিবংশ' পাঠ করিতে ভয় করে। বোধ করি, আদিরসের বাহুল্যবশত এইরূপ প্রবাদসৃষ্টি ও তাহার ফলে গ্রন্থের পঠন নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে। সে যা হউক, কবির রচনাপ্রণালী ও কবিত্ব এত লোভনীয় যে, উক্ত অমার্জ্জনীয় দো সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। নিম্নে আমরা ভবানন্দ কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি।—

রাগ ধানশী।

কালার ভাবে সদাএ আকুল মোর হিআ। ধু
এ ধন যৌবন দিআ, শ্যামেরে সমুখে থুইআ,
দেখি রূপ নআন ভরিআ॥
যে বোল বোলউক লোকে, যার মনে যেই দেখে,
ননদীএ বোলউক অসতী।
গুরু গৌরবিত জনে, বোলউক যে লয় মনে,
ছাড়ে ছাড়উক্ নিজ পতি॥
শ্রবণে কুণ্ডল দিআ, যোগিনীর ভেশ* হইআ
যথা তথা যাইমু মনদুখে।
কাণুর বিরহে মোর, তনু হৈল জর জর
কি বলিব গোকুলের লোকে॥
মুই যদি এমত জানো, যমুনা পুলিনে কা
ত' কেনে ভরিতে যাই জল।
বেহানে পড়িছে বাধা, কুলের কলঙ্কিনী রা
পাইলু তাহার প্রতিফল॥

* ভেশ—বেশ।

শুনহ পরাণের সই, তোহ্মাতে মরম কহি,
মোর রূপ কালার অধীন।
অনিমত মনে ভাবি, রাতুল চরণ সেবি,
রচিলেক ভবানন্দ দীন॥

রাগ বসন্ত।

আইস রে সোণার বন্ধু, রাখো হিআর মাঝে রে।
প্রাণ ছাড়ি গেলে বন্ধু কি করিব লাজেরে।
নআনে সদাএ দেখো ঐ মোর সাধ।
কেশে বান্ধিআ রাখো কালা পাট জাত॥
কাজল না হএ বন্ধু নয়ানে পরিতুম।
কালা পুতি নহে বন্ধু গলে গাথি দিতুম॥
সহজে হইনু দাসী না ভাবিঅ ভিন।
রাধার সুবাদ কহে ভবানন্দ দীন॥

রাগ—আহীর।

আম বন্ধু কালারে রতন।
কেমতে যাইমু ঘরে উদিত তপন॥
ডাকে করে কলরব চিকুরে কোকিল।
সুখ্য জাগিলে মোর যাইব জাতিকুল॥
দিনকর কিরণে জানি অবশেষ। (?)
আন্ধারে পৈরাও বন্ধু তোহ্মার জে ভেশ॥
বদন পদ্ম দিআ আন্ধারে কর কালা।
বন্ধুর গলাতে দেঅ তোহ্মার বনমালা॥
তোহ্মার জে পীত ধাড়া আন্ধারে দেঅ পৈরি।
আন্ধার হস্তেতে দেওরে তোহ্মার মুরারি॥
কুবরী বসাইআ বন্ধু বান্ধিআ দেঅ চূড়া।
দোহুতী গাথিআ দেঅ মালতীর মালা॥
বরিহা বান্ধিআ দেয় তাহার উপরে।
এরূপ দেখিলে লোকে না পুছিব মোরে॥
তোহ্মার সমান ভেশ সাজাই মোরে দেঅ।
প্রেমসখা বলিমু লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ॥
বিলম্ব উচিত নহে শুন প্রাণবন্ধে।
ঘরে চলি যাও বোলে দীন ভবানন্দে॥

রাগ ভূপালী।

প্রাণবন্ধুরে মুই বুরিমু কথ। (১)
খোয়ারি রাধার গাএ কথ সহিব এথ॥
শিশু হোতে তোহ্মার চরিত্র জানি ভালে।
বেহানের কথা কৈলে না রয় বিকালে॥
আগে মিঠা দিআ বন্ধু তিতা দিঅ পাছে।
রসবতীর মিত হেন কোনে বলিআছে॥
কুমারের পোথানি (২) তোহ্মার পিরীতি কেবল।
বাহিরে লেপনা দিআ ভিতরে আনল॥
ভাবিতে পাপ্পর শেষ কুরিতে বিরহে।
হরিপদতলে দীন ভবানন্দে কহে॥

এ গ্রন্থে এরূপ সঙ্গীতের অভাব নাই। কিন্তু স্থানাভাবে আর উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

বোধ হয়, কবি ভবানন্দ সঙ্গীতশাস্ত্রেও বিশারদ ছিলেন। তিনি যে সকল রাগ রাগিণীর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সঙ্গীতশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে তাহাদের বহার সম্ভবপর হইত না। ভাটিয়াল, তুড়ি, বড়ারি, নট, পটমঞ্জরী, বসন্ত, গুরী, শাম (?), সারঙ্গ ভৈরবী, গান্ধার, নাগদস্তা, বেলোয়ার, প্রেমবারি, দুঃখী ারি প্রভৃতি রাগ রাগিণীতে গেয় বহু গীত এই কাব্যে বিদ্যমান। 'ত্রিপদী' এই চিহ্ন 'লাচারি' নামে অভিহিত। চতুর্দ্দশাক্ষরী পদগুলি কোথাও 'পয়ার' এবং থাও বা 'পদবন্ধ' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'পয়ার' শব্দটি কোথা হইতে

(১) কথ—কত।

(২) পোথানি—কুম্ভকারের ভাঁটি।

পাসিল, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়ের মতে 'পাদ' শব্দ হইতে 'পয়ারের' উৎপত্তি হইয়াছে। বিরুদ্ধ-মত-স্থাপনে অক্ষম হইলেও উক্ত মতের ভ্রমাত্মকতায় আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। 'পয়ার' শব্দটি সর্ব্বপ্রথমে কোন্ কবি কোন্ কাব্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানা গেলে, সম্ভবতঃ এ তর্কের মীমাংসা হইতে পারে। পূর্ব্বে 'পদ্যকার' হইতে 'পয়ার' আসিয়াছে, এই-অনুমান করিয়া আমরা রমেশ বাবুকে লিখিয়া পাঠাইয়াছি। রচনার নমুনাস্বরূপ নিম্নে 'পদ্যকার'-হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্রবণে শোভিছে ভালো অরুণ কুণ্ডল। সকুতার হার তাতে অধিক শোভিছে।
চন্দ্র জিনি শোভা করে দুই গণ্ডস্থল॥ সুরেশ্বরী ধারা দেখি হইল লজ্জিত॥
নাসিকা শোভিছে যেন খগপতি জিনি। ভাল ভুজদণ্ডে তোর কঙ্কণ সে সাজে।
চলিতে চঞ্চল কিবা খঞ্জনগমনী॥ পদ্মে মৃণালদণ্ড প্রবেশিল লাজে॥
লোচন কমল যেন অতি মনোহর। কনক দাড়িম্ব জিনি বন্ধিয়া অধর।
কামের কামান যেন দেখিতে সুন্দর॥ অমৃতের ধারা যেন করে নিরন্তর॥
ললাটে উজ্জ্বল তোর সিন্দূরের ফোঁটা। হেন লয় মোর মনে প্রাণি দিনু ডালি।
শরতের চন্দ্র জিনি বিদ্যুতের ছটা॥ কেবা দিআছে তোরে বিমল কাঁকুলি॥
চিকুর চামর জিনি নাই তার মূল। ইত্যাদি।
দোলতী মালিআ দিছ মালতীর ফুল॥

এই কাব্যে এমন অনেক নূতন শব্দ ও বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, যাহা অধুনা 'অপ্রচলিত' পর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে সকলেই নারীগণের 'পতিনিন্দা' পাঠ করিয়াছেন; এই গ্রন্থেও তাহার কতকটা বিদ্যমান, কিন্তু নিতান্ত অশ্রাব্য বলিয়া আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। সে কালের হিন্দুগণ স্ত্রীজাতির কিরূপ নাম রাখিতেন, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।—

"কামেশ্বরী পদ্মিনেত্রা সুরেখা কমলা। নেত্রাবতী কুরঙ্গাক্ষী আর ধন্যমানী।
চন্দ্রাবতী চন্দ্রমালা আর চন্দ্রকলা॥ অর্ককলা বিজয়া যে রোহিণী মোহিনী॥
সাবিত্রী সুগন্ধা সুমিত্রা লজ্জাবতী। রাধাবতী পূর্ণিমা চন্দ্রমা সুন্দরী।
কনকা কমলামুখী অম্বিকা যুবতী॥ অর্কপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরিকা সুন্দরী॥
অঞ্জনা খঞ্জনা দয়া চন্দ্রিকা মালতী। সীতা তারা পদ্মাবতী উর্ম্মিলা রূপসী।
বিষ্ণুপ্রিয়া মহাবিষ্ণু শ্যামা অদিতি॥ মনোরমা কামাখ্যা জয়নি (?) উর্ব্বশী॥
অরুণী অপরাজিতা বিনতা চন্দ্রমুখী। গঙ্গাপ্রিয়া পদ্মাবতী রম্ভা রূপেশ্বরী।
সুধামুখী রমাবতী আর চন্দ্ররেখা॥ অহল্যা চন্দ্রিকা আর কালিন্দী সুন্দরী॥

যমুনা কালাখ্যা প্রভাবতী চিত্রাঙ্গদা। উষাবতী সমদলা শশীলা যুবতী।
হরিপ্রিয়া ভানুবতী জয়া অনুরাধা। দময়ন্তী দেবজানি ভৈরবী জয়ন্তী" ইত্যাদি।

প্রাচীন সকল গ্রন্থই ভাষালোচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেকালের ভাষা ইদানীন্তন কালের মত এমন বিদেশীয়-গন্ধ-যুক্ত ছিল না; ভাবরাশিও অকৃত্রিম ছিল। সরলতা সেকালের ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। অধুনা আমরা সারল্যকে বনবাস দিয়া দুরূহতাকে আশ্রয় করিয়াছি।

এই গ্রন্থে আমি, তুম্মি প্রভৃতি সর্ব্বনামের স্থলে আহ্মি, তুহ্মি প্রভৃতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সপ্তমী বিভক্তির 'তে' স্থানে 'ত' প্রায় সর্ব্ব স্থলেই আছে; যথা—পুছিএ তোহ্মাত,—রাখাত জিজ্ঞাসে, ইত্যাদি। ২য়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক' ব্যবহৃত হয়; যথা,—'দেবতাক হিংসা করি রৈল ইন্দ্রপুর।' এবং,—'কর্ম্মদোষে আপনার বিধাতাক নিন্দে।' উত্তম পুরুষের ভবিষ্যতী ক্রিয়ার 'করিব' প্রভৃতির স্থলে করিম, করিমু, বর্ত্তমান কালে 'ধরি' প্রভৃতি স্থানে ধরম্, ধরোঁ,* মধ্যম পুরুষের বর্ত্তমান কালে 'করিতেছ' ইত্যাদির স্থলে 'করসি' ইত্যাদির প্রয়োগও দেখা যায়। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। 'করিলাম' ইত্যাদি স্থলে 'করিলু' বা 'করিলুয়,' এবং 'করিতাম' ইত্যাদি স্থলে 'করিতু' প্রয়োগ আছে।

অতীত কালে উত্তমপুরুষে নামপুরুষের ক্রিয়ার প্রয়োগ প্রাচীন সকল কাব্যেই সুলভ; এই কাব্যেও আছে। নামপুরুষে 'করন্তি' ইত্যাদি প্রকারের ক্রিয়া-প্রয়োগ অনেক স্থানে আছে; যথা,—'সদাএ তোহ্মার গুণ করন্তি বাখান।' 'আমি' প্রভৃতি সর্ব্বনামের বহুবচনে আহ্মারা, আমার প্রভৃতির বহুবচনে আহ্মারার, তোহ্মারার প্রয়োগ আছে।

নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলির আর দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধকলেবর বর্দ্ধিত করিলাম না:—কেহ্নে—কেন; কোভ—কভু; মেহ—মেঘ; মেলানি—বিদায়; দড়—দৃঢ়; কুঅর বা কুঞ্জর—কুমার; সমাই—(সমূহ-পদ-জাত কি?) সকল; বওধিক (=বয়োধিক?)—বুড়া; আকুত—ইচ্ছা বা আগ্রহ; নিবিত্তে—নিমিত্তে; সাফল—সফল, ন্যায়—বিচার, নালিস; দেআন—কাচারি; অবুদ—অবোধ; ছাওআল—বালক; হোনে বা হনে—হইতে; বেলি—বেলা; গুমান বা গুমানি—গর্ব্ব; বাটোআরি—ডাকাতি; আছোক—থাকুক; নৌআলি—নূতন; আস্তাহিত—অন্তর্হিত; লড়িল—চলিল; বাহুরিআ—ধিঙ্গিরা; পাঁখার—কলস; বাও—ধনু; লেহালিআ—চাহিয়া; সাঅর—সাগর; বরিখে—বর্ষণ করে; একু—এক;

* কোন কোন পুঁথিতে 'ধরোঁ' রূপও চলিত আছে।

তোহর—তোর ; গামারি—গাছ বিশেষ ; ভৈন—ভগ্নী ; নগরিআ—নাগরিক ; 'নগরুআ'ও হয়।

প্রশ্নবোধক 'কি' স্থলে 'নি' অনেক কাব্যের মত এই কাব্যেও সাধারণ।

পতিআন—আশ্বাস।—

'এথেক মতির স্থানে দিলা পাতিআন। চলিলোহ কামদেব হাতে ধনুবাণ ॥'

ভাঙ্গরা—ভাঙ্গখোর, সুতরাং মাতাল।

'সহজে ভাঙ্গরা তুহ্মি কিবা আছে জ্ঞান। অহঙ্কারে আপনারে আপনে বাখান ॥'

'মতুরা' শব্দটিও এই শ্রেণীর ;

নাতি—পৌত্র ; স্ত্রীলিঙ্গে নাতিন বা নাতিনী। নাতির পুত্র=পরিনাতি, (প্রনাতি)।

গোহারি—নালিশ। 'গোহারি করিম গিআ কংসের বিদিতে।'

স্থান—চতুর, চালাক। 'তোহ্মা মনে আহ্মা হোতে তুহ্মি বড় স্থান।'

উলিল—উদয় হইল। যথা,—'আকাশে উলিল ভানু।' 'উন্না'র অর্থ 'নামা'ও হয়।

'বালক' অর্থে 'বাহ্মা' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে বহুল দৃষ্ট হয়। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'বালীর' প্রয়োগও দেখা যায়।

অপান্তর—বিপদ। 'রাধিকামঙ্গলে,' 'অন্যথা' অর্থেও ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি : 'মুই জানিতু এথা হৈব অপান্তর।'

হের—হে। এই অর্থে 'হের' শব্দের প্রয়োগ আরও অনেক পুঁথিতে দেখা যায় : 'শুন হের প্রাণসখি কহি বিবরণ।' অদ্যাপি চট্টগ্রাম নেজামপুর অঞ্চলে লোককে 'হেরই' বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

নায়ক—স্ত্রীলিঙ্গে—নায়কী। 'ভেদ নাই অঙ্গে অঙ্গে নাআক নাআকী প্রেমরস।'

সেকালের অনেক কবি বিশেষ্য বিশেষণের লিঙ্গবিচার করিতেন না। তাহার প্রমাণ অনেক পাইয়াছি। পশ্চাদুদ্ধৃত পদে পাঠকগণ তাহার একটি নিদর্শন দেখুন ঃ

'আর অধ গোপশিশু আইব একাকিনী। তার আগে এই দুষ্ট মরিব জননী ॥'

তাঞি—তিনি, সে। (এখানে স্ত্রীলিঙ্গ।) 'কেমনে আসিব তাঞি তোহ্মার গোচর।' চট্টগ্রামে কথিত ভাষায় তিনি=তাঞি, সে=তে, স্ত্রীলিঙ্গে (হিন্দুমতে) সম্ভ্রমার্থে 'তাঞি' ও তুচ্ছার্থে 'তাই,' এবং মুসলমান-মতে সম্ভ্রমার্থে 'তাঞি' ও তুচ্ছার্থে 'তেই' প্রযুক্ত হয়।

হেনহি—নিশ্চয়ার্থক এই 'হি' এখন 'ই'তে পরিণত হইয়াছে। যেমন,—অদ্যহি=অদ্যই, ইত্যাদি।

'কেন' শব্দের 'কেহ্নে,' 'কেনে' ও 'কেনি' প্রয়োগ দেখিয়াছি; কিন্তু 'কেহা' এই প্রথম দেখিলাম। চট্টগ্রামে 'কেহা' অদ্যাপি ভূরিপরিমাণে প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ অনেক। যেমনঃ—

'আমি সে প্রেমবতী, তুহ্মি সে প্রাণপতি, কাতি যৌবন দিলা, পিরীতি বাড়াইল কেহা,
তবে মোরে ছাড়ি জাও কেহা।' অখনে হইব কোন গতি।'

দুলাল—এই শব্দটি 'আলালের ঘরের দুলাল' কথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। এই বাক্যের উৎপত্তি কিরূপে হইল? 'হেন রে দুলাল বাছা না যাইয় তুহ্মি কংসের ভুবন'—পদে 'দুলাস' শব্দটির দ্বারা মাতৃ-হৃদয়ের কতখানি স্নেহ অভিব্যক্ত হইয়াছে!

গাঠি—গাঁঠুরি, বোঁচ্‌কা।

'গাঠির নাবিক্য তুহ্মি হারাইলা হেলে। সুখে নিদ্রা জাও প্রভু মধুপুরে গেলে॥'

আকুস—আকুলতা। 'তোহ্মারি আকুল দেখি হৈলু হতমতি।' বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে বিশেষণের প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক আছে।

খেওয়া দেওয়া—পার করা। 'কানু বাটোআর খেওআ দেহি সেই ঘাঠে।'

খেওআনি—যে পার করে, ঘাঠিআল।

কেরআল—দাঁড়। অভিধানে 'কেরবাল' আছে।

পাতোআলা—হাইল।

ইহার একটি স্থানে একবারে চট্টগ্রামী অপভ্রষ্ট ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—'হিচে পানি,'—সিঁচে পানি। যাহা অধুনা 'মাইকেলী ক্রিয়া' নামে পরিচিত, এই গ্রন্থ হইতে তাহারও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছিঃ—'মথুরাতে গিআ আহ্মি কংস নিপাতিলে।'

বাঙ্গালায় পাদপূরণে, সম্প্রসারণে ও নিশ্চয়ার্থে কতকগুলি বর্ণের ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নোক্ত বাক্যে 'নাইক' পদের 'ক' পাদপূরণে ব্যবহৃত। যথাঃ—

পাঁউর অলঙ্ঘ্য বাক্য খণ্ডান নাইক। সেই হেন হেতু লোকে প্রাণ ছাড়ে পিক॥'

মোহর (=মোর), তোহর (=তোর), আউগে (=আগে), আউট (=আট), আওয়াস (=আবাস), হেনই প্রভৃতি স্থলে হ, উ, ওয়া এবং ই (প্রাচীন হি) আমাদের উক্ত কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

এই গ্রন্থখানি যে চট্টগ্রামী কবির রচিত, তাহা এখন আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। এই কয় বৎসরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, সাহিত্য বিষয়ে চট্টগ্রাম অধুনা যতই পশ্চাৎপদ হউক না কেন, প্রাচীন সাহিত্যে চট্টগ্রাম অগ্রগণ্য ছিল।

এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রায় দেড় শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহার একখানি খণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের নিকট আছে। ভাষাতেও প্রাচীনতার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। হরিবংশে 'গৌড়ীয় যুগে'র সাহিত্যের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সুতরাং ইহা যে খুব প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক এক জন পরম কৃষ্ণভক্ত, অথচ চৈতন্যদেবের বন্দনা করেন নাই। কেবলমাত্র এই একটি কারণে সহজে তাঁহাকে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত করা যায় না। এক সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থাদির অনুবাদের ধুম পড়িয়াছিল। এই গ্রন্থখানিও তৎকালে রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা যে অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, এরূপ অনুমান, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে।

শ্রীআব্দুল করিম।

পল্লী ও নগর।

১

যেখানে "বুড়ী" স্কেচ্ (Sketch) করিতে বসিয়াছিল, সেটা পল্লীগ্রাম। ভ্রাতা প্রফুল্ল বিলাত যাইবার পূর্ব্বে বুড়ীকে স্কেচ্ করিতে শিখাইয়াছিল। বুড়ী পেন্সিল-স্কেচ্ ছাড়িয়া এখন তূলিকা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। গ্রামের কৃষক দীনবন্ধু দাসের কন্যা মালতী বুড়ীর পোর্টফোলিও ও ড্রয়িংপত্র বহন করিয়া নদী-সৈকতে একটা বটবৃক্ষের তলায় বসিয়াছিল। স্কেচ্ হইয়া গেলে বুড়ী বৃক্ষতলে আসিয়া চিত্রখানি রঞ্জিত করিবে।

বুড়ী অনেক দূরে। সেখান হইতে সূর্য্যাস্তের শেষ বর্ণগুলি আকাশপটে ভাল করিয়া দেখা যায়। অতিশয় কৌশলে বুড়ী স্কেচখানি সমাপ্ত করিয়া সম্মুখস্থ দৃশ্যের দিকে শেষবার চাহিয়া দেখিল।

বুড়ী দেখিল, আকাশ অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে। আকাশ ও পৃথিবীর সন্ধিস্থল মায়াময়। যত দূর যাওয়া যায়, আকাশও তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানবের আশাও তাহাই।

বোধ হয়, আকাশের সহিত আশার কোনও সম্বন্ধ আছে। সাত বৎসর পূর্ব্বে বুড়ীর বয়স সাত বৎসর ছিল। তাহার তিন বৎসর পরে বুড়ীর অতুলনীয় সুন্দর

মুখখানি দেখিয়া ধনকুবের কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় পুত্রের সহিত বুড়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর পরেই বুড়ী শুনিল যে, তাহার বাসরঘরের সাধের বর এমন কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে এ জন্মে আর কেহ ফিরিয়া আসে না। কিন্তু সে কথা বাহিরে রাষ্ট্র হয় নাই।

কচি মেয়ে বুড়ী, গোলাপী মুখখানি শুভ্রবসনে ঢাকিয়া, অনেক দিন স্বামীর আশ্রয় বসিয়া ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সে মুখখানি দেখিয়া অধিকদিন শোকে অধীর হইতে হয় নাই। শ্বশুরের মৃত্যুর পর বুড়ী দাদার কাছে আসিয়াছিল। ভ্রাতা ভগ্নী উভয়েই পিতৃমাতৃহীন। শিবহাটীর জমিদারী বিচক্ষণা পিসীমা ও গোমস্তা ভজহরির হস্তে তত্ত্বাবধারণার্থ সমর্পণ করিয়া প্রফুল্ল সিভিলসার্ভিস পাস্ করিতে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বিলাত গিয়াছিল।

বুড়ীর হৃদয়ের আশা কোন অর্থ ও অবলম্বন না পাইয়া সখী মালতীর বাল্য স্নেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

যেখানে বুড়ী স্কেচ করিতে বসিয়াছিল তাহার নিকটেই দাহস্থান। একটি বালুকা-স্তূপের উপর বসিয়া বুড়ী সন্ধ্যা দেখিবার সাধে স্কেচখানি পদতলে রাখিয়া মাথার চুল ছড়াইয়া দিল। সম্মুখে ভরা নদী, এবং সিন্দুরভরা সন্ধ্যার ললাট।

বুড়ী আত্মহারা হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এমন সময় নদীসৈকতের নীরবতা ভাঙ্গিয়া মালতীর স্বর বুড়ীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

"সই, ঝড় আস্‌ছে,—পালা'।"

কথার অর্থ বুঝিবার অগ্রেই বৈশাখের ঝড়,—সন্ধ্যার আঁধার ও নদীতরঙ্গ একত্রিত করিয়া বুড়ীর বালুকা-আসন নিমেষের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সে আঁধারে বুড়ী কোথায় গিয়া পড়িল, তাহা কেবল এক জন অশ্বারোহী দেখিতে পাইল।

২

জরাগ্রস্ত শাখাপল্লববিহীন একটা বজ্রাহত, বৃদ্ধ, দগ্ধ ও ভগ্ন তরুর মূলে মিষ্টার চট্টোপাধ্যায় বুড়ীর তরুণ আহত দেহ সযত্নে রক্ষা করিয়া পৃথিবী ও আকাশের দিকে চাহিলেন।

শিশির চট্টোপাধ্যায় প্রশান্তহৃদয় যুবাপুরুষ; কিন্তু এমন বিপদে পূর্ব্বে পড়েন নাই।

ক্রমে কালো মেঘ ও প্রবল বায়ুর সহিত তাঁহার বজরা আসিয়া ঘাটে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত বুড়ীকে বজরায় লইয়া গিয়া নির্ম্মলার কোলে ফেলিয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন।

নির্ম্মলা ও নির্ম্মলার মাতার শুশ্রূষায় বুড়ী নয়ন মেলিয়া চাহিল। ইতিমধ্যে মিষ্টার চট্টোপাধ্যায় গ্রাম হইতে পাল্কী ও বেহারা প্রভৃতি আনিয়া বুড়ীকে তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

ঝড় থামিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিতেছিল। কালো মেঘ এক কোণে সরিয়া গিয়া গগনের তারকাখচিত প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল।

বুড়ীকে ধরিয়া পাল্কীতে রাখা হইল। মালতী পাল্কীর সহিত গেল। যাইবার সময় মিষ্টার চট্টোপাধ্যায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মালতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে?"

শিশির। তুমি কে?

মালতী। আমি মালতী।

শিশির। ওঁর নাম কি?

মালতী। হিরণ্ময়ী। জমিদারদের মেয়ে।

শিশির। তা' আমি জানি। তুমি ওঁর কে?

মালতী। আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে। আমি ওঁর সই। আপনার নাম কি?

শিশির। বলিব না।

মালতী অবাক্ ও হতাশ হইয়া চাহিয়া রহিল। প্রাণদাতার কি নাম বলিতে নাই?

মিঃ শিশির চট্টোপাধ্যায় বজরায় আসিয়াই বজরা ছাড়িয়া দিলেন। নির্ম্মলা বলিল, "দাদা, মেয়েটি কে?"

শিশির। কেন, তোমরা কথা কও নাই?

নির্ম্মলা। তুমি কি আশ্চর্য্য লোক! মোটে জ্ঞানসঞ্চার হইতেছিল, এমন সময় পাঠাইয়া দিলে, তোমার কি মনে নাই?

শিশির। তোমরাও আশ্চর্য্য লোক; প্রাণটা বাঁচাইলে, কিন্তু পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করিলে না?

নির্ম্মলা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাতা বলিলেন, "শিশির চিরকালই এক রকম।" নির্ম্মলা বলিল, "তুমি কি কঠিন; মেয়েটিকে দেখিয়াই আমার কেমন স্নেহ হইয়াছে। অন্ততঃ তাদের বাড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসা আমাদের উচিত ছিল।"

শিশির। তাদের অনেক লোক জন আছে।

নির্ম্মলা। বোধ হয় বড়লোক। মেয়েটি বড় সুন্দরী।

শিশির। বোধ হয়।

নির্ম্মলা। কি আশ্চর্য্য! কাদের মেয়ে, তা একবার জিজ্ঞাসা করিলে না? বোধ হয় ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল।

শিশির। নির্ম্মলা! জগতে কে কার মেয়ে, সে পরিচয়ে আবশ্যক কি? কোনও অজ্ঞাতমঙ্গলসাধনার্থ ঈশ্বর বালিকাটির প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

নির্ম্মলা ভ্রাতার স্বভাব জানিত; শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল। নদীবক্ষে বজরা পাল তুলিয়া তীব্রবেগে ছুটিল।

মিষ্টার শিশির চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার। হুগলীর জজ-আদালতে প্রায় তিন দিন ধরিয়া একটি নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণতনয়ের সপক্ষে বক্তৃতা করিয়া তাহাকে খালাস করাইয়া লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণতনয় সজলনয়নে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল, "ঈশ্বর আপনাকে সুখী করিবেন।"

ভগ্নী নির্ম্মলা ও মাতা বজরায় করিয়া শিশিরকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা হইতে আসিতেছিলেন। মধ্যে শিবহাটী গ্রামের সম্মুখে ঝড় আসিয়াছিল। শিশির নির্ম্মলার পত্র পাইয়া অশ্বারোহণে বজরার প্রতীক্ষায় অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল।

৩

পল্লীগ্রামের ঝিল্লীকুল সারা রাত্রি ধান্যক্ষেত্রে পাহারা দিয়া সকালে ঘুমাইয়া পড়িল। দীনবন্ধু কৈবর্ত্তের কন্যা মালতী "সই"কে দেখিতে গেল।

পিসীমা ও ভস্মহরি গোমস্তা নিবারণ ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে জলডুবির যত প্রকার ঔষধ যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া বুড়ীর শিয়রে সারা রাত্রি বসিয়া ছিল। তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলে বুড়ী মিটি মিটি চাহিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

উদ্যানে মালতী বকুলবৃক্ষের তলায় ফুল কুড়াইতেছিল। বুড়ী বলিল, "সই, তুমি কখন আসিলে?"

মালতী স্নেহভরে জীবিতা বুড়ীর কণ্ঠ জড়াইয়া কাঁদিল। বুড়ী বলিল, "সই, আমার স্নেচ্‌খানা কই?"

মালতী। নদীতে ভাসিয়া গিয়াছে।

বুড়ীর পক্ষে এই সংবাদ অতীব কষ্টকর হইয়া পড়িল। বারো দিন ধরিয়া শিবহাটী গ্রামের শ্মশানঘাটের "স্নেচ" প্রস্তুত হইয়াছিল।

উভয়ে পরস্পরের হাত ধরিয়া অনেক মাঠ পার হইয়া মালতীর বাটীতে গেল। গত নিশার ঝড়ের কাণ্ড দেখিয়া প্রভাত হাসিতেছিল। পল্লীগ্রামের জীবনটাই দুঃখময়। শ্মশান হইতে দরিদ্র-কুটীরের ব্যবধান অতি অল্প। মধ্যে কতকগুলি ধান্যক্ষেত্র, এবং একটা সোজা পথ।

সেই সোজা পথ দিয়া কৃষক-বধূ ও কৃষকবালকগণ ঘাট হইতে বাটী এবং বাটী হইতে ঘাটে আনাগোনা করিতেছিল।

জমিদারতনয়া বুড়ী মালতীর চুল বাঁধিয়া, এবং কৃষকবালকদিগকে "মুড়ি" খাইবার প্রাত্যহিক পয়সা দিয়া আনন্দিতমনে পূর্ব্বসন্ধ্যার দৃশ্যস্থলে "স্কেচ" খুঁজিতে গেল।

এক পাল কৃষকবালক সহ মালতী তন্ন তন্ন করিয়া স্কেচ খুঁজিয়া বেড়াইল। নদীতটে কত পাখী উড়িয়া গেল, কত গাভী বৎস লইয়া জল খাইয়া গেল। স্কেচের কোনও সন্ধান হইল না।

বুড়ী বলিল, "আমি দৃঢ়মুষ্টিতে স্কেচখানি ধরিয়া ছিলাম, ভাসিয়া যাইবার ত কোনও কারণ দেখিতে পাই না।"

মালতী বলিল, "তাঁর হাতে ত সাদা কাগজ দেখিতে পাই নাই।"

বুড়ী। কার?

মালতী। ও মা! সে কথা জান না? তোমাকে যিনি বজরায় লইয়া গিয়াছিলেন।

এক জন কৃষক বলিল, "সে একটা সাহেব।"

মালতী। দূর! তিনি বাঙ্গালী। আর বজরাতে একটি পরমসুন্দরী মেয়ে বসিয়া তোমার পায়ে ফ্লানেল দিয়া অগ্নির তাপ দিতেছিল।

বুড়ী সমগ্র ঘটনার তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া একটু গম্ভীর হইল; পরে একটু ভয় পাইল। তার পর বুড়ীর সুন্দর মুখে আরক্তিম প্রভা ফুটিয়া উঠিল। বুড়ী বলিল, "তাঁহারা কে?"

মালতী। আমি নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন না।

বুড়ী। তাঁহারা আমার নাম জানিয়াছেন?

মালতী। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি।

বুড়ী। তুমি বোকা মেয়ে। এত দিন তোমাকে লেখাপড়া শিখাইলাম, কিন্তু তোমার একটু বুদ্ধি হইল না। অজ্ঞানিত পুরুষের নিকট আমার নাম বলিতে গেলে কেন?

মালতী। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

বুড়ী। সই, সহরের লোক বড় ধূর্ত্ত, তোমাকে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে দেখিয়া সব কথাগুলি জানিয়া গিয়াছেন। আমার আর একটা সন্দেহ হইতেছে।

মালতী বুড়ীর ভর্ৎসনায় মুখখানি ছোট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সই?"

বুড়ী চুপি চুপি বলিল, "বোধ হয় স্কেচখানি তিনিই লইয়া গিয়াছেন। কি লজ্জার কথা!"

মালতী। তাঁহার ভারি অন্যায়।

বুড়ী। পরিচয় না দিয়া এইরূপ চলিয়া যাওয়া অভদ্রোচিত ব্যবহার। যে মেয়েটি আমার নিকটে বসিয়াছিল, তার নাম কি?

মালতী। তার মা একবার "নির্ম্মলা" বলিয়া ডাকিয়াছিল।

বুড়ী হৃদয়ের সহিত সেই নামটি গাঁথিয়া রাখিল। কিন্তু বুড়ীর নিকট তাহার প্রাণদাতার ব্যবহার কুৎসিত ও অন্যায় বলিয়া বোধ হইল।

৪

মিষ্টার শিশির চট্টোপাধ্যায় কিছু কাল ইতালীতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা অসম্ভব। যাহাদিগের হৃদয়ে প্রকৃতির ছবি অঙ্কিত হয় নাই, যাহারা আকাশে, বৃক্ষে, নদীর জলে, অস্তগামী সন্ধ্যায়, পূর্ণিমাপ্রসন্ন নিশীথিনীর শোভায় বিশ্বস্রষ্টার মহিমা নিরীক্ষণ করিতে এখনও শিখে নাই, তাহাদিগের পক্ষে চিত্র একটা আঁকা বাঁকা প্রতিলিপিমাত্র।

কিন্তু শিশিরের সে ভ্রম আজি দূর হইল। যখন বুড়ীর কোমল দেহ স্কন্ধে করিয়া বজরায় লইয়া আসিতেছিলেন,—তখন শিশিরের বোধ হইয়াছিল, একখানা সাদা কাগজ তাহার ব্রেষ্ট-পকেটের নিকট ঝুলিতেছিল। সেখানা তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পকেটে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এখন সেটাকে যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই অবাক হইতে লাগিলেন।

একটা ভরা নদীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার পরপারে বিস্তৃত শ্মশান, এবং সারি সারি কুটীর আলোকিত করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। সমগ্র দৃশ্যের সম্মুখে আশাপূর্ণনেত্রে একটি যুবাপুরুষ বসিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে!

চিত্রখানি কেবল স্কেচ মাত্র, কিন্তু সে স্কেচ সামান্য শিক্ষার ফল নহে। প্রত্যেক রেখা, প্রত্যেক আলোক ও আঁধারের রেখাবিন্যাসগুলি, যুবকের ভাবপূর্ণ মুখ ও আশাপূর্ণ দৃষ্টি, সকলই অপূর্ব্ব!

ক্ষণেক শিশিরের বোধ হইল যে, চিত্রস্থ যুবককে কোথায় দেখিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে তাঁহার বাল্যসখা প্রফুল্ল!

কম্পিতহস্তে শিশির স্কেচখানি লইয়া নির্ম্মলার নিকট গেলেন। শিশির নির্ম্মলাকে বলিলেন, "নির্ম্মলা, দেখ ত, ছবির এই মুখ প্রফুল্লের মত বোধ হয় না?"

নির্ম্মলা নিমেষের মধ্যে চিনিল। দুই বৎসর ধরিয়া নির্ম্মলা যাহার মুখ দিবানিশি মানসপটে অঙ্কিত করিতেছিল, সে মুখ চিনিতে কতক্ষণ লাগে?

নির্ম্মলা। যাও! তোমার সকল বিষয়েই ঠাট্টা!

শিশির। ভগ্নী! কথাটা উপহাসের নয়। একটু গম্ভীর হইবার কারণ আছে। এ চিত্র আমার কারিকুরী নহে। পরশু রাত্রে শিবহাটীর ঘাটে যে জলমগ্না বালিকাকে লইয়া ব্যস্ত ছিলে, এ তাহারই অপূর্ব্ব শিক্ষার পরিচয়। তাহার পরিচয় জানাটা আবশ্যক ছিল।

নির্ম্মলা। বোধ হয় সে প্রফুল্লের কেহ হয়।

শিশির। কে হয়?

ভ্রাতা ভগ্নী কলিকাতায় প্রফুল্লকে প্রত্যহ দেখিত। বুড়ী বিধবা হইবার পর প্রফুল্লের জীবনে একটা কালিমার রেখা পড়িয়াছিল। প্রফুল্ল শিশির ও নির্ম্মলার নিকট কখনও ভগ্নীর কথা উল্লেখ করে নাই। কাজেই উভয়ে জানিত যে, প্রফুল্লের সংসারে আর কেহই ছিল না।

নির্ম্মলার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। নির্ম্মলা কথায় কথায় একদিন প্রফুল্লকে বলিয়াছিল, "তোমার যদি ভগ্নী থাকে, আমি তাহার সহিত আলাপ করিব।"

তাহারই পূর্ব্বদিন বুড়ীর বৈধব্যসংবাদ পাইয়া প্রফুল্ল বজ্রাহতের ন্যায় অধীর হইয়াছিল। প্রফুল্ল অনেক কষ্টে হৃদয়ের ব্যথা লুকাইয়া নির্ম্মলাকে বলিয়াছিল, "না, আমার কোনও ভগ্নী নাই, আমার সংসারে কেহ নাই।"

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মিষ্টার চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "নির্ম্মল! আমি আর একবার হুগলীর দিকে যাইব। তুমি প্রফুল্লের কোনও পত্র পাইয়াছ?"

নির্ম্মলা কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। কলিকাতা সহরটা তার শ্মশান বলিয়া বোধ হইল। নির্ম্মলা ভাবিল, পল্লীগ্রামই সুন্দর। নির্ম্মলার চোখে জল আসিল।

৫

প্রফুল্ল সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভগ্নীকে লিখিল, "বুড়ী, আমি শীঘ্রই বাড়ী যাইব। তোমার স্কেচের কত দূর হইল?" বুড়ী লিখিল, "দাদা, স্কেচখানি

হয় ত জলে ভাসিয়া গিয়াছে, নয় ত কেহ চুরি করিয়াছে। দুঃখিনীর পক্ষে উভয়ই সমান। তুমি আসিয়া তদন্ত করিও।"

তাহার পর বুড়ী প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের সময় সেই ভগ্নতরুমূলে বসিয়া থাকিত। শ্মশানঘাটে একটি তরু ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে যাইতেছিল, অন্য স্থানে একটি অঙ্কুরের উদ্ভব হইতেছিল। হৃদয়ে একটা কোমল, সুন্দর, পবিত্র ক্ষেত্র আছে; সেখানে প্রেম অঙ্কুরিত হইলে বিশ্বস্রষ্টার অভিপ্রায় সার্থক হয়। ধীরে ধীরে দুঃখবারি সেচন করিয়া আশার ভাঙ্গা বেড়া দিয়া, নীরবে অলক্ষ্য যত্নে কে যেন হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে সেই অঙ্কুরটি বর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

প্রতিদিন এক জন যুবাপুরুষ বৃক্ষরাজির অন্তরালে লুকাইয়া বুড়ীর চিন্তাপূর্ণ সুন্দর মুখখানি অনিমেষনয়নে দেখিত, এবং সন্ধ্যা হইলে নীরব নদীতট ত্যজিয়া দূরস্থ বজরায় চলিয়া যাইত। এ কথা অন্য কেহ জানিত না।

সাত দিন ধরিয়া মিষ্টার শিশির বুড়ীর স্কেচখানি রং দিয়া সুন্দর বর্ণে আঁকিলেন, এবং প্রফুল্লের চিত্রের পার্শ্বে স্নেহবিজড়িত মুখে বুড়ীকে দাঁড় করাইয়া দিলেন।

শিশির কয় দিনের মধ্যে সমস্ত সন্ধান লইয়াছিলেন, কিন্তু নির্ম্মলাকে সে কথা বলেন নাই।

৬

বুড়ী মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, বজরায় যে মেয়েটি ছিল, তারা কোথায় থাকে?'

মালতী। বোধ হয় কলিকাতায়।

বুড়ী। কলিকাতা মস্ত সহর। নচেৎ তাদের পত্র লিখিতাম। আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। দাদা আসিলে জিজ্ঞাসা করিব।

মালতী। বোধ হয় সেই পুরুষটি মেয়েটির স্বামী।

বুড়ী। বোধ হয় না।

মালতী। কেন সই?

বুড়ী। পুরুষটি চোর। চোর কখন স্ত্রী সঙ্গে করিয়া চুরি করিতে আসে না। চোর না হইলে সে পরিচয় দিত।

বুড়ী বহু দিন চিন্তার পর তাহার অজ্ঞানিত প্রাণদাতার উপর রাগ করিয়াছিল। পরিচয় না দিয়া স্কেচখানি লইয়া যাওয়ার কথা মনে হইলে বুড়ী রাগ সংবরণ করিতে পারিত না।

সেই রাত্রিতে প্রফুল্লের বাড়ী আসিবার কথা। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বুড়ী উৎসাহ-সহকারে অপেক্ষা করিয়া পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

পূর্ণিমার নিশি। গ্রাম, মাঠ, জলপথ ছাইয়া স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ সুধাবর্ষণ করিতেছিল। বহুদিনের স্মৃতির বোঝা মাথায় করিয়া একটি পথিক হুগলী ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে শিবহাটী গ্রামে আসিয়া পুরাতন ভদ্রাসনের উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে বসিল।

প্রফুল্ল হ্যাট কোট ছাড়িয়া চাদর গায়ে দিল। খানিকটা মাথায় বাঁধিল। একটি সিগারেট জ্বালিয়া তাহার ধূম আম্রকাননের অন্ধকারের মধ্যে ছাড়িতে লাগিল। প্রফুল্লের মতে মানবের দুইটিমাত্র বিশ্রামস্থান। জন্মভূমি ও স্বর্গ। যে জন্মভূমিতে বিশ্রামলাভ করে নাই, তাহার পক্ষে স্বর্গকল্পনা বৃথা।

প্রফুল্ল অনেকক্ষণ বাঁধাঘাটে শুইয়া থাকিল; কিন্তু ঘুম হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখীন হইয়া ভজহরি গোমস্তার বাতায়নপথে উঁকি মারিল।

বৃদ্ধ প্রভুভক্ত ভজহরি ঈশ্বরচিন্তা করিতেছিল। হঠাৎ শুভ্রবসনমণ্ডিতমস্তক একটা গোরা পুরুষের ন্যায় মানুষ দেখিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি ভজহরির গৃহে প্রবেশ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সকলে ভাল ত?"

ভজহরির চমক ভাঙ্গিল। ভজহরি বলিল, "দাদাবাবু! একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে বৃদ্ধাবস্থা, চিনিতে পারি নাই। সকলে ভাল আছে। বুড়ী দিদি এতক্ষণ বাহিরে বসিয়া ছিল, এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

"আচ্ছা, তুমি শয়ন কর!" বলিয়া প্রফুল্ল বৈঠকখানায় গেল। সেখানে জনক-জননীর দুইখানি বৃহৎ চিত্রপটের সম্মুখে মস্তক নত করিয়া স্বর্গ হইতে তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল।

মধুর মলয় বহিয়া প্রাঙ্গন প্রফুল্ল ও স্নিগ্ধ করিতেছিল। গৃহ হইতে বারান্দায় আসিয়া প্রফুল্ল দেখিল, একখানি সুন্দর ছবি দেয়ালে সংলগ্ন রহিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র-কিরণে চিত্রখানি উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নিম্নে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা ছিল—"চোরা মাল।"

৭

অনেকক্ষণ ধরিয়া ছবিখানি দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া গেল। প্রফুল্ল দেখিল যে, শিবহাটীর শ্মশানঘাটের পর পারে অস্তমিত সূর্য্যের আলোকে এক জন বসিয়া আশাপথ চাহিয়া আছে, অন্য জন তাহার পশ্চাতে চুপি চুপি ভুবনমোহন হাসি অধরে চাপিয়া অগ্রসর হইতেছে।

প্রফুল্ল ভাবিল, বুড়ী কি নিপুণ চিত্রকর! কিন্তু বুড়ীর মুখ কল্পনই বুড়ীর হাতের লেখা। প্রফুল্ল স্বয়ং পাকা চিত্রকর। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহাতে দুই জনের কারিকুরি আছে!

প্রথম সূর্য্যকরের সহিত বুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বুড়ী বলিল, "দাদা, তুমি সাহেবদের মত সুন্দর হইয়াছ।"

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বুড়ী, ও ছবিখানা কি তোর টানা?"

বুড়ীর দৃষ্টি ছবির দিকে ধাবিত হইল। ছবি দেখিয়া বুড়ীর মুখমণ্ডল রক্তহীন হইয়া পড়িল। অবাক নিঃস্পন্দ হইয়া হিরণ্ময়ী ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে স্থিরভাবে বুড়ী বলিল,—"স্কেচখানি আমার।"

প্রফুল্ল। সমস্তটা?

বুড়ী। কেবল আমার ছবিটা নয়। রংও আমার নয়।

প্রফুল্ল। রং এবং তোমাকে দিয়া ছবিখানি সাজাইয়াছে কে?

বুড়ী। জানি না। বোধ হয় তিনি সেই—

প্রফুল্ল। সেই কে?

বুড়ী। আমি জলমগ্ন হইলে যিনি তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল। তিনি "স্কেচ" পাইলেন কোথায়?

বুড়ী। বোধ হয় আমার হাত হইতে চুরি করিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল। চোরা মাল রং করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কবে?

বুড়ী। বোধ হয় আজ সন্ধ্যার পরে।

প্রফুল্ল। অবশ্য, তুমি জান।

বুড়ী। না দাদা, আমি কিছুই জানি না।

প্রফুল্ল। আচ্ছা, ছবির রং দেখিয়া তোমার মুখের রং গেল কেন?

বুড়ী। দাদা, আমি তাঁহাকে কখনও দেখি নাই, এবং নালতী পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তা বলেন নাই।

প্রফুল্ল। দেখ্ বুড়ী, আমি ভিনিসের চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রাইজ পাইয়াছি। আমার সঙ্গে চালাকী খাটিবে না। আসল কথাটা তোকে বলিয়া দিই। যে চিত্র টানিয়াছে, সে বড়মানুষ; কেন না, ঐ কার্‌মিন্ রেডের প্রত্যেক কেয়ুখানির দাম পাঁচ টাকা। যে তুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার দাম অন্ততঃ দশ টাকা। তোর মুখের ভাব আনিতে তাহার অন্ততঃ দশ দিন লাগিয়াছে। তাহার সহিষ্ণুতা আছে, এবং সে কঠিন পরিশ্রমী। তোর ওষ্ঠাধরের পবিত্র রেখার প্রতিচ্ছবি তাহার হৃদয়ের পবিত্রতার পরিচয় দিতেছে। তোর আনন্দময় চক্ষুর মধ্যে একটু বিষাদের কজ্জল এমন ভাবে পরাইয়া দিয়াছে যে, আমার বোধ হয়, সে অন্ততঃ সাত আট দিন তোর মুখের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়াছিল। এবং তুই তাহার দিকে

পাইয়া দেখিস্ নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, তোর চোখের তারা দুটির দক্ষিণ পার্শ্ব মাত্র সে Study করিয়াছিল।

বুড়ী। কি আশ্চর্য্য!

প্রফুল্ল। দাঁড়া, আরও দেখি। শোন্! বোধ হয় সে তোর Admirer; কেন না, তোর পা দুখানি অসম্ভব সুন্দর করিয়াছে; কিংবা হয় ত তুই বসিয়াছিলি, সে পা দুখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। সে বৃক্ষতলে বসিয়া চিত্রে রং দিত; কেন না, ভার্মিলিয়নটা (Vermillion) পরিষ্কার ফুটে নাই। এবং আমার বোধ হয়, এটা শিবহাটীর গ্রাম্য ঘাট; কেন না, শ্মশানের সম্মুখে নদীটা সোজা বহিয়া গিয়াছে, সে জায়গাটার Pencilling সে মুছিয়া দৃশ্যটার পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। আমি এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি, তার নামের প্রথম অক্ষর "শি"।

বুড়ী অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রফুল্ল। এই দেখ্, প্রথমে তার নাম লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু Chinese white দিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে! Water-colourএর ঐ প্রধান দোষ। বাকি ইতিহাসটুকু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে আমার বোধ হয়, তাহার হৃদয় প্রশান্ত, ধর্ম্মে ও স্নেহে ভরা, তাহার অহঙ্কার নাই, এবং সে কাহারও নিকট প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাহে না। লোকটা সহরের, কিন্তু পল্লীগ্রাম ভালবাসে। আচ্ছা বুড়ী! এমন কিছুই জানিস্ না, যাহাতে তার সন্ধান পাওয়া যায়?

বুড়ী। বোধ হয়, তাঁহার স্ত্রী কিংবা ভগ্নীর নাম নির্ম্মলা। তিনি বসন্তরায় আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

প্রফুল্লের মুখ ও গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এ স্বভাবটা তাহার বিলাতে হইয়াছিল। প্রফুল্ল বলিল, "বুড়ী, তোর কি এখনও একটুও সংসারের জ্ঞান হইল না?"

বুড়ী। কেন দাদা?

"পরে জানিতে পারিবি। আজ আমার কতদিনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে,"—বলিয়া, প্রফুল্ল বুড়ীর মুখের দিকে চাহিল। বুড়ীর জীবনের অন্ধকারভাগ প্রফুল্লের হৃদয়ের অর্দ্ধেকটা আচ্ছন্ন করিয়াছিল—আজি সুপ্রভাত সেটা মুছিয়া দিয়া স্বর্গ হইতে সুখের বারতা লইয়া আসিল।

প্রফুল্ল বাটীর মধ্যে গিয়া পিসীমাকে ডাকিল। প্রফুল্ল বলিল, "পিসীমা তুমি কচি লাউয়ের ঘণ্ট আবার রাঁধ।"

পিসীমার নয়ন অশ্রুজলে আঁধার হইয়া গেল, প্রফুল্ল পিসীমার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "পিসীমা, তোমার বিন্দাবিবাহ সম্বন্ধে কি মত?"

দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, 'দেখো বামার মা, তুমি অনেক কালের পুরোণো লোক—মেয়েটাকে যে রকম করে' হোক্—যত্ন করে' বাঁচিও।'—এতদিন গহনা বিক্রি করে' গতর খাটিয়ে তোকে মানুষ করে' এনেচি। এখন বুড়ী হয়েচি—যা' কিছু ছিল, তাও শেষ হ'য়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে যা' কিছু পাই, আর সেই সহরের গঙ্গার ধারে বট গাছের তলায় স্নানযাত্রার সময় যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল—তিনি আমাদের কষ্টের কথা শুনে দয়া করে মাঝে মাঝে শিষ্যি দিয়ে চালটা ডালটা এটা ওটা যা' কিছু পাঠান, তাতেই একরকম করে' চলে যাচ্চে। তুই সঙ্গে গেলে বাঁড়ুয্যে মশায়ের বেটা মহেন্দ্র খুসী হ'য়ে টাকাটা সিকেটা দেয়, তাই তোকে নিয়ে যাই। ওদের সঙ্গে আমার অনেক কালের আলাপ—ওরা হচ্চে গ্রামের মস্ত জমীদার।"

"তুমি যদি আমার আপনার মা হ'তে, এমন কথা কখনই মুখে আন্‌তে না। যা হোক্, আমার মরণই ভাল—আমি কখনই বাবুদের বাড়ী যাব না।"

আর কোনও কথা না বলিয়া প্রতিমা ঘরে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া ভাঙ্গা তক্তার উপর পড়িয়া জন্মহারা মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দক্ষিণে দুয়ার দিয়া বৈশাখী বাতাস ঘরে ঢুকিয়া স্নেহময়ী মাতার ন্যায় বালিকার নিবিড় আর্দ্র শ্লথ কেশ-জাল নাড়িয়া চাড়িয়া শুকাইয়া দিতে লাগিল। ঝল্‌ঝলে রৌদ্রকিরণ বালিকার মুখে আসিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা দশটার সময় প্রতিমা পুকুরে স্নান করিতে যাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, মহেন্দ্র তাহাদের বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে আসিতেছে। প্রতিমা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইল। হিংস্র জন্তু যেরূপ লোলুপ ব্যগ্র দৃষ্টিতে শিকারের প্রতি চাহিয়া দেখে, মহেন্দ্রও সেইরূপ আশে পাশে তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। কুটীরে পৌঁছিয়াই বলিয়া উঠিল, "হ্যাগা বামার মা, রকমটা কি—তোমাদের যে আর দেখাই নেই!"

বামার মা মহেন্দ্রকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিল। "অ্যাঁ! আপনি জমীদার বাবু আমাদের বাড়ীতে! কি পুণ্যি করেচি!—আসুন,—পোড়ার-মুখীটা আবার বেতের মোড়াটা কোথা রেখে' গেছে—আঃ কি আপদ!—আসুন, তক্তার উপর বসুন।"—এই বলিয়া ভাঙ্গা তক্তার উপর একটা গামছা বিছাইয়া দিল। "দেখ্‌চেন ত আমাদের অবস্থা!"

মহেন্দ্রের অত শত বাজে কথা শুনিবার ধৈর্য্য ছিল না। সে একেবারে আসল কথাটা পাড়িয়া ফেলিল।

"সব ত দেখ্‌ছি—কাল কেন যাওয়া হয়নি বল দেখি?"

বামার মা মহেন্দ্রের আসিবার উদ্দেশ্য বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিল, "জানেন ত আজকালকার মেয়েরা কারো কথা শুনে না। মেয়েটা যত ডাগর হচ্চে, ততই যেন লজ্জায় ভেঙ্গে পড়চে। কোথাও বেরোতে চায় না। ক' দিন জোর করে' আপনাদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিলুম। কাল কত করে' বল্‌লুম, কোন মতেই আর যেতে চায় না, কাঁদ্‌তে লাগল। মা-মরা মেয়ের চোখের জল দেখে আমারো চোখে জল এল, আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লুম না।" এই বলিয়া বামার মা চোখের কোণ মুছিতে লাগিল; "আর রোজ রোজ নিয়ে গেলে গিন্নিমাই বা কি মনে কর্‌বেন—না যাওয়াই ভাল।"

মহেন্দ্র অবিবাহিত। বৃদ্ধা মা ও একটি বিধবা ভগ্নী সংসারে ছিল। মহেন্দ্র মাতাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না। পুরাতন অনাবশ্যক সরঞ্জামের মত তিনি গৃহের এক কোণে পড়িয়াছিলেন। মহেন্দ্র বলিল, "সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমি তোমার মেয়েকে দেখেছি—আমার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছে, আমি জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। যে-কেমন করিয়া হোক্, তাহাকে চাই। আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিব, তুমি এ বিষয়ে আমার সহায়তা কর। তাহাকে না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিব—ব্রহ্ম-হত্যার ভাগী তোমাকে হইতে হইবে। এখানে আমার পক্ষে আমার অনেক বিঘ্ন, চারি দিকে প্রজা, জানিতে পারিলে আমার মাথা হেঁট হইবে—তোমাদেরও কলঙ্ক।"

"আচ্ছা, আর একবার খুব চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

"দেখো, ঠিক হয় যেন"—এই বলিয়া বামার মার হাতে দশটি টাকা দিয়া মহেন্দ্র গৃহাভিমুখে ফিরিল।

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে বামার মা ভাবিতে লাগিল, "কি করি! উপায় কি?"

এ দিকে প্রতিমা মহেন্দ্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেই ঘাটে আসিয়া খানিকক্ষণ বসিল; ভাবিতে লাগিল, "ভগবান যাহার কপালে দুঃখ লেখেন, তাহার দুঃখ লাগিয়াই থাকে। জন্মাবধি মা বাপের ত মুখ দেখিতে পাইলাম না। যিনি আমাকে মানুষ করিলেন—আমার পালয়িত্রী মাতৃস্থানীয়া—তিনি লোভে পড়ি আমার কি যে করিবেন, ঠিক নাই। লক্ষ্মীছাড়া ঐ জমীদারের ছেলেটা ত আ শনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদনের দারুণ কষ্ট সহ্য হয়, কিন্তু একমাত্র

দাঁড়াইবার স্থান ধর্ম্মের উপর শয়তানের দৃষ্টি পড়িয়াছে—কি করিয়া সহ্য করি!" প্রতিমা উঠিয়া "হায় জগদম্বা!" বলিয়া উপর্য্যুপরি দুই চারিটা ডুব দিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া মহেন্দ্রের ভয়ে গৃহে না ফিরিয়া একেবারে পুকুরপাড়ে পুরুৎঠাকুরণের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রতিমা যখন গৃহে ফিরিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা। বামার মা তখন আহারাদি শেষ করিয়া নাসিকাগর্জ্জনসহকারে নিদ্রা যাইতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"বৎস, ধর্ম্ম ঐ জলের মত স্বচ্ছ পরিষ্কার, ঐ ফুলের মত নির্ম্মল পরিমলপূর্ণ, এই বাতাসের মত লঘুপ্রাণ হিল্লোলময়, ঐ শিশুর মুখের মত সহজ সরল। প্রেম চাই, ভক্তি চাই, তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। যিনি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি অসীম জ্ঞানময় শক্তিময় করুণাময়। এই জগৎকৌশল তাঁহার অসীম জ্ঞানের, সাক্ষ্য দিতেছে—সূর্য্য চন্দ্র, ফুল ফল, মাতৃস্তন্য তাঁহার অসীম করুণার সাক্ষ্য দিতেছে। যখনই মনে খটকা লাগিবে, তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছা ব্যতিক্রম বলিয়া মনে ধারণা জন্মিবে, তখনই আপনার ক্ষুদ্রত্ব অসীমত্ব স্মরণ করিয়া সেই অসীম জ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। তিনি যেটুকু জ্ঞান, যেটুকু শক্তি দিয়াছেন, তাহা লইয়াই ত আমাদের স্পর্দ্ধা; তবে কেমন করিয়া সেই অসীমের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই! একখণ্ড তৃণ কি উপাদানে কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল, যখন বুঝিবার আমাদের শক্তি নাই, তখন আমরা তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার কার্য্যের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কেমন করিয়া দেখিব, বুঝিব! সব বুঝিতে পার না বলিয়া তাঁহাকে অবিশ্বাস করিও না, স্বীয় জ্ঞানের পরিমিতি উপলব্ধি কর। বৎস, তোমার বিক্ষিপ্ত বাসনা, তোমার সমস্ত কামনা সেই পরমাত্ম-বিন্দুতে নিক্ষেপ কর, সংহত কর, দেখিবে কি আনন্দ,—শান্তি, তাহা আর কিছুতেই পাইবে না। প্রেমানন্দ, তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ, ধর্ম্মের এই সার কথা।"

"বাবা, দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি?"

"বৎস, জাগতিক দুঃখ চিরকালই থাকিবে। অবিশ্বাসী যাহারা, তাহারা দুঃখকে দুঃখই মনে করিয়া ভয় পায়—ভক্তেরা সেই দুঃখকে মাথার মণি করিয়া তাহারই মধ্যে আনন্দলাভ করে। রামায়ণ ত পড়িয়াছ,—সীতা এত দুঃখ সহ্য করিয়াও কেন জন্মজন্মান্তরে রামচন্দ্রকেই পতিরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন? দুঃখের মধ্যেও বনবাসিনী সতী পতিপ্রেমে এমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, যাহা হর্ম্ম্যবাসিনী রাজেন্দ্রাণীর পক্ষেও দুর্লভ। ভগবানে প্রাণ

মন অর্পণ কর, দেখিবে, যে আনন্দ পাইবে, তাহার নিকট জাগতিক সাংসারিক দুঃখ অতিশয় তুচ্ছ নগণ্য বলিয়া বোধ হইবে।"

"বাবা, আমার আর একটি প্রশ্ন আছে—সংসারধর্ম্ম ভাল, না সন্ন্যাসধর্ম্ম?"

"এ বিষয়ে আমি আপাততঃ কিছু বলিব না। যখন সময় হইবে, পরে এ প্রশ্নের উত্তর দিব।"

সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলীর আরও অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তাহার পর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। জটাজূটশ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল বৃষ্টিবারিধৌত শরতের রৌদ্রের ন্যায় সহসা জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল। এমন সময় আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা প্রতিমা সেইখানে আসিয়া গলবস্ত্রে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী চক্ষুরুন্মীলন করিলে প্রতিমা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন, "মা, তুমি না আর একবার এখানে আসিয়াছিলে?"

"হ্যাঁ ঠাকুর, গত বৎসর স্নানযাত্রার সময় আমার মায়ের সঙ্গে আপনার চরণ দর্শন করতে এসেছিলুম।"

"মা, তোমার মুখখানি এত বিষণ্ণ কেন—তোমার কি কোন কষ্ট আছে?"

"হ্যাঁ ঠাকুর, আমার বড় দুঃখ। খাওয়া-পরার কষ্টের কথা বল্‌চিনে—আমার ভারি বিপদ!"

সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে উঠিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলেন। তাহারা উঠিয়া গেলে কহিলেন, "তোমার যাহা বলিবার আছে, নিঃসঙ্কোচে খুলিয়া বল। আমি তাহার বিধান করিবার চেষ্টা করিব।"

সন্ন্যাসীর স্নেহমাখা আশ্বাস-বচনে প্রতিমা যেন অনাস্বাদিত পিতৃস্নেহের স্বাদ পাইল, কহিল, "ঠাকুর, আমাদের গ্রামের জমীদারের জ্বালায় আর ধর্ম্ম থাকে না।"

সন্ন্যাসীর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, কহিলেন, "কে সে? তাহার নাম কি?"

"মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"মহেন্দ্র? সেই পাষণ্ড! তোমার মা ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না? তিনি কেন তোমার সঙ্গে আসেন নাই?"

প্রতিমা অধোবদনে কহিল, "তিনি আমার আপনার মা নহেন—আমাকে মানুষ করিয়াছেন। তিনিও লোভে পড়িয়া এই কুচক্রান্তে যোগ দিয়াছেন।" প্রতিমার চোখ দিয়া জল পড়িল।

সন্ন্যাসী যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার আত্মসংযম করিয়া কহিলেন, "ইহার আমি প্রতীকার করিতেছি।" পরে

শিষ্যদিগের মধ্যে এক জনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন;—"ইহাকে লইয়া মঠে রাখিয়া আইস—আনন্দময়ীকে বলিয়া দিবে, ইহার পরিচর্য্যার যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রেমানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাখ্না গ্রামে যে বৃদ্ধার নিকট আহারীয় দ্রব্য মধ্যে মধ্যে লইয়া যাও, সেই বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।"

প্রেমানন্দ আদেশ পালন করিতে তখনই চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরের পর প্রেমানন্দ বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "ঠাকুর, আমাকে কেন ডাকিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, বিশ্রাম কর, পরে বলিতেছি।"

বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার কন্যা আজ প্রাতে আমার নিকট আসিয়াছে—সে এইখানেই আছে। শোন, তোমার কন্যার নিকট তাহার বিপদের কথা শুনিয়া স্থির করিয়াছি, কিছুকালের জন্য তাহাকে অন্যত্র রাখিব। তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে তোমার কষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সহ্য করিতে হইবে। আমি যাহা করিতেছি, তোমাদের মঙ্গলের জন্য।"

"ঠাকুর, আপনি দেবতা; আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

"তোমার কন্যার সহিত দেখা করিতে চাও ত ইহার সঙ্গে যাও। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, সে সুখে থাকিবে। তুমি এই বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্মে মতি রাখিও—হরিনাম করিয়া দিন কাটাইয়া দাও।"

বামার মা সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রতিমার সহিত দেখা করিতে মঠে গমন করিল। মৃতা-কন্যার বিদায়-দৃশ্য পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন, বিস্তারিত লেখা বাহুল্য। তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বামার মার নিতান্ত গর্হিত অমার্জ্জনীয় অপরাধ সত্ত্বেও প্রতিমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

বামার মা যখন একাকী গৃহাভিমুখে ফিরিল, তখন সূর্য্য প্রায় অস্তোন্মুখ। অন্ধকার সুপ্তি শান্তিতে চরাচর আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। গাভীরা ধূসর ধূলিকণা উড়াইয়া গৃহে ফিরিতেছে। পাখীরা একে একে কুলায়ে আসিয়া বসিতেছে। প্রতিমার জন্য বামার মার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। সে কাঁদিতে লাগিল,—

[illegible]র দিনও শেষ হইয়া আসিয়াছে—ইহকাল পরকালের মাঝখানে দাঁড়াইয়া [illegible] এমন কাজ করিতে গেলাম! আহা, বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি—আমারই

বুদ্ধির দোষে এমন ঘটিল!" দূরে দেখিল, একটা গাভী বৎসকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় একটা কুকুরকে তাড়া করিয়া গেল।—বৃদ্ধা মনে মনে বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, পশুদেরও বাৎসল্য আছে, ধর্ম্ম আছে, আর আমি মানুষ হইয়া এমনই অধম!"—বৃদ্ধা মাটিতে বসিয়া পড়িয়া সেই অদৃশ্য মহেশ্বরের চরণে বারবার মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সহর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে সন্ন্যাসীর মঠ। ছোট ছোট সারি সারি অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর—মাটির দেয়াল, উপরে খড়ের চাল। সন্ন্যাসী একটী একটি ঘরে থাকিতেন—অন্যান্য ঘরগুলি শিষ্য ও অতিথিদিগের জন্য। মঠের জমী প্রায় বিশ ত্রিশ বিঘা হইবে—লতা গুল্ম জঙ্গলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। জমীর মধ্যভাগে একটি সুবৃহৎ কাঁঠাল গাছ—ইট দিয়া বাঁধানো। এই বৃক্ষতলে বসিয়া সন্ন্যাসী ধ্যান করিতেন।

বামার মা চলিয়া যাইবার অনেকক্ষণ পরে একটু রাত্রি করিয়া সন্ন্যাসী মঠে ফিরিলেন। প্রতিমা তখন বসিয়া মঠের বৃদ্ধা পাচিকা আনন্দময়ীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সন্ন্যাসী আনন্দময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার আজ আহার করিতে বিলম্ব হইবে, আমার আহার প্রস্তুত রাখিয়া তোমরা আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে যাও; দেখিও মেয়েটিকে খুব যত্ন করিও।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী অতি অল্প সময়ই নিদ্রা যাইতেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিতে অথবা ধ্যানমূর্ত্তিতে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। সমুদ্রের অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে যেমন একটা চঞ্চলতা প্রবাহিত, সুদূর একতান ক্রন্দনধ্বনি নিরন্তর উত্থিত হইতে থাকে—সন্ন্যাসীর প্রশান্ত স্থির গম্ভীর মূর্ত্তির মধ্যেও তেমনই সর্ব্বদা একটা চঞ্চল ব্যাকুলতা প্রকাশমান—যেন কি ধরিতে চাহিতেছেন, সম্পূর্ণ ধরিতে পারিতেছেন না—যেন কি ছাড়াইতে চাহিতেছেন, সম্পূর্ণ ছাড়াইতে পারিতেছেন না—যেন অন্তরে অন্তরে জোয়ার ভাঁটা খেলিতেছে।

সন্ন্যাসী আজ যেন সমধিক চিন্তাগ্রস্ত। স্তব্ধ বনানী। রজতশুভ্র জ্যোৎস্না ঘন নিবিড় চিক্কণ পত্র হইতে পত্রান্তরে পিছলিয়া পড়িতেছে। দূর হইতে বাঁশীর শব্দ আসিতেছে। ঝর্ঝর করিয়া বাতাস বহিতেছে। নারিকেল-তরুশির কাকেরা মাঝে মাঝে কা কা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। খড়ের

উপর দুই একটা ইঁদুর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। সকলই বিরল—যে মন্দির-বিহ্বল প্রকৃতি-রাণী আপনাকে সামলাইতে পারিতেছেন না। গ্রীষ্মহেতু কুটীরের সকল দ্বারই উন্মুক্ত। ঘরে জ্যোৎস্না ঢুকিয়াছে। সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন, প্রতিমা মাধবীলতার ন্যায় শুষ্কচর্ম্ম অস্থিপঞ্জরসার বৃদ্ধাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া শুইয়া আছে। বালিকার মুখখানি নিদ্রাতেও যেন বিষাদভরা। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

ভোর হইতে না হইতে সন্ন্যাসী প্রেমানন্দকে ডাকিলেন। প্রেমানন্দ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী রাত্রে কিছুই আহার করেন নাই—আহারদ্রব্য পূর্ব্ববৎ সজ্জিত রহিয়াছে। প্রেমানন্দের প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী বলিলেন, "সন্তোষ কুমারকে ত তুমি জান। মঠের সমস্ত ব্যয় সেই একরকম নির্ব্বাহ করে। ছেলেটি অতিশয় সৎ। ধনীর সন্তানকে এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রায়ই দেখা যায় না। সন্তোষের মাও যেন সাক্ষাৎ নারায়ণী। আমি স্থির করিয়াছি, উহাদের বাড়ীতে বালিকাকে রাখিব। তুমি কি বল?"

প্রেমানন্দ কহিল, "বাবা, অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তাহা হইলে এখনি সঙ্গে করিয়া উহাকে রাখিয়া আইস, বিলম্ব করিও না। সন্তোষকুমারকে এই পত্রখানি দিবে।"—তাহার পর প্রতিমাকে কাছে ডাকিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "মা, তোমাকে যাহার নিকট পাঠাইতেছি, সে আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র। তোমার কোনও ভয় নাই, সেখানে তুমি সুখে থাকিবে। সকলকে ভালবাসিও, সেবাশুশ্রূষা করিও, গৃহের কাজকর্ম্ম দেখিও। আমিও প্রায় তোমার খোঁজ লইব।"

প্রতিমা সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রেমানন্দের সহিত চলিল। তখনও ভাল করিয়া আলো ফোটে নাই। গাভীরা মাঠে রোমন্থন করিতেছে। কোঁচড়ে মুড়ি লইয়া রাখাল-বালকেরা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া আসিতে প্রতিমার কষ্ট বোধ হইতেছিল। অল্প দূরে গিয়া সে একবার মঠের দিকে ফিরিয়া চাহিল—দেখিল, সন্ন্যাসী তখনও তাহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।

ক্রমে তাহারা সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সহর সবেমাত্র গা-ঝাড়া দিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। দোকানদারেরা দোকানের ঝাঁপ খুলিতেছে। সমস্ত রাত্রি অন্যত্র কাটাইয়া ইয়ার-বাবুরা গলা-ধরাধরি করিয়া গৃহাভিমুখে

ফিরিতেছেন। সন্ন্যাসীর সহিত প্রতিমাকে যাইতে দেখিয়া তাহারা হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল—পরস্পরে বলিতে লাগিল, "ব্যাপারটা কি! সন্ন্যাসী বেটা এ কাহাকে লইয়া যাইতেছে!"—একটু দূরে গিয়া তাহারা গান ধরিল—"কে বায় ঐ নবীন সন্ন্যাসী।"

অবশেষে উভয়ে গন্তব্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিল। গঙ্গার উপরেই বাড়ী। কোমল পুষ্পশয্যা নদীর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। বাগানে নানাবর্ণের ফুল—মধ্য-ভাগে প্রস্তরমণ্ডিত একটি জলের ফোয়ারা। চতুর্দ্দিকে মেদিগাতার বেড়া। সন্তোষ বাগানে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতেছিল। প্রেমানন্দ প্রতিমাকে লইয়া সেই-খানে উপস্থিত হইল। সন্তোষ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রেমানন্দ সাদরসম্ভা-ষণ করিয়া সন্ন্যাসীর পত্রখানি তাহার হাতে দিল। পত্রে লেখা ছিল,—"বৎস, ইহাকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। সহোদরার মত দেখিবে—যাহা বলিবে, ইহার দ্বারা সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া লইতে। তুমি সুবিধামত একদিন মঠে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

সন্তোষ ছোট ভগ্নী মালতীকে ডাকিয়া কহিল, "ইহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যা,—মাকে বলিস্, সন্ন্যাসী ঠাকুর পাঠাইয়া দিয়াছেন।"—তাহার পর প্রেমানন্দের সহিত নানান্ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

প্রেমানন্দ চলিয়া গেলে সন্তোষ পাঠাগারে আসিয়া বসিল। প্রকাণ্ড হল—মস্ত মস্ত কড়িকাঠ পর্য্যন্ত উঁচু সেল্‌ফে বই সাজান রহিয়াছে—বইয়ে যেন দেয়াল সমস্ত মোড়া। নানারকমের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়িয়া আছে। টেবিলের উপর বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের ছবি। চারিধার হইতে বৈদ্যুতিক তার চলিয়াছে। ঘরে ঢুকিলে গন্ধেতেই যেন কবিত্বের দম্ আট্‌কাইয়া আসিবার উপক্রম হয়।

সন্তোষ বিজ্ঞানে এম্. এ. পাশ করিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তাহার বিজ্ঞা-নের প্রতি আন্তরিক টান। স্কুলে পাঠকালে সে ক্রিস্‌কফ্‌স্ কয়েল প্রভৃতি বৈজ্ঞা-নিক যন্ত্র স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া সহপাঠিদিগকে চমৎকৃত করিত। পিতার অগাধ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া এক্ষণে সে বৈজ্ঞানিক কোন নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও অজস্র অর্থব্যয় করিতেছে—স্থির করিয়াছে, বিবাহ না করিয়া এই কাজেই জীবনপাত করিবে।

সন্তোষ বসিয়া বসিয়া এটা ওটা নাড়া-চাড়া করিতেছে, এমন সময় মালতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, দেখ্‌বে এস, এমন সুন্দর

মেয়ে কখনো দেখনি! তখন গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা ছিল, কিছুই দেখ্‌তে পাও নি,—লক্ষ্মী দাদা, তুমি পাশের ঘর থেকে লুকিয়ে দেখ্‌বে এস—তোমার পায়ে পড়ি।"—এই বলিয়া হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল।

সন্তোষ মালতীকে বড় ভালবাসিত। তাহার কথা উপেক্ষা না করিতে পারিয়া উপরে গেল। সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে মুগ্ধ হইল। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে আসিতে অতর্কিতভাবে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—"এমন মুখ ত দেখা যায় না!"

ক্রমশঃ।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহযোগী সাহিত্য।

আকবর।

ভারতের প্রধান মোগল সম্রাট জলাল-উদ্দিন আকবরের বিষয় এখন অনেকেই নানা ভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন। কেহ আকবরকে এক নবধর্ম্মের পয়গম্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কেহ তাঁহাকে ভারতের প্রধান সমাজসংস্কারক বলিয়া পরিচিত করেন। গত অক্টোবর মাসের "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" নামক মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আকবরের সমাজসংস্কারচেষ্টার একটু পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিচয়পদ্ধতিতে আমরা আকবরকে চিনিতে পারি নাই। এ পরিচয় ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ না হইলেও অত্যন্ত একদেশব্যাপী ও সঙ্কীর্ণ। সমাজ-সংস্কারক আকবরকে লোকসমাজে যথাযোগ্য-ভাবে পরিচিত করিতে হইলে, আকবর-চরিতের তিনটি পর্য্যায়ের ব্যাখ্যা আবশ্যক।

১। আকবরের উদ্দেশ্য কি ছিল?

২। সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে তাঁহার চেষ্টা।

৩। আকবরের নিজের ব্যবহার ও কার্য্যপদ্ধতি।

লোকহিতার্থ আকবর কোনও কার্য্য করিতেন কি না, আমরা তাহা স্পষ্ট বলিতে পারি না। কিন্তু আকবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের সহিত একটা "বুঝা-পড়া" করিয়া না লইতে পারিলে ভারতে মোগল আধিপত্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেনানী-গণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। অনেক মোগল ওমরাহ আকবরের গুপ্ত শত্রু ছিলেন; অনেক প্রাদে-শিক সুবাদার আকবরের সহিত প্রকাশ্যভাবে বিরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। পাঠানগণ পদে পদে মোগলদিগের শত্রুতা করিত, তাহারা মোগলের উচ্ছেদ করিবার কোনও অবসর ত্যাগ করিত না। একে ত সে সময়ে হিন্দুস্থানে মুসলমানের সংখ্যা অত্যল্প ছিল, তাহার উপর হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত সমকক্ষতা করিয়া, তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া একটু উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানের প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধি—সম্ভ্রমজ্ঞান হিন্দুর হৃদয়ে অতি অল্পমাত্রায় অবস্থিতি করিতেছিল। দিল্লীর সিংহাসন পাশবল প্রক্ষেপের উপর নির্ভর করিত। এমন কি, হিন্দু-

... ...

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আকবরকে আধুনিক ইংরেজী চঙ্গের সমাজসংস্কারক বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন। আধুনিক হিসাবে সমাজ-সংস্কারক তিনি ছিলেন না। আকবর রাজনীতিবিশারদ, দূরদর্শী, চতুর, স্বার্থপর সম্রাট ছিলেন। ধর্ম্ম, সংস্কার, দয়া, মায়া, ক্ষমা,—সকলই তাঁহার রাজনীতির আসবাব ছিল। তিনি নিজে তেরটি বিবাহ করিতে পারিয়াছিলেন; অন্যের বেলা একটি বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। নিজে অত্যন্ত—অতিমাত্রায় বিলাসী ছিলেন, উপদেশ দিবার সময় সংযম ও ত্যাগের কথাই কেবল কহিতেন। তিনি যুবতীবিবাহ ও স্বেচ্ছাবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন, অথচ তাঁহার প্রেম-স্বয়ম্বরাদির পথে তিনিই বাধাস্বরূপ ছিলেন। আকবর কাহাকেও জামাতৃপদে বরণ করেন নাই, আকবরের অনুসরণ করিয়া আলমগীরের পাসনকাল পর্য্যন্ত সম্রাটের সংসারের বেলা অন্যত্রই বিবাহ হয় নাই। তিনি সতীদাহ উঠাইতে চাহিয়াছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার "জানগোলী" "নবরত্ন সোলী"র ব্যবহারে কত কন্যা পরিণীতা হইয়াছে, কত বিধবার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এমনই ভাবে, ইতিহাসের ঘটনার সহিত আকবরের উপদেশমালার সামঞ্জস্য করিতে হইলে, আপনা-আপনিই আকবরের অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। আকবর যদি সত্যসত্যই ধর্ম্মপিপাসু, জাতিহিতৈষী, সমাজসংস্কারপিপাসু হইতেন, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাসের মূর্ত্তি অন্যরূপ হইয়া যাইত। তিনি কেবল মাটির মোয়া দেখাইয়া হিন্দুকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন; আওরঙ্গজেবের কঠোর ও সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মপরায়ণতার প্রকোপে হিন্দুর এই বিমুগ্ধতা নষ্ট হইয়াছিল। ভারতে মোগলরাজ ধূলিসাৎ হইয়াছে।

আহাঙ্গীর বাদশা অনেকটা পিতৃপদানুসরণ করিতেন। তাঁহারও দাড়ি ছিল না; তিনিও আচার-ব্যবহারে অনেকটা হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি খাঁটি মুসলমান; তাঁহার পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদ; তাঁহার রাজ্যের সকল মস্‌জেদে তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া খোৎবা পঠিত হউক। জাহাঙ্গীরের পরে শা-জাহাঁ আরও একটু অধিকতরমাত্রায় মুসলমান ছিলেন। তিনি দাড়ি রাখিয়াছিলেন, নিয়মিত নমাজ পড়িতেন; এমাম—মোল্লার সহিত পরামর্শ করিতেন। শা-জাহাঁর পরে আওরঙ্গজেব ইস্‌লাম ধর্ম্মের মাত্রা অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ফলে মোগল সাম্রাজ্যের নিধন। আকবর যে শক্তি সমাজদেহে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিপর্য্যস্ত সমাজ ধীরে ধীরে সেই শক্তি-ক্রিয়াকে একেবারেই স্তম্ভিত করিয়া দিল।

আমরা যে ভাবে আকবর-চরিত-কথার আলোচনা করিলাম, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সে ভাবে করেন নাই। তিনি আকবরকে রাজা রামমোহন রায়ের ইস্‌লামী Enlarged Editionএ পরিণত করিয়া, আকবর-চরিতের আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই ভাবে আকবরের কথা কহিলে, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায়ের সহিত সমাজসংস্কারকার্য্যে আকবরের তুলনায় সমালোচনা করিলে, বাঙ্গালী জাতির অপমান করা হয়—বিদ্যাসাগরের অমর্য্যাদা করা হয়, রামমোহন রায়কে কলঙ্কিত করিতে হয়। রাজনীতির মাপ-কাঠিতে আকবরকে মাপিলে, আকবর অদ্বিতীয়, অসাধারণ, অপূর্ব্ব। সামাজিক মনুষ্যের হিসাবে আকবরের আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আকবর সে মহান্ নাই।

স্পেন্সার।

যে সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন মনীষী জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া পাশ্চাত্য জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, দার্শনিকশ্রেষ্ঠ মহামতি স্পেন্সার তাঁহাদের অন্যতম। কয়েক মাস পূর্ব্বে আচার্য্যপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ড যে একটি অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ কি? স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্য প্রতিভায় যাঁহারা ইংলণ্ডকে কমলার মরকতপ্রদীপ্ত পীঠতল শ্বেতদ্বীপকে দেবী বীণাপাণির রম্য ক্রোড়ে পরিণত করিয়াছিলেন তাঁহারা একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাই সেখানে এখন এরওও ক্রম নামে পরিচিত হইতেছে; এখন সেখানে চেম্বার্লেন ও ব্রডারিক ব্রাডষ্টোন ও ব্রাইটের আসনে উপবিষ্ট; সিপ্ লি সরস্বতীর বরপুত্র।

সম্প্রতি সুবিখ্যাত "ফেরিম" পত্রে মিঃ স্পেন্সার সম্বন্ধে কয়েকটি অতি সুন্দর গল্প প্রকাশিত হইতেছে। গ্রাণ্ট এলেনের লিখিত বলিয়া গল্পগুলির একটু বিশেষ মূল্য আছে। গ্রাণ্ট এলেনও কিছু দিন পূর্ব্বে ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্পেন্সার সম্বন্ধে এই গল্পগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, স্পেন্সারের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার ঐ সকল গল্প প্রকাশিত না হয়।

গ্রাণ্ট এলেন ও স্পেন্সার উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল; এবং রাজনৈতিক মতদ্বৈধ সত্ত্বেও সে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। কেবল রাজনীতি কেন, আরও অনেক বিষয়ে এই বৃদ্ধদ্বয়ের মতের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইত। স্পেন্সারের উপর গ্রাণ্ট এলেনের অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মনে করিতেন, এমন উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক—এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মনুষ্য-জগতে দুর্লভ।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, প্রতিভাশালী ব্যক্তি সচরাচর সাধারণের অনুরাগভাজন হইতে পারেন না। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ন্যায় বিরাট পুরুষ—যাঁহারা তরবারি হস্তে পৃথিবীর ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের জন্য সংসারের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা যোগী ও তপস্বীর ন্যায় নির্জ্জনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে জ্ঞানের সাধনা করেন, জনসাধারণ তাঁহাদের কর জনের পরিচয় জানিতে ব্যস্ত হয়? কয় জন তাঁহাদিগকে জানিতে পারে? গ্রাণ্ট এলেনের একটি গল্প হইতে আমরা জানিতে পারি,—মনোবিজ্ঞান রাজ্যের এই মহাযশস্বী কৃতিমান মহাপুরুষকে তাঁহার প্রতি-বেশিগণও চিনিত না।

বহুদিন হইতেই গ্রাণ্ট এলেনের সহিত স্পেন্সারের পত্রব্যবহার ছিল, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলাপ পরিচয় ছিল না। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণ্ট এলেন স্পেন্সারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাসস্থানে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে স্পেন্সার কুইন্স পার্ডেন বেসওয়াটার নামক স্থানে বাস করিতেন।

এই প্রসঙ্গে গ্রাণ্ট এলেন যে গল্পটি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমি কুইন্স গার্ডেনে উপস্থিত হইয়া প্রতিগৃহে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, 'এখানে হার্বার্ট স্পেন্সার থাকেন কি?' আমার প্রশ্নের কি ফল হইল, শুনিবেন? ইংরাজ দ্বাররক্ষকগণ সন্দেহাকুল-নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, 'স্পেনসার! স্পেন্—সার? এ নাম ত পূর্ব্বে কখন

নাই মহাশয়! লোকটা হয় ত হোটেলে থাকিতে পারে।' আমি পুলিশ প্রহরীকে সেই প্রশ্ন করিলাম; সে বলিল, 'স্পেন্সার? না মশায়, ও-নামের কোন লোক এ দিকে থাকে না। আপনি ঠিকানা ভুলিয়াছেন।'—ইহাদের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'হা পরমেশ্বর! ইংলণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে কি এমন অজ্ঞতা সম্ভব? বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই নগরীর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিতেছেন, আর এখানকার একটি প্রাণীও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানে না? কি আশ্চর্য্য!'

গ্রাণ্ট এলেন স্পেন্সারের মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় কিছু নিরাশ হইয়াছিলেন। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে স্পেন্সার যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার আকৃতি তদনুরূপ 'জাঁকালো' ছিল না; তাই গ্রাণ্ট এলেন লিখিয়াছেন,—এমন অনেক বড়লোক আছেন, যাঁহাদের আকার দেখিলেই প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন জর্জ্জ মেরিডিথ। কিন্তু স্পেন্সারকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে তিনি অত বড় লোক। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি এক জন সাধারণ ভদ্রলোক; কিন্তু লোকটির সহিত ভালরকম পরিচয় হইলে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার মনের ভাব মুখে প্রকাশিত হয় না।

কুইন্‌স গার্ডেনের একটি বোর্ডিং হাউসে স্পেন্সার একাদিক্রমে দশ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বোর্ডিং হাউসে জলযোগ ও আহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তাঁহাকে দেখা যাইত না। বেস ওয়াটারে (Bays water) একটা দুধের দোকান ছিল, নীচের তলায় দুধ বিক্রয় হইত; দ্বিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, সেই কক্ষে বসিয়া তিনি দিবারাত্রি দর্শনালোচনায় রত থাকিতেন। রাশি রাশি পুস্তকের মধ্যে তিনি সমাধিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার জীবন যোগীর জীবন ছিল। একাগ্রচিত্তে তিনি দর্শনশাস্ত্রের যে আলোচনা করিতেন, সাধকের তপস্যার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। এই দশ বৎসরের মধ্যে তিনি বোর্ডিং হাউসের কর্ত্রীর নিকটও তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করেন নাই; দাস ভৃত্যেরা তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে ঠিকানা বলিয়া দিয়া তাঁহার নির্জ্জন চিন্তায় বিঘ্ন উৎপাদন করে; কিংবা তাঁহার ঠিকানা জানিয়াও 'জানি না' বলিতে বাধ্য হয়।

স্পেন্সার সকল বিষয়েই সূক্ষ্ম আলোচনা করিতেন; যদি কেহ তাঁহাকে বলিত, 'আজ দিনটি বেশ পরিষ্কার', তিনি উত্তর করিতেন, 'হাঁ, কাল হইতে যে পশ্চিম বাতাস বহিতেছে, তাহা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আকাশ এমনই পরিষ্কার থাকিবে।' যদি কেহ বলিতেন, 'শ্রীমতী জোন্‌স বেশ সুন্দরী।'—তিনি উত্তর দিতেন, 'সুন্দরী ত হইবেনই, উঁহার পিতা ছিলেন পশ্চিমদেশীয় হাইল্যাণ্ডার, মাতা আইরিস রমণী, হাইল্যাণ্ডার পুরুষ ও আইরিস রমণীর সম্মিলনে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সৌন্দর্য্যে সুখী হয় বটে, কিন্তু উচ্চমনোবৃত্তি লাভ করিতে পারে না।' সকল বিষয়েই তিনি এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া কথা কহিতেন।

সেই জ্ঞানবৃদ্ধ সুপণ্ডিতের তিরোধান হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কত সুন্দর সুন্দর গল্প ভক্তগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এখানে তাহারই দুই একটিমাত্র প্রকাশ করিলাম।

ডাক্তার স্যামুয়েল স্মাইলস্।

ডারউইন পেন্সারের শোকস্মৃতি পাশীও থাকিতে থাকিতেই অতীত বৎসরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের সাহিত্যাকাশ হইতে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে; আমরা ডাক্তার স্যামুয়েল স্মাইল্‌সের কথা বলিতেছি।

ডাক্তার স্মাইলসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক 'সেল্‌ফ্ হেল্প' প্রথমে জনসমাজে লাভ করিতে পারে নাই; তিনি নিজেও জানিতেন না যে, তাঁহার 'সেল্‌ফ্ হেল্প' সাহিত্যজগতে সুচিরস্থায়ী হইবে। কতকগুলি যুবক একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শিক্ষার্থিগণের কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করা উচিত। সেই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ তিনি এই গ্রন্থের রচনা করেন। কিন্তু এমন এক-খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও প্রকাশক সমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই; তিনি ডাক্তার স্মাইল্‌সের পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনার এ বহি বিক্রয় হইবে না, এখন ক্রিমীয় যুদ্ধ চলিতেছে, রক্তপাতের বিবরণ ও জয়পরাজয়ের লোমহর্ষণ কাহিনী পাঠ করিবার জন্যই পাঠকসমাজ উৎসুক। যুদ্ধবিষয়ক প্রবন্ধ ও সংবাদপত্র ভিন্ন সাধারণ পুস্তক এখন বিক্রয় হওয়া অসম্ভব।' প্রকাশকের কথা শুনিয়া ডাক্তার স্মাইল্‌স নিরুৎসাহ হইলেন না, নিজের ব্যয়ে তিনি 'সেল্‌ফ্ হেল্প' প্রকাশিত করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের আঠার হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়া গেল। ক্রিমীয় যুদ্ধের রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেও অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু সেল্‌ফ্ হেল্প' জীবনের যুদ্ধে অগ্রসরোদ্যত নবীন পাঠকমণ্ডলীর নিকট প্রত্যক্ষ অস্ত্রের ন্যায় চিরসমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ প্রথমে উপেক্ষিত হইলেও এক দিন না এক দিন সমাজে তাহা আদরলাভ করে—ডাক্তার স্মাইল্‌সের 'সেল্‌ফ্ হেল্প' তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

'সেল্‌ফ্ হেল্প'র পর ডাক্তার স্মাইল্‌স সেই পুস্তকের আদর্শে 'ক্যারেক্টার', 'ডিউটি', 'থ্রিফ্‌ট' নাম দিয়া কয়েকখানি উপদেশমূলক পুস্তক প্রণয়ন করেন। শিক্ষার্থিগণের নিকট সেই সকল পুস্তকেরও সম্যক আদর হইয়াছিল। ডাক্তার স্যামুয়েল স্মাইল্‌সের যশঃ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই অভিব্যাহিত হয় নাই। তিনি এক জন কাজের লোকও ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ হইতে দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথের কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। চৈত্র। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর "সমাজ ও তাহার আদর্শ" নামক প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এবার সপ্তম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। সমাপ্ত হইলে এই প্রবন্ধটি প্রকৃতই উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে স্থান লাভ করিবে কি না, বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর "বনপথে" তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ-চিত্র,—রমণীয়; কিন্তু অসম্পূর্ণ। শ্রীযুক্ত শশধর রায় "উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া একটি ধারাবাহিক রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। এবার 'মুণ্ডকোপনিষদ্' সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদ যদি যথাযথ না হয়, কেবল সংস্কৃতের কথাই

পাঠক যদিও সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভাষা ও ছন্দের সৌষ্ঠবে অধিকতর অবহিত হইতে হইবে। যথাযথ অনুবাদে অনুবাদকের স্বাতন্ত্র্য শৃঙ্খলিত থাকে; সুতরাং অনুবাদে অবিকৃত মূল ভাব প্রতিবিম্বিত করিয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, রচনার লাবণ্যবিধানের অবকাশ ও সম্ভাবনা অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। স্বাধীন মর্ম্মানুবাদে ততটা দাসত্ব আবশ্যক হয় না,—সুতরাং অনুবাদক বাহ্য সৌন্দর্য্যেও মনোযোগী হইতে পারেন। শশধর বাবু সুকবি,—সুতরাং আশা করি, তাঁহার অনুবাদেও আমরা কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদচিহ্ন দেখিতে পাইব। শ্রীযুক্ত বিশেশর ভট্টাচার্য্য "কুচবিহারে সাহিত্যচর্চ্চা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'প্রাচীন কালে' কুচবিহারে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা ছিল। ১৫৫৫ হইতে ১৫৮৭ পর্য্যন্ত রাজা নরনারায়ণ রাজ্য করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কুচবিহারে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ 'রত্নমালা' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ ও রাম সরস্বতী ভাগবতের বাঙ্গলা অনুবাদ করেন। লেখক বলিতেছেন,—"কুচবিহার লাইব্রেরিতে এমন অনেক পুঁথি আছে, তাহা যত্নের সহিত রক্ষিত ও মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য।" লেখক আশা করেন, "কুচবিহারের মহারাজার কালিদাস (কালিকাদাস?) দত্ত বাহাদুরের দৃষ্টি এই গ্রন্থগুলির দিকে পতিত হইবে।" যাঁহারা দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা জানেন, তাঁহারা এরূপ দুরাশা করিবেন না। কত প্রাচীন পুঁথি অযত্নে কীটে কবলিত ও ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালী অভিজাত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার প্রতি যেরূপ অনুরাগ থাকিলে দেশের ও সাহিত্যের শ্রী অনুরূপ হইত। কাশীর মহারাজ মহীতাপচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বর্ণযুগ এখন অতীতের স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। মহীতাপচাঁদের বর্ত্তমান বংশধর, সাহিত্য-পরিষদের গৃহনির্ম্মাণকল্পে মগদ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। অবশ্য সারস্বত ভিক্ষুকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আকাঁড়া', তাহার বিচার এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। অন্নহীন দরিদ্রের দৃষ্টিকোণে যদি পুষ্টি সম্বন্ধে কবেই বাঙ্গলা সাহিত্যের এই ক্ষীণতম-জীর্ণতম অঙ্কুরটি কালে মহাক্রমে পরিণত হইতে পারিবে। এ দুরাশা,—এই 'নিশায় স্বপ্ন' কখনও সফল হইবে কি না, কে বলিবে? শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যালের "চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে নূতন কথা নাই। এরূপ ইতিহাসক্ষেত্রে এত রোমন্থন অসহ্য। "প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যে" শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত বিদ্যানিধি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু রচনার শৃঙ্খলা নাই।

ভারতী। চৈত্র। "বঙ্গমাতা" শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের একটি ক্ষুদ্র কবিতা। পুরাতন ভাবেরও নয়—কথার প্রতিধ্বনি। রচনাটি রমণী বাবুর প্রাপ্য নয়। কেবল,

"তা বলে' কি ভুলি তোমা', ভুলি আপনায়
মা বলিব বিমাতায়—অমরের মায়?"

এই দুইটি চরণ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "ভারতে য়ুরোপীয়" একটি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে অবতীর্ণ হন। ভারতের বন্দরে সেই প্রথম য়ুরোপীয় জাহাজ। সতীশবাবু সংক্ষেপে ভাস্কো-ডা-গামার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমান্ সত্যসুন্দর দেব "জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড" প্রবন্ধে মাত্রাতীত 'লেক্‌চার' দিয়াছেন। 'লেক্‌চার' দিবার ও 'লেক্‌চার' শুনিবার একটা বয়স আছে। কল্যাণভাজন সত্যসুন্দরের এখনও 'লেক্‌চার' দিবার বয়স হয় নাই, মনে হইতেছে। আমরাও বোধ করি 'শুনিবার

দমন পার হইয়াছি। আপনের ন্যায় সজীব জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক সেই উচ্ছ্বাস পত্রিকাকে করিয়া দিবেক কল জীবনে পরিপূর্ণ করুন,—একথেয়ে 'লেকচার'-রূপ ছিদ্রপথে তাহা বঙ্গদেশের 'নর্দ্দামা'য় ঢালিয়া দিয়া ফল কি? শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবু কি উদ্দেশ্যে "ভোরের স্বপন" নামক গল্পটি লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। প্রাদেশিক ভাষার নায়িকা লইয়া দন্তরুচিকৌমুদী প্রকটিত করিবার কাল অন্তর্হিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু "প্রচারে" "সীতারামে"র প্রথমেই লিখিয়াছিলেন,—"এখনও এ প্রদেশে এমন অনেক স্থূলবুদ্ধি লোক আছেন যে, তাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গলা-নিবাসী ভাতৃগণকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া উপহাস করেন।" সেই "এখনও"র পর কুড়ি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূপেন্দ্র বাবু এখনও সেই "এখনও"র জের টানিতেছেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের "চীনপ্রবাসীর পত্রে" বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে; কেবল চীনের পরিচয় নাই। কেদার বাবু চীনদেশে বসিয়া লিখিয়াছেন, "এ নিকল শক্তির মহানাধার অন্তর্তম মূলমন্ত্র—নক্তিরূপা, তেজদৃপ্তা (ওজোবলযুতা) জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী।" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "প্রাতিমোক্ষ" নামক বৌদ্ধশাস্ত্রীয় প্রবন্ধটি উপাদেয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্কলিত বিবরণে প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আচার ব্যবহার ও জীবনযাত্রার প্রণালী উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। রচনাটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "হরিহর বাইতি" একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। 'ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে গৃহীত।' বুঝিলাম, কিন্তু আহার ধর্ম্মমঙ্গল? যখন একাধিক ধর্ম্মমঙ্গল বিদ্যমান, তখন রচয়িতার নাম দিলে ভাল হইত। তাঁহা এখনও 'হামাগুড়ি' দিতেছে, কিন্তু হরিহর বাইতির চরিত্র-সমালোচনায় দীনেশ বাবু সুদৃষ্টি ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্থান থাকিলে আমরা প্রবন্ধটির সারসংগ্রহ করিয়া দিতাম। উপসংহারে দীনেশ বাবু বলিতেছেন,—"ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লখা ডুমুনী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্যক্তির উপাখ্যান দ্বারা দৃষ্ট হয়, সত্য-রক্ষা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী এক সময়ে বঙ্গদেশে কিরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। * * * পূর্ব্বতন কবি, নানা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক সাজসজ্জার অভ্যন্তর হইতে, সামাজিক যে চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছে, তাহা আমাদিগের অতীত সমৃদ্ধির কথা স্মৃতিপথে উজ্জীবিত করে—যে সমস্ত মহৎ গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় জীবন সমুজ্জ্বল হয়—এই সমস্ত নিবিড় কাল্পনিক উপখ্যানের ভিতর আমরা সেই সৌম্যদৃপ্ত চরিত্রগৌরবের আভা দর্শন করি। সত্যের প্রতি বিপুল আস্থা ও প্রতিজ্ঞার প্রতি অখণ্ড ঘৃণা যখন পল্লীর নিম্নশ্রেণীর কুটীরেও এরূপ সুস্পষ্টভাবে অতিব্যক্ত ছিল—তখন বঙ্গদেশ প্রকৃতই স্বর্গোপম ছিল।"

প্রবাসী। চৈত্র। "জাপান ও ভারতবর্ষ" একটি সাময়িক প্রবন্ধ। লেখকের অভিপ্রায়, স্বাধীন জাপান জগতে নব্য ভারতের আদর্শ হউক। "অসভ্য জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস" নামক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের সঙ্কলিত প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সামন্তসিংহ "শ্রীমদ্বিজয়নেমি সূরী"র সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সামন্তসিংহ মহাশয় বাঙ্গালী না হইয়াও যে বাঙ্গলা লিখিতেছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত রামনরেশ বসুর "পূণা" বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেনের "পতিব্রতা সতী"র আখ্যানবস্তু চিত্তাকর্ষক। লিপিকৌশল ও গল্প-রচনায় হাত থাকিলে আলোচ্য আখ্যানবস্তুর সদ্ব্যবহার হইতে পারিত। "সৌন্দর্য্যের স্নান" একটি গল্প, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব

কর্ত্তৃক 'জর্ম্মন হইতে অনূদিত।' অনুবাদে অপপ্রয়োগের প্রাচুর্য্য আছে বটে, কিন্তু ভাষাটি আশাপ্রদ। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ "শাস্ত্রবাদের বিনাশ" প্রবন্ধে 'নানা মুনির নানা মত' উদ্ধৃত করিয়াছেন। বোধ হইতেছে, তাঁহার প্রতিপাদ্য এই, বেদ অভ্রান্ত বা অপরিত্যাজ্য নহে। নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ তাহা স্বীকার করিবেন না। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ "বাঙ্গলা ভাষার ইংরাজকৃত উন্নতি" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোনও নূতন কথা বলিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কুর্গ" প্রবন্ধটি মন্দ নহে। কিন্তু "যত দিন না কৌলীন্য ও জাতিভেদ প্রভৃতি কুপথা সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, ততদিন আমরা দুর্ব্বল ও কাপুরুষ নাম হইতে রক্ষা পাইব না"—ইত্যাদি অমূল্য সিদ্ধান্তগুলি অসহ্য। 'ধান ভানিতে শিবের গীত' কেন? শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার "কামসূত্রে"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় "সাহিত্য-সংহিতা"য় বিস্তৃতভাবে কামসূত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। আবার বিজয় বাবু সেই পথের পথিক হইতেছেন!—আলোচ্য প্রবন্ধে নূতন কথা দেখিলাম না। আশা করি, বিজয় বাবুর ভাবী প্রবন্ধে নূতন তথ্য ও সিদ্ধান্ত দেখিতে পাইব।

বিবিধ।

"আর্য্য-দর্শন"-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অসুস্থ ও প্রায় শয্যাগত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র নিরাময় হউন, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

"দেরাদুন, মসুরী ও হরিদ্বার" নামক একখানি সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে। লেখকের অনিচ্ছাবশতঃ আমরা তাঁহার নাম প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। গ্রন্থখানি কেবল ভাবুকের উচ্ছ্বাসে ও প্রকৃতিবর্ণনায় পূর্ণ নহে। লেখক বহুযত্নে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে অনেক জ্ঞাতব্য কথার সমাবেশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি মাসিকপত্রে "রামায়ণ" সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় প্রবন্ধ একত্র সন্নিবেশিত ও "রামায়ণী কথা" নামে প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "রামায়ণী কথার" একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আপাততঃ দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, কৌশল্যা, সীতা ও হনুমানের চরিত্র প্রকাশিত হইতেছে।

দীনেশ বাবু মধ্যে মধ্যে গল্প লিখিয়া থাকেন, সাহিত্য-সমাজে তাহা অবিদিত নাই। এবার তিনি কল্পনার কুঞ্জে আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন। দীনেশ বাবুর রচিত "তিন বন্ধু" নামক একখানি উপন্যাস মুদ্রিত হইতেছে। দীনেশ বাবুর "রামায়ণী" ও "তিন বন্ধু"—দুইখানি গ্রন্থই শীঘ্র প্রকাশিত হইবে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র "ভারতী" "সাহিত্য" প্রভৃতি মাসিকপত্রে ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর এতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য

মিত্র মহাশয়ের সারগর্ভ রচনায় বঞ্চিত ছিল। আনন্দের বিষয় এই দশ বৎসর পরে তিনি আবার আমাদের সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গত মাঘের "প্রবাসী"তে সিদ্ধমোহন বাবুর "তিব্বতে হিন্দু পরিব্রাজক" ও ফাল্গুনের "সাহিত্যে" "সে কালের অকাল" প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, এবার সিদ্ধমোহন বাবুর অবলম্বিত ব্রত অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সিদ্ধমোহন বাবু বহুকাল হায়দ্রাবাদে বাস করিতেছেন। তিনি নিজাম হাইকোর্টের একমাত্র বাঙ্গালী উকীল। হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশিত "ডেকান্ পোষ্ট" নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী। হায়দ্রাবাদের মুসলমান সমাজে মিত্র মহাশয় যেরূপ সমাদৃত, দাক্ষিণাত্যে "ডেকান পোষ্ট"র প্রতিপত্তি তদপেক্ষা অল্প নহে। মিত্র মহাশয় আরবী ও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞ; বহুদিন ইসলাম্ সাহিত্যের অনুশীলন করিতেছেন। ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য হইয়াছেন।

আরবী ও পারসী শব্দ বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গলা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রণালী বা পদ্ধতি নাই। যাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেই ভাবে আরবী ও পারসী শব্দের 'বানান' লিখিয়া থাকেন। ঔরঙ্গজীব, ঔরংজেব, আরঙ্গজেব, অরংজেব,—কোনটি ঠিক? তাঁহার পিতার নাম অকবর না আকবর? বাঙ্গালায় transliterationএর কোনও নিয়ম নাই, এই জন্য লেখকগণের যথেচ্ছাচারে আরবী ও পারসী শব্দগুলির বাঙ্গলা ভাষায় দুর্দ্দশার সীমা নাই। "সাহিত্য-পরিষদ" এ বিষয়ে অবহিত হইলে ভাল হয়। পরিষদ যদি সিদ্ধমোহন বাবুকে আরবী ও পারসী শব্দ বর্ণান্তরিত করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং সিদ্ধমোহন বাবু পরিষদের প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষার একটি প্রকৃত অভাব বিদূরিত হইতে পারে। সিদ্ধমোহন বাবু আরবী, পারসী, ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন। নিজামের রাজ্যে মুসলমান সমাজ ও মৌলবীসম্প্রদায়ের সাহচর্য্যে বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সফল হইবেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত করিতেছেন। রাজসাহী হইতে প্রকাশিত "ঐতিহাসিক চিত্র" বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে। "চিত্রে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিখিল বাবুকে "ঐতিহাসিক চিত্র" নামটি ব্যবহার করিবার অধিকার দিয়াছেন। অক্ষয় বাবুর ঐতিহাসিক চিত্রের সঙ্গে নিখিল বাবুর ঐতিহাসিক চিত্রের একটু প্রভেদ আছে। নিখিল বাবুর চিত্র প্রধানতঃ আমাদের ছাত্রসমাজে ঐতিহাসিক জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য উদ্দিষ্ট; "আলো"র সূচনায় বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন, "জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে।" এই কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ "চড়ায় ঠেকিয়া" অক্ষয় বাবুর ঐতিহাসিক চিত্র জাহাজ বানচাল হইয়া গিয়াছে।—বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলি,—নিখিল বাবুর নূতন ঐতিহাসিক চিত্র "ডিঙ্গী এ হাটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, পুরাতন জাহাজের মালীম অক্ষয় বাবু ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের সাহায্যে নিখিল বাবুর এই সাধু সংকল্প সফল হউক।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

২২ শে শ্রাবণ। শ্রীমতী কামিনী সেনের "আলো ও ছায়া"র আলোচনা করিতেছিলাম। সেন-কন্যাকে বর্ত্তমান বাঙ্গালার মহিলা-কবিকুলের উপর নিঃসংশয়ে প্রাধান্য দিতে পারা যায়। কিন্তু কোনও কোনও সমালোচক তাঁহাকে যে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছেন, আমি কিছুতেই সে অপকর্ম্মের সমর্থন করিতে পারি না। "পঞ্চক", "ভালবাসার ইতিহাস", "চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ", "যৌবন-তপস্যা" প্রভৃতি কবিতা যে এক জন প্রতিভান্বিত কবির পরিচয় দিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, সর্ব্বস্থলে ভাষার ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্য যে দেখিতে পাই না, সে ত্রুটি, কবির স্বভাবকোমল জাতিত্বের কথা ভাবিয়া, উপেক্ষা করাই উচিত। তিনি যে এই অধম বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এতটাও করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরীর কথা। গ্রন্থকর্ত্রীকে সার্টিফিকেট দিতে গিয়া কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহার "সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণের" প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, গ্রন্থমধ্যে এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় গুণের একটু অভাব আছে। আর একটা কথা;—হেম বাবু বর্ত্তমান কবিকে ডিপ্লোমা দিবার কালে মহাকবি মাইকেলের নামোল্লেখ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন। ইহা শুধু অন্যায় নহে, অদূরদর্শিতাও বটে। কারণ, ইহাতে শ্রীমতী কামিনী সেনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কেহ কেহ কামিনী-কবির অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত আখ্যান-কবিতা দুইটির অতিরিক্ত প্রশংসা করেন। কেহ বা এইখানেই নবীন কবির প্রবীণতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উহাদের ছন্দের গঠন কতকটা অপরিপক্ক; কারণ, অমিত্রাক্ষরের যে স্বাধীন, স্বাভাবিক স্রোতোগতি, উহাতে তাহার সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

২৩ শে শ্রাবণ। এমিয়েল তাঁহার জর্ণালের এক স্থলে বলিতেছেন,—"To hunt down consideration and reputation, to force the esteem of others;—seemed to me an effort unworthy of myself, almost a degradation. I have never thought of it." বাঙ্গালীর যত যশের আশায় দ্বারে দ্বারে বিচরণ করা, প্রকৃতির প্রিয় সন্তান কবির পক্ষে নিতান্ত

লজ্জা ও হীনতার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাহা লিখিতেছি, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে সযত্নপরিপোষিত যে চিন্তারত্নগুলি সাধারণের সমক্ষে বাহির করিয়া দিতেছি, তাহা যদি কাহারও স্নেহ বা সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম না হয়, তাহার মত দুর্দ্দশাও ত আর কিছু নাই। আমার প্রাণের প্রিয়তম কথাগুলিকে কেহ যদি সাগ্রহে হৃদয়ে তুলিয়া না লইল, তবে এই দুষ্কর সাহিত্য-ব্রতের প্রয়োজন কি? আমার জীবনের সারভূত শক্তি সঞ্চারিত করিয়া যদি কাহারও নির্জ্জীব হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিতে না পারিলাম, তবে আমার জীবনেই বা কাজ কি? আমি যাহার প্রশংসা করি, পূজা করি, তাহাই হইতে চাই। আপনার জীবনকে সেই উচ্চ মহত্ত্বে উত্তোলিত করিতে চাই। আর, আমি যে আদর্শ পাঠক সাধারণের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি, আশা করি, তাহারাও স্বীয় স্বীয় জীবনকে তদনুসারে নিয়মিত করিবে। সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার উদয় না হইলে উহা অসম্ভব। সুতরাং যাহাতে পাঠকেরা কবির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার আদর্শ-প্রতিমাকে পূজা করিতে শিখে, সে পক্ষে যত্ন করা সকল সাহিত্যসেবীরই কর্ত্তব্য। ইহা হীনতা বা দীনতা নহে। ইহা মহত্ত্বেরই অঙ্গ-স্বরূপ।

২৪ শে শ্রাবণ। আমার কাব্য-চর্চ্চার বয়ঃক্রম বড় বেশী নহে। বাল্যকালে প্রচলিত সঙ্গীত সকলের সুরের অনুকরণ করিয়া কখনও কখনও গীতিরচনা করিতাম বটে, কিন্তু উহার কারণ নিজের মনের মতন গান গাহিবার অভিলাষ, প্রকৃত কাব্যানুরাগ নহে। একখানা গানের খাতা ছিল; উহার ভিতর অপরাপর সঙ্গীতের সহিত নিজের রচনাগুলিও লিখিয়া রাখিতাম। তখনকার রুচিটা বড় বিশুদ্ধ ছিল না। একটু বর্দ্ধিত বয়সে একদিন সেই যত্নরক্ষিত খাতাখানার আলোচনা করিতেছিলাম। গানগুলির ধরণ দেখিয়া নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। একে একে সমগ্র পত্রগুলি ছিঁড়িয়া অগ্নিদেবকে উপহার দিলাম। তা'র পর অনেক বর্ষ নীরবে কাটিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কি শুভক্ষণেই কাষ্টআর্টস্ পরীক্ষায় কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Excursion কাব্যের প্রথম সর্গ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল! আমার প্রাণের সেই পুরাতন অনাদৃত উৎস নব ভাবে-নব গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে আজ ১০।১১ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে কত ঝড় এই মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কত সময়ে এই প্রয়োজনশূন্য জীবনের বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু কবিতা আমাকে একবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে বিষাদের জলদরাশি অপসারিত করিয়া তাহার প্রশান্ত সান্ত্বনাময়

সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি হৃদয়-গুহায় প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহারই স্বর্গীয় আশ্বাসে এই দুর্ভর জীবনকে এত দূর টানিয়া আনিতে পারিয়াছি।

২৫ শে শ্রাবণ। বঙ্গীয় কবি হেমচন্দ্রের রচনা ও মহাকবি মাইকেলের কাব্যগুলি পাঠ করিয়াই আমার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল। বোধ হয়, সর্ব্বাগ্রে "মেঘনাদবধ" পাঠ করি। অপরিণতবুদ্ধি বালক তখন মাইকেলের মহত্ত্বে কেবল অভিভূত হইয়া পড়িত; প্রাণের ভিতর ভাল করিয়া আরও করিতে পারিত না। তৎপরে "বীণা" নামক পত্রিকায় "সারদামঙ্গলে"র সমালোচনা পাঠ করিয়া উহার প্রতি আমার অনুরাগ আকৃষ্ট হইলে, একখণ্ড ক্রয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করি। ইহাই আমার বাঙ্গালা কাব্যপুস্তক-ক্রয়ের সূচনা। এখন স্মরণ হইতেছে, ইতিপূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ রায়ের "অবসরসরোজিনী" এক বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পাঠ করিয়াছিলাম। তখন রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতা বড়ই মধুর লাগিত। মনে হয়, তাঁহার "শারদীয় জলদ" শীর্ষক "আর্য্যদর্শনে" প্রকাশিত একটা কবিতায় মুগ্ধ হইয়া, উহা নিজহস্তে একখানা কাগজে লিখিয়া লইয়া, তখনকার দুই এক জন বন্ধুকে শুনাইয়াছিলাম। তাঁহারা কাব্যরসের তেমন অনুরাগী ছিলেন না। তাঁহাদের বিরক্তি দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইত। "সারদামঙ্গল" পাঠ করিয়া রাজকৃষ্ণের প্রতি সেই অনুরাগ কোথায় ভাসিয়া গেল। মধুকর পুষ্পবিহীন দেশে আসিয়া পড়িলে অতিকষ্টে মৃত্তিকা হইতেও মধুসঞ্চয় করে। কারণ, মধু নাহিলে তাহার দিন চলে না। কিন্তু বিবিধ কুসুমগন্ধে সুবাসিত চিরবসন্তময় কোন উদ্যানের সন্ধান পাইলে তাহার যে আনন্দ, যে অসীম উচ্ছ্বাস, তাহা কে বর্ণনা করিবে? ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের উদয় হইয়াছিল; কিন্তু আমি তাঁহার কোনও খবর পাই নাই। ক্রমশঃ তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম। প্রথম প্রথম সর্ব্বস্থলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। তথাপি সেই উদীয়মান রবির অপূর্ব্ব আলোকে আমার হৃদয়াকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রসম্প্রদায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

২৬ শে শ্রাবণ। পুরাতনের জীর্ণকুটীর হইতে হঠাৎ নূতনের বিচিত্র সৌন্দর্য্য-গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথকেই বাঙ্গালার বর্ত্তমান কবিকুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু সে মোহ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। আমার প্রথমপ্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থে রবীন্দ্রের পদ্ধতি অনেকটা লক্ষিত হইবে। তবুও তখন তাঁহার এক আধটা কবিতামাত্র পাঠ করিয়াছিলাম। নূতন পদ্ধতির শিক্ষা আমি বঙ্গীয় কবি বিহারীলাল ও প্রধানতঃ ইংরাজী Romantic কবিদিগের নিকট প্রাপ্ত হই। Wordsworth, Shelley, Keats এবং Coleridge আমার সাহিত্য-

জীবনের আদিগুরু। মহাকবি সেক্সপীয়র সকল প্রথারই সমাদর করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে সকল স্থলে Romantic পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমার সেইগুলিই বেশী ভাল লাগিত। এখন আর পুরাতনের উপর নূতনকে ততটা প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত নহি। সাধারণ মানবের অগোচর কবিহৃদয়ের গূঢ়তম ভাবরাশি, রহস্যময়ী প্রকৃতির গভীরতম কাহিনী প্রকাশ করিতে হইলে নূতন প্রথাই যে অধিকতর উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সাধারণ পাঠকের তাদৃশ আয়ত্তাধীন নহে। অথচ সাধারণের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিলে কোনও কাব্যেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই এখন আমি উভয় প্রথার সম্মিলনের পক্ষপাতী। ভাব বা চিন্তা যতই রহস্যময় হউক না কেন, ভাষায় প্রকাশ করিবার কালে তাহাকে যত দূর স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করিতে পারি, তাহাই বাঞ্ছনীয়।

২৭শে শ্রাবণ। * * * ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু মহাশয় এই প্রকার নিমন্ত্রণে যৎকিঞ্চিৎ উপহার বা উপঢৌকনপ্রদান রূপ যে সামাজিক পদ্ধতি আছে, তাহার উচ্ছেদসাধনার্থ একখানা দস্তখতের খাতা খুলিয়াছেন। আমি অনুরুদ্ধ হইয়াও নামটা লিখিতে করিতে পারিলাম না। হঠাৎ এরূপ বিষয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলা ভাল নহে। সম্প্রতি এই ত ম—নাথের সহোদরার বিবাহোপলক্ষে যৎসামান্য কিছু না দিয়া মনের তৃপ্তি হইল না। ভবিষ্যতের কথাও ভাবিতে হয়। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এইরূপ ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট উপঢৌকন পাইবার আশা করেন, এবং না পাইলে অভিমানও করিয়া থাকেন। সামর্থ্য থাকিলে তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তা' ছাড়া, যাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আমার গৃহে কোনও দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠাইলেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করাও ত নিতান্ত অভদ্রতার কাজ। সুতরাং দান প্রদান বন্ধ করিবার বিষয়টা, যাঁহারা সহি করিতেছেন, কেবল তাঁহাদেরই মধ্যে নিবদ্ধ হইলে ভাল হয়। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা দিলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই; আর যাঁহারা সামর্থ্যহীন, তাঁহাদের বাধ্য হইয়া দেওয়া ভাল নহে; এবং তাঁহাদিগকে বাধ্য করাও ভাল নহে।

২৮শে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ "রাজা ও রাণী" দেখিলাম। ইহাতেও সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের প্রয়াস দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু সকল স্থলে সংশোধনগুলি সমীচীন নহে। বর্ত্তমান সংস্করণে সঙ্গীত ও গদ্যাংশগুলি প্রায়শঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা মন্দ নহে। গ্রন্থের গদ্যাংশে কোনও

পরিবর্ত্তনই সংঘটিত হয় নাই।—অমিত্রাক্ষরের উন্নতিসাধন করিতে গিয়া কবি অনেক স্থলেই খারাপ করিয়া ফেলিয়াছেন। "এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথসাগরে" এই ছত্রের পরিবর্ত্তে "এ নিস্তব্ধ অন্তরের অনন্ত নিশীথে" এই কটমট লাইনটি দেখিয়া আমি উন্নতির স্থলে অধোগতিই অনুভব করিলাম। রবিবাবু আপন রচনা সম্বন্ধে আগে যেরূপ অন্ধ ছিলেন, এখন দেখিতেছি, তিনি ততোধিক মমতাবিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কাটিয়া, ছাঁটিয়া, উড়াইয়া, গুঁড়াইয়া তিনি যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এত দূর নির্ম্মম হইয়াও তিনি যে সর্ব্বত্র সুবুদ্ধি ও সুবিচারশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তাঁহার নাটকীয় পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অথচ, কয়েকটি ভাল লাইন মাঝখান হইতে মারা গেল। পাঠকেরা কত দূর সন্তুষ্ট হইবেন, বলিতে পারি না। আমি ত তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। পূর্ণ বিরামের স্থলে গুরু অক্ষর (যুক্তাক্ষর) ব্যবহার বিষয়ে আমি যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহার সুফল ফলিতে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। "রাজার সতর্ক দৃষ্টি পড়ুক সর্ব্বত্র" ইহার স্থলে "রাজার নিযুক্ত দৃষ্টি সর্ব্বত্র পড়ুক" তবু সহা যায়। কিন্তু এত করিয়াও রবীন্দ্র বাবু তাঁহার ভাষাকে নির্দ্দোষ করিতে পারিলেন না।

২৯ শে শ্রাবণ। বিচিত্র-চিত্রগুলি বাদ দিয়া রবীন্দ্রের "চিত্রাঙ্গদা"র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। "বিদায়-অভিশাপ" নামক সুন্দর কবিতাটিও ইহার সহিত সংযুক্ত দেখিলাম। চিত্রাঙ্গদার রবীন্দ্রের অমিত্রাক্ষর অনেকাংশে নির্দ্দোষ। ইহার স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বিষয়টিও বেশ চিত্তাকর্ষক। মহাভারতের মহাকবির অমর চরিত্র দুইটিকে কোনও অংশে হীন না করিয়া, কবি ইহাদের উপর আপনার কবিত্ব ও গুণপণার বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম যখন গ্রন্থখানি পাঠ করি, মনে হইয়াছিল, ইহার বুঝি কোনও প্রকার গূঢ় উদ্দেশ্য নাই;—কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্রের সমাবেশ। কিন্তু পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া আমার ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল। কবি ইহাতে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের একটি ইতিহাস বর্ণিত করিয়াছেন। প্রেমের মূলে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি ও আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল, ইহাতে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্যে মানুষের মন বেশী দিন শান্তিলাভ করিতে পারে না। আর সে শোভা স্থায়ীও নহে। প্রেমিক স্বীয় বাহ্যিকের শারীরিক সৌন্দর্য্যোপভোগে অতি অল্প দিবসেই নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্মহীন

বিলাসিলীলা প্রেমের আদর্শ নহে; কর্ত্তব্যপালনের পথে আমরা সাহচর্য্যই ইহার চরম উদ্দেশ্য। ইহাই প্রেমের বিষম পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে দম্পতী তাহাদের মিলন বজায় রাখিতে পারিলেন, তাঁহারাই ধন্য। কারণ, "শ্রান্তিহীন সে মিলন চিরদিবসের।" এইরূপে প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যের মোহ, যৌবনের ভ্রান্তি, উপভোগের অরুচি, তৎপরে "ভূষণ-বিহীন" সত্যের অভ্যুদয়, ইহাই প্রেমের প্রকৃত ইতিহাস। যে কবি এই মহান্ ইতিহাস এমন সুন্দর ও মধুর করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তিনি সহস্র সাধুবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

ফুলের ফুরায় যবে ফুটবার কাজ,
তখন প্রকাশ পায় ফল।"—

এই একটিমাত্র-বাক্যে সমগ্র গ্রন্থের উপদেশ নিবদ্ধ রহিয়াছে।

৩০শে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" আলোচনা করিতেছি। ইহাতে কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা স্থান পাইয়াছে। "বসুন্ধরা" শীর্ষক কবিতায় কবির ভাবের বিশালতায় পাঠকের হৃদয় উদার ও প্রসারিত হইয়া উঠে। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া না পড়িলে এই কবিতাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। দীর্ঘতা-দোষ সত্ত্বেও ইহাই "সোনার তরী" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। "সমুদ্রের প্রতি" আর একটি চমৎকার কবিতা। ইহা বিশালতা ও গাম্ভীর্য্যে বায়রণের সমুদ্র-সম্বোধনের সহিত তুলনীয়। কিন্তু, কল্পনার নূতনত্বে এবং আধ্যাত্মিকতার মহত্বে ইহা বায়রণের রচনাকেও পরাজিত করিয়াছে। ইহার ভাষার গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রগর্জ্জনেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। যে কবি মহত্ত্ব ও উদারতার এরূপ সমুচ্চ শিখরে আপনাকে উত্তোলিত করিতে পারেন, তিনি যে অনেক সময়ে আকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ভাবে মগ্ন হইয়া তাঁহার মূল্যবান সময় ও প্রতিভার অপব্যবহার করেন, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে দুই একটি দুর্ব্বোধ কবিতা দেখিলাম। "ঝুলন," "অনাদৃত" প্রভৃতি কবিতার উদ্দেশ্য কি, তাহা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। "প্রতীক্ষা" নামক কবিতায় কবি দেশ-কালের অতীত, সৃষ্টির পরপ্রান্তস্থিত সেই মহা-অন্ধকার রাজ্যের কি সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন! তাঁহার কল্পনার অনুগমন করিতে করিতে আমরা দিশাহারা হইয়া যাই; এই মর্ত্ত্য-কারাগারের সহস্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আপনাদিগকে যেন অন্তহীন মহাশূন্যে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত দেখিতে পাই; মানব-জন্মের এই সমুচ্চ অধিকার স্মরণ করিয়া দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত সংসার-সংগ্রামে অগ্রসর হই। ইহা অপেক্ষা কবিতার সার্থকতা আর কি হইতে পারে?

৩১শে শ্রাবণ। আজ জীবনটা নিতান্ত শূন্যময় ও গ্রন্থিহীন বলিয়া বোধ হইতেছে। চারি ধারে, অন্তরে ও বাহিরে, এই কঠোর নিয়ম ও সংযমের শাসন নিতান্ত কষ্টকর অনুভূত হইতেছে। দেখিতেছি, কত শত লোক আত্মবিস্মৃতির আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত শাসন অতিক্রম করিয়া আপনাদিগকে প্রমোদ-প্রফুল্ল প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছে। পরিণাম যাহাই হউক, বর্ত্তমানটা ত তাহাদের এক-রকম স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতেছে। আর পরিণামের ভাবনায়ই বা প্রয়োজন কি? স্ত্রী ভিন্ন গতি ত কাহারই নাই। তবে বৃথা কেন এই অনিশ্চিত ও অদৃষ্ট ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া নিশিদিন কেবল রোদন ও দীর্ঘশ্বাসে [illegible] ধাতুরঙ্গমে, নিরন্তর নিরানন্দে অতিবাহিত করি? যদনের চিন্তায় প্রণয় [illegible] সাধিত হইতে পারে; কিন্তু এই দারুণ যন্ত্রণা-নিবারণের উপায় কি? তাই ভাবি, শ্রাবণের এই বিষম বৃষ্টিধারাবিতাড়িত ঝটিকার ন্যায়, যাহাদের কোন উদ্যমে, আমিও কেন এই সংসার-সমুদ্রের উপর দিয়া বাহিয়া যাই না? মাতঃ তোমার তুমি, হে পুণ্য পবিত্রতার আকর, অনাদি আদর্শ প্রকৃতি! এই অন্তর সংশয়-বৃশ্চিকের দংশন হইতে আমায় রক্ষা কর। যাহার জীবন পূর্ব্বেই [illegible] হইয়া পড়িয়াছে, সে কি তোমার চরণে আপনাকে নিয়ত করিয়া রাখিতে পারিবে না? যাহার প্রেমের গৃহ তুমি স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া দিয়াছ, সে কি তোমার মুখ চাহিয়া নূতনতর গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না? হে দেবতার এই বর্ষাকালের ভীষণ মেঘেন্দ্র নিমজ্জিত করিয়া তোমার অক্ষয় ভাবাণী প্রতিধ্বনিত কর। এই মৃত্যুময় বিদ্যুৎ-বিভীষিকা পরাহত করিয়া মোর সেহ শান্তিবর্ষিণী পবিত্র মুখজ্যোতি বিভাসিত কর। আমার [illegible] হৃদি ও ভক্তি।

১লা ভাদ্র। আজ পূর্ণিমা; কিন্তু জ্যোৎস্নার দর্শন নাই। বর্ষার ক্রোড়ে চাঁদের শোভা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমার জীবনের অবস্থাও ঠিক এইরূপ নহে? এই দেবদুর্লভ যৌবন-কুঞ্জে বসিয়া আমি কেবল একটা অন্ধকারময় দৃশ্য দর্শন করিতেছি। আশার দিগন্তবিহারী মলয়-সমীর, প্রেমের মিষ্ট নবীন কিরণজাল, উৎসাহের উন্মাদকর পুলকোচ্ছ্বাস,—সকলই যেন কোথায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ভাটিবনীর অপর পার্শ্ব হইতে গোধূলির আলুটে রেডিওধ্বনি কোন দেবকিন্নরী ভেদ করিয়া কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। মানব প্রাণের ভিতর, হৃদয়ের অতি নির্জ্জন প্রদেশে, এইরূপ একটা হৃদয়স্পর্শী ঝঙ্কারধ্বনি মাঝে মাঝে শ্রুতিগোচর হয়। অন্তর-বাজা আকুল হইয়া উঠে; তার।

কে আমাকে বলিয়া দিবে, এ কিসের সঙ্গীত, কোথা হইতে আসিয়া এই দীন সংসার-পথিকের প্রাণে প্রবেশ করিতেছে। এ কি সেই বিশ্বদেবতার চিরোচ্চারিত আহ্বান-রব? এ কি সেই নিখিল-জগতের নিরন্তরোত্থিত রহস্য-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি? এই সঙ্গীত, এই গভীর কলতান কি একবার ভাল করিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না? আমরা হতভাগ্য সুকৃতিশূন্য মানব, এই মর্ত্যধামে কেবল ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি। এই নিত্যদুঃখময় জীবনের মুহূর্ত্তমাত্র সেই মঙ্গল-গীতি শ্রবণ করিয়া জীবন কি সার্থক করিতে পারিব না? হায়! দুরাকাঙ্ক্ষ! হায় মূঢ়! সংসার মৃত্তিকার ভারে তোর শ্রবণযুগল যে নিতান্ত বধির হইয়া গিয়াছে! তোর অদৃষ্টের সে শক্তিই যে লোপ পাইয়াছে!

২রা ভাদ্র। বর্ষার বোধন আরম্ভ করিয়াছি। কয়েকটি লাইন এইখানে লিখিয়া রাখিলাম।—

ঘিরিল বরষা আজি; সান্দ্র অন্ধকার
ঘন মৃত্যুছায়ারূপে এসেছে বেড়িয়া;
সঘন ঝর ঝরে বারি, বৃষ্টি অনিবার;
অশনি সাপিনী সম উঠিছে গরজি;
গর্জ্জিছে জীমূত-মন্দ্র কম্পিত গগনে,
আমি পান্থ সঙ্গিহীন সংসার প্রহরে।

ছিল একদিন; নাট্যশালা সম ঘরে
পরিপূর্ণ প্রীতিরসে, উল্লাস-লালসে
উথলিত এ আবাস; আনন্দ-উৎসবে
কাটিত চঞ্চলকাল;—নিদ্রার পরশে
সুদীর্ঘ-প্রহর নিশি নিমেষের প্রায়;—
ছিল সেই একদিন, আজি নহে, হায়।

ছিল প্রেমসাথী এক; সন্ধ্যায় প্রভাতে
নিশ্বাস-মলয়ে যার উঠিত শিহরি'
ভাবরাশি, গর্ব্বভরা স্নেহবারি-পাতে
উজ্জ্বকান্তি শতদল নম; প্রাণ ভরি'
সে পুণ্যসৌরভ-সুধা মধু কবি' পান
সংশয়, বিষাদ, ব্যথা হ'ত অবসান।

ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লবে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি।

ইংরেজদিগের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, সত্য অনেক সময়ে উপকথা অপেক্ষাও অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ হইয়া থাকে। অদৃষ্ট সময়ে সময়ে এমন অদ্ভুত খেলা খেলে, মানুষকে এমন অভাবনীয় অবস্থায় লইয়া যায়, যে তাহাতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। যদি কোন দুর্ভাগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসকার ফরাশী রাষ্ট্রবিপ্লবে ঘটনাবলীর সহিত কোন বাঙ্গালীর চরিত্র বিজড়িত করেন, তাহা হইলে তাঁহার বন্ধুবর্গ, অন্ততঃ সমালোচকবর্গ, ধুব সম্ভব তাঁহার মস্তিষ্কের অবস্থা পরীক্ষা করাইবা

প্রজ্ঞ চিকিৎসক ডাকাইবার ব্যবস্থা করিবেন। উপন্যাসেও যাহা অদ্ভুত বলিয়া বিবেচিত হইবার কথা, প্রকৃতই তাহা একদিন ঘটিয়াছিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সহিত এক জন বাঙ্গালীর জীবন বিজড়িত ছিল।

ফ্রান্সের নৃপতি পঞ্চদশ লুইর শেষ উপপত্নী মাদাম দুবারীর কলঙ্কিত নাম জগদ্বিখ্যাত। বিলাসমগ্ন, রূপমুগ্ধ লুই ছয় বৎসর কাল ফ্রান্সের ঐশ্বর্য্যবৈভব অকাতরে এই বিলাসিনীর চরণতলে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাহার যখনই যে সাধ, যে সময়, যে খেয়াল হইয়াছে, যতই অসঙ্গত, যতই ব্যয়সাধ্য হউক, তাহা পূর্ণ হইতে অণুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। তাহার কর্ম্মহীন জীবনের দীর্ঘ দিন কাটাইবার অসংখ্য উপকরণের মধ্যে জীবজন্তুও স্থান পাইয়াছিল—পাখী ছিল, কুকুর ছিল, বানর ছিল, আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম একটি অল্পবয়স্ক ক্রীতদাস ছিল। তখনকার সাময়িক পত্রাদিতে ও সাহিত্যে এই বালক ক্রীতদাস, নামে 'জামর' এবং জাতিতে নিগ্রো বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ফরাসী উপন্যাসলেখক আলেকজন্দর দুমা তাঁহার একখানি বিখ্যাত উপন্যাসে ইহাকে স্থানদান করিয়া চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। মিষ্টার গ্রীন ইহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত নামও জামর নহে, জাতিও নিগ্রো নহে।

ভারতের সহিত বাণিজ্যকারী একখানি ইংলণ্ডীয় জাহাজের অধ্যক্ষ বঙ্গদেশ হইতে একটি বালককে ক্রয় করিয়া বা জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, এবং ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাহাকে ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে লইয়া গিয়া মাদাম দুবারীর নিকট বিক্রয় করে। কৌতুক করিয়া তাহার ডাক-নাম রাখা হইয়াছিল জামর, এবং এই নামেই সে পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রকৃত নামকরণ হইয়াছিল, লুই জীন ডিউডেট। ক্রীতদাস বলিয়া তাহার শিক্ষাবিধানের কোনও ত্রুটি হয় নাই। পরম যত্নের সহিত তাহাকে সুশিক্ষিত করা হইয়াছিল, এবং সে নিজেও সাহিত্যানুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকীয় প্রভাবের মধ্যে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও সে রাজার একান্ত ভক্ত ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের যাহা মূলমন্ত্র—সাম্য ও স্বাধীনতা—তাহা তাহারও বীজমন্ত্র ছিল। সেই জন্য সে তাহার পরমহিতৈষিণী প্রতিপালিকা মাদাম্ দুবারীর নিকট হইতে স্নেহ, প্রভূত অনুগ্রহ ও উপকার, এবং অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস পাইয়াও অন্তরমধ্যে তাঁহার প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। দুবারীর কৃপায় ও আনুগ্রহে তাহার আশাতীত পদোন্নতি হইয়াছিল—দুবারীর ভৃত্য থাকিয়াও সে মঁসিয়েন নামক রাজকীয় প্রাসাদ ও সম্পত্তির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই পদ অভিজাতদিগের প্রার্থ্য ছিল। ইহাতে, কি অভিজাতবর্গ, কি সহযোগী ভৃত্যবর্গ, অনেকেই তাহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ও বিরূপ হইয়াছিল। এই বিরাগে জামরের সাংসারিক ক্ষতি অবশ্যই ছিল না; কেন না, স্বয়ং রাজা তাহার ক্রীতদাস, রাজার উপর যে রাজা, সেই সর্ব্বময়ী তাহার সহায়; কিন্তু ইহা সময়ে অসময়ে, অনেক সময়েই, কঠোর শ্লেষ ও মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গবিদ্রূপে পরিব্যক্ত হইত। তাহাতে জামরকে অনেক মর্ম্মবেদনা সহিতে হইত। এই সকল কারণে, রাজভক্তি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাহা কিছু, তাহারই প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্বেষ ও ক্রোধ তাহার চিত্তমধ্যে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ পায় নাই। এই অপমানিত, মর্ম্মাহত, ক্ষুব্ধ, বিশ্বাসঘাতক ক্রীতদাস উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া রহিল। মন্দভাগিনী মাদাম্ দুবারী বুঝিতে পারিল না যে, যিহুদের চিতা নিজ সাজান হইতেছে—দুগ্ধদানে সর্পপোষণ হইতেছে।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ লুইর মৃত্যু হইল। সচ্চরিত্র সাধুপ্রকৃতি ষোড়শ লুই গণিকাকে সিংহাসনসান্নিধ্যে থাকিতে দিতে পারিলেন না। দুবারীকে প্রথমে রাজসংস্রব হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইল; কিন্তু পরে আবার তাঁহাকে লুসিয়েনের প্রাসাদে থাকিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সময়েও জামর পূর্ব্বের ন্যায় অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যভাবে তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এবং যাঁহার কৃপায় তাহার সর্ব্বস্ব, সেই স্নেহময়ী, ভৃত্যবৎসলা, বিশেষতঃ তাহার প্রতি অসীমবিশ্বাসপ্রবণা, কুলীন সর্ব্বনাশের গুপ্ত গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রবিপ্লবের করালানল ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। জামর দেখিল যে, তাহার প্রতি হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বিপ্লবকারীদিগের মধ্যে যাহারা অতিমাত্র ভীষণ, নির্দ্দয়, পিশাচবৎ, নৃশংস, হিংস্রজন্তুর ন্যায় শোণিতপিপাসু, এইরূপ এক মানব-রাক্ষসের দলে দুবারী জামর যোগ দিয়া, অভিজাতবর্গের কার্য্যকলাপের উপর খর দৃষ্টি রাখিবার জন্য ভারসাইল নগরে বিপ্লবসংশ্লিষ্ট যে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হইল। গ্রীভ্ নামে ইহার এক জন সহযোগী ছিল। এই ব্যক্তি নামপরিবর্ত্তনে ইংরেজ। ফরাসী বিপ্লবের নর-রাক্ষসদিগের মধ্যে গ্রীভ্ এক জন প্রধান ছিল। জামর তাহার পরিণী প্রতিপালনকারিণী দুবারীর কার্য্যের খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই গ্রীভের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল; এবং দুবারী জামরকে এতই বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার কোন কার্য্যই তাহার অবিদিত ছিল না।

গ্রীভের আনীত অভিযোগমূলে দুবারী ধৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার হীনাবস্থ প্রতিবাসীরা তাঁহার কৃত শত উপকার স্মরণ করিয়া অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। তাঁহার নিষ্ঠুর শত্রুগণ কবলিত শিকারে বঞ্চিত হইয়া অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিল। গ্রীভ্ একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিল; তাহা মাদাম্ দুবারীর বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগে ও দুষ্ক্রিয়ার আরোপে পূর্ণ। দুবারী এই ব্যাপারে জামরের হস্ত পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। জামর এখন প্রকাশ্যে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। শোণিতপিপাসু গ্রীভের অবিরাম উত্তেজনায় ও নিষ্ঠুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ভার্সাইলের বিপ্লব-সমিতি শেষে মাদাম্ দুবারীকে ধৃত করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির করিলেন। গ্রীভ্ স্বয়ং গিয়া হতভাগিনীকে টানিয়া আনিয়া পারীসের সাঁপেলাজি নামক কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

এই কারাগারে আবদ্ধ হইয়া, জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, অভাগিনী যখন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রমাদ গণিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে বধ-যন্ত্রের বিভীষিকা দেখিতেছিল, সেই সময়ে নর-রাক্ষস গ্রীভ্ তাঁহার বিরুদ্ধে রীতিমত অভিযোগ দাখিল করিল। অভিযোগের মর্ম্ম এই যে, মাদাম্ দুবারী যে পুনঃপুনঃ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে; ইংলণ্ডপ্রবাসী করাসী অভিজাতদিগকে তিনি বিপুল অর্থসাহায্য করিয়াছেন; বিপ্লবের লক্ষ্য ব্যর্থ করিবার জন্য প্রতি-বিপ্লব ঘটাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। অভিযোগসমর্থনার্থ সাক্ষীদিগের যে দীর্ঘ তালিকা দাখিল করা হইয়াছিল, তাহাতে পাপিষ্ঠ জামর এক জন প্রধান সাক্ষী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, জামরের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে যে, মাদাম্ দুবারীর গৃহ অভিজাতদিগের একটা প্রধান আড্ডা। এরূপ দুষ্কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার জন্য জামর তাঁহাকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। জামরের পরিচয় এইরূপ দেওয়া হইয়াছিল; "জামর এক জন ভারতবর্ষের লোক। তাহার শৈশবকালে, যখন তাহার বয়স চারি বৎসর সেই সময়ে, দুবারীর রূপমোহমুগ্ধ আত্মবিক্রীত দাস প্রঞ্চদশ লুইর অনুচরেরা বঙ্গদেশের এক নিভৃত পল্লী হইতে তাহাকে তাহার পিতামাতার স্নেহক্রোড় হইতে ছিনিয়া করিয়া লইয়া আসে, এবং লুই তাহাকে সামান্য কুকুর বিড়ালের ন্যায় চিত্তবিনোদনার্থ মাদাম্ দুবারীকে উপহার প্রদান করেন। কিন্তু শিক্ষার কি আশ্চর্য্য শক্তি! রুশোর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া জামর রুশোর ভক্ত ও বিপ্লবের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে সে মাতার স্নেহ পাইবার অধিকারী,

সেই কি না তাহাকে অপমান করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। তাহার অপরাধ এইমাত্র যে, সে স্বাধীনতাপ্রিয়। সর্ব্বস্বপরিত্যক্ত নিরাশ্রয় জামর অবশেষে আমার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে।"

১৭৯৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর মাদাম্ দুবারীর বিচার বা বিচারের প্রহসনাভিনয় হইল। তাঁহার প্রতিকূলে প্রধান সাক্ষী জামর। সে জবানবন্দিতে বলিল,—"আমার নাম লুই-বেনেডিক্ট জামর; বয়স একত্রিশ বৎসর; ভারতবর্ষের অন্তর্গত বঙ্গদেশ আমার জন্মভূমি। এক্ষণে আমি ভার্সাইল নগরীর রক্ষা-সমিতির (Committee of Public Safety) অধীনে নিযুক্ত আছি। একখানা জাহাজের অধ্যক্ষ আমাকে ফ্রান্সে লইয়া আসে, এবং দশ বৎসর বয়সে আমি আসামীর ভৃত্য নিযুক্ত হই। স্বদেশভক্ত সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার প্রতি কঠোর অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য আমি তাঁহাকে কতক সম্পত্তি দেশের কার্য্যে অর্পণ করিয়া বক্রী রক্ষা করিবার উপায় করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহা অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে অনেক লোক যাতায়াত করিত। সাধারণতন্ত্রের পরাজয়বার্ত্তায় তাহারা আনন্দপ্রকাশ করিত। তাহাতেই আমি বুঝিয়াছিলাম, তাহারা অভিজাত-শ্রেণীর লোক। এই ব্যাপারেও নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি শুনেন নাই। উপরন্তু, যখন তিনি অবগত হইলেন যে, গ্রীভের সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে, এবং গ্রীভ নিজে ফ্রাঙ্কলিন, মারাট প্রভৃতি স্বদেশভক্তদিগের সহযোগী, তখন তিনি ক্রোধান্বিতা হইয়া তিন দিনের মধ্যে তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আমাকে আদেশ করিলেন।"

মাদাম্ দুবারীর বিচার বা অবিচার শেষ হইয়া গেল। সেই সময়ে ফ্রান্সে এইরূপ অভিযোগের বিচারফল যাহা হইবার তাহাই হইল—৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। বধ্যমঞ্চে অভাগিনী যখন উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিতেছিল,—"রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার প্রাণদান কর। আমার যাহা কিছু আছে, আমার যথাসর্ব্বস্ব, তোমরা গ্রহণ কর, কেবল আমার জীবনভিক্ষা দাও"—তখন তাঁহার এই মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া অবিচলিত ছিল কেবল পাপিষ্ঠ জামর। কিন্তু এত পাপানুষ্ঠান করিয়াও সে সন্দেহের হাত এড়াইতে পারে নাই। সে যে রাজকীয় প্রভাবের মধ্যেই বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়াছে, বিপ্লবকারীরা তাহা ভুলিতে পারে নাই। মাদাম্ দুবারীর মৃত্যুর তিন সপ্তাহমাত্র পরে সেও ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। ছয় সপ্তাহ কারাবাসের

পর সহকারী বান্ধবদিগের চেষ্টায় মুক্তিলাভ করিয়া সে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

ইহার পর ফ্রান্সের উপর দিয়া, ইউরোপের উপর দিয়া, এক প্রলয়-ঝটিকা বহিয়া গেল। বিপ্লবের দোহাই দিয়া যাহারা স্বদেশীয়ের শোণিতে ধরিত্রী কলঙ্কিত করিতেছিল, বিপ্লবের নামেই তাহাদেরও শোণিতপ্রবাহ বহিয়া গেল। তাহার পর সংহার-ধূমকেতুর ন্যায় নেপোলিয়নের অভ্যুদয় হইল। দুর্ব্বল ডিরেক্টরির ধ্বংস-সাধন করিয়া তিনি স্বয়ং ফ্রান্সের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন—কন্‌সল্ হইলেন, সম্রাট হইলেন। ইউরোপময় ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। কত যে অর্থনাশ, কত যে লোকক্ষয় হইল; কত পুরাতন রাজ্যের ধ্বংস, নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল; কত দীর্ঘশ্বাস হাহাকার পড়িয়া গেল, তাহার সীমা হয় না। বহুবর্ষব্যাপী অজস্র শোণিতপাতের পর অবশেষে সমগ্র ইউরোপের সমবেত চেষ্টায় নেপোলিয়নের পতন হইল। এতদিনের মধ্যে জামরের আর দেখা নাই, সন্ধান নাই—সে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্দেশ।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেণ্টহেলেনা শৈলদ্বীপে নেপোলিয়ন নির্ব্বাসিত; অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিরূঢ়; এই সময়ে জামরকে আবার লোকান্তরে দেখা গেল। পারীসের এক অতি দরিদ্র, অপরিষ্কার, দুর্গন্ধময়, জঘন্য পল্লীতে একখানি ক্ষুদ্র, জীর্ণ, অন্ধকার ঘরে তাহার বাস। সে কখনও বিবাহ করে নাই; কিন্তু রমণীর আকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করিতেও পারে নাই। সেই মোহের বশেই তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। শেষে শিক্ষকতা করিয়া সে অতি কষ্টে দিনপাত করিত। কিন্তু এইরূপ জীবিকাও শেষে অপ্রাপ্য হইল। বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া তাহার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মন্দভাগ্য ছাত্রগণ সামান্য অপরাধে বা বিনাপরাধে সে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিত যে, তাহাদের আর্ত্তনাদে সমস্ত পল্লী প্রতিনিয়ত উদ্বেজিত হইত। প্রহারবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া ছাত্রগণ ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার দিন আর চলে না। এত বড় পৃথিবীটাতে তাহার বন্ধু বলিতে কেহ ছিল না। তাহার প্রকৃতির গুণে তাহার জন্য একটু সহানুভূতি, একটু সমবেদনা, একটু করুণাও কাহারও হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই। ক্লেশে, অনাহারে, মর্ম্মপীড়ায় তাহার আয়ু শেষ হইল। হিংস্র পশুর ন্যায় সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল; ঘৃণিত পশুর ন্যায় তাহার মৃত্যু হইল। কুকুরটা বিড়ালটাও অনাহারে মরিলে লোকে একবার 'আহা' করে; হতভাগ্য জামরের জন্য কেহ 'আহা' করে নাই।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎকট ভক্ত সে চিরদিন ছিল। তাহার সমস্ত গিয়াছিল, কিন্তু মারাট ও রোবেশপিয়রের দুইখানি মলিন প্রতিকৃতি ও রুসোর কয়েকখানি গ্রন্থ শেষ পর্য্যন্ত তাহার সেই বিকট কুটীরে ছিল। বাঙ্গালীর স্নেহের কি বিচিত্র আদর্শ!

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

মায়ার বন্ধন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্তোষ ঘরে ঢুকিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর এ কাহাকে পাঠাইলেন—পরিচয় কিছুই ত জানি না। মুখখানি কিন্তু ভারি [illegible] কোন উচ্চবংশে জন্ম হইবে।"

একটু পরে মালতী আসিয়া কহিল, "কেমন দেখ্‌লে দাদা, বড় সুন্দর—না?"

সন্তোষ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "হুঁ।"

মালতী। মা বল্‌ছিলেন, তোমার যদি ঐ রকম সুন্দর টুক্‌টুকে একটি বউ হয় ত বড় খুসী হন।

সন্তোষ। যা! তোর আর অত জ্যাঠামি কর্‌তে হবে না।

মালতী। না দাদা, জ্যাঠামি নয়, আমারও ভারি ইচ্ছে ঐ রকম আমার একটি বৌদিদি হয়।

সন্তোষ। আচ্ছা সে পরে হবে এখন। আপাততঃ দেখিস উঁহার যেন কোন বিষয়ে অসুবিধা বা কষ্ট না হয়। তা' হলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর ভারি রাগ কর্‌বেন।

সন্তোষ স্থানিত, সন্ন্যাসীর নাম করিলে মালতী আদেশপালনটা ভাল করিয়া করিবে—তাই তাঁহার নাম করিল। সন্তোষের পিতা সন্ন্যাসীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। সেই অবধি বাড়ীর সকলেরই সন্ন্যাসীর প্রতি অচলা ভক্তি। সন্তোষ কলের বৈজ্ঞানিক হইলেও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ। যাঁহার পিতা যাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন, সন্তোষ প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছে।

মালতী কহিল, "সে কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না। আমি আসিবামাত্র জবির ফিতা দিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া দিয়াছি। আমার

পট্‌কানে রঙের শাড়ীটা তাহাকে পরাইয়াছি, আমার সোনার কয়গাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়াছি। আমার ঘরটাও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি—আমি মায়ের কাছে থাকিব এখন। হ্যাঁ, ভাল কথা, মা বলিতেছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে একদিন যাইতে চাহেন—তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।"

সন্তোষ কহিল, "তা বেশ, লইয়া যাইব।"

মালতী চলিয়া গেলে সন্তোষ একখানা বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পাতা আর উল্টাইল না।

সম্মুখে গঙ্গা প্রবাহিত। ঘোলা জল ছল্ ছল্ করিয়া উদাসীর মত চলিয়াছে। পারে টেণের শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসিয়া লাগিতেছে। দুই একটা নৌকা তরঙ্গে দোল পাইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। মাঝিরা গান ধরিয়াছে,—

যমুনার কালো জল
কালো রূপে ঢল্ ঢল্!
কোন্ খানে চোরাবালি—
সচতুর নাবিয়ালি—
সাবধানে চল্!

মাঝিরা পাড়ি দিবার সময় কতবার এ গান গাহিয়াছে, সন্তোষ তাহাতে কর্ণপাতও করে নাই। আজ মাঝিদের এই গান যেন কত সার্থক হইয়া তাহার শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অকূল সমুদ্রে জাহাজ যেমন তরঙ্গ দলন করিয়া সদর্পে চলিতে চলিতে হঠাৎ প্রচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গে আহত হইয়া বানচাল হইয়া পড়ে—সন্তোষেরও তেমনি জীবনের উচ্চ আশা দৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্তই যেন হঠাৎ যেন একখানি সুন্দর মুখের কাছে আসিয়া ঠেকিল। সন্তোষ উঠিয়া ঘরের ভিতর গেল। সে কতবার যে এইরূপ অনাবশ্যক অন্তঃপুরে যাওয়া আসা করিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। মাতা বলিলেন, একদিনেই পুত্রের নাড়ী বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিনের মধ্যেই মালতী প্রতিমার সঙ্গে খুব ভাব করিয়া ফেলিল। সন্তোষের কাছে প্রতিমার সঙ্কোচও অনেকটা কমিয়া আসিল।

মধ্যাহ্নে বেলায় আহারাদি শেষ করিয়া মালতী প্রতিমার ঘরে আসিয়া বসিল। তাহার মুখে একটা পান গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "তোমার ত ভাই এখানে মোটে মন হচ্ছে না? দাদা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন।"

প্রতিমা হাসিতে হাসিতে কহিল, "জিজ্ঞাসা করেন নিজে হইতে, না সন্ন্যাসী ঠাকুরের থাকিতে?"

মালতী কহিল, "অত শত ভাই জানি নে, তিনি যা' বলেন, তাই বলুম।"

প্রতিমা কহিল; "তাঁহাকে বলিও, আমার কষ্ট এই যে, তিনি এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করেন।"

মালতী পানের ডিবেটা প্রতিমার কাছে সরাইয়া দিয়া কহিল, "যদি ভাই রাগ না কর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার পরিচয়টা—"

মালতীর কথা শেষ হইতে না হইতে প্রতিমা কহিল, "আমার পরিচয় জানিতে চাও? আমার পরিচয় এই—মা নেই, বাপ নেই—যিনি আমাকে জন্মাবধি মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত কুঁড়েঘরে ছিলাম। তাহার পর কোনও কারণে সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রয়ে আসি—তিনি আবার আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

অনিয়া মালতীর কষ্ট হইল, কিন্তু সে সমস্তটা জানিবার লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া কহিল, "কারণটা কি ভাই আমরা শুনতে পাই নে?"

মালতী কথাটা এমনই অভিনাসস্বরে কহিল যে, প্রতিমা তাহাকে না বলিয়া আর থাকিতে পারিল না। প্রতিমা মহেন্দ্রের কথা সব খুলিয়া বলিল, কেবল এ বিষয়ে তাহার মাতার যোগদানের কথাটা চাপিয়া গেল।

মালতী স্বভাবতঃই একটু কৌতুকপ্রিয়। সে মজা করিবার জন্য কহিল, "দেখো ভাই, দাদাকেও যেন কোন দিন দোষী কোরো না।"

প্রতিমা উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কাহার সহিত কাহার তুলনা! এক পশু, আর এক জন মানুষ!"

মালতী হাসিতে হাসিতে কহিল, "দাদাকে বলিয়া দিতেছি, তুমি তাঁহাকে বলিলে।"

প্রতিমা কহিল, "আর আলিও না ভাই! তোমার কেবলি ঐ ঠাট্টা। আমার এখন আমার একটা কাজ করিয়া দাও দেখি। আমার মাকে আমার ভ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। তোমার দাদাকে বল না, সন্ন্যাসী ঠাকুরের অনুম লইয়া মাকে এইখানে আনাইয়া দিতে।"

মালতী কহিল, "দাদাকে বলিব এখন।"

প্রতিমা মালতীর চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিল। তাহার পর উঠিয়া গৃহকর্ত্ত পাকা চুল তুলিয়া দিতে তাহার ঘরে গমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে সন্তোষ মাতাকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী তখন দিবা-সমভিব্যাহারে সহরে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

মাতাপুত্রে পদধূলি গ্রহণ করিলে, সন্ন্যাসী তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে বলিলেন। তাঁহারা বসিলে, সন্ন্যাসী সন্তোষকুমারকে কহিলেন, "তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ—তোমার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমি ঠিক করিয়াছিলাম, আজই তোমাদের ওখানে যাইব। কথাটা এই—বৎস, এ যাবৎকাল তুমি আমার সকল বিষয়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছ, এক্ষণে আর এক বিষয়ে তোমার সহায়তা প্রার্থনীয়। আমি স্থির করিয়াছি, পুরুষদিগের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে এই মঠের জমীর মধ্যে অনাথা বিধবাদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিব। যে বালিকাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি, তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে এইটি উদিত হইয়াছে। এখানে ঐরূপ আশ্রম থাকিলে উহাদের তোমাদের নিকট পাঠাইবার আবশ্যক হইত না।"

সন্ন্যাসীর কথায় সন্তোষ প্রতিমাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইল,—অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কহিল, "আপনি কাজ আরম্ভ করিয়া দিন, সমস্ত খরচ আমি দিব।"

সন্ন্যাসী তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "মেয়েটি ভাল আছে ত?—কাহারো মুখখানি বড় বিষণ্ণ।"

সন্তোষ কহিল, "ভাল আছে। তবে তাহার মাকে দেখিবার জন্য সে বড় ব্যস্ত হইয়াছে। তাহা আপনার অনুমতি-সাপেক্ষ।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কালই আমি তাহার মাকে আনিতে পাঠাইব।"

সন্তোষের মাতা এতক্ষণ চুপ্ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তিনি সন্তোষকে কাছে ডাকিয়া কানে কানে কহিলেন, "বাছা, তুমি একবার ও দিকে যাও ত—ঠাকুরের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

মাতার অভিপ্রায় সন্তোষ বুঝিতে পারিল। যাহাতে কথাবার্ত্তা কানে আসিয়া পৌঁছায়—সে কাছাকাছি ঘুরিতে লাগিল।

মাতা কহিলেন, "ঠাকুর, এমন মেয়ে ত কখনো দেখি নি। যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব! আহা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়!"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "গৃহের কাজকর্ম্ম দেখে ত?

মাতা কহিলেন, "সে তাহাকে বলিতে হয় না, আপনা হইতেই সমস্ত করে। আমার কেন সেবাশুশ্রূষা করে! এখন ঠাকুর সন্তোষের সঙ্গে উহার বিবাহ দাও।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি খোঁজ লইয়া সব জানিয়াছি। মেয়েটি সম্পূর্ণ অনাথা। উহার পিতা সংসারত্যাগী, মাতা বহু দিনই পরলোকে গমন করিয়াছেন। গ্রহের একটি পুরাতন পরিচারিকা উহাকে মানুষ করে। গোত্র কিংবা অন্যান্য বিষয়ে সন্তোষের সহিত উহার বিবাহ হইতে কোনই বাধা নাই। সম্প্রদান আমি স্বয়ং করিতে পারি। এখন সন্তোষ ঐ অনাথাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে?"

মাতা কহিলেন, "ঠাকুর, সে পাইলে এখন বর্তিয়া যায়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বিবাহ সম্বন্ধে ত আমি কোন আপত্তি দেখি না।"

মাতা কহিলেন, "তাহা হইলে কন্যার মনটা আমি একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি। তাহার পর ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিব।"

সন্ন্যাসী "তথাস্তু" বলিয়া উঠিলেন। মাতাপুত্র উভয়ে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সন্তোষ সন্ন্যাসীর সহিত মাতার কথোপকথন সমস্ত শুনিয়াছিল। যতক্ষণ না গাড়ী বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, সে কর্ত্রীর অন্তঃপুরের মধ্যে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে একটা সুখের ছবি আঁকিতে লাগিল।

দক্ষিণ দিকের অনতিপ্রশস্ত গলির মধ্যে গাড়ী আসিয়া থামিল। বাড়ীর ভিতর গাড়ী যাইবার পথ ছিল না। সন্তোষ আগে নামিয়া মাতার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল। তাহার পর নবীন আশায় উৎফুল্ল হইয়া দ্রুতগতিতে পাঠাগারের দিকে চলিল।

সন্তোষ পাঠাগারে ঢুকিবে, এমন সময় দূর হইতে দেখিল, প্রতিমা ও মাধবী মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া এটা ওটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছে। প্রতিমার লাবণ্য-ছটায় সেই শ্রীহীন নিধন বাড়ীখানি যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মস্তক অবগুণ্ঠন-হীন—দীর্ঘ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঊষালোকে তাহার সঙ্কোচহীন সুন্দর নিরলঙ্কৃত মুখের উপর পড়িয়া পীত আভায় মণ্ডিত করিয়াছে। সন্তোষ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর আপনাকে সংযত করিয়া মৃদুপদক্ষেপে সহজ শান্তভাবে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে কোমটা টানিয়া জানালার কাছে গিয়া একেবারে কোণঠেসা হইয়া দাঁড়াইল।

মালতী গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু প্রতিমাকে তাহা জানিতে দেয় নাই। এক্ষণে সে প্রতিমাকে লজ্জাহত দেখিয়া তাহার নিকটে গিয়া, "লজ্জা কি, এস না!" বলিয়া হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া আনিল।

সন্তোষ বিনয়নম্রস্বরে কহিল, "আমার নিকট অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র আছে—দেখাই আসুন।"—এই বলিয়া তড়িৎ ও চুম্বক সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য নানা-প্রকারের যন্ত্র সকল চালন করিয়া দেখাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মালতী ইচ্ছা করিয়া প্রতিমাকে একলা ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। সে পূর্ব্বে এ সকল দেখিয়াছিল—তাহার আর দেখিবার কৌতূহল ছিল না। প্রতিমা মুস্কিলে পড়িয়া অধোবদনে দেখিতে লাগিল।

সন্তোষ যন্ত্রচালনা করিয়া দেখাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ঘূর্ণ্যমাণ চক্রের মধ্যে তাহার অঙ্গুলি পতিত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল; ঝরঝর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। প্রতিমা সেই মুহূর্ত্তে লজ্জা সঙ্কোচ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি শাড়ীর কিয়দংশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া জলে ভিজাইয়া সন্তোষের অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া দিল। সন্তোষ সেই কোমল অঙ্গুলির স্পর্শে, ঋজুতনুবেষ্টিত বস্ত্রাঞ্চলের গন্ধে, মুহুর্মুহু ত্যক্ত তপ্ত নিশ্বাসপাতে বালিকার কাতরতা দৃষ্টে আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না।—জ্বালা যন্ত্রণা সমস্ত ভুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রতিমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি তোমাকে বড় ভালবাসি—তুমি আমাকে ভালবাসো?—বল—বল—বল?"

প্রতিমা মুখের উপর বড় বড় দুই চোখ রাখিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "ভালবাসি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতিমাকে হারাইয়া বামার মার মনে আর সুখ নাই। সে তাহার ঐ জীর্ণ পতিতপ্রায় কুটীরের ন্যায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সে প্রত্যহ দেখে—প্রতিমার স্বহস্তনির্ম্মিত লাউমঞ্চে বড় বড় লাউ ফলিয়া আছে; কুলুঙ্গির উপর তাহার সেই সাধের সাজি শূন্য পড়িয়া আছে; ঘরের কোণে তাহার সেই বেগুন তুলিবার আঁকুশিটা তেমনই ভাবে দাঁড় করান রহিয়াছে; সে দেখে, আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদে। তাহার অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়, মানুষকরার টান গর্ভধারিণী মাতার স্নেহ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

বেলা নয়টা। বামার মা দাওয়ায় বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে টিয়া-পাখীকে রাধাকৃষ্ণ বুলি শিখাইতেছে। এমন সময় মহেন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্র। কি গো বামার মা, রকমটা কি! খুব ফাঁকি দিলে যা' হোক্!

বামার মা অন্য দিনের ন্যায় মহেন্দ্রকে খাতির যত্ন কিছুই করিল না, শুধু বেতের মোড়াটা পাড়িয়া বসিতে দিল। মহেন্দ্র বসিলে কহিল, "ও সব কথা আর মুখে আন্‌বেন না—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "বলি বামার মা, তোমার অত ধর্ম্মজ্ঞান কবে হইল?"

প্রতিমা বড় দুঃখে যে বলিয়াছিল, "গরীব বলিয়া তাহার কি আর ধর্ম্ম নাই!"—সে কথা এখন বামার মার কানে করুণ সুরে বাজিতে লাগিল। সে উত্তেজিত হইয়া কহিল, "হ্যাঁ, যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছি! ইহাকে ধর্ম্মই বলুন, আর যাহাই বলুন!"

মহেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁগো সাবিত্রী ঠাকরুণ, তোমার মেয়ে এখন কোথায় আছে বল দেখি?"

বামার মা। আমি জানি না।

মহেন্দ্র একখানা দশ টাকার নোট্ দেখাইয়া কহিল, "এই দেখিতেছ!"

বামার মা উঠিয়া ভূমিতে পদাঘাত করিয়া হুঙ্কার রবে কহিল, "উহাতে আমি থুতু ফেলি!"

মহেন্দ্রের ভারি রাগ হইল। সে উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "সাবধান! জান, আমি তোমাকে এখনি ভিটে-ছাড়া করিতে পারি!"

বামার মা নির্ভয়ে কহিল, "অনেকে পারেন, আমি ভয় করি না! আমার নিজের জন্য কিছুমাত্র ভাবি না। অধর্ম্ম যাহা করিয়াছি, তাহা কেবল ঐ মেয়ের কষ্ট দেখিতে পারি নাই বলিয়া।"

মহেন্দ্র কহিল, "শোনি, আজ আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি—তোমাকে ত ভিটাছাড়া করিবই, উপরন্তু তোমার মেয়েকে যেখান হইতে হউক সন্ধান করিয়া কাড়িয়া আনিব!"—এই বলিয়া মহেন্দ্র দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বামার মা জানিত, নিশ্চয়ই প্রতিমার কূলকিনারা একটা কিছু হইয়াছে, তাহার কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই—তাই সে ধর্ম্মের বলে বলী হইয়া এত জোরের সহিত সমানে কথা কহিতে পারিয়াছিল। কিন্তু মহেন্দ্রর শেষ কথায় তাহার মনে একটু ভয় হইল, ভাবিতে লাগিল, "হতচ্ছাড়া জমীদারের ছেলেটা নাসাইয়া গেল—না জানি কি করিবে।"—বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় প্রেমানন্দ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাবা তোমাকে তোমার কন্যার নিকট লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। প্রস্তুত হও।"

মা আনন্দে আটখানা হইয়া কহিল, "হ্যাঁগো, সে এখন কোথায়

প্রেমানন্দ কহিল, "সেখানে গেলেই জানিতে পারিবে।"

বামার মা তাড়াতাড়ি সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল। প্রতিমার পরিবার কাপড় ও সখের জিনিসপত্র সঙ্গে লইল। তাহার পর দুয়ারে তালাচাবি লাগাইয়া প্রেমানন্দের সহিত চলিল।

সন্ন্যাসী প্রেমানন্দকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করাইয়া বামার মাকে একেবারে তাহার কন্যার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে। প্রেমানন্দ সেই জন্য অন্য পথ দিয়া একটু ঘুরিয়া সন্তোষের বাড়ীতে তাহাকে একেবারে আনিয়া উপস্থিত করিল।

বাড়ীর রকম-সকম সাজসজ্জা দেখিয়া বামার মা অবাক্ হইল। মালতী দৌড়িয়া নীচে আসিয়া বামার মার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। প্রতিমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বামার মা তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া কান্না থামাইতে গিয়া নিজে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। সন্তোষের মা ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বামার মার হাত ধরিয়া "এস, দিদি এস," বলিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন।

সুখদুঃখের নানান্ কথার পর সন্তোষের মাতা কহিলেন, "দিদি, তোমাকে আমরা ছাড়িতেছি না, এখানে বরাবর থাকিতে হইবে।"

বামার মা কহিল, "তাহাতে আপত্তি কি,—প্রতিমা ছাড়া সংসারে আমার কে আর আছে?"

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকালে প্রকাণ্ড ছাতের একপার্শ্বে প্রতিমা ও মালতী বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নদীর ধারের ঝাউগাছগুলির মাথা ছাত ছাড়াইয়া উঠিয়াছে;—তাহাদের মধ্যে বাতাস আটকাইয়া শাঁ শাঁ শব্দ করিতেছে। আকাশে তারা ফুটিয়াছে। নদীবক্ষে চাঁদ হাসিতেছে। মাঝিরা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া রান্নার উদ্যোগ করিতেছে;—তাহাদের উননের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দূর হইতে চিতার মত দেখাইতেছে।

মালতী প্রতিমাকে কহিল, "এস ভাই, তোমাকে আমি জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিখাই।" এই বলিয়া কোন্‌টা সপ্তর্ষি, কোন্‌টা মঙ্গলগ্রহ ইত্যাদি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে লাগিল। সে দাদার নিকট এ সব শিখিয়াছিল। দেখাইতে দেখাইতে মালতী প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া কহিল, "তুমি ভাই কোন্ গ্রহ?"

প্রতিমা হাসিতে হাসিতে মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তোমারই জয়।"

মালতী কহিল, "ঠিক কথা, তুমি ফুলের মালা, আমরা ভাই তোমাকে গলায় পরব।"

প্রতিমা কহিল, "সে ভাই তুমি, তোমার নামেই প্রকাশ পাচ্চে।"

মালতী কহিল, "তা হ'লে ভাই তুমি কি?"

এমন সময়ে একটা কাগজের মোড়ক হাতে সন্তোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্তোষ বসিয়া কহিল, "ইহার মধ্যে কি আছে, যে বলিতে পারিবে, তাহাকে এই হীরার আংটিটা দিব।"

মালতী তাড়াতাড়ি কহিল, "ক্রীস্‌মাস কার্ড।"

প্রতিমা একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "লজঞ্চুষ।" কাহারও কথা ঠিক হইল না। মোড়কের মধ্যে সন্তোষের স্বহস্তে তোলা প্রতিমার ফটো ছিল। প্রতিমা যখন প্রাতে বাগানে বেঞ্চের উপর একলা বসিয়াছিল, সন্তোষ লুকাইয়া তাহার ছবি নিয়াছিল।

মালতী তাড়াতাড়ি দাদার হাত হইতে ছবি কাড়িয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। খানিকক্ষণ দেখিয়া "কি সুন্দর!" বলিয়া প্রতিমার মুখের কাছে ছবিখানা ধরিল। প্রতিমা মুখ ফিরাইয়া লইল। তখন মালতী উঠিয়া মাকে ছবি দেখাইতে নীচে নামিয়া গেল।

মালতী উঠিয়া গেলে সন্তোষ জ্যোৎস্নালোকে প্রতিমার মুখখানা একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। দেখিল,—চন্দ্রাকার বঙ্কবেণী হইতে বকুলফুলের মালাটি ঈষৎ খসিয়া পিঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; বনপুষ্পাচ্ছাদিত ভ্রূযুগের মধ্যভাগে কাঁচপোকার টিপ্ তারার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে; নীবির কালো জলের মত স্বচ্ছ গভীর ঐ লজ্জানাথা নয়ন দুইটির কি সুন্দর চাহনি;—ওষ্ঠ ঈষৎ গোলাপী আভায় রঞ্জিত। সন্তোষ আস্তে আস্তে প্রতিমার অঙ্গুলিতে হীরক-অঙ্গুরীয়কটি পরাইয়া দিয়া কহিল, "এতদিনে আমার জীবন সার্থক হইল।—তুমি আমার জীবন-দায়িনী। জীবনে আমি কখনও এত সুখ পাই নাই।"

প্রতিমা কহিল, "আমিও কি কম সুখী হইয়াছি।"

সন্তোষ কহিল, "মা ত আমাদের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সন্ন্যাসী ঠাকুরের অনুমতি হইলেই হয়।"

প্রতিমা কহিল, "ঠাকুর কি বলেন?"

সন্তোষ কহিল, "তিনি দিন স্থির করিয়া বলিয়া পাঠাইবেন বলিয়াছেন।"

প্রতিমা কহিল, "ঠাকুরের কৃপায় যখন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন কৃপায় আবার আমাদের মিলন হইবে।"

এই সময়ে মালতী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, হীরক-অঙ্গুরী প্রতিমার অঙ্গুলিতে শোভা পাইতেছে। মালতী বুঝিয়াছিল, প্রতিমাকে দিবার জন্যই সন্তোষ আংটিটা আনিয়াছে, তবু সে কহিল, দাদা, তুমি বড় পক্ষপাতী। আমার আঁচ বরং কাছাকাছি গিয়াছিল, তবু তুমি আংটিটা প্রতিমাকে দিলে।"

সন্তোষ হাসিতে লাগিল।

গল্পগুজবে অনেক রাত্রি হইল। ঝি আসিয়া খবর দিল, আহার প্রস্তুত হইয়াছে। উঠিল। মাথার উপর দিয়া একটা পেচক চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। ঝি "দূর্! আঃ ম'লো যা!" বলিয়া গালি দিতে দিতে নীচে নামিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সকালে মহেন্দ্র মোসাহেব-পরিবেষ্টিত হইয়া বৈঠকখানায় ঢালা বিছানার উপর বসিয়া আছে। সেতার তানপুরা বাঁয়া তবলা নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র চারি পাশে আছে—সম্মুখে মদের বোতল এবং একটি গ্লাস রহিয়াছে। আসবাবের মধ্যে দেয়ালে কতকগুলি নগ্ন রমণীর চিত্র, এবং গিল্টির ফ্রেমকরা বড় বড় আয়না। একটি কাঠ হইতে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিতেছে। গেলাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে মহেন্দ্র কহিল, "আমাকে ধরে কা'র সাধ্য।"

মোসাহেবদিগের মধ্যে এক জন কহিল, "রামো! রামো! তাহাও কি হয়? যদি ধরাই পড়েন—টাকায় কি না হয়? খুনকে খুনই চাপা পড়িয়া যায়, এ অতি সামান্য কথা।"

আর এক জন কহিল, "ঠিক কথা। এই ত কিছু দিন পূর্ব্বে রামা বাগদীটাকে মারা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, কি হইল?"

অন্য এক জন কহিল, "আপনার প্রতাপে পুলিশসুদ্ধ থরহরি কম্পবান।"

এই সময়ে কদাকার কৃষ্ণবর্ণ গুণ্ডার মত একটি লোক আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মহেন্দ্র কহিল, "কি হে ভবানী, কি হইল?"

ভবানী মস্তক কহিল, "সমস্তই ঠিক; রাত্রি দশটার পর যাত্রা করা যাইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার প্ল্যানটা কি বল দেখি?"

ভবানী কহিল, "তবে শুনুন। আমি গিয়া প্রথমে জল তুলিবার বেহারার সহিত আলাপ করিয়া ফেলিলাম। তাহার হাতে দুইটা টাকা দিয়া শিখাইয়া

দিলাম—কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পুরাতন মনিব-বাড়ীর আলাপী ভৃত্য বলিয়া আম পরিচয় দিতে। আমি একটা ময়লা কাপড় পরিয়া ছোটলোকের সাজে গিয়াছিলা বেহারার সহিত বাড়ীর চারি পাশ ঘুরিয়া দেখিলাম, পাঁচিলের এক খানিকটা ভাঙ্গা আছে। সেইখান দিয়া অন্ততঃ চারি পাঁচ জন লোক এক প্রবেশ করা যায়। যে ঘরে মেয়েটি রাত্রে শয়ন করে, তাহাও দেখিলাম—সে দোতালার উত্তর দিকের সর্ব্বশেষ কোণের ঘর। সেই ঘরের গা দিয়া একটি বাঁকানে লোহার সিঁড়ি নীচে নামিয়াছে। এই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ছোট একটু বারান্দা মত,—তার পর ঘরের দরজা। আমি বেহারাকে আরও পাঁচ টাকা দিয়া ভিতর হইতে আজ দরজার হুড়কোটা খোলা রাখিতে বলিয়া দিয়াছি। খোঁজ ল জানিলাম, সে ঘরে আর কেউ থাকে না—মেয়ের মা বাড়ীর গি প্রায়ই শয়ন করে।"—এই বলিয়া ভবানী বোতল হইতে মদ ঢালিয়া এক পান করিল। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, —"আমি আর রাম সিং ঐ যাইব; পাঁড়ে আর হীরালাল পাঁচিলের ফাঁকের কাছে থাকিবে। আপনি— একটা তেঁতুলগাছ আছে—তাহার তলায় দাঁড়াইবেন। পাল্কী গলির ম থাকিবে। শুনিলাম, মস্ত একটা কুকুর সমস্ত রাত্রি ছাড়া থাকে—ঐ যা' ভয়।"

কুকুরের কথায় মহেন্দ্র ভীত হইয়া কহিল, "আমার কি না গেলে নয়?"

ভবানী কহিল, "আপনি না গেলে চলিবে না। আপনি থাকিলে পু কিছু বলিতে সাহস করিবে না।"

মহেন্দ্র মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিল,—কহিল, "আচ্ছা, তবে যাওয়া যাই

ভবানী কহিল, "পাল্কী বেহারা আর ক্লোরোফরমের শিশিটা ঠিক আছে ত

মহেন্দ্র কহিল, "সব ঠিক।"

ইহার পর অনেক্ষণ ধরিয়া গান বাজনা চলিল।

রাত্রি দশটার পর মহেন্দ্র দল বল সহ যাত্রা করিল। তখন আকাশে ত মেঘ দেখা দিয়াছে। বাতাস নাই, গাছের পাতা পর্য্যন্তও নড়িতেছে না। যেন কোন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় স্তব্ধ, স্তম্ভিত। অন্ধকারে কেত মাড়া জঙ্গলের উপর দিয়া সকলে চলিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মাখ হইতে সহরে আসিতে হইলে মঠের পাশ দিয়া আসিতে হয়। ঐ অতিক্রম করিয়া নদীর পথ ধরিল। ভৎপরে গহরে পৌছিয়া গলি একেবারে গন্তব্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বকথামত সকলে নিজ নিজ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। পাল্কী গলির মধ্যে রহিল। ভবানী সমস্ত ঠিকঠাক্ করিয়া রাম সিংকে লইয়া উপরে গেল।

মহেন্দ্র সেই তেঁতুল-গাছের তলায় দাঁড়াইয়া এ দিক ও দিক চারি দিক চাহিয়া দেখিল,—অন্ধকারে কোনও দিকে কিছুই দেখিতে পাইল না। মাথার উপর তেঁতুল-গাছের ভিতর দিয়া ঝোড়ো বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে বহিয়া যাইতেছে; আকাশে বিদ্যুৎ হানিতেছে; কুকুরের বিকট চীৎকার মধ্যে মধ্যে শোনা যাইতেছে। মহেন্দ্র ভয়ে জড়সড় হইয়া ভাবিতে লাগিল, "কেন মরিতে ইহাদের সহিত আসিতে গেলাম!"

এ দিকে ভবানী সিঁড়ির উপর দিয়া উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া আস্তে আস্তে আঙ্গুল দিয়া দরজা ঠেলিল—দরজা খুলিল না। আরও একটু সজোরে ঠেলিল, তথাপি খুলিল না। ভবানীর মাথায় বজ্রপাত হইল। সে মনে মনে বেহারাকে অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, বাহির হইতে দরজায় ছিট্-কানি লাগান রহিয়াছে। ভবানী তখন আনন্দিতমনে মেড়ুয়াবাদীর বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইতে বন্ধ না করিলে ঝড়ে দরজা খুলিয়া যাইবে, এবং ভিতর হইতে প্রতিমা অর্গল বন্ধ করিয়া দিবে—এই বিবেচনায় সে ভিতরে খোলা রাখিয়া বাহিরে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ভবানী অতি সন্তর্পণে ছিট্‌কানি খুলিয়া রাম সিংএর সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে দরজা ভেজাইয়া দিল। রাম সিং দরজায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। ঘরে ঘরের এক কোণে একটা সেজ্ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে ভবানী চকিতের মধ্যে ঘরের চারি দিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দেখিল, খাটের মশারি তোলা রহিয়াছে। প্রতিমা—আকাশের গায়ে মেঘরেখার ন্যায়—নীচের বিছানায় কারুকার্য্যখচিত নীল আস্তরণের উপর শুইয়া আছে। ভবানীর অত শত ভাবিবার অবসর ছিল না। সে আস্তে আস্তে শয্যার কাছে গিয়া ক্লোরোফরম্-মিশ্রিত রুমালটা তাহার নাকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিল। অল্পক্ষণ গোঁ গোঁ শব্দ, তাহার পর আর চেতনা রহিল না। মড়েই মনে দুই পার্শ্বে ধরিয়া বিছানাসুদ্ধ প্রতিমাকে পাল্কীতে আনিয়া তুলিল। মহেন্দ্রও তেঁতুল-গাছের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া আবার সকলে মিলিয়া ফিরিয়া চলিল। ঘন ঘন মেঘ ডাকিতেছে; মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হইতেছে; এখনই যেন সহিথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। চলিতে চলিতে দলের সাহিব একটা

চৌকিদারের দেখা হইল। চৌকিদার কহিল, "বাবুলোক এৎনা রাতকো কাঁহা যাতি হো?"

মহেন্দ্র কহিল, "জানানা সওয়ারী—হাঁ, এ বরষমে তুমারা হোলিকা বক্‌সিস্ নেই মিলা।" এই বলিয়া তাহার হাতে দুইটা টাকা দিল। সে টাকা পাইয়া হাস্যমুখে সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ক্রমে তাহারা মঠের কাছে আসিয়া পড়িল। মহেন্দ্র আনন্দোৎফুল্ল হইয়া পাল্কীর দরজা ঈষৎ খুলিয়া জ্ঞানশূন্যা প্রতিমাকে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "এখন্ প্রতিমাঠাকরুণ, কি হইবে? পালাইবে কোথায়? কে তোমাকে রক্ষা করিবে?"

কথাটা নিদ্রাতন্দ্রাহীন যোগমগুপাসীন সন্ন্যাসীর কানে গিয়া পৌঁছিল। তিনি দ্রুতপদে ঘরে গিয়া প্রেমানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যদিগকে উঠাইয়া কহিলেন, "বড় বিপদ। তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া সকলে মিলিয়া তাড়াতাড়ি মঠের সম্মুখে আসিয়া একবারে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এই প্রলয়রাত্রে অন্ধকারে সন্ন্যাসীদের সেই ভৈরবমূর্ত্তি দেখিয়া, যে যেখানে পারিল, পাল্কী ছাড়িয়া পলাইল। কেবল মহেন্দ্র দৌড়াইতে না পারিয়া ধরা পড়িল। মহেন্দ্র সন্ন্যাসীর পাদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দনস্বরে কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া দিন। এমন কাজ আর কখনও করিব না!"

সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কখনই না! আজ তোমাকে ছাড়িব না! কাল যাহা হয়, হইবে।" এই বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিয়া আশ্রমে লইয়া চলিলেন। শিষ্যেরা পাল্কী স্কন্ধে বহন করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

আশ্রমে আসিয়া পাল্কী নামাইল। আনন্দময়ী ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া প্রতিমাকে পাল্কী হইতে বাহির করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

প্রতিমার তখনও জ্ঞান হয় নাই। মুখখানি পাণ্ডুর বিবর্ণ; নিশ্বাস স্বল্প পড়িতেছে। সন্ন্যাসী তাহার শিয়রে বসিয়া জ্ঞানসম্পাদনের নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অনেক যত্নে ক্রমে প্রতিমার একটু একটু জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন প্রতিমা হাতের উপর ভর দিয়া ঈষৎ উঠিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চারি দিকে তাকাইয়া কহিল, "এ কি! ও কে? আমি কোথায় আসিয়াছি?"

সন্ন্যাসী মহেন্দ্রকে সরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "মা, কোনও ভয় নাই। তুমি আমাদের নিকটে আছ। একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

প্রতিমা তন্দ্রাবিজড়িত হইয়া আবার শুইয়া পড়িল।

মহেন্দ্রকে শিষ্যেরা একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল। মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। মঠের সকলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল।

ক্রমশঃ।

জীব ও জাতি।

অতি পুরাকাল হইতে মানবগণ পৃথক্ পৃথক্ জাতি বা সমাজে বিভক্ত। এই সকল জাতি বা সমাজের সমষ্টিগত এক প্রকার জীবন আছে। পূর্ব্বে যে সকল জাতি ছিল, এখন তাহারা নাই; এখন যাহারা আছে, তাহারা পূর্ব্বে ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও যে চিরকাল থাকিবে না, তাহা নিশ্চিত। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যে সকল জীব ছিল, এক্ষণে তাহাদের অনেকেরই বিলোপ হইয়াছে; আবার এখন যে সকল জীব জলে বা স্থলে বাস করে, পুরাকালে তাহারা কল্পনায়ও আসিত না। ফলতঃ জাতিবিশেষের জন্ম, অভ্যুদয়, পতন ও বিলোপ কোনও না কোনও জীবজীবনের ঐ সকল ঘটনারই অনুরূপ। জীবের দেহে যে যে নিয়মে জৈবিক ক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন হইলে তাহার কল্যাণ হয়, জাতীয় জীবনেও সেই সেই নিয়ম অনুসৃত হইলে জাতির অভ্যুদয় হয়। অন্যথা ক্রমে অবনতি ও পরিণামে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীতে জীব অসংখ্য;—মনুষ্যজাতিও বহুসংখ্য। নিকৃষ্ট জীব ও শ্রেষ্ঠ জীবে বিস্তর প্রভেদ; অনুন্নত ও উন্নত মানবসমাজের প্রভেদও তদপেক্ষা অল্প নয়। এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে মানবসমাজ ও জীবের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌসাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

জীবসমূহ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়;—এক আদিজীব (Protozoa), দ্বিতীয় মিশ্রজীব (Metazoa)। আদি জীব অমিশ্র; কেন না, উহাদের দেহ একটিমাত্র কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহারাই জীবশ্রেণীর সর্ব্বনিম্ন পর্ব্বীতে অবস্থিত। ইহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা কোনও প্রকার বোধশক্তি নাই; এমন কি, এত বড় আবশ্যক যন্ত্র যে উদর, তাহাও নাই। তোমরা হয় ত মনে করিবে—আঃ! কি আরাম! উহারা ত বড়ই সুখী, কেন না, পেটের জ্বালাই না সকল জ্বালার মূল!—কিন্তু বাস্তবিক তাহা বলা চলে না। উহাদের পেট

নাই বটে, কিন্তু আহারেও বিরাম নাই; আর সমস্ত দেহটাই পেটের কার্য্য করে। তবেই দেখ, ব্যাপার বরং আরও ভয়ানক। যখন সীমাবদ্ধ উদরের জন্য আমাদিগকে এতটা বেগ পাইতে হয়, তখন সর্ব্বশরীরব্যাপী উদরের জ্বালা না জানি কতই কষ্টকর! বাস্তবিক ঐ দুর্ভাগ্য জীবদিগকে সর্ব্বদা জলে বা তদ্বৎ কোনও তরল পদার্থে থাকিয়া সাঁতার কাটিতে হয়। ঐ তরল পদার্থে উহাদের আহারের উপযোগী যে কোনও দ্রব্য মিলিত থাকে, তাহা উহাদের উদররূপী শরীরকে স্পর্শ করিলে, তাহাই শোষণ করিয়া, উহারা জীবনধারণ করে। সন্তরণের জন্য তাই কি হস্তপদাদি আছে? সমস্ত শরীরটিকে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিয়াই উহাদিগকে সাঁতার কাটিতে হয়। কত কত জীব উহাদিগকে খাইয়া জীবিত থাকে, তাহাদিগের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করা এই উপায়হীন আদিজীবদিগের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তথাপি সংখ্যায় ইহারা অগণিত; তাই অনেক মরিলেও, ইহারা শীঘ্র নির্ব্বংশ হয় না।

এখন দেখা যাউক, এই আদিজীবের সমকক্ষ মনুষ্যজাতি কিরূপ। যদি কোনও জাতি এরূপ থাকে,—যাহারা কখনও বিদ্যার চর্চ্চা করে না, সুতরাং যাহাদের জ্ঞান নিজের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে প্রসারিত হয় না,—যাহারা সর্ব্বদা বুভুক্ষু, এবং খাদ্যের অভাবই যাহাদের চূড়ান্ত অভাব,—যাহাদের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কেবল নিজেরই ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত (প্রায়শঃ মৃগয়ান্বেষণে) ঘুরিয়া বেড়ায়,—যাহারা সমষ্টির নিমিত্ত বা অসময় ভাবিয়া আহরণ বা সঞ্চয় করে না,—অর্থাৎ না কৃষিক্ষেত্র, না দোকানপাট, না সাধারণ ধনাগারের আবশ্যকতা অনুভব করে, যাহাদের সামাজিকতার একেবারেই অভাব, অথবা সমাজবন্ধন একেবারেই শিথিল,—যাহারা স্বদেশ ও স্বভূমির রক্ষায় নিতান্ত অনুপায় বা নিশ্চেষ্ট,—যদি এই প্রকার মানবজাতি কোথাও থাকে, তাহাদিগকে ঐ নিম্নতম শ্রেণীর আদিজীবের সমতুল্য বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে কি? তথাপি ভারতের স্থানে স্থানে, লঙ্কার পার্ব্বত্য প্রদেশে, আণ্ডামান দ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায় ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে যে সকল অনুন্নতাবস্থ মনুষ্যজাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই ত তত্তদ্দেশের 'আদিজীব'। ইহাদের সম্বন্ধে একটা রহস্য এই যে, ইহারা সভ্যতর জাতির ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষে প্রায়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংস ঠিক্ রক্তারক্তির ফল নয়। অবশ্য প্রবল সভ্য জাতি মনে করিলে সহজেই উহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারে। অনাবশ্যক মনে করিয়া বা দয়াপরবশ হইয়া সেটা তাহারা করে না বলিয়া, আর কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে, সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া, উহারা টিকিয়া থাকিতে পায়। তথাপি ক্রমে উহাদের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা

জাতীয় জীবনের শেষ সীমায় প্রায় পৌঁছিয়াছে। ভারতের "দস্যু"দিগকে আগন্তুক আর্য্যগণ প্রায় নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সর্ব্বনিম্ন পদবীর জীব ও জাতির কথা বলা হইল। এক্ষণে সর্ব্বোচ্চ পদবীর জীব ও জাতির কথার আলোচনা করা যাউক। শ্রেষ্ঠজীবসমূহ মিশ্রজীবশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা প্রায়ই পূর্ণাঙ্গ। যে হেতু মানুষই জীবসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই জন্য মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই পূর্ণাঙ্গ জীবের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

নিম্নতম পদবীর জীবের দেহে যেরূপ একটিমাত্র কোষ থাকে, সেইরূপ পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ কোষের সমবায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীব বা মানবদেহ গঠিত। উভয়বিধ কোষের সাধারণ ধর্ম্ম,—যাহাকে জীবনী-শক্তি বলিতে পারা যায়,—তাহা একই প্রকারের। বিভিন্নজাতীয় মনুষ্যেরও জীবনীক্রিয়াদি সম্বন্ধে পার্থক্য নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণা শীতাতপাদিবোধ সকলেরই সমান। বস্তুতঃ মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। যা কিছু পার্থক্য, সমস্তই জাতিগত। সমষ্টির গুণের তারতম্যেই প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়।

মিশ্রজীবসমূহের কোষের আকার সাধারণতঃ অতিক্ষুদ্র, আর ঐ সকল কোষকে আহারান্বেষণের নিমিত্ত আদিজীবের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। স্থূলদৃষ্টিতে প্রধান প্রভেদ এইটুকু। কিন্তু বিশেষ পার্থক্য এই যে, মানবাদি শ্রেষ্ঠ জীবদেহের কোষসমূহ স্বাধীন ও স্বার্থপর নয়। যতদিন দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন প্রায় প্রত্যেক কোষকে অনবরত পরিশ্রম করিতে হয় বটে, কিন্তু কেহই স্বার্থের নিমিত্ত, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা পুষ্টির জন্য গভর্ণমেণ্ট খাটায় না;—সমষ্টির কল্যাণই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য। ষোলআনার কল্যাণ হইতেই প্রত্যেক কোষ বা কোষপুঞ্জের ইষ্ট সাধিত হয়। সমকর্ম্মা বহুকোষের সংমিলনে প্রথমে বিভিন্ন প্রকারের টিসু (Tissue) গঠিত হইয়াছে, এবং ঐরূপ বহু টিসুর সমবায়ে এক একটি শারীর যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এক একটি যন্ত্রের উপরে এক একটি কার্য্যের ভার অর্পিত আছে। যতক্ষণ যন্ত্রগুলি কার্য্যক্ষম থাকে, ততক্ষণই প্রাণ। পক্ষান্তরে, যতক্ষণ প্রাণের স্থিতি, ততক্ষণ একটি যন্ত্রও স্বকার্য্যে অবহেলা করে না।

হস্ত বহুপরিশ্রমে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া ও প্রাণগণ যত্নে উহার পারিপাট্য বিধান করিয়া মুখে তুলিয়া দিয়াই অবসর গ্রহণ করিল। স্থূলদৃষ্টিতে হাতকে বোকা বলিয়াই বোধ হইবে। সে তাহার পরিশ্রমার্জ্জিত সামগ্রীর সমস্তটা নিজেই ত উপভোগ করিতে পারিত? কিন্তু হাত নিঃসংশয়ে জানে যে, ঐ যে আহার্য্য

মুখবিবরকবলিত হইল, উহা হইতেই তাহার কল্যাণ সাধিত হইবে। এইরূপ প্রত্যেকে অপর বন্ধুকে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে।

মুখে চর্ব্বণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে দন্ত ও রসনা প্রধান সহায় বটে, কিন্তু উহাদেরও সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বার্থ নাই। রসনা যেন একটু সৌখীন। সুখাদ্যের রসাস্বাদনসুখ একা তাহারই একচেটে; এটা ঝাল, ওটা নুনে পোড়া, অমুক জিনিসটা বাসী; ইত্যাদি নানাপ্রকারের খুঁটি নাটি সে সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। কিন্তু দেহ-রূপ পুরীর প্রধান দ্বারের যে রক্ষক, সে অতটা সতর্ক না হইলে, অবাঞ্ছনীয় বহু পদার্থ অন্দরে চলিয়া যাইতে পারে। কেবল হাঁ করিলে ও ঢোক গিলিলে, কেবল ফাটক খুলিলে ও দিনাতর্কে আগন্তুককে শুদ্ধান্তে প্রবিষ্ট করাইলে, তাহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। কাজেই দরোয়ানজীর মেজাজ অত খিট্‌খিটে। তাহার নিজের স্বার্থ কিছুমাত্র নাই, সকলই ষোলআনার জন্য।

তার পর উদর। ইহারও একটা ভারি দুর্নাম আছে।—নিজে দেহভূমির মধ্যস্থলটি অধিকার করিয়া সুদৃঢ় পঞ্জরপ্রাচীরপরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত। কখনও কোনও কাজে নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া অন্যের অর্জ্জিত ও আহৃত আহার্য্যের ধ্বংসসাধনই একমাত্র কার্য্য। অতএব উদর ঘোর স্বার্থপর; এবং উদরই আমাদের সকল যন্ত্রণার মূল! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদর নিতান্তই নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী। আহার্য্যকে নানা প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া পাকযন্ত্রের সাহায্যে তাহার সারাংশকে তরুণ শোণিতে পরিণত করিয়া শোণিতবহা নাড়ীর সূক্ষ্ম কৈশিকসমূহের মুখে পৌঁছিয়া দেওয়াই উহার প্রধান কার্য্য। অসারাংশকে অবিলম্বে নিষ্কাশিত করিয়া দেহভূমিকে নির্ম্মল রাখাও উদর যন্ত্রের অন্যতম কার্য্য। তা ছাড়া, তোমার শিরঃপীড়াই হউক, বা অঙ্গুষ্ঠের গ্রন্থিসমূহে মর্ম্মস্পর্শী বাতের বেদনাই হউক; অধিক কি, তুমি প্রসূতি, তোমার ঐ শিশুটি একটু বাল্‌সাক, বিকট বিস্বাদ দুর্গন্ধ ঔষধ খাইতে হইবে তোমার ঐ উদরকে। শরীর মাঝে উদর নামে যে একটা প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ আছে, তাহার এক দিকে সাধারণ ধন বা আহার্য্যের ভাণ্ডার, অন্য দিকে রন্ধনশালা। রন্ধনশালার পার্শ্বেই কয়েকটি অত্যাবশ্যক মশলার কুঠরী আছে। ঐ সকল মশলার সাহায্যে রন্ধনক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। প্রকাণ্ড রাজ্যে কোষরূপী শ্রমজীবীরা যে যেখানে থাকিয়া খাটুক না, অন্যের জন্য তাহাদিগকে ভাবিতে হয় না; যতক্ষণ ভাণ্ডারে কণিকামাত্র আহার্য্য থাকে, যতক্ষণ রন্ধনশালার উননে একটুও আগুন থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ উদর সকলেরই মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলিয়া না দিয়া থাকিতে পারে না।

শরীর-রাজ্যে 'দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে' যেরূপ সুশৃঙ্খলা দেখিলাম, অন্যান্য সমুদয় ব্যাপারে ঠিক ঐরূপ সুশৃঙ্খলাই বিদ্যমান। কোষদিগের কেবল আহার নয়, এমন কি, সকলের স্নানের নিমিত্তও সুব্যবস্থা আছে। স্নানাবশিষ্ট ক্লেদকলুষিত জল অবিলম্বে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া হয়। সকল কাজেই এইরূপ। যেখানে এরূপ সুনিয়ম, সেখানে নিয়ামকের সত্তা স্বতঃই অনুমিত হইতে পারে। বস্তুতঃ, শরীর-রাজ্যের শাসনপ্রণালী বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

কোষসমূহকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। একশ্রেণী শাসক,—রাজার জাতি, ইহারা শ্বেতবর্ণ। অপর শ্রেণী শাসিত,—প্রজার জাতি, ইহারা বিবিধবর্ণ। রাজার জাতির রাজধানী রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে, সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাকারে সুরক্ষিত। রাজধানীর সম্মুখে বড় বড় দুইটি ফটোগ্রাফের যন্ত্র বসান আছে। যে কোনও পদার্থ রাজদ্বারে উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকৃতি তৎক্ষণাৎ উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে রাজকীয় কোষগণসমীপে উপস্থাপিত হয়। রাজধানীর বামে ও দক্ষিণে দুইটি শব্দবহ যন্ত্র (telephone) স্থাপিত আছে। বাহিরে অতি দূরেও কোনও প্রকার শব্দ হইলে, সেই শব্দ রাজদুর্গাধীশ কোষসমূহে অবিলম্বে পৌঁছিয়া থাকে। এ ছাড়া দেশময় টেলিগ্রাফের তার বিস্তৃত আছে। অতি দূর প্রদেশে নখাদি সুদূর অন্তরীপ কেহ স্পর্শ করিলে, এমন কি, তেমন দূরের বনভূমিজাত কোনও একটি উদ্ভিজ্জের অগ্রভাগমাত্র কেহ একটু নমিত করিলে, সে সংবাদও তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে উপনীত হয়। যদি স্পর্শক্রিয়া অসদভিপ্রায়ে হইয়া থাকে, তাহার প্রতিবিধানের উপায়ও তৎক্ষণাৎ অবলম্বিত হয়।

দেহ-রাজ্যে কিন্তু দুই প্রকার টেলিগ্রাফ আছে। এত ক্ষণ যাহার কথা বলিলাম, তাহা রাজকীয় তার, রাজার খাস বন্দোবস্তে চালিত। রাজধানীর পররাষ্ট্র-বিভাগ (Foreign Department) ইহার চালনা করিয়া থাকেন। বাহিরের সহিত সম্বন্ধই যে সমধিক গুরুতর। সমস্ত রাজনীতির উহাই ত একমাত্র ভিত্তি। সুতরাং রাজা এই টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত অন্যের হস্তে দিতে পারেন না। রাজ্যের হোম্ ডিপার্টমেণ্টের পরিচালনাধীন আর এক প্রকার তার আছে। এই শেষোক্ত তারের সহিত রাজার সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই—হোম্ডিপার্টমেণ্টের অনেক কাজই যে লোক্যাল্ সেল্ফ্ গবর্মেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির অধীন।—ইহাদের হেড্ অফিস সমূহ ঠিক রাজধানীতে না হইয়া, কলেরুকা নামক সহরতলীতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহুদূর বিস্তৃত—প্রায় ধর,—ধাপা পর্য্যন্ত। কোনও কোনও কার্য্যের অর্দ্ধেক ফরেন্ ডিপার্টমেণ্টের, আর বাকিটা হোম্ ডিপার্টমেণ্টের আয়ত্ত। এই দেখ না, দক্ষিণ

হস্তের ব্যাপারে হস্ত, মুখ, দন্ত ও রসনা দ্বারা যতটুকু কাজ হয়, তাহার জন্য স্বেন্ ডিপার্টমেন্ট সম্পূর্ণ দায়ী ;—তাহার পরিচালনা হয় খাস রাজধানী হইতে। কিন্তু গলাধঃকরণ হইবামাত্রই উক্ত ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব রহিত হয়, আর তন্মুহূর্ত্ত হইতে ধাপায় পৌঁছান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই মিউনিসিপ্যালিটির অধীন। মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যও শ্বেতকোষবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু উহারা রাজধানীর খাস শ্বেত-কোষ নয়। উহাদের কার্য্যাকার্য্যের বিবরণ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাজধানীতে পৌঁছে না। সাধারণতঃ, মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যবিশেষে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, রাজ-ধানী হইতে তাহার প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবিত হয়।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রেষ্ঠজীব মানবের শরীরে নিখুঁৎ সমাজগঠনের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। কোনও মনুষ্যসমাজ বুঝি উন্নতির অত উচ্চশিখরে আজও উঠিতে পারে নাই। কিন্তু যাঁহারা উন্নতি করিতেছেন, বা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে ঐ অভ্রান্ত আদর্শ পড়িয়া রহিয়াছে। এই আদর্শের আলোচনা করিলে আমরা সামাজিক অনেক গূঢ় ও জটিল সমস্যার সুমীমাংসায় অনায়াসে উপনীত হইতে পারি। কঠোর জীবনসংগ্রামে জাতিবিশেষ কেন ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতেছে, আবার তাহারই প্রতিবেশী অন্য [illegible] জাতি তরতর করিয়া উন্নতির পথে কেন অগ্রসর হইতেছে, অতি সহজেই তা[illegible] বুঝিতে পারা যায়। একটু চিন্তা করিলে জাতীয় উন্নতির দুইটি মূলমন্ত্র সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ। যদি কোনও জাতি সগৌরবে টিকিয়া থাকিতে অভিলাষ করে, তবে তাহার প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে ঐ দুইটি মূলম[illegible] জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তে জাগরূক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। দুইটিই বা বলি কেন[illegible] ধরিতে গেলে মূলমন্ত্র একটিমাত্র—'স্বার্থত্যাগী হইয়া কর্ত্তব্য পালন [illegible]র।' কথাটা ভারতে ভারতেরই মত পুরাতন, উহাই ত আমাদের গীতার মূল [illegible]র্ম ; কিন্তু হায়! আমরা উহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। মুখে উহার আবৃত্তি [illegible]ই করি, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত!

ঠিক্ ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন অতি শুভমুহূর্ত্তে নিদ্রাবিহ্বল জাপানের কানে কানে কোনও অনুকূল ইষ্টদেবতা, কেমন করিয়া জানি না, ঐ ম[illegible] মূলমন্ত্রটি নিষিক্ত করিয়াছিলেন ; সহসা সেই দিন সকলে সনাতন নিদ্রা ত্যাগ করি[illegible] জাগিয়া উঠিল, এবং নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি একেবারে ভুলিয়া গিয়া একপ্[illegible]ণ একটি প্রবল নূতন জাতি গড়িতে বসিয়া গেল। মহামন্ত্রী শোগুণ পূর্ব্বে সম্রাট্[illegible] সাক্ষিগোপাল রাখিয়া নিজে বংশানুক্রমে রাজত্ব করিতেন ; তিনি তদ্দণ্ডেই আপ[illegible]র সেই মুহূর্ত্তে

স্বত্ব অম্লানবদনে মিকাডোর হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভূস্বামী দাইমীগণ সমগ্র দেশটাকে আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেকে স্বাধীন নৃপতির ন্যায় বীর স্বীয় রাজধানীতে পূর্ব্বে বিরাজ করিতেন; তাঁহারাও সেইদিন মিকাডোর পদপ্রান্তে রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং 'দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতের জন্য আমাদিগকে কি করিতে হইবে, প্রভো, আদেশ করুন!' এইরূপ প্রার্থনা করিয়া যুক্তকরে সম্রাট্‌সকাশে দণ্ডায়মান হইলেন। দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া সেই প্রথম জন্মভূমিকে আকুলপ্রাণে "মা! মা!" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। কি চমৎকার শুভফল! সেই দিন যে জাতিটির জন্ম হইল, আজ তাহার বয়স সবেমাত্র ছত্রিশ বৎসর। এই শিশু জাতিটির শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরাক্রম দেখিয়া এই মুহূর্ত্তে জগদ্‌বাসী স্তম্ভিত, বিমোহিত, বিস্ময়বিহ্বল। কিসে এমন হইল, স্বয়ং জাপান কিন্তু তাহা অভ্রান্ত ভাষায় সকলকে বলিয়া দিতেছেন। স্বদেশের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত কুড়ি জন লোকের জীবন উৎসর্গ করিবার প্রয়োজন হইলে যে জাতির দুই হাজার বীর তদ্দণ্ডেই সেই সম্মানের প্রার্থী হয়, সে জাতির গৌরবের মূলমন্ত্র অবোধ্য ভাষায় রচিত নয়।

দুইটি চরমসীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। জীব-জগতে এক সীমায় নিতান্ত হীনাবয়ব কোষৈকসম্বল অসম্পূর্ণ আদিজীব; অপর সীমায় পূর্ণতার আদর্শ মানবদেহ। জাতিসমূহের এক দিকে অষ্ট্রেলিয়ার বুশম্যান্ প্রভৃতি; অপর দিকে ইংরাজ, জাপানী প্রভৃতি বীরের জাতি।

এখানেই প্রবন্ধের 'ইতি' দিতে পারিলে আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতাম। কিন্তু আমরা নির্ল্লজ্জ জাতি কি না, তাই এখন যে কথাটি তোলা আবশ্যক, কিন্তু না তোলাই উচিত ছিল, তাহা চাপিয়া রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হইল না, এবং চাপিয়া রাখিলে তোমরাও আমাকে সহজে ছাড়িতে না। কথাটি এই,—আমরা কোন্ পর্য্যায়ের? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিবার পূর্ব্বে আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—মা ধরিত্রী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবিষ্ট হইয়া কলঙ্কিত কালা মুখ চিরতরে ঢাকিয়া ফেলি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে আজও এমন এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বাহ্বাস্ফোটপূর্ব্বক অম্লান-বদনে বলিতে পারেন,—বাঃ, আমারই ত জগতের জাতিসমূহের শীর্ষস্থানীয়; আমাদেরই নিকট সমস্ত জগৎ একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছে, আমাদের সমাজগঠন নিখুঁৎ—ইত্যাদি ইত্যাদি,—'কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?' পর্য্যন্ত। ইঁহাদের কেহ কেহ বলেন, ভারত

ভৌতিক উন্নতি না হউক, এবলজাতিসমূহকে বৈষয়িক ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারিলে, সকলের গুরুস্থানীয় থাকিয়া যথেষ্ট সম্মানার্হ হইবে। ইহাদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। ইহারা স্বচ্ছন্দে গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত সুদীর্ঘ থলিয়া সেলাই করিতে থাকুন! আমি দূর হইতে নমস্কার করিতেছি, এবং দক্ষিণার মৎপ্রাপ্য অংশের সম্পূর্ণ স্বত্ব দ্বিধাশূন্য হইয়া ত্যাগ করিতেছি। কেবল শিক্ষা দিয়া, কেবল মাষ্টারী করিয়া, কি জীব-জগতে, কি মনুষ্য-সমাজে, কেহ বড় হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাই না।

কাহারও কাহারও মত একেবারে বিপরীত। ইহারা বলেন, আমরা আর জীবিত নাই,—অনেক পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাকালে পৃথিবীতে এমন অনেক জীব ছিল, যাহাদের এক্ষণে অস্তিত্বলোপ হইয়াছে। আমরা তাহা হইলে উহাদেরই অন্যতমের সমস্থানীয়—আর্ম্মাডিলো, ম্যাষ্টোডন্ প্রভৃতির সমতুল্য। এইরূপ অনুমানের বৈজ্ঞানিক হেতু এই যে, মৃতদেহের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ আমাদের জাতীয়দেহে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। একটি লক্ষণ এই যে, সমস্তদেহব্যাপী একটা স্পন্দন আমাদের জাতিতে পরিলক্ষিত হয় না। জীবিতদেহে কোথায় নিভৃত বক্ষোগহ্বরে থাকিয়া হৃদ্‌যন্ত্র স্পন্দিত হয়, আর যুগপৎ সর্ব্বশরীরে সেই স্পন্দন ঠিক তালে তালে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। যাহার স্পন্দন নাই, তাহার মৃত্যু হইয়াছে বৈ কি? মৃতদেহের আর একটি লক্ষণ এই যে, শারীর উপাদানগুলি চিরন্তন কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। সর্ব্বপ্রথমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ মূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তৎপরে মাংসপেশীগুলি গলিত হইয়া কৃমিবিশেষ পরপুষ্টজীবের আধারভূত হয়; ক্রমে রসভাগ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া উড়িয়া যায়; অবশেষে অস্থিসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধরার ধূলির সহিত মিশিয়া যায়। স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্লেষণের চূড়ান্ত উদাহরণ।

ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা অনেকগুলি মৃত ও মুমূর্ষু জাতির পরিচয় পাই। তাহাদের কাহারও কাহারও অস্থি পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ হইয়াছে, যেমন ব্যাবিলনিয়ান, ফিনিশিয়ান, কার্থেজিয়ান প্রভৃতির। আজ ঐ সকল পুরাতন জাতির পরিচয় দিবার জন্য একটি প্রাণীও নাই। কাহারও কাহারও দেহের কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু জীবিত অবয়বের সহিত তুলনা করিলে চিনিতে পারা যায় না; আর প্রায়ই ইহাদিগকে পরপুষ্টগণ পাইয়া বসিয়াছে; যেমন গ্রীক্, মৈশর, পারসীক প্রভৃতি। যাঁহারা বলেন, আমরা মরিয়াছি, তাঁহারা আমাদিগকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে চান। মুমূর্ষুদিগের মধ্যে তুরুষ্ক ও চীনের

এক্ষণে নাভিশ্বাস উপস্থিত; স্পেন ও পর্টুগালকে বৈদ্য জবাব দিয়াছে; আর ফ্রান্স জরা অনুভব করিতেছে।

কি কি কারণে কোনও একটি জাতির মৃত্যু ও লোপ হয়, তাহারও মীমাংসা জীব-জগৎ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোনও জীবের লোপ পাইবার প্রধান কারণ এই যে, উহারা পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপযোগিতার তারতম্যবিধান করিতে কালবশে অক্ষম হইয়া পড়ে। এই অসামর্থ্যে পদে পদে পদস্খলন হওয়ায় ক্রমে নিজে পশ্চাৎপদ ও প্রতিদ্বন্দিসমূহ প্রবল হইয়া উঠে,—চরম ফল অস্তিত্বলোপ।

তবে কি আমরা সত্য সত্যই মরিয়াছি? ইতঃপূর্ব্বে ভারত কি কখনও 'এক' হইতে পারিয়াছিল? একছত্রাধীন না হইলে কোনও দেশ 'এক' হইতে পারে কি? পুরাকালে ভারতকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অসংখ্য নরপতি রাজত্ব করিতেন; ইহারা প্রায় পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন। এমন স্থলে সমগ্র ভারতে যুগপৎ স্পন্দন কখনও সম্ভবপর ছিল কি? পুরাকালে ভারতের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার কোনটি সমষ্টির চেষ্টার ফল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কদাচিৎ কোনও রাজা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; কেহ বা স্থপতিশিল্পের উন্নতিকল্পে যত্ন করিতেন; কেহ বা ভাস্করশিল্পের অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন;—এই প্রকার যা কিছু উন্নতির আজও নিদর্শন পাওয়া যায়, তৎসমস্তই ব্যক্তিগত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলমাত্র। ফলতঃ ইদানীং জাতীয়তা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কখনও ভারতে পরিস্ফুট হইয়াছিল কি না, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ হিসাবে আমাদিগকে মৃত না বলিয়া অসম্পূর্ণ জীবের পর্য্যায়ে রাখিলে নিতান্তই অসঙ্গত হয় কি? তাহা হইলে একটু আশায় বুক বাঁধিবার অবসর পাই যে! যে মৃত, তাহার ত আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই, তার ত সব ফুরাইয়াছে। মরার উপরে যে আর গালি নাই!

না, না,—আমাদিগকে মরা বলিও না। ঐ যে জড়তা এখন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, উহা কৌষেয়-কীটের কুম্ভক অবস্থার বিকল্প হইতেও ত পারে? কে বলিতে পারে যে, জড়তা ও সংকীর্ণতারূপী ঐ দুশ্ছেদ্য আবরণকে বিদীর্ণ করিয়া চারুচাকচিক্যশালী উড্ডয়নশীল নবশরীর দেখাইয়া একদিন আমরা জগৎকে বিমোহিত করিব না? কিন্তু মনে থাকে যেন, কৌষেয়-কীট যে আকারে কোষে প্রবেশ করিয়া কুম্ভকে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত পক্ষধারী নবশরীরের কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য থাকে না। আমরা যা ছিলাম, আবার তাই হইতে চেষ্টা করিলে

সকলই পণ্ড হইবার সম্ভাবনা। কোষে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সুশ্যামল মাতৃভূমিতে কীটের প্রিয়ভোজ্য পত্রপল্লব বহুলপরিমাণে ছিল—তখন ব্যাকরণ সাহিত্য ষড়্-দর্শনাদি মহীরুহের শ্যামলপত্রচর্ব্বণে পটুতা দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ হইত; কিন্তু ইতোমধ্যে জননী ধরিত্রী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—কিশলয়ের উপরে স্তরে স্তরে থরে থরে নববিকশিত কুসুমদাম সজ্জিত রাখিয়া, ঐ শুন, মা স্নেহভরে 'আয় রে বাছা সকল' বলিয়া ডাকিতেছেন,—এখন পত্রচর্ব্বণবৃত্তি পরিহার করিয়া, মধুচয়নপটু না হইলেই নয়। কীট হইয়া থাকিলে, ভাই, কেমন করিয়া মধুচয়ন করিবে?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

যে হেতু ও সে হেতু।

১

দীনু সরকারের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সংসারের ঘটনাবলীর সচরাচর একটা কারণ থাকে। কোন ঘটনার একটার অধিক কারণও থাকে, এবং কোনটার বিশেষ কারণ আপাততঃ থাকে না, কিন্তু পরে প্রকাশ পায়।

যে হেতু বিবাহ করিলে প্রায় পুত্র কন্যা জন্মিয়া থাকে, অতএব দীনুর পিতার ভাগ্যে দীনু জন্মিয়াছিল। এবং সে হেতু দীনুর মাতার পুত্রসাধ মিটিয়াছিল। অতএব স্ত্রীর আহ্লাদ দেখিয়া দীনুও অপর্য্যাপ্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

যে হেতু মাতৃস্নেহ হইতে গাঢ়তর স্নেহ জগতে বিরল, অতএব দীনু আদরে বাড়িয়া 'বুদ্ধিতে খাট' হইয়াছিল। দীনু দেখিতে অতি সুশ্রী, কিন্তু তাহার পিতা মাতা কেহই সুশ্রী ছিল না। ইহার কারণ আপাততঃ কিছুই বুঝা যাইবে না, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইবে।

দীনুর পিতার, দীনুর মাতার ও স্বয়ং দীনু সরকারের ও পাওনাদার প্রভৃতির যুক্ত অদৃষ্টক্রমে দীনুর পিতার হঠাৎ কাল হইয়া গেল। যে হেতু স্বামী মানবলীলা-সংবরণ করিলে স্ত্রী বিধবা হইতে বাধ্য, সে হেতু দীনুর মাতা বিধবা হইল।

সামান্যমাত্র অঙ্কের সংস্থান রাখিয়া দীনুর পিতা ভবধাম হইতে স্বর্গধামে গিয়াছিলেন। অতএব দীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া অনাথা বিধবাকে দীনুর ভরণপোষণ ও অধ্যয়নের নিমিত্ত ভিক্ষা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

দীনু বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগতি অবলম্বন করিয়া দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সকলে বলিল, "দীনু, লেখাপড়া ছাড়িয়া দাও।" অতএব দীনু সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিল।

দীনুকে সকলেই ভালবাসিত।

২

যে হেতু অতি বৃদ্ধ হইলে প্রায় বাঁচে না, সে হেতু দীনুর মাতা মরিয়া গেল। দীনুর মাতা মৃত্যুকালে দীনুকে দীনুরই হাতে সঁপিয়া গেল, যে হেতু আর কেহ ছিল না।

মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া দীনু সন্ধ্যাকালে ভগ্ন বাটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কাঁদিল। যে হেতু দীনুর বুদ্ধি নিতান্ত প্রখর ছিল না, এবং পূর্ব্ব হইতে দুঃখে, যত্নে, স্নেহে লালিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার অধিকমাত্রায় কাঁদিবারই কথা।

দীনুর যে গ্রামে বাস, সেই গ্রামের জমীদার অটল বসু ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। দীনুর পিতার জীবদ্দশায় বসুজা মহাশয় অনেকবার দীনুকে "ঘরজামাতা" করিবার অভিপ্রায়ে তস্য পিতার নিকট প্রস্তাবনা উত্থাপিত করিয়াছিলেন।

ক্রন্দনাদি সমাধান করিয়া ও সংসারের শূন্যতা প্রভৃতি অনুভব করিয়া দীনু সরকার নত ও দুঃখ সন্তপ্ত-বদনে বসুজা মহাশয়ের বহির্বাটীতে মুণ্ডিত-মস্তকে উপনীত হইল। যে হেতু অনেক বাকী খাজনা জমীদারের প্রাপ্য ছিল।

অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর-মুখশ্রী-যুক্ত যুবকের পরিচিত মস্তকে ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশের অভাব লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বসুজা মহাশয় দুঃখিত হইলেন; যে হেতু স্বার্থ ও নিঃস্বার্থভাব উভয়ই দুঃখস্রোত-পরিচালনার উপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল।

৩

অতএব বসুজা মহাশয় বলিলেন, "দীনু তোমার এই দুরবস্থার সময় আমি বাকি খাজনার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে চাহি না।"

দীনু সে হেতু করযোড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। বসুজা মহাশয় পুনর্ব্বার বলিলেন, "দীনু তোমার মাথার উপর এখন কেহই নাই, এবং সংসার বড় ভীষণ স্থান। তোমার বুদ্ধি কম, কিন্তু তুমি সুন্দর, সুশীল ও সচ্চরিত্র। এমন অবস্থায় তোমাকে পুত্রপদে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছি।

"যে হেতু আমার পুত্রসন্তান নাই, অতএব পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে সকলে পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে আমার একমাত্র আদরের কন্যা মাতঙ্গিনীর ভবিষ্যতের অবস্থা ভাল না হইতে পারে। সে হেতু আমার ইচ্ছা, তোমাকে গৃহ-

জামাতা করতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদিগের পুত্রসন্তানের মুখ দেখিয়া আমি মনের আনন্দে সংসার হইতে অপসৃত হই।"

উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া বসুজা মহাশয় গোমস্তাকে বলিলেন, "দেখ, দীনু সরকার অদ্য হইতে আমার গৃহজামাতা, এবং বিষয়ের উত্তরাধিকারী; যে হেতু তিন কুলে আমার কোন আত্মীয় স্বজন নাই। সে হেতু দীনুর পুরাতন বাটী ভূমিসাৎ করতঃ অচিরাৎ তাহার মাল মশলা সংগ্রহ করহ। উহা দ্বারা বাকি খাজানা শোধ হইবে। দীনুর স্থাবর সম্পত্তি ছুই এক টাকা মূল্যের যাহা আছে, বেচিয়া খাতায় জমা কর।

"যে হেতু দীনু এখন আমার উইল অনুসারে অত্রস্থ জমিদারীর মালিক হইবে, এবং আমার গৃহজামাতা হইবে, সে হেতু তাহার পূর্ব্বপুরুষের ও পূর্ব্ব বাসস্থানের চিহ্ন রাখা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে।"

৪

গোমস্তা হুকুম পালন করিতে গেল। পিতৃ-মাতৃ-ভিটা-হীন দীনু স্বীয় অবস্থার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া বসুজার পুষ্করিণীর পাড়ে জল খাইতে গেল। যে হেতু এবংবিধ ব্যাপারে তাহার দারুণ তৃষ্ণা লাগিয়াছিল। দীনু বাল্যসখী মাতঙ্গিনীকে বড় ভয় করিত; কারণ, মাতঙ্গিনী বয়সে দীনু অপেক্ষা ছুই বৎসরের ছোট হইলেও, আয়তনে ও বলবুদ্ধিতে দীনু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সময় পাইলে সে দীনুকে চড়টা, চাপটা, ইট পাট্‌কেলটা মারিত। যে হেতু তাহার স্মৃতি দীনুর মানসপটে অঙ্কিত ছিল, সে হেতু দীনুর অন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল।

সে হেতুই দীনু গাভীর ন্যায় অপর্য্যাপ্ত জলপান করিয়া গ্রাম্য স্কুলের দিকে গেল, এবং ভূতপূর্ব্ব শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বেশ্বর দা', বিবাহ হইলে স্ত্রী কি মারিয়া থাকে?"

বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক তাবৎ বৃত্তান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে দীনুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দীনু বাবু, আপনার অদৃষ্ট ভাল। তামাক্ ইচ্ছা করুন।"

দীনু সরকার সে হেতু ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের সম্মুখে সভয়ে তামাকু পান করিল, এবং আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মাষ্টার পুনরপি বলিলেন, "যে হেতু আপনি ভবিষ্যতে পরগণা শিবহাটীর ষোল-আনার মালিক, আপনার স্ত্রীর নিকট মারি খাইতে কোন আপত্তি উত্থাপন করা উচিত হয় না, সে হেতু অধিক বলা বাহুল্য—"

দীনু আত্মরক্ষা হইতে চেষ্টা করিল, যে হেতু অন্য কোনও উপায় ছিল না।

৫

বহু আড়ম্বরে, ঘোরতর বাস্তভাণ্ডের সহিত একদা রাত্রিকালে দীনুর বিবাহ হইয়া গেল। যে হেতু বিবাহ রাত্রিকালে হইয়া থাকে।

সকলে সে হেতু বলিল, "দীনুর কপাল ভাল। পথের ভিখারী হঠাৎ এত বড় উচ্চপদস্থ হওয়া, ইহা কি আমার তোমার পক্ষে সম্ভবে? এই জন্যই দীনুকে এত সুন্দর করিয়া বিধাতা গড়িয়াছিলেন; এই জন্যই দীনু এত সুবীর শান্ত; ওঃ! সেই হেতু।"

ইহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে দীনবন্ধুর শরণাগত হইল, এবং সে হেতু দীনু সকলকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনাদি করিয়া চা খাওয়াইল। যে হেতু (ইহাও জানা থাকে যে) দীনু পূর্ব্বে অনেকের বাটীতে সকালে বিকালে চা খাইয়া আসিত।

বিবাহের কিছুদিন পরেই আয়ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি দীনুকে বুঝাইয়া এবং কন্যা মাতঙ্গিনী দেবীকে দীনুর ভার সমর্পণ করিয়া, এবং গোমস্তা পরমবৈষ্ণব শ্রীনিত্যানন্দ দাসকে সাক্ষী রাখিয়া, বৃদ্ধ বসুজা বৃন্দাবনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দীনুর মুখ শুখাইয়া গেল, যে হেতু, তাহা বলা বাহুল্য। দীনু বলিল, "প্রতিপালক! এ সময়ে তীর্থে না গিয়া—"

মাতঙ্গিনী সরোষে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "চোপ্! বাবা তীর্থে যাবেন না ত আমাদের আঁচল ধ'রে বসে থাক্‌বেন?"

দীনু বলিল, "অবশ্য—সে কথা ঠিক—"

জামাতার উপর পুত্রীর প্রতাপ অন্তরে লক্ষ্য করিয়া বসুজা মহাশয় সানন্দে মালা জপ করিলেন, এবং বলিলেন, "দেখ নিতাই, আমাদের দীনু কি শান্ত ছেলে!"

নিত্যানন্দ সে হেতু বলিল, "প্রভুর ইচ্ছা—সকলই প্রভুর ইচ্ছা!" এবং চক্ষু উল্টাইয়া স্বর্গের দিকে আরোপিত করিল।

সেইদিনই বসুজা মহাশয় বৃন্দাবনে গেলেন, এবং যাইবার সময় কন্যাকে বলিলেন,—"মা, দীনুকে দেখো; তোমার পুত্রসন্তান হইলে আবার আসিব; দীনুকে দেখো, তার মাথার উপর কেহই নাই।"

কন্যা বলিল, "কোনও ভয় নাই, বাবা, তুমি যাও।"

সে হেতু বসুজা মহাশয় গেলেন।

৬

ক্ষীর, সর, নবনী, রোহিত মৎস্যাদি প্রচুরপরিমাণে সেবা করিয়াও দীনু ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। যে হেতু—কেবল খাইলেই যে সকলে হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহা নহে।

সেইদিন মাতঙ্গিনী দীনুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ তুমি রোগা হইতেছ, ইহার কারণ কি ?"

দীনু। বোধ হয়—যে হেতু আমার রোগা ধাত্।

মাতঙ্গিনী। দেখ, আমার সঙ্গে চালাকী খাটিবে না—তুমি চা ছাড়িয়া দাও; আর অত রাত্রি জাগিয়া ইয়ারদের সঙ্গে পাশা খেলিও না। ফের যদি কথা না শুন, তবে বুঝা যাইবে।

বাটীর মধ্যে চা বন্ধ হইয়া গেল, এবং সেইদিন হইতে আজ্ঞাধীন পরমবৈষ্ণব গোমস্তা নিত্যানন্দ দাসের তদ্বিরে ইয়ারগণ সন্ধ্যার সময় ভদ্রাসনে আর প্রবেশ করিতে পারিল না।

সে হেতু দীনবন্ধু সন্ধ্যার সময় এবং পুনর্ব্বার সকালে, উপর্য্যুপরি নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিল। যে হেতু চা না খাইলে একটা কিছু খাওয়া চাহি, এবং তাহা না খাইলে নিদ্রাভিভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এ দস্তুর বন্ধ হইয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গের পর মাতঙ্গিনী দাসীর রোষ বর্দ্ধিত দেখিয়া দীনু পূর্ব্বাপেক্ষা ভয় পাইল। এবং একদিন নিদ্রার আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া দীনু দুইটা কঠিন চাপড় খাইল।

এবং মাতঙ্গিনী রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিল, "তুমি নিতান্ত অকর্ম্মা এবং অলস। তোমার হাতে পড়িয়া আমার ইহকাল পরকাল গেল। হায়! হায়! বাবা কি অন্য পাত্র খুঁজিয়া পান নাই ?"

যে হেতু মাতঙ্গিনী এবম্প্রকারে ঘোররবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, সে হেতু দীনুকে তাহার পদযুগল স্পর্শ করিয়া কাতরস্বরে বলিতে হইল, "ওগো! তুমি কেঁদ না; আমি দরিদ্র, অভাগা, পথের ভিখারী; ইহার উপর অশান্তি ও ক্রন্দন প্রভৃতির যন্ত্রণা সহ্য করিতে আর পারি না, ওগো! থাম।"

মাতঙ্গিনী বলিল; "তবে তুমি অত ঘুমাইও না। বরঞ্চ আমি ঘুমাইলে মাথায় বাতাস করিও।"

৭

সে হেতু দীনু প্রতিদিন মাতঙ্গিনী শুইলে তাহার মাথায় বাতাস করিত, এবং বাতাস করিয়া বিশ্রান্ত হইয়া পড়িত।

তাহারই মধ্যে একদিন মাতঙ্গিনীর ঘোর নিদ্রাবস্থা লক্ষ্য করিয়া দীনু বিমল বাতাস খাইতে খিড়কী পুষ্করিণীর দিকে গেল। তখন দ্বিপ্রহর।

দীনু একটা কামিনীগাছের সুশীতল ছায়া দেখিয়া সেখানে গিয়া বসিয়া পড়িল,

এবং যে হেতু তাহার মনের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল, সে হেতু আকাশ পাতাল ভাবিয়া দীনু কাঁদিতে লাগিল।

দারুণ রৌদ্র, তাহার উপর জ্যৈষ্ঠ মাস। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই সন্তপ্ত। এমন সময় কামিনী বৃক্ষের তলে একটা লোককে কাঁদিতে দেখিয়া পুষ্করিণীর জলে অর্দ্ধমগ্না ও অর্দ্ধনগ্না একটি বালিকা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া লুক্কায়িতভাবে বৃক্ষের দিকে গেল।

কিন্তু বিধির লিখন! দীনু তাহা দেখিতে পাইল, এবং বালিকাও তাহা বুঝিল।

দীনু ডাকিল, "কে ও, সরলা!"

সরলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিল, "আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন?"

দীনু বলিল, "যে হেতু আমি অভাগা।" সে হেতু কি ভাবিয়া সরলাও কাঁদিল।

অনেক দিনের কথা—দীনুর মাতা বলিয়াছিল, "বাবা, আমাদের যদি অবস্থা ভাল হয়, তবে তোর সঙ্গে সরলার বিবাহ দিব।"

সরলা মিত্রদিগের কন্যা। লাবণ্যভরা—সুন্দরী, স্নেহের আধার। তিন বৎসর পূর্ব্বে শিবহাটীর হাটে মাছ কিনিতে গিয়া সরলা বর্ষাকালে কর্দ্দমে আছাড় খাইয়াছিল, এবং দীনু তাহাকে স্কন্ধে করিয়া খাল পার করিয়া দিয়াছিল। সেই দিন হইতে দীনুর সুন্দর মুখ ও কোমল হৃদয়ের স্মৃতি মধ্যে মধ্যে সরলার মনে জাগিত। সে হেতু বোধ হয় দীনুরও জাগিত।

দীনু বলিল, "সরলা! মাতঙ্গিনী আমাকে ধরিয়া মারে।"

সরলা বলিল, "তুমি পালাইয়া যাও না কেন?"

দীনু। কোথায় যাব?

সরলা ভাবিল, "তাই ত!"

সরলার কচিমুখ ম্লান হইয়া গেল। দীনু সে হেতু চক্ষের জল মুছিল। অর্থাৎ—জগতে কেহ ভালবাসিলে তাহারও কাঁদিতে ইচ্ছা করে না।—

৮

সরলা দুই তিনবার অনিমেষনয়নে দীনুর মুখ পানে চাহিয়া চলিয়া গেল।

তাহা ঊর্দ্ধ হইতে মাতঙ্গিনী দেখিয়াছিল। যে হেতু মাতঙ্গিনী নিদ্রাভঙ্গের পর বিস্ফারিতনয়নে ত্রিতল ছাতে আরোহণপূর্ব্বক দীনুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

মাতঙ্গিনী কম্পিতা হইয়া পড়িল। যে হেতু দৃশ্যটা কিছু অভাবনীয়, স্বপ্নের এবং চিন্তার অগোচর।

দীনু ফিরিয়া আসিলে মাতঙ্গিনী বলিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

দীনু। ঘাটের ধারে।

মাতঙ্গিনী। কেন ?

দীনু।—ঘুম পাইয়াছিল, সে হেতু রৌদ্রে বেড়াইতেছিলাম।

মাতঙ্গিনী। আর কে ছিল ?

দীনু। কৈ, তা আমি দেখি নাই।

এই অভূতপূর্ব্ব মিথ্যা কথার মাতঙ্গিনীর আর সন্দেহ রহিল না। মাতঙ্গিনী ঘোর রবে বলিয়া উঠিল, "তোমার এই কাজ ? ওঃ বিশ্বাস ঘাতক !—"

এবং মূর্চ্ছাসংবরণ করিয়া মাতঙ্গিনী ডাকিল, "নিত্যানন্দ ! এস ত !"

পরম বৈষ্ণব গোমস্তা নিত্যানন্দ মালা হাতে করিয়া আসিল। যে হেতু বিপৎকালে জপ করাই উত্তম কল্প।

মাতঙ্গিনী বলিল, "উহাকে দড়ি দিয়া বাঁধ।"

দীনু সে হেতু একটু অপমানিত বিবেচনা করিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "কেন, আমার দোষ কি ?"

"দোষ কি ?" বলিয়াই মাতঙ্গিনী একটা প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল, এবং সেই মুষ্ট্যাঘাত নিবারণ করিতে গিয়া নিত্যানন্দ দীনুর উপর পড়িয়া গেল, এবং পুনর্ব্বার উঠিয়া মাতঙ্গিনীর আজ্ঞাক্রমে দীনুর হাত পা বাঁধিল, এবং রামসিংহ দরওয়ানের সাহায্যে সকলে তাহাকে ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে শিমুল বৃক্ষের গোড়ায় বাঁধিল।

মাতঙ্গিনী বলিল, "সকলে দেখুক, পরনারীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে স্বামীর কি শাস্তি হইয়া থাকে।—"

দীনু কাতরস্বরে বলিল, "ওগো ! আমি দৃষ্টিপাত করি নাই, আমি অশ্রুপাত করিতেছিলাম, তাহা দেখিয়া সরলা কাঁদিয়াছিল।"

মাতঙ্গিনী বলিল "আচ্ছা, সরলা আবার কাঁদুক, এবং তুমি আবার কাঁদ। দেখি কে কত কাঁদিতে পার !"

এইরূপে শিবহাটীর ষোল আনা জমীদারীর মালিক শিমুল বৃক্ষের তলায় বন্ধনদশায় পড়িয়া রহিলেন।

৯

কেন যে এই দশা ঘটিল, তাহা সকলের জানা সম্ভবপর নহে। রামসিংহ বলিল, "উঁহার মেষ রাশি, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে মেষের বন্ধন-ভয়, এইরূপ পঞ্জিকায় প্রকাশ, সেই হেতু।"

পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ বলিল, "ওঃ শাস্ত্র কি সত্য! এবং পঞ্জিকায় ইহাও প্রকাশ যে, আষাঢ় মাসে মেঘের স্ত্রীলাভ, সে হেতু কি বিবেচনা করহ?"

ঘোরা রজনী। মাতঙ্গিনী পরিশ্রান্ত হইয়া সুষুপ্তা, এবং দ্বারবান রামসিংহ পুষ্করিণীর পাড়ে প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত।

দীনু বলিল, "রামসিং! একটু চা খাওয়াইতে পার?" যে হেতু দীনুর তৃষ্ণা পাইয়াছিল।

রামসিংহ বিশ টাকায় রক্ষা করিয়া দীনুর জন্য চা আনিতে গেল। উদ্যান পার হইতে না হইতে একটি বালিকা আসিয়া রামসিংহের পদযুগল জড়াইয়া ধরিল।

সরলা বলিল, "রামসিং! দীনুকে ছাড়িয়া দে, আমি তোর জন্য এই সোনার মালা এনেছি।"

রামসিংহ বহু চিন্তাপূর্ব্বক কহিল, "আচ্ছা, কিন্তু বাবুকে গ্রাম হইতে পলায়ন করিতে হইবে।"

সরলা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "বেশ।"

রামসিংহ চা আনিতে গেল, এবং সোনার মালা পাগড়ীর মধ্যে রক্ষা করিল; যে হেতু তাহার কোর্ত্তায় পকেট ছিল না।

ইত্যবসরে সরলা ধীরে ধীরে দীনুর নিকট গিয়া তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল, এবং একবার কম্পিতস্বরে বলিল, "পলাও।"

দীনু বলিল, "আমি এখনও চা খাই নাই।"

সরলা। আমাদের বাড়ীতে চা আছে, সেখানে খাবে চল।

দীনু সরলাদের বাড়ী গেল। সরলা তাহার অগ্রজ সুধীর মিত্রের পোর্টম্যাণ্টো হইতে চা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি জল গরম করিল, এবং রন্ধনশালা হইতে চিনি আনিয়া একবার হতাশভাবে বলিল, "দুধ নাই।" যে হেতু অত রাত্রিতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না।

১০

দীনু বলিল, "দুগ্ধের আবশ্যক নাই।" অতঃপর দীনুর চা খাইয়া মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। প্রায় দুই মাস ধরিয়া দীনু চা খায় নাই।

দীনু বলিল, "সরলা, তুমি আজ আমাকে স্বাধীনতা দিয়াছ। আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু মনে রেখো—আমি সংসার হইতে চলিলাম—যেখানেই যাই, তোমার স্নেহ সহৃদয়তা অনুক্ষণ ধ্যান করিব।"

ইহার পর সেই রাত্রিকালে নব্য উকীল সুধীর মিত্রজা মহাশয়ের সহিত

দীনুর কি পরামর্শ হইল, এবং পরদিন প্রভাতে শিবহাটীর ষোল আনা মালিক নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িলেন।

রামসিংহ চীৎকার করিয়া সকলকে বলিল, "কি প্রতাপ! বাবু দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছেন, এবং গ্রামশুদ্ধ লোক কি হারামজাদা! কেহ আমার আর্ত্তনাদ শুনিল না?"

সকলে বলিল, "বাকি খাজনার দায়ে লোকটা ঘরজামাতা হইয়াছিল, এখন যথাসর্ব্বস্ব সুবর্ণ ও জহরাৎ লইয়া পলায়ন করিয়াছে।"

কেবল ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক বলিল, "না।"

যে হেতু সে সকল কথা জানিত।

১১

পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ মাতঙ্গিনীর সহিত বৃন্দাবনে গেল, এবং যথাক্রমে উভয়ে তাবৎ বৃত্তান্ত বসুজা মহাশয়কে জানাইল।

বসুজা মহাশয় মালা জপিতে জপিতে বলিলেন, "ব্যাটা কি হারামজাদা! উহার পেটে এত বুদ্ধি ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।"

নিত্যানন্দ! সে হেতুই এই ঘটনা।

বসুজা মহাশয় সরোষে উইল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "কুছ্ পরওয়া নাহি, উহার নামে বাকি খাজনার নালীশ করহ, এখনও তামাদি হয় নাই।"

বসুজা মহাশয় তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, এবং সে হেতু মাতঙ্গিনীও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিল; এবং বাকি খাজনার নালিশও হইল।

কিন্তু এ দিকে সুধীরচন্দ্র মিত্র অন্যায় উৎপাতের বর্ণনা করিয়া দীনুর তরফে বসুজা মহাশয়ের নামে নালিশ ঠুকিয়া দিল।

উভয় পক্ষের সমান অবস্থা, সে হেতু সকলে পরস্পর রফা করিতে বাধ্য হইলেন।

রফার সর্ত্ত এই,—দীনু মাতঙ্গিনীকে বৈষ্ণবধর্ম্মানুসারে খালাস দিবে, এবং মাতঙ্গিনী ইচ্ছানুসারে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিবে।

অতএব আষাঢ় মাসে দীনু বৈষ্ণব হইল, এবং খালাস পাইয়া কলিকাতায় গেল। সেখানে কোন সাহেব দীনুর ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বলিল, "যে হেতু তুমি নিরেট মূর্খ, অথচ সৎ, সে হেতু তোমাকে আমার হাউসের মুৎসুদ্দি করিয়া দিলাম।"

সহিত উহার বিনিময় হইত। লিবান্ত সাগরোপকূলে প্রাচীন টায়র, সিদন প্রভৃতি, এবং পরবর্ত্তী যুগের একর, আস্কালন প্রভৃতি নগরবাসী বণিক্ জাতি পৃথিবীর যে উপকারসাধন করিয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও, পৃথিবীর সভ্যসমাজ চিরকাল উহার স্মৃতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত হৃদয়ে বহন করিবে।

তিনটি বিভিন্ন পথে সে কালে ভারতের পণ্যদ্রব্য বাহিত হইত। প্রথম বা মধ্যবর্ত্তী পথ পারস্য হইয়া প্রাচীন কাল্ডিয়া ও পরবর্ত্তী বাবিলোনিয়ার মধ্য দিয়া সমুদ্রতীরে টায়র টায়র পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। দ্বিতীয় পথে উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন বাহ্লীক প্রদেশ হইয়া, পথে চীনদেশাগত দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া, পণ্যবাহী দল কাস্পীয় হ্রদের দক্ষিণ তীর বাহিয়া চলিত। তৃতীয় জলপথে পারস্য বা লোহিত-সাগর-মুখের বন্দর পর্য্যন্ত গিয়া, এক পথে পশ্চিমে মিশর ও অন্য পথে সিরীয়ার দিকে যাইত। এই তিনটি প্রধান বাণিজ্যপথের অধিকার লইয়াই প্রাচীন কালের সভ্য জাতিগণের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ঘটিয়াছে, এবং ইহার কর্ত্তৃত্বই পাশ্চাত্য জনগণের সুখসম্পদ-বৃদ্ধির প্রধান সহায় হইয়াছে। যে রাজবংশ যখন এই বাণিজ্য-পথের সহিত ভারতের ধন রত্নের অংশভাগী হইতে পারিয়াছিল, তাহারাই তদানীন্তন পাশ্চাত্যজগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রাচীন কাল্ডিয়া ও মিশরের প্রতাপ খর্ব্ব হইলে, যুদা টায়র প্রভৃতি খণ্ডরাজ্যের অধিপতিগণ কিয়ৎকাল এই বাণিজ্যের ফলভোগ করিয়াছিলেন। পালমিরার মরু প্রদেশের মধ্যে তড়মুর নগর নির্ম্মাণ করিয়া যশোধন সলোমন মধ্যবর্ত্তী বাণিজ্যপথের অধিকারী হইলেন। পশ্চিম প্রান্তে দামস্কস প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দাউদের দ্বারাই অধিকৃত হইয়াছিল। টায়র-রাজ মহাপ্রবলের সহিত দ্বন্দ্ব না করিয়া সাম-দানের ব্যবস্থা করিলেন; এমন কি, সলোমনের অর্ণবযান-নির্ম্মাণের নিমিত্ত সূত্রধরাদিরও সহযোগ করিয়া দিলেন। সমসাময়িক মিশররাজকেও অগত্যা ঐ পথে বাহিত গন্ধদ্রব্যের গুঁড়া পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। লোহিত সমুদ্রের পূর্ব্বোপকূলে বন্দর ও বাণিজ্যপোতের সৃষ্টি হইল। কিন্তু সলোমনের সঙ্গে সঙ্গেই দুই পুরুষের এই সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভারতবাণিজ্যের প্রধান পথ তৎপরে যুদা রাজ্যের হস্তচ্যুত হইল বটে, কিন্তু গন্ধদ্রব্যের তীব্র স্মৃতি শীঘ্র বিলুপ্ত হয় নাই। মণিমাণিক্যের উজ্জ্বল কিরণে ঝলসিত দৃষ্টি নিমীলিত হইয়াও অতীত সুখ বিস্মৃত হইতে পারিল না। পূর্ব্বার্দ্ধ—বাইবেলের নানা স্থানে নানা ভাবে এই কথার উল্লেখ বা গৌণভাবে অস্পষ্ট নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়।

মধ্যযুগে বাবিলন ও পারস্য রাজগণ, শেষে মাসিডন্ ও সুদূর পশ্চিমের রোম সাম্রাজ্য, উল্লিখিত মধ্যবর্ত্তী বাণিজ্য-পথের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে ভূমধ্যসাগরের উপকূল রক্তাক্ত করিয়াছেন;—ওবলের অত্যাচারে প্রাচীন খণ্ডরাজ্যগুলি গিয়াছে। কিন্তু অধিকারীর পক্ষেও এ পথ চিরসুখের হয় নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান বাবিলন পঞ্চমে পারসীকের পদানত হইয়াছে। পারস্যরাজগণ ক্রমে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিলে, শেষে পাশ্চাত্য বাণিজ্যাধিকারী এথেনীয়গণের সহিত সংঘর্ষে, সুপ্রসিদ্ধ সালামিস্ ও মারাথনের যুদ্ধব্যাপার ঘটিয়াছিল। ফিনিশীয়দিগের স্থাপিত নৌসাধনোন্নত কার্থেজের সহিত পরবর্ত্তী কালে রোমকগণের সংঘর্ষ হইয়াছে; শেষে পম্পীর সময়ে এসিয়ার এই উপকূল প্রদেশ রোমের হস্তগত হইয়া তাহাদের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে।

মাসিডনের অধীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধযাত্রার পর হইতেই ভারতের বিষয়ে ইউরোপীয়গণের সাক্ষাৎসম্বন্ধে দৃষ্টি পড়ে। সিলিউকস্ ও টলেমীর দূতগণের বর্ণিত বিবরণে পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের সেকালের অবস্থা ইউরোপখণ্ডে বহুলপরিমাণে পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লিখিত এক গ্রীক্ গ্রন্থে (২) দৃষ্ট হয়, গুজরাট, মালাবার উপকূলের কয়েকটি বন্দর, করমণ্ডল, মছলী-পত্তন ও বঙ্গোপসাগরের মুখে প্রাচীন প্রসিদ্ধ গাঙ্গ্য বন্দরের সহিত মিশরের গ্রীক নাবিকগণের পরিচয় ছিল। প্রায় সমকালবর্ত্তী টলেমীর গ্রন্থে নির্দ্দেশ আছে যে, ভারতের উপকূলভাগের তদানীন্তন সমস্ত প্রধান বন্দরে ও বঙ্গোপসাগরের উভয় কূলের বন্দরসমূহে, এমন কি, দক্ষিণ-পূর্ব্বোপকূলের কয়েকটি বন্দরেও, যে কালের মিশরবাসী ও পাশ্চাত্য বণিকদিগের গতিবিধি ছিল। টলেমী পূর্ব্ব-দক্ষিণের যে স্থানকে সিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কোচিন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। যাহা হউক, এ কালে ভারতের সর্ব্বপ্রকার মূল্যবান বস্তু যে ইউরোপে নীত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ যুগে উপকূল বহিয়া অর্ণবপোত সকল পারস্য ও লোহিত সাগরের মুখের বন্দরে পণ্যদ্রব্য পৌঁছাইয়া দিত; তৎপরে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথে মধ্যসাগরের বন্দরে যাইত তথা হইতে ইউরোপীয় বণিকের সাহায্যে ঐ পণ্যজাত নানা স্থানে বিক্রীত হইত;—মিশরের মধ্য দিয়া আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছিত।

(২) Periplus of the Erythrean sea (Mc. Rindle)=ভারতসাগর-পরিদর্শন।

রোম সাম্রাজ্যের উন্নতির দশায় বাণিজ্যের প্রধান পথ সকল রোমীয়গণের করতলগত হয়। উত্তর আরবের মরুদেশমধ্যে পাল্‌মিরা সেকালে সমৃদ্ধিগৌরবে বিখ্যাত হইয়াছিল। তথাকার রাজা রোমের মিত্ররাজগণের মধ্যে পরিগণিত হন। দামস্কসের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত বসোরা নগর ট্রেজান নরপতির সময়ে রোমের নবাধিকৃত আরব্য প্রদেশের রাজধানী হইয়াছিল। সেকালে ঐ নগর পিত্রিয়া, হেজাজ্ প্রভৃতি দেশসমূহের "সমৃদ্ধ বিপণি" বলিয়া অভিহিত হয়। অদ্যাপি রাব্বা নগরীতে অদ্যাপি রোমীয় নাট্যপ্রাঙ্গণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাণিজ্যই রোমকগণের উদ্দেশ্য না হইলেও, তাহাদের অধিকারবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য খণ্ডে ভারতের দ্রব্যজাত সমধিক পরিচয়লাভের সুবিধা পাইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত লোহিতসাগরোপকূলের জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর গ্রন্থে (১) সেকালের মিশর ও ভারতের বাণিজ্যবৃত্তান্ত সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে বল্যাণের পিত্তল ধাতুপাত্র, কাষ্ঠ ও তুলা, সিন্ধুদেশজাত কস্তুরী ও গন্ধদ্রব্য, তাম্রপর্ণীর (সিংহল) সমীপবর্ত্তী দেশ হইতে রোম, অগুরু, চন্দনকাষ্ঠ, লবঙ্গ, জয়িত্রী প্রভৃতি আহরণের উল্লেখ আছে।

পরবর্ত্তী কালে সারাসেন আরবগণ নবোদ্দীপ্ত উদ্যমে ভারতীয় বাণিজ্যের মধ্যপথ ও ক্রমশঃ সমুদ্রপথও অধিকার করিয়া বসিল। সপ্তম শতাব্দীতে খলিফাগণের প্রভাবে বোগ্দাদ বসোরা প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থান ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের প্রধান আড়া হইয়াছিল। একাধিকসহস্ররজনীর উপন্যাসে সিন্ধবাদ নাবিকের কাহিনী নবম শতাব্দীর কথা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সিন্ধবাদ প্রথম যাত্রায় এক সমরাজার দেশে উত্তীর্ণ হয়; সে রাজার রাজ্য ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ইনি প্রাচীন বিজয়নগরাধিপ নরসিংহ বলিয়া অনুমিত হন। দ্বিতীয় যাত্রায় সিন্ধবাদ "রিহা" রাজ্যে উপনীত হয়; কেহ কেহ ইহা মান্নার উপকূলের স্থানবিশেষ বলিয়া মনে করেন। এখানে কর্পূর প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থবারে সে মালবার দেশে আইসে; সেখানে বন্যভূমিতে গোলমরিচ সংগ্রহের কথা নির্দ্দিষ্ট আছে। সিন্ধবাদ সিংহলের উপকূলেও গিয়াছিল; এখানে চন্দনের উল্লেখ আছে। সিন্ধবাদের পরবর্ত্তী জলযাত্রাগুলিতে কোথাও মান্নার উপসাগরে শুক্তিসংগ্রহের কথা, কোথাও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে অগুরু চন্দন প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে পারিস্ নগরীতে প্রকাশিত আবিরেণটের গ্রন্থে দুই জন প্রাচীন আরব ভ্রমণকারীর বিবরণ আছে;—তাঁহারা

(১) Cosmos Indicoplenstes.

নবম ও দশম শতাব্দীতে ভারত ও চীন পর্য্যটন করেন। ইহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে চাউল, মদ্য, চীনামাটীর বাসন ও সর্ব্বপ্রথমে চার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে সোলেমান্ বসোরাবাসী বণিক, ৮৫১ খৃষ্টাব্দের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার বিবরণীতে, চীন হইতে ভারতসাগরীয় দ্বীপাবলি পর্য্যন্ত পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্রপথের অপেক্ষাকৃত নির্ভুল নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি পারস্য উপসাগরের কূলস্থিত সিরাফ নগরবাসী আবু সৈয়দ; ইনি দশম শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার সময় চীনদেশে বিদ্রোহবশতঃ আরবগণের চীনবাণিজ্য বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অষ্টম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত আরও দুই এক জন পর্য্যটকের বিবরণ পাওয়া যায়। এ সকলে গন্ধদ্রব্য, সুপারি, মশলা, কর্পূর, চন্দন, অগুরুকাষ্ঠ ব্যতীত চীনামাটী, ইক্ষু, মৃগনাভি ও রেশমেরও উল্লেখ আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হস্তলিখিত একখানি আরবী পুস্তিকায় দশম শতাব্দীতে কনষ্টাণ্টিনোপলের রোমীয় সম্রাটের নিকট হইতে বোগ্দাদের খলিফার নিকট দূত-প্রেরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। খলিফার আড়ম্বরের বর্ণনা সলোমনের সভাবর্ণনার অনুরূপ। হিব্রুরাজের সভার মত এখানেও ভারতীয় মূল্যবান দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, ভারতজ মণিমাণিক্যে রাজসদন সমুজ্জ্বল।

একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজয়দৃপ্ত আরব মুসলমান দলের প্রবল প্রতাপে পারস্য হইতে ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী উপকূলভাগ বিধ্বস্ত হইলে, প্রধান স্থলপথে ইউরোপের দিকে পণ্যদ্রব্যের গতিবিধি বন্ধ হইয়া গেল। এই কালেই ভিনিস ও জেনোয়ার বণিক-সম্প্রদায় তৃতীয় পথে পণ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যবসায় আরম্ভ করে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কৃষ্ণ-সাগর-বাহিত এই বাণিজ্যব্যাপারে তাহাদের ধনবৃদ্ধি হইয়াছিল। সীরিয়া প্রদেশের অধিকার লইয়া তিন শত বর্ষ ধরিয়া মুসলমানের সহিত খৃষ্টীয়গণের যে আবিরাম ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তৎকালে ঐ বণিকদলের অনেকে যোদ্ধৃবর্গের আহার-সংস্থানের সহায়তা করিয়া ধর্ম্মোন্মত্ত রাজকুলের কার্য্যের সহিত আপনাদের বাণিজ্যাধিকারপ্রসারের যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণপ্রদর্শনে বিরত হয় নাই। সময়ে সময়ে খৃষ্টীয়দল প্রবল হইলে লোহিতসাগরের বাণিজ্যপথ মুক্ত থাকিত। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে যৎকালে খৃষ্টানগণ মুসলমানকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া একবার কনষ্টাণ্টিনোপল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তখন পুনরায় ভারতের বাণিজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া, ইটালীয় বণিকগণের বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে

স্রোত ফিরিল। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেলজুক্ তুর্কীসম্প্রদায় পারস্য জয় করিল। ত্রয়োদশের প্রথমে জঙ্গীস্ খাঁর প্রচণ্ড চমূ সর্ব্বনাশী বাত্যাবিপ্লবের মত পশ্চিম এসিয়ায় উৎপতিত হইল। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এক দিকে বোগদাদের সারাসেন্ খলিফাগণের অবশিষ্ট অধিকার বিধ্বস্ত হইল; অন্য দিকে জঙ্গীস্ খাঁর মোগল পঙ্গপালদল তাঁহার নেতৃত্বে ইউরোপখণ্ডে পোলাণ্ড পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ছাইয়া ফেলিল। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে তৈমুর মুষ্টিমেয় খৃষ্টান নাইট্-দলকে এসিয়াখণ্ড হইতে উৎখাত করিলেন। একালে তাতার-দলের তাণ্ডব নৃত্যে দিগন্ত ধ্বনিত হইল; শান্তির সহচরী বাণিজ্যের আশা লোপ পাইল। পারস্যসাগর হইতে মধ্যসাগর পর্য্যন্ত বাণিজ্যের মধ্যপথ প্রথমেই আবদ্ধ হইয়াছিল; শেষে মোগলের হস্তে উত্তরের পথেও গোল বাধিল।

গ্রীক্ ও রোমক বণিকদল সমুদ্রপথে মিশর অথবা মধ্যসাগরোপকূলের বন্দর-সমূহে ব্যবসায় চালাইয়া যেমন প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতেছিল, পশ্চিমোত্তর পথ দিয়া কৃষ্ণসাগরের ব্যবসায়েও এককালে ইউরোপীয় বণিক্ সেইরূপ লাভবান হইত। তুর্কী তাতার দলের প্রাবল্যে স্থলপথ আবদ্ধ হইল। কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে বিতাড়িত হইয়া ভিনিসীয় বণিকদল অলেকজাণ্ড্রিয়ায় প্রধান আড্ডা করিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে তুর্কী সাম্রাজ্যের অর্ণবপোত সকল মধ্যসাগরের পূর্ব্বভাগ আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। ভিনিসবাসী বণিকদল ইতিপূর্ব্বে জেনোয়ার অধঃপতন সাধন করাইয়া স্বার্থসাধন করিয়াছিল; এক্ষণে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান সাম্রাজ্যের নিকট নতশিরে সন্ধি প্রার্থনা করিয়া, অন্ততঃ মিশর হইতে বাণিজ্যতরণীগুলি যাহাতে অবাধে দেশে আসিতে পারে, কিয়ৎকাল তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ ভাবে আর কতকাল চলিতে পারে? লাভের পন্থা কে কবে ক্ষমতা থাকিলে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে? ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে শতাধিক যুদ্ধজাহাজ ও দ্বিগুণসংখ্যক সহযাত্রী তরণী সংগ্রহ করিয়া তুর্কী দল ভিনিসের হস্ত হইতে নিগ্রোপন্থ কাড়িয়া লইল; দশ বর্ষের মধ্যে ইটালীর সমগ্র উপকূলভাগ বিধ্বস্ত করিয়া ইউরোপীয় বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিল। ক্রমশঃ সকল পথ রুদ্ধ হইলে, বণিকসমাজে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইল। এই সময় হইতেই অন্য কোনও দিক দিয়া ভারত-যাত্রার উপায়-চিন্তার প্রয়োজন হইল। বাণিজ্য-পথ অবরোধের কথায় অবশ্য কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, একালে ভারতের আর কোনও পণ্যদ্রব্যই ইউরোপখণ্ডে নীত হইত না। নানা স্থান দিয়া নানা উপায়ে ভিনিস্ ও অন্য স্থানের ইউরোপীয় বণিক ব্যবসায়ের যথাসাধ্য আয়োজন

করিয়া যথাসম্ভব লাভবান হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন জর্ম্মনীর হান্‌সা সমিতির বণিকগণও কতকাল ধরিয়া এ বাণিজ্যের অংশগ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বাণিজ্য-পথ অবরুদ্ধ হইলে লাভের ভাগ ক্রমেই অল্প হইয়া আসিল। এই লাভের পুনরুদ্ধারকামনাই পরবর্ত্তী ইউরোপীয়গণকে উৎসাহিত করিয়াছিল; ইহারই প্রেরণায় জেনোয়াবাসী প্রথিতনামা কলম্বস্ ভারতের পথানুসন্ধানফলে আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের আবিষ্কার করিলেন! ভারতের বাণিজ্য-পথ আবিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় সমাজে পরবর্ত্তিকালে যে উদ্যম দেখা দিয়াছিল, যে ভাবে পর্ত্তুগীজগণ ভারতের পথ-নিরূপণ করিয়া দিয়া ইতিহাসে নবযুগের আবির্ভাব ঘটাইল, তাহা সময়ান্তরে বর্ণন করিবার অভিলাষ রহিল। (১)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যৈষ্ঠের পল্লী।

আলমপুর ক্ষুদ্র পল্লী। একদিন জ্যৈষ্ঠের প্রভাতে কোনও বন্ধুর সঙ্গে এই পল্লীগ্রামে পদার্পণ করিলাম। তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বাকাশ তখন প্রভাত-অরুণের লোহিত কিরণস্পর্শে কেবল অরুণাভ হইয়াছে। সংকীর্ণ গ্রাম্য পথ বিসর্পিতগতিতে চলিয়া গিয়াছে। উচ্চ পথের দুই ধারে ধান্যক্ষেত্র; ক্ষেত্রের পার্শ্বে উচ্চ আইল; আইলের পদতলে নয়ঞ্জুলি (নালা); নয়ঞ্জুলি সবুজ তৃণদলে সমাচ্ছন্ন। বানগাছগুলি সমীরণে হিল্লোলিত হইতেছে; পথের ধারে বাবলাগাছের ডালে বসিয়া কতকগুলি ক্যাঁচকেঁচে পাখী কোলাহল করিতেছে; একটি কালো ষাঁড় ধান্যক্ষেত্রে নামিয়া একাগ্রচিত্তে পরস্বাপহরণ করিতেছে। খানদুই ছৈ-যুক্ত

---

(১) মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া সংক্ষেপে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইল। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

McCrindle's Ancient India Series.

Ancient Commerce of India. by G. Oppert. Ph. D.

commerce & Navigation of the Ancients &c. by Dean Vincent.

Journal of the Royal Asiatic Society.

Haklyut Society's publications.

Birdwood & Foster's Old Records &c.

Sir W. Hunter's latest work on British India.

গরুর গাড়ী 'ক্যাঁ কোঁ' শব্দ করিতে করিতে ভিন্ন গ্রামের দিক হইতে আসিতেছে। ঝোড়া কক্ষে লইয়া কয়েক জন মেছুনী দূরবর্ত্তী বিলে মাছ আনিতে যাইতেছে। অদূরবর্ত্তী আমবাগান নিস্তব্ধ; অন্ধকার তখনও সেখানে স্থানে স্থানে জমিয়া আছে। একটি শৃগাল একটা ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া ঊর্দ্ধমুখে হুয়া হুয়া করিয়া ডাকিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে বনান্তরালে পাঁচটি, সাতটি, ক্রমে দশ পনেরটি শৃগাল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'ক্যাহুয়া' 'ক্যাহুয়া'। এক স্থানে ভাগাড়ে কতকগুলা গোহাড় পড়িয়াছিল, দুই তিনটি গ্রাম্য কুক্কুর তাহা চর্ব্বণ করিতে করিতে যেমন শৃগালগুলির সমকণ্ঠের রাগিণী শুনিতে পাইল, অমনই তাহারা অস্থিচর্ব্বণ পরিত্যাগ করিয়া 'ভেউ—ভেউ' শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল।

গ্রামের মধ্যে আমাদের 'পুষ্পকরথ' অর্থাৎ গোশকট প্রবেশ করিতেই চমৎকার সৌরভে নাসিকা পূর্ণ হইল; দেখিলাম, একটি সুবৃহৎ বকুলগাছের তলদেশ দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতেছে; প্রস্ফুটিত বকুলফুলগুলি নীরবে বৃক্ষমূলে ঝরিয়া পড়িতেছে। দুটি কৃষক-কুমারী মলিন বস্ত্রের অঞ্চল মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে ফুল কুড়াইয়া এক স্থানে স্তূপাকার করিতেছে; তাহাদের তৈলবর্জ্জিত বিবর্ণ কেশে দুই চারিটি শাখাভ্রষ্ট বকুল ফুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। একটি চাষার ছেলে বকুল গাছের তলায় একটা আমকাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া বনজাত লতা দিয়া বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছে; তাহারও হৃদয়ে কোনও রকম কবিত্ব অঙ্কুরিত হইয়াছিল কি না, কে বলিবে?

গ্রামের ভিতরের পথও জঙ্গলময়—পথের দুইধারে আশ্‌শ্যাওড়ার বন, কোথাও শ্যাকুলের কাঁটা, কোথাও বেতবন। নিবিড় বেতবনের মধ্যে বসিয়া শ্যামা শিষ্ দিতেছে। থোকা থোকা সাদা বেতের ফল সতেজ সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাইতেছে।

বাঁশের বন পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; তাহাদের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া প্রাতঃ-সূর্য্যরশ্মি ধূলিরাশি চুম্বন করিতেছে,—স্বর্গের কিরণ ধরণীর ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যেন মলিন হইয়া গিয়াছে। বাঁশবনের পাশে কয়েকটি খেজুরগাছ—তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রের শুষ্ক আঘাতচিহ্ন, কিন্তু স্কন্ধদেশ কাঁদি কাঁদি পীতবর্ণ ফলে সুশোভিত; চাষার ছেলেরা কটিদেশে কাস্তে আঁটিয়া খর্জ্জুরগুচ্ছ-আহরণের সংকল্পে গাছে উঠিতেছে।

পথের দুই পার্শ্বে গৃহস্থের বাড়ী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণ্ময় গৃহ, খড়ের চাল। অধিকাংশ

ঘরের 'মটকা'র উপর শ্রেণীবদ্ধ জলপূর্ণ কলস;—গৃহস্থেরা অগ্নিভয়নিবারণের অভিপ্রায়ে এই সকল কলসী স্থাপন করিয়াছে; দৈবাৎ চালে আগুন লাগিলেই ঢিল ছুঁড়িয়া কলসী ভাঙ্গিয়া দেয়; সমস্ত জল চালের উপর গড়াইয়া চাল—সিক্ত করে, অগ্নিকে প্রবল হইতে দেয় না। কোন কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গনে দুই একটি গোলা, গোলার মুখ বন্ধ, চালের উপরটা চূড়াকার, সেই চূড়া এক একটি মৃণ্ময় গামলা দিয়া ঢাকা। পথের উপর স্থানে স্থানে দুই তিনখানি গরুর গাড়ী প্রসারিতবক্ষে পড়িয়া আছে। চাষী গৃহস্থবাড়ীর খোলা আঙ্গিনায় দুই তিনটা বলদ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তৃণচর্ব্বণে 'উপবাসভঙ্গ' করিতেছে। গৃহস্থবধূরা কেহ কেহ কলসপূর্ণ গোময়মিশ্রিত জল লইয়া প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া দিতেছে; কেহ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রাঙ্গনে সম্মার্জ্জনী চালন করিতেছে। রাখালের দল এক এক পাল গরু লইয়া গোচারণের মাঠে চলিয়াছে। কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রে 'বিদা' দিতে যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে দুটি বলদ বা দুটি মহিষ,—স্কন্ধে 'বিদা'; ধানের জমীর ঘাস উন্মূলিত করিবার জন্য এ সময় ধান্যক্ষেত্রে বিদা দিবার আবশ্যক হয়।

গ্রামের মধ্যে সংকীর্ণ বনপথ এক পল্লী হইতে অন্য পল্লী পর্য্যন্ত প্রসারিত; পল্লী অতিক্রম করিয়া কোনও পথ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কোনও পথ গ্রামপ্রান্তস্থ বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। পথগুলি ছায়াচ্ছন্ন; কোথাও তেঁতুলগাছ, কোথাও জামগাছ, অশ্বত্থগাছ, আমগাছ ও কাঁঠালগাছ। তেঁতুলগাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্রবর্ণ অসংখ্য ফুল, অসংখ্য অতি ক্ষুদ্রাকার প্রজাপতি সেই সকল ফুলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিতেছে, উড়িতেছে, উড়িতে উড়িতে এক দিক হইতে অন্য দিকে যাইতেছে। জামগাছে থোকা থোকা কালো জাম ফলিয়া আছে। এক একটি জামগাছে দুই তিনটি পল্লীবালক,—তাহারা কাঁধে একখানি গামছায় থলি ঝুলাইয়া এক ডাল হইতে অন্য ডালে আরোহণ করিতেছে, থলি পূর্ণ করিয়া জাম পাড়িতেছে।—গাছের নীচে দুই তিনটি পল্লী-বালিকা,—পরিধানে মলিন বস্ত্র, কেশ রুক্ষ, কাহারও হাতে দুটি কালো কাচের চুড়ি, কাহারও হাতে অন্বিতপ্রায় রৌপ্যবলয়,—তাহারা করুণকণ্ঠে বৃক্ষারোহী বালকগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে; কেহ বলিতেছে, "ও হারুদাদা, একটা জাম দে!" কেহ বলিতেছে, "বলা কাকা, আমি দুটো জাম নেব।" হারাধন বা বলরাম, দেখিলাম, অত্যন্ত দাতা! কেহ একটি সুপক্ক জাম খাইয়া তাহার আঁটিটা বালিকার মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছে, "এই নে!" কেহ এক থোকা কাঁচা জাম নীচে ফেলিয়া দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

একটা রাস্তার ধারে গোটাকত কাঁঠাল গাছ; গুঁড়িতে বড় বড় কাঁঠাল ফলিয়াছে। দুই পাঁচটা এত বড় যে, দেখিয়া মনে হয়, আধমন হইবে। কাঁঠাল পাকিবার সময় হইয়াছে। এক জন গৃহস্থ গাছে উঠিয়া প্রত্যেক কাঁঠালটির উপর 'টোকা' (অঙ্গুলির আঘাত) দিয়া দেখিতেছে, তাহা পাকিয়াছে কি না। যে কাঁঠালটির 'ঠক্ ঠক্' শব্দ হইতেছে, তাহা পাকে নাই, এবং পাকিতে বিলম্ব আছে বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতেছে; কিন্তু যাহাতে টোকা দিলেই 'ঢপ্ ঢপ্' করিয়া শব্দ হইতেছে, তাহার আর পরিত্রাণ নাই, তৎক্ষণাৎ তাহার বৃন্তে কাস্তের আঘাত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ধপাস্ করিয়া শব্দ! আবার যে কাঁঠালটি অধিক পাকিয়াছে, তাহা পাড়িবার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। বৃক্ষমূল হইতে এক জন একগাছি মোটা দড়ি ঊর্দ্ধে গাছের উপর নিক্ষেপ করিল, বৃক্ষারোহী ব্যক্তি তাহা ধরিয়া তদ্দ্বারা কাঁঠালটা শক্ত করিয়া বাঁধিল, তাহার পর সেই দড়ি পাশের একটা ডালের উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া কাঁঠালটির বোঁটা কাটিয়া তাহা ধীরে ধীরে নীচে নামাইয়া দিতে লাগিল। খুব বেশী পাকা হইলে এ ভাবে কাঁঠাল পাড়াও সুবিধাজনক নহে। রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় নামিতে নামিতে তাহা দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়, এবং 'ভুঁতুড়ি' ছাড়িয়া কোষগুলি মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে।

বেলা অধিক হইলে গ্রামের মধ্যে হাট বসিল। আমরা যখন হাটে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা। গ্রামে শনিবারে ও মঙ্গলবারে হাট বসে। শনিবারের হাটকে 'চারের হাট' ও মঙ্গলবারের হাটকে 'তিনের হাট' বলে। 'তিনের হাট' অপেক্ষা 'চারের হাটে'ই অধিক জিনিসপত্রের আমদানি। আজ চারের হাট; দশটার সময়েই হাট লোকে লোকারণ্য। চারি দিকের দশ পনেরখানি গ্রামের লোক হাট করিতে আসিয়াছে। হাটে নানাবিধ তরিতরকারী, ফলমূল বিক্রীত হইতেছে। ফলের বাজারে আম কাঁঠালেরই প্রাধান্য অধিক। বাগ্দীরা ঝোড়াপূর্ণ করিয়া বিক্রয়ের জন্য বসিয়া গিয়াছে। কোথাও রাশীকৃত কাঁঠাল, কতক পাকা, কতক কাঁচা, কিন্তু পুষ্ট হইয়াছে। পাকা কাঁঠাল অপেক্ষা পরিপুষ্ট কাঁঠালেরই আদর অধিক, কারণ, তাহা দুই চারি দিন ঘরে রাখা চলে। হাটে কতরকম ফল বিক্রীত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই।—কালো জাম, জামরুল, ফলসা, গোলাপজাম, লিচু, পেঁপে, বনকাঁঠাল, তরমুজ, খরমুজ, ফুটি,—আনারস বর্ষার ফল,—কিন্তু এখনই কোনটি দেখা দিয়াছে। এক স্থানে একরাশি ডাব। তালশাঁস-বিক্রেতা কয়েক ঝুড়ি কাটিয়া আনিয়া বিক্রয়ের জন্য বসিয়া আছে; কেহ ক্রয় করিতে আসিলে ছুরির সাহায্যে শাঁস বাহির করিয়া দিতেছে। এক পয়সায় বারখানি

তালশাঁস, পাঁচ ছয় গণ্ডা আম। গরীব দুঃখীরা কোনরূপে দুটি পয়সা সংগ্রহ করি পারিলে আর তাহাদের ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে হয় না; পাঁচ গণ্ডা আম তিন গণ্ডা তালশাঁস উদরগহ্বরে প্রেরণ করিলে দুর্ব্বাসা ঋষির ন্যায় ক্ষুধাতুর ক্ষুধাও প্রশমিত হয়। দেখিলাম, পল্লীজননী তাঁহার অঞ্চল ভরিয়া দরিদ্র সন্তানগণের জন্য ফল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠমাসে পল্লীগ্রামে যত ফল, বৎসরের অন্য কোনও সময় এত ফল পাওয়া যায় না। অনেক পল্লীবাসী এ সময়ে একবেলা ভাত রাঁধে না, এক একটা কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া চারি পাঁচ জনে মিলিয়া তাহাই খাইয়া ক্ষুধানাশ করে। ইহারা বলে, পাকা কাঁঠাল দেশী সালসা।

নদীর ধারেই হাট। দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে ব্যবসায়ীরা নৌকায় গুড়, তামাক, লবণ, নারিকেল প্রভৃতি সামগ্রী হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। ভিখারীরা দলে দলে নৌকার ধারে দাঁড়াইয়া গোপীযন্ত্র ও খঞ্জনী বাজাইয়া মোটাসুরে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে। নদীর অদূরে বটগাছের ছায়ায় বসিয়া গ্রাম্য জোলারা দেশীয় তন্তুজাত মোটা কাপড়, গামছা বিক্রয় করিতেছে। আর একটা সুবিস্তীর্ণ অশ্বত্থগাছের ছায়ায় বসিয়া বেদেরা তালপাতের ছাতা বিক্রয় করিতেছে,—ছোট ছাতার দাম চারি পয়সা, অপেক্ষাকৃত বড় ছাতার দাম ছয় পয়সা; রাখাল কৃষাণে গেঁজে হইতে পয়সা বাহির করিয়া এক একটা ছাতা কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। বেদেদের স্ত্রীলোকেরা গাছের আর এক পাশে বসিয়া কুলা, ঝুড়ি, ফুলের সাজি ডালা প্রস্তুত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিক্রয়ও করিতেছে। গ্রাম্য কুমারেরা রাশি রাশি হাঁড়ি, কলসী, জলের কুঁজো, মাটীর প্রদীপ, দীপগাছা থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছে; সেখানে স্ত্রীলোক ক্রেতার সংখ্যাই অধিক।

হাটের মধ্যে দুই চারিখানি সন্দেশ মুড়কির দোকান। এক পাশে শুঁড়ির দোকান; সেই দোকানের সম্মুখে একখানি চাটাইয়ের উপর বসিয়া কয়েক নীচজাতীয় পুরুষ মদ খাইতেছে, মাতলামী করিতেছে, এক একবার রাসভ-নিন্দিত স্বরে একটা শ্যামাবিষয়ক গান ধরিতেছে, আবার তখনই গান পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইতেছে।

গ্রাম্য রমণীগণ সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কলসীকক্ষে নদীতে স্নানে যাইতেছে; এক একবার অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া চকিতদৃষ্টিতে জন দেখিয়া লইতেছে।

গ্রাম ঘুরিয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পর বিশ্রামান্তে নদী করিতে চলিলাম। ক্ষুদ্র নদী। নদীগর্ভে অধিক জল নাই। তীরে কিছু

শুনা গিয়াছে, সুধীর মিত্র দীনুর জামিন স্বরূপ দশ হাজার টাকা হাউমে আমানত রাখিয়া দীনুকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। সে হেতু কৃতজ্ঞতার আবেগে দীনু সরলাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া হৃদয়মন্দিরে স্থাপিত করিল। এই বিবাহের পর দীনুর ক্ষুধা বাড়িয়াছে, এবং সুন্দর মুখের চাপা অংশগুলি পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। দীনুর বুদ্ধিও খুলিয়াছে, এবং প্রায় বিশ জন লোক প্রত্যহ দীনুর বাটীতে চা খায়; যে হেতু উদারচরিত্র, সৎ ও সহৃদয় লোকের বাটীতেই সকলে চা খাইয়া থাকে।

এই সব ঘটনা হেতু দীনুও সুখী, এবং পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দের সহিত কণ্ঠীবদল করিয়া মাতঙ্গিনীও সুখী। বসুজার বিস্তীর্ণ জমিদারী এখন ঠাকুরের সেবায় লাগে, এবং সে হেতু অনেক দীনদুঃখী প্রতিপালিত হয়। যে হেতু সকলই ভগবানের ইচ্ছা!

ভারতে পাশ্চাত্য বণিক।

রত্নপ্রসূ ভারতভূমির অতুল বৈভব-গৌরব সুচিরকাল সভ্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়া লোকের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। প্রাশ্চাত্য খণ্ডে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রথম বিলাসবাসনা জাগিয়াছে, তখন হইতেই ভারত-জাত ধনরত্নের উপর লক্ষ্য পড়িয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের উষাগমেই দৃষ্ট হয় যে, কাল্ডিয়া বাবিলন, মিশর, চীন প্রভৃতি প্রাচীন কালের সভ্য জনপদ সকলে ভারতের পণ্য দ্রব্য সুপরিচিত ছিল। মহাভারত-বর্ণিত কালেও পশ্চিম এসিয়ার নবোদ্ভিত কাল্ডিয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া ভারতের দ্রব্যসম্ভার বহিয়া সার্থবাহ-সম্প্রদায় পশ্চিমোত্তর সাগরোপকূল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত, ইহার প্রমাণ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন মিশরে গন্ধদ্রব্যাদিসহযোগে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শব-রক্ষণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গেই সেখানেও ভারতের সুগন্ধি দ্রব্যের যশঃ-সৌরভ প্রসারিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিশররাজ সিসষ্ট্রীস পারস্য উপসাগর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য প্রথম ঐতিহাসিক হিরোদোতাস তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। মিশরের প্রাচীন প্রবাদ-মূলে সিসষ্ট্রীসের ভারতবিজয়ের কাহিনী বিশ্বাস না করিলেও, পশ্চিম এসিয়ার উক্তরূপ অধিকার দ্বারা তাঁহারই প্রভাবে ভারতীয় দ্রব্যজাত মিশরে প্রথম উপনীত

হয়, এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ট্রয়ের মহাযুদ্ধ-সংঘটনের কথা পণ্ডিতসমাজে অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। হোমার ভারতের নামোল্লেখ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় সেকালেও পশ্চিম প্রদেশে ভারতজ পণ্যের প্রচার ছিল, তাহার প্রমাণ লক্ষিত হয়। মিশরের প্রাচীন রাজধানী যে থিব্‌সের শত সিংহদ্বার ও বিংশ সহস্র সজ্জিত রথের কথা হোমারের কর্ণগত হইয়াছিল, (১) তাহার শোভাসম্পদবর্দ্ধনে প্রাচীন ভারত কত দূর সাহায্য করিয়াছিল, কে বলিবে?

কিঞ্চিদূন তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইহুদী-রাজা দাউদ্ ও সলোমনের সময়ে কিয়ৎকাল এই বাণিজ্যেই তাঁহাদের ধনভাণ্ডার পুষ্ট হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ মরু দেশের এক প্রান্ত বহিয়া যে পথে পণ্যবাহী দল ভারতের দ্রব্যজাত লইয়া মধ্যসাগরের কূলে উপনীত হইত, তাহা ইহাদের অধিকারের মধ্য দিয়াই প্রসারিত ছিল। প্রাচীন বাইবেলে সলোমনের কীর্ত্তিগাথা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে, রাজ্যবিস্তারের সহিত বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধিও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। যুদার প্রথম বাণিজ্যপোত তাঁহার আদেশেই নির্ম্মিত হয়। বিশাল রাজসিংহাসনের প্রধান উপকরণ গজদন্ত, বহুবিধ 'মণিমাণিক্য', ভিন শত 'সুবর্ণফলকের ঢাল,' 'কেলিকুহরের শাখামৃগ ও ময়ূর ময়ূরী', 'গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী বণিক্,' এবং সম্ভবতঃ ভজননন্দিরের রক্তপল্লবপু চন্দনকাষ্ঠ গঠিত স্তম্ভ-সমূহের নিমিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ সলোমন ভারতের নিকটেই ঋণী—এইরূপ অনুমিত হইয়াছে।

এসিয়া খণ্ডের প্রাচীন বণিক সুপ্রসিদ্ধ ফিনিশীয়গণের দ্বারাই ভারতজাত পণ্য দ্রব্য পাশ্চাত্য প্রদেশমধ্যে প্রসারিত হইয়াছিল। এই ফিনিশীয় বণিকদলই এ দেশের দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে সভ্যতার প্রচার করিয়া প্রাচীন ইউরোপ ও আফ্রিকার উত্তরখণ্ডে মনুষ্যত্বের প্রসারবৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহারাই প্রাচ্য মৃৎপাত্র-গঠন, ধাতুপাত্রের কলাই, কাষ্ঠের কারুকার্য্য, কাচনির্ম্মাণপ্রণালী, গজদন্তের দ্রব্য—সর্ব্বশেষে বর্ণমালার প্রচার করিয়া সুদূর প্রতীচ্য-জগতে প্রাচীর বালারুণের অমল কিরণপ্রকাশে প্রধান সহায় হইয়াছিল। যুদা রাজগণ প্রধান বাণিজ্য-পন্থার অধিকারী হইয়াও বাণিজ্যবিস্তারে ইহাদের সাহায্যগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্থলপথের উৎপাত ও অত্যাচারে যখন ভারতের পণ্যদ্রব্য অর্ণববানে পারস্য ও লোহিত সাগর হইয়া উত্তর-পশ্চিমে আনীত হইতে লাগিল, তখনও ফিনিশীয় বণিকগণের

(১) Iliad. IX. 381—84.

ধূলিরাশি প্রসারিত, প্রখরসূর্য্যরশ্মিসম্পা
আমতে যাইবার সংকীর্ণ পথটি কিছু দূর পর্য্যন্ত
বাগান। আমরা আম কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ছা
মধ্যে এক একটা উত্তপ্ত বাতাসের ঝাপটা আসিয়া বৃক্ষপত্র
বৃক্ষমূলে নিপতিত শুষ্কপত্র সর্ সর্ শব্দে উড়িয়া যাইতেছে।
বঁইচি, ময়না কাঁটা, আশ্‌শ্যাওড়ার জঙ্গল। এই সকল জঙ্গল
অত্যন্ত নিবিড় থাকে; এখন আম কাঁঠালের সময় বাগানে সর্ব্বত্র
তাহারা জঙ্গল অনেকটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।—অত বেলাতেও
ছোট ছোট ছেলেরা বাগানের মধ্যে আম কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। কেহ আ
কেহ ফলসা গাছে উঠিয়া জাম ও ফলসা খাইতেছে। বাগানের মধ্যে কণ্টকময়
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঁইচি-গুল্মে লালের আভাযুক্ত কালো কালো বঁইচি পাকিয়া আছে।
চাষার ছেলেরা অতিকষ্টে পাকা বঁইচি সংগ্রহ করিতেছে; কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া
যাইতেছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

বাগানের পাশেই ধানের জমী। ধানগাছ এখনও খুব বড় হয় নাই। নূতন
ধানগাছের শ্যামলতায় চক্ষু জুড়াইয়া গেল। কোনও স্থানে চারাগুলি খুব ঘন,
কোথাও অত্যন্ত পাতলা। ধান্যক্ষেত্রে অত্যন্ত ঘাস জন্মিয়াছে; কৃষাণেরা দল বাঁধিয়া
ঘাস নিড়াইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সুখ দুঃখের গল্প চলিতেছে। কৃষাণদের
মাথায় 'মাথাল', কাঁধে গামছা, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত। অদূরে গোচারণের মাঠ।
রাখালেরা তালপাতের ছাতি মাথায় দিয়া পাঁচনে ভর করিয়া ত্রিভঙ্গবেশে দাঁড়াইয়া
দাঁদির' আগুনে খর্শান ধরাইয়া তামাক খাইতেছে। মাঠে ঘাস অধিক নাই; যাহা
গেছে, গরুগুলা ক্ষুধার জ্বালায় তাহাই খুঁটিয়া খাইতেছে,—গোরু নাড়িয়া মাছি
হইতেছে। দুই একটা গরু বিরলপত্র বাবলাগাছের নীচে শুইয়া পড়িয়া রোমন্থন
করিতেছে। ভেড়া ও ছাগলের পাল আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।
কতক পাতিহাঁস জলের ধারে দাঁড়াইয়া প্যাক্ প্যাক্ করিয়া ডাকিতেছে, আবার
অধিক ; ল নামিয়া জলের মধ্যে মুখ পুরিয়া দিয়া নতগ্রীবভাবে কি খাইতেছে,
হইতেছে সাঁতার দিয়া একটা টোপাপানার জঙ্গলে প্রবেশ করিতেছে। নদী-
গাকা একটা আকন্দগাছের আড়ালে বসিয়া দুটি শৃগাল লুব্ধদৃষ্টিতে হাঁসগুলির
দুই চারি নিরীক্ষণ করিতেছে।

কাঁদি তা স্নানার্থীর সংখ্যা এখন অধিক নহে। কয়েকটি ছেলে জলক্রীড়ায়
তীক্ষ্ণ অ পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। গ্রাম্য বৃদ্ধারা নদীজলে অর্দ্ধনিমগ্ন, একটা

বা পাথরের ছোট তেলমাখা বাটী হইতে তাল
রাখিতেছে; কেহ পিতলের কলস মাজিতেছে,
দুই কানে উভয় হস্তের তর্জ্জনী প্রবেশ করাইয়া
করিয়া ডুব দিতেছে। কোন কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ স্নানান্তে
হইয়া অস্ফুটস্বরে 'জবাকুসুমসঙ্কাশং' ইত্যাদি স্তবে মধ্যাহ্ন-
ন ও মধ্যে মধ্যে প্রণাম করিতেছেন। 'পুখুরে' ঘোড়ায় চড়িয়া
ড়্ বড়্ তড়্ বড়্ শব্দে নদীর ধারে উপস্থিত হইল; তাহার পর
জলে দাঁড়াইয়া ঘোড়া দুটির সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহাদিগকে
রাশির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া স্নান করিতে নামিল। ঘোড়া দুটি মহানন্দে
শৈবালচর্ব্বণ আরম্ভ করিল। কয়েকটা মহিষ রাখালের পাঁচন অগ্রাহ্য করিয়া
জলে নামিয়া পড়িল, এবং জলের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া কেবল নাক ও চোক
জলের উপর রাখিয়া সতৃষ্ণদৃষ্টিতে নীলাকাশের দিকে চাহিতে লাগিল। দুই একটি
রাখাল, তীরে পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া রাখিয়া গামছা পরিয়া জলে নামিল; তাহার পর
মহিষের পিঠের উপর চড়িয়া পাঁচন দিয়া মহিষগুলিকে তাড়াইতে লাগিল; কিন্তু
মহিষগুলা তীরে না উঠিয়া আরও গভীর জলে চলিল; রাখালের শাসন তাহারা
আদৌ মঞ্জুর করিল না।

জ্যৈষ্ঠমাসে পল্লীগ্রামে মধ্যাহ্নের জলযোগের আয়োজন নিতান্ত সামান্য নহে।
কলিকাতার ভীমনাগের আধাছানার গোল্লা, স্মিথ বা স্কটের বাড়ীর লেমনেড্,
তাহাতে বরফের টুক্‌রা, বোম্বাই গোপালভোগ হিমসাগর প্রভৃতি আম্র, মজঃফর-
পুরের আমদানী লিচু প্রভৃতি ফল সেখানে নাই। বন্ধুর পরিবারে নিত্য যাহা
ব্যবহৃত হয়, তাহাই আমাদিগকে প্রদত্ত হইল। বেলফুলের কুঁড়ির মত শুভ্র
সুগোল মুড়ি, তাহাতে সরবাটা ঘি ও চিনি মাখানো, কচি শশা চাকা চাকা
করিয়া কাটা, অন্যান্য সাময়িক ফল কিছু কিছু, এবং সুমিষ্ট সুস্নিগ্ধকর ডাবের
জল; তদ্ভিন্ন দুধ ও চিনির সংযোগে প্রস্তুত অপুষ্ট নারিকেল বাটার একরকম
গৃহজাত মিষ্টান্ন সন্দেশ ও মিঠাইয়ের অভাব পূর্ণ করিল। বন্ধু বলিলেন, এখন
আম খাওয়া হইল না, বৈকালে বাগানে গিয়া ও রসের আস্বাদন ভাল করিয়া
লওয়া যাইবে।

জলযোগের পর আহারাদি করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বিস্তীর্ণ গালিচার উপর দেহ
প্রসারিত করিলাম। কিন্তু নিদ্রার সম্ভাবনা দেখিলাম না। বৈঠকখানায় ক্রমেই
গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণের সমাগম হইতে লাগিল। পায়ে খড়ম, কাঁধে গামছা ও

ভ্রূয়ের মধ্যে রক্তচন্দনের স্থূল ফোঁটা ধারণ করিয়া শিরোমণি ঠাকুর বৈঠকখানায় পাশার আড্ডা ফেলিলেন; ট্যাঁক হইতে নস্যের শামুক বাহির করিয়া নাসিকার উভয় ছিদ্রে প্রায় অর্দ্ধমুষ্টিপরিমাণ নস্য প্রবেশ করাইলেন; তাহার পর গম্ভীরস্বরে ভৃত্যকে ডাকিয়া তামাক দিতে আদেশ করিলেন। তিনি তাঁহার 'রিজার্ভড্' হুঁকাটির জন্য কলাপাতার একটি নল প্রস্তুত করিতে করিতে অন্যান্য খেলোয়াড়ের সমাগম হইল। আধ ঘণ্টার মধ্যে 'ছ তিন নয়' ও 'কচে বারো' প্রভৃতি মামুলী শব্দে বৈঠকখানা মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কাহারও হাতে হুঁকা, কাহারও হাতে পাতা। কেহ বা গামছা দিয়া ক্রমাগত দেহের ঘর্ম্ম অপসারিত করিতে করিতে খেলা দেখিতেছেন। খেলার উৎসাহে শিরোমণি মহাশয়ের কাছা খুলিয়া গিয়া দত্তমহাশয়ের হাঁটুর নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অপরাহ্ণে বাগানে চলিলাম। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা, কিন্তু রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত প্রবল। গ্রাম নিস্তব্ধ, পথ জনহীন, কেবল দুই একখানি গরুর গাড়ী মাল লইয়া চক্রশব্দে বিজন পল্লীপথ মুখরিত করিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দুই একটা ঘুঘু পথের ধারে গাছের শাখায় বসিয়া সকরুণ মধুরশব্দে প্রেমালাপ করিতেছে, এবং কপোতের দল কোনও জলাশয় লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ঘন পল্লবের অন্তরাল হইতে ফটীকজল শব্দ উত্থিত হইতেছে,—হতভাগ্য চাতকের পিপাসানিবারণের জন্য কোথাও একবিন্দু জল নাই। তাহার কাতর আর্ত্তনাদ নিস্তব্ধ বনভূমিতে যেন একটা বিষাদের সূচনা করিতে লাগিল।

আমরা আম্রকাননে প্রবেশ করিলাম। বহুদূর বিস্তীর্ণ বাগান। চারি দিকে উচ্চ মাটীর আইল; আইলের পাশে ধানের জমী। অপরাহ্ণ সমাগত দেখিয়া কৃষাণেরা সেদিনের মত কাজ বন্ধ রাখিয়া ঘাসের আঁটি মাথায় লইয়া গ্রামের দিকে চলিল; এই ঘাস তাহারা তিন চারি পয়সায় গৃহস্থগণের কাছে বিক্রয় করিবে। মাঠ হইতে ঘুঁটে কুড়াইয়া ঝোড়া বোঝাই করিয়া নিম্নশ্রেণীর বর্ব্বীয়সী রমণীগণ গৃহে ফিরিতেছিল। আমাদিগকে বাগানের মধ্যে দেখিতে পাইয়া কেহ কেহ বাগানে আসিয়া দুই একটি আম চাহিল। বন্ধুর ইঙ্গিতে রাখালীরা তাহাদের দুই চারিটি করিয়া আম দিয়া বিদায় করিল।

বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত একটু পরিষ্কার জমীর উপর একখানি পর্ণকুটীর;—বাঁশের মাচা উচ্চ বংশদণ্ডের উপর স্থাপিত। প্রহরীরা রাত্রে এই মাচার উপর শয়ন করিয়া বাগান পাহারা দেয়। মাচার নীচে কতকগুলি ভস্ম ও অঙ্গার, বাঘের ভয়ে রাত্রে রাখালীরা আগুন জ্বালিয়া রাখে।

আমাদিগকে বাগানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া দুই তিন জন রাখালী ভাল গাছে আম পাড়িতে উঠিল। তাহাদের হাতে এক একটি ছোট আঁকুশি। আঁকুশির অগ্রভাগে ছোট জালের ঝোলা, এই ঝোলায় আম পাড়িয়া তাহারা কোঁচড় পূর্ণ করিতে লাগিল। আধঘণ্টার মধ্যে রাশি রাশি আম স্তূপাকারে টোঙ্গের ভিতর জমিয়া গেল। তখন বাছ বাছিয়া বাছিয়া এক একটি আমে ছুরি চালাইতে লাগিলেন। ছোট বড় নানা আকারের নানাজাতীয় দেশী আম, তাহাদের নামই বা কেমন অদ্ভুত!—কুমড়োজালি, হুদে, পেঁপে, তিলে, তেলাকুচো, নাকি, সিঁদুরে প্রভৃতি আমের ভিতর তীক্ষ্ণ ছুরি চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমালোচনা চলিতে লাগিল। সেই দোষগুণের বিশ্লেষণ ও সমালোচনার কাছে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের মাসিক সাহিত্য সমালোচনা কোথায় লাগে! বিধাতার পরমলোভনীয় দান এই আমগুলি যেন মাসিকপত্রিকার প্রবন্ধ অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর! কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের রসনা অপরিতৃপ্ত থাকিল না।

সমস্ত দিন ভয়ানক গরম গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বাকাশে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা গেল। তাহার পর অল্প ঝড় উঠিল। রাখালীরা অতঃপর গাছের উপর থাকা নিরাপদ নহে বুঝিয়া, গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি আমের ভাগ করিতে লাগিল। চারি ভাগে আমগুলি বিভক্ত হইলে তিন ভাগ বাগানের মালিকা পাইলেন, এক ভাগ রাখালীরা পাইল। দুই শত আড়াই শত আম এক এক ভাগে পড়িল।

রাশি রাশি ধূলি ও গাছের পাতা উড়াইয়া প্রবলবেগে ঝড় বহিতে লাগিল। তাহার পর কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইল। ক্ষুদ্রকুটীরে ময়লা ছেঁড়া কাঁথায় বসিয়া অধিককাল অপেক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর হইবে ভাবিয়া আমরা বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। আমাদের সঙ্গে একটিমাত্র ছাতা ছিল, আমাদের ভৃত্য কোথা হইতে একটা তালপাতার ছাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল। তাহা মাথায় দিয়া বৃষ্টিধারা হইতে মাথা বাঁচাইয়া আমরা বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। গ্রামের লোক 'বাবু'দের মাথায় তালপাতার ছাতা দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

বাড়ী পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় মেঘগর্জ্জন। অন্ধকার আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত নীলাভ বিদ্যুতের জিহ্বা নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর চট্‌পট্ শব্দে শিলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। বাড়ীর ছেলে মেয়েরা গামছা মুড়ি দিয়া শিলা-সংগ্রহের জন্য জলে ভিজিতে লাগিল। শীতল বায়ু-হিল্লোলে গ্রীষ্মের জ্বালা প্রশমিত হইল।

তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। ক্ষুদ্র গ্রামখানি সেই অন্ধকারের মধ্যে বৃক্ষ-পল্লব-সমাচ্ছন্নদেহে মৌনভাবে সিক্ত হইতে লাগিল। পথে জনমানব কেহ নাই। কেবল ঝুপ্ ঝুপ্ জলের শব্দ! বিরলবসতি পল্লীর দূরে দূরে সংস্থিত মৃণ্ময় গৃহের বাতায়নপথে মৃৎপ্রদীপের ম্লান শিখা সেই ঘনবর্ষণের তিতর দিয়া কি এক রহস্যময় কুহকের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল, এবং ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দে বোধ হইতেছিল, ক্ষুদ্র পল্লীর প্রান্তসীমায় আরব্য-রজনীর-উপন্যাস-লোকবাসী কোনও দুর্দ্দান্ত যক্ষদল তাহাদের অদৃশ্য মায়াপুরী হইতে শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পরস্পরের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে!

এক ঘণ্টার মধ্যেই ঝড়জল সমস্ত থামিয়া গেল। গ্রীষ্মের প্রতপ্ত প্রকৃতি সুশীতল হইল। গুল্মান্তরালে খদ্যোতের আলোক হীরকদীপ্তি বিকাশ করিতে লাগিল, এবং সুপ্তপ্রায় অরণ্যের অন্তরাল হইতে ঝিঁঝিঁর দল অবিচ্ছেদে যে ঝিল্লীধ্বনি আরম্ভ করিল, তাহা যেন সেই দিগন্তব্যাপী নৈশ অন্ধকারের প্রান্ত হইতে পল্লী-প্রকৃতির মর্ম্মকাহিনী বহিয়া আনিতে লাগিল।

সহসা সেই শব্দ ডুবাইয়া শ্যামসুন্দরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে খোল করতালের মিশ্র ধ্বনির সহিত পল্লীর সংকীর্ত্তনের দল সমস্বরে গাহিয়া উঠিলেন,—

"সংকীর্ত্তন মাঝে আমার গৌর নাচে,
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে!"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

আর্য্যজাতির প্রসার ও দিগ্বিজয়।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ জানুয়ারী মাসের "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে "আর্য্যজাতির বিস্তার" বিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কেমন করিয়া আর্য্যঋষিগণ ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া ভারতবিজয়ী আর্য্যগণ ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, চীন, যবদ্বীপ, মানব প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহারও ইতিহাস-কথা বিবৃত আছে। ঋগ্বেদের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত আর্য্যগণের বিস্তৃতির পর্য্যায় ও ক্রমবিকাশের কথা বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষিদেশ, মধ্যদেশ, আর্য্যাবর্ত্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রবিড়, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, প্রভৃতি নানা দেশে আর্য্যগণের বিস্তৃতির উল্লেখ নাই করিলাম। যাঁহারা পুরাণ পাঠ করিয়াছেন,

শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আর্য্যজাতির বিস্তারের কথা জানিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি জয়ের কথা লোকসমাজে তত প্রচারিত নাই। তাহারই বিস্তৃত আলোচনা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মে রাজবংশের একটা ইতিহাস আছে, উহার নাম মহাধাজাবিণ। উহাতে লেখা আছে যে, শাক্য-বংশজাত অভীরাজা ব্রহ্মে যাইয়া উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তর ব্রহ্মে তাগাউঙ্গ নগরে তিনি রাজধানী স্থাপিত করেন। অভীর পরে বত্রিশ জন রাজা উত্তর ব্রহ্মে রাজত্ব করেন। পরে পূর্ব্বদেশ হইতে চীন আক্রমণকারিগণ আসিয়া শক-বংশকে পরাজিত ও পরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে। আরও এক জন শকরাজ ঠিক এই সময়ে উত্তর ব্রহ্মে গমন করেন। ইঁহার নাম দাঙ্গা সারা। তিনি যে সময়ে উত্তর ব্রহ্ম জয় করেন, সেই সময়ে গৌতম বুদ্ধ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। খৃষ্টপূর্ব্ব নবম কি দশম শতাব্দীতে যে আর্য্যগণ ব্রহ্ম দেশ বিজয় করেন, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের ভাষায় পালির সহিত অনেক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে। সপ্তাহের সাত দিনের সংস্কৃত নামই বজায় আছে। ব্রহ্মগণ পিতৃপুরুষের ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মেও মনু ব্যবস্থাপক ছিলেন। "ধম্মথাট্" ব্যবস্থাপুস্তক ব্রহ্মের মনু কর্ত্তৃক লিখিত। ব্রহ্মের পূজাপাঠের অন্যান্য আচার ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী হইয়া থাকে। এখনও হিন্দুর মত অনেক রীতিপদ্ধতি প্রচলিত আছে। স্তূপাদি খনন করাইলে পুরাতন দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ব্রহ্মে তৈলঙ্গ দেশ হইতে হিন্দুগণ যাইয়া বসতি করেন। টীহ বা টীশ রাজা দক্ষিণ ব্রহ্মে রাজা হয়েন। ইনি কর্ণারক বা কর্ণাটের রাজা ছিলেন। এই সিহ, টীহ, টীশ, ফীহ রাজা খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে রাজত্ব করেন। ইনি সুবর্ণভূমি বা থাটন নগরে রাজ্য করিতেন। এই তৈলঙ্গ বংশের অনেক কীর্ত্তি এখনও দক্ষিণ ব্রহ্মে পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম হইতে হিন্দুগণ শ্যামরাষ্ট্রে, ইন্দুচীন বা নব-কাম্বোজে, এনাম বা নব-চম্পা বা কাম্পিল্য দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। শ্যামরাষ্ট্রের রাজধানীর নাম 'অযোধ্যা' বা 'আয়িথেয়া' হইয়াছিল। শ্যামে নব কোশল প্রদেশ ছিল। কৌণ্ডিল্য ঋষি বা ব্রাহ্মণ কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া দেশে যাইয়া রাজা হন। নবকাম্বোজে এখনও ব্রাহ্মণশাসনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কাম্বোজসাম্রাজ্য বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল। কাম্বোজে যে সকল মন্দির এখনও বিদ্যমান, তাহা হিন্দুগণের স্থপতিবিদ্যার অপূর্ব্ব নিদর্শনস্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। একটি মন্দিরে পাঁচ হাজার প্রস্তরস্তম্ভ আছে। মন্দিরগাত্রে রামায়ণের নানা ঘটনার আলেখ্য কোদিত আছে। পাথরের গাঁথুনিই অপূর্ব্ব! এমন গাঁথুনি এখন হয় না। ইহার নাম অঙ্কোর-বাট। যবদ্বীপে "বরোবাদর" বা বারদোয়ারী নামধেয় আর একটি অপূর্ব্ব মন্দির এখনও আছে। উহা অঙ্কোর-বাটের প্রতিকৃতিস্বরূপ। সুমাত্রা ও যব দ্বীপকে প্রাচীন হিন্দুগণ যবদ্বীপ নামেই জানিতেন। সুমাত্রায় একটা সংস্কৃত শিলালিপিতে আছে যে, "রাজা আদিত্যবর্ম্ম প্রথম যবভূ"। ইহা খৃঃ অব্দ ৬৫৬ সালে লিখিত হয়। যবদ্বীপের উল্লেখ রামায়ণেও আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, যবদ্বীপই রামায়ণের লঙ্কা; অন্ততঃ বিবরণসাদৃশ্য সম্পূর্ণ আছে। যবদ্বীপে ব্রাহ্মণশাসন অতি দৃঢ় ছিল। এখানে বৌদ্ধবিপ্লব বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। বালী, লম্বক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপেও এখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে, অগ্ন্যুদ্গারে ও আগ্নেয় গিরির উৎপাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত

হইয়াছে। বোর্ণিও, সেলিবিজ প্রভৃতি দেশেও ব্রাহ্মণশাসনের, আর্য্য-প্রাধান্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। স্তূপাদি খনন করিয়া অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। রাজা রুকের সময়ে বোর্ণিও দেশের একটা বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়। তাহাতে হিন্দু-প্রাধান্যের কথাই আছে। সিংহল দ্বীপে বিজয় সেন যাইয়া রাজ্যবিস্তার করেন। তবে অধ্যাপক রীস্ ডেভিড্‌স্ এ কথায় আস্থাস্থাপন করেন না। চীনের অনেক স্থানে তন্ত্রোক্ত যন্ত্রাদির আবিষ্কার হইয়াছে। কোরিয়া দেশে প্রকৃতই এক শিবমন্দির দেখা গিয়াছে;—সেই সৌরীপট্ট, সেই শিবলিঙ্গ—সেই সবই বর্ত্তমান। কিম্বদন্তী আছে যে, জাপানেও বাঙ্গালী হিন্দু গিয়াছিলেন। অন্য দিকে—খোটান, বাদাক্‌শান্, সমরখন্দ প্রভৃতি দেশে ডাক্তার ষ্টীন হিন্দু ধর্ম্মের ও সভ্যতার নিদর্শন পাইয়াছেন। গোবী মরুদেশের বালুকানিমজ্জিত অনেক গ্রাম পল্লী উৎখাত হইয়াছে। সেই সব ভূগর্ভস্থ গ্রাম ও পল্লীতে হিন্দুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার ষ্টীন একখানি পুস্তক রচনা করিয়া এই সব কথার আলোচনা করিয়াছেন। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, পশ্চিমে পারস্যদেশ হইতে দক্ষিণে ভারত ও পূর্ব্বে জাপান পর্য্যন্ত হিন্দুত্বের বিস্তার এককালে ছিল। সম্প্রতি সোমালি প্রদেশে, ম্যাসোনাল্যাণ্ডে এবং মধ্য আফ্রিকায় হিন্দুয়ানীর নানা চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। বিখ্যাত পাইওনীয়র পত্রে এই বিলুপ্ত হিন্দুত্বের সম্যক্ আলোচনা হইয়াছিল। সোমালি দেশে কিম্বদন্তী আছে যে, এক প্রবলপরাক্রমশালী হিন্দুরাজা সে দেশে বহুকাল পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। পরে মুসলমানগণ তাঁহাকে পরাজিত করে, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ মুসলমান হয়। যাহারা মুসলমান হইল না, তাহারা আদিমনিবাসীদিগের সহিত মিশিয়া গেল। এই সব নানা বিষয়ের অনুধাবন করিলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আজ যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান জাতি পৃথিবীকে বিরিয়া রহিয়াছে, তেমনই এককালে এই ভারতের হিন্দুগণও সাগরাম্বরা ধরিত্রীকে করামলকবৎ আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

যুগ-প্রলয়।

গত জানুয়ারী মাসের "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে মিষ্টার গস্‌লিং "যুগ-প্রলয়" এবং ভূস্তরের প্রাকৃত পরিবর্ত্তনের বিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। সে প্রবন্ধের মর্ম্ম বুঝিবার পূর্ব্বে, আমাদের গুটিকরেক বিষয় প্রথমে জানা উচিত। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা অগ্রে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া, পরে প্রবন্ধের কথা কহিব।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর নানাদেশ পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, সকল দেশের জলবায়ুর অবস্থা এখন যেমন আছে, পূর্ব্বে তেমন ছিল না, পরেও তেমন থাকিবে না। অর্থাৎ 'আব্-হাওয়া' নিত্যপরিবর্ত্তনশীল অবস্থামাত্র। যে দেশ এখন চিরতুহিন-সমাবৃত ও জীববাসের যোগ্য নহে; সে দেশের ভূস্তরে, তুষার-বিস্তারের স্তরে স্তরে গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসী জীবজন্তুর কঙ্কালমালা প্রোথিত রহিয়াছে; গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৃক্ষগুল্মলতার অঙ্গারক-চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। যে দেশ এখন নদনদী-পর্ব্বতপরিবৃত হইয়া নানা জনপদ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, স্পষ্ট বুঝা যায়, সে দেশ এককালে মেরুতুষারবিস্তারে অবগুণ্ঠিত ছিল। সমুদ্রগর্ভ পরিদর্শন করিয়াও বুঝা যায় যে, আট্‌লাণ্টিক, ভারত সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের স্থানে স্থানে দেশ ও মহাদেশ ছিল; এখন সে সব অতলতলে ডুবিয়াছে। কেন এমন হইল? কোন্ শক্তির প্রভাবে এমন খণ্ডপ্রলয় সংঘটিত হয়?

পৃথিবীর দুইটি মেরুর চারি দিকে দুইটি তুষার-কিরীট বিরাজ করিতেছে। উত্তরমেরু অপেক্ষা দক্ষিণমেরুর তুষার-আস্তরণ বৃহত্তর ও বহুদূরব্যাপী। দক্ষিণমেরুর চারি দিকেই বিশাল সমুদ্র, অত বড়, অমন গভীর সমুদ্র পৃথিবীর আর কোনখানেই নাই। দক্ষিণ ভারতসমুদ্র ও প্রশান্ত সাগরের স্থানে স্থানে এত গভীর জল যে, অনেকে অনুমান করেন, বুঝি বা এ সমুদ্রের তলদেশ নাই। দক্ষিণ-মেরুর বিরাট 'গ্লেসিয়র' ভিত্তির উপর এই জলরাশি চল্ চল্ করিতেছে;—ভিতরেও জল, বাহিরেও জল, চারি দিকে জল,—অতল, অপার, অগাধ, অজ্ঞেয় জলরাশি ন নাশক্তিসামঞ্জস্যে স্থির হইয়া আছে, এবং এই জলরাশির উপর পৃথিবী—মহীমণ্ডলের মৃৎখণ্ডমাত্র যেন অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় ভাসমান রহিয়াছে; বিরাট মৃৎপিণ্ড নিজের ভারে কিছু নিমজ্জিত, এবং আভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা কিছু বা সংহৃত ও সঙ্কুচিত। এখন যে পর্য্যায়, তাহাতে, উত্তরমেরুর দিকেই মৃৎপিণ্ড জলের উপরে জাগিয়া থাকিবে,—আছেও তাহাই। উত্তরে যেটুকু জাগিয়া আছে, সেইটুকুতেই জীবজগতের বিকাশ হইয়াছে। ভূমণ্ডলের দুইটি গতি আছে;—প্রথম দৈনিক-আবর্ত্তনগতি, দ্বিতীয় পরিক্রমণগতি—সূর্য্যের চারি দিকে পরিক্রমণগতি। সূর্য্য যদি স্থির থাকিত, সৌরমণ্ডলে যদি অন্য কোনও শক্তির ক্রিয়া না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর এই দুইটি গতির কোনও বিপর্য্যয় কখনও ঘটিত না। কিন্তু বিপর্য্যয় ঘটে; সে বিপর্য্যয়ঘটনার একটা পদ্ধতিও আছে; একটা কালনির্দ্দেশও আছে। কোনও ক্রমে এই ভাসমান পৃথিবীর শক্তিসামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই একটা ওলটপালট হইয়া যায়। দক্ষিণের জলরাশি উত্তরে যায়, দক্ষিণমেরুর তুষারকিরীট চূর্ণ হইয়া যায়, সেই বিচূর্ণিত খণ্ড সকল উত্তরমেরুর তুষার-আস্তরণের পুষ্টিসাধন করে। যেখানে জল ছিল, সেখানে স্থল হয়; যেখানে স্থল ছিল, সেখানে অগাধ নীলাম্বু উত্তালতরঙ্গে নাচিতে থাকে। ইহাই যুগ-প্রলয়, বা খণ্ডপ্রলয়।

চক্রধুরের দুইটি মুখে আমাদের পৃথিবীর দুইটি মেরু অবস্থিত। ইহা ছাড়া অন্য মেরু আছে। উহাকে ইংরেজীতে 'ম্যাগ্‌নেটিক পোল' বলে। পুরাণের এক আখ্যায়িকায় আছে যে, ধরাদেহের একটা 'তমুপ' শক্তি আছে; এই তমুপ ধরার ব্রহ্মরন্ধ্রে সঞ্চিত থাকে; এবং সেই স্থান হইতে চক্রাকারে—সর্পগতিতে পৃথিবী বেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র বিসর্পিত ও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যখন ধরার ভার অসহ্য হয়,—অর্থাৎ শক্তিসামঞ্জস্য নষ্ট হয়, তখন এই তমুপ শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। মনে হয়, এই 'তমুপ' ইংরেজী 'পার্থিব ম্যাগ্‌নেটিজম্' মাত্র। যাহা হউক, এই ম্যাগ্‌নেটিক পোলের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; ইহার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তন—জলবায়ুর বিবর্ত্তনও সংঘটিত হয়। বিলাতের অনেক বৈজ্ঞানিক অনুমান করিয়া থাকেন যে, এই গোলক-পৃথিবীর গর্ভে আর এক গোলক আছে। উপরের গোলক যেমন ঘুরিতেছে, ভিতরের গোলকও তেমনই ঘুরিতেছে। কেবল উভয়ের গতি বিপরীত। এই দুই আবর্ত্তনগতির সংঘর্ষে পৃথিবীর 'ম্যাগ্‌নেটিজমের' উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধরাগর্ভস্থ গোলকের ঘূর্ণন-গতি সূর্য্য-পরিক্রমা গতির দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। এই শাসনসামঞ্জস্যের বিপর্য্যয় মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। এই বিপর্য্যয়েই খণ্ডপ্রলয়।

এইবার মিষ্টার গস্‌লিংএর কথা বলিব। সহস্র বৎসর অন্তর মহাবিষুব রেখার উত্তর ও দক্ষিণাংশে আবহবিকৃতি হয়। রাশিচক্রে বিন্যাস-বিপর্য্যয়ে এইটুকু হইয়া থাকে। ফলে, কখনও বা উত্তর দিকে আট দিন অধিক শীত বা গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, কখনও বা দক্ষিণাংশে আট দিন

অধিক শীত বা গ্রীষ্ম হয়। গত ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরখণ্ডে পূর্ণ-অষ্টাহ কাল অধিক গ্রীষ্ম ছিল; এখন সাড়ে সাত দিনও নয়। চারি শত বৎসর পরে, অর্থাৎ ২৩০০ খৃষ্টাব্দে উত্তরাংশে শীতাধিক্য হইবে। পৃথিবীর মেরুশলাকা সূর্য্যের চারি দিকে ঘনকোণের হিসাবে (conical motion) ঘুরিয়া থাকে; ইহাকে ইংরেজীতে Precession cycle কহে। এই আবর্ত্ত ২৬০০০ বৎসরে পূর্ণ হইয়া থাকে;—এই গতিজনিত আবহ-বিপর্য্যয়ও ২৪০০০ বৎসরে হইয়া থাকে। পুরাণাদিতে একটা কল্পের স্থিতি ৮৬৪০০০০ বর্ষ ব্যাপী, এবং মহাকল্পপ্রলয় সহস্র কল্পে পূর্ণ হয়;—অর্থাৎ, ৮৬৪০০০০০০০ বর্ষকালব্যাপী। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে যে, উল্লিখিত দৈবদিনে কল্প ও মহাকল্প প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাদাসিধা হিসাবে ৩৬০ চান্দ্রদিনের দ্বারায় বিভাগ করিলে একটা কল্প ২৪০০০ বৎসর স্থায়ী হয়; এবং মহাকল্পপ্রলয় ২৪০০০০০০ বর্ষকাল স্থায়ী হয়। বর্ত্তমান কালের ভূতত্ত্ব ও গতিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্তের সহিত এক হইল।

কল্পান্তে কি হয়? দুই মেরুর তুষারকিরীটের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়; আবার নূতন সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়। আগামী কল্পে উত্তরমেরুর তুষার-আস্তরণ বর্দ্ধিত হইবে; দক্ষিণমেরুর তুষার-উষ্ণীষ এখন হইতেই ক্ষীয়মাণ। আর পাঁচ হাজার বৎসর পরে পূর্ণক্ষয় সম্ভাবিত হইবে। ফলে উত্তরদেশ জলে নিমজ্জিত হইবে, ইউরোপের অর্দ্ধেক জলে ও বরফে ঢাকা পড়িবে, ভারতের জলবায়ুর অবস্থা বর্ত্তমান ইতালীর মত হইবে; ভীষণ গ্রীষ্ম আর থাকিবে না। দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের গর্ভ হইতে নূতন দেশ উত্থিত হইবে। পুরাকালের 'আট্‌লাণ্টিস্' মহাদেশ আবার জাগিবে; আর দক্ষিণ-সাগরগর্ভস্থ 'লেমুরিয়া' আবার জীববাসযোগ্য হইবে। ভারতবর্ষ চিরস্থায়ী দেশ, ভারতবর্ষের কোনও বিকৃতি ঘটিবে না। ডাক্তার ব্লানফোর্ড বলেন যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা পুরাতন, মনুষ্যের আদি বাসস্থান। সহস্র বৎসর পরে আবার বৈদিক ভারত জাগিয়া উঠিবে। আবার সরস্বতী দেখা দিবে, আবার লবণী ও মধুমতী প্রবলা হইবে, আবার প্রকৃত ত্রিবেণী পরিস্ফুট হইবে! আমাদের চারি যুগের স্থিতিকাল ১, ২, ৩, এবং ৪,—এই অনুপাতে নির্দ্ধারিত আছে। পঞ্জিকা প্রভৃতিতে যুগসকলের যে স্থিতিকাল নির্দ্ধারিত আছে, তাহাকে ৩৬০ চান্দ্রদিনে ভাগ করিলে, ভূতত্ত্বের সিদ্ধান্তের সহিত সকল পৌরাণিক সিদ্ধান্ত এক হইয়া যাইবে। প্রথমে হেলি; পরে ডাক্তার ওয়ালেস্, ড্রেসন, স্যর রবার্ট বল, গীকী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ যে সব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত সে সকলই এক হইয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগের প্রথমে দেহত্যাগ করেন। আরও ৪২৭০০০ বর্ষ পরে কলিযুগের শেষ হইবার কথা। অর্থাৎ, পৌরাণিক হিসাবে, ৪৩২০০০ বর্ষে কলিযুগের শেষ হইবে। এই ৪৩২০০০ কে ৩৬০ দিয়া ভাগ করিলে, ১২০০ বর্ষ হয়। গত ১২৪৮ খ্রীঃ অঃ পূর্ব্বে কলির এক পর্য্যায় অতীত হইয়াছে; আরও ১২০০ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ২৪৪৮ খ্রীঃ অঃ পরে, তাহা পর্য্যায় শেষ হইবে। অর্থাৎ, মোট ৭০০০ বর্ষ কলিকল্পের স্থিতি আছে।

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্য হিন্দুগণ শীতপ্রধানদেশবাসী ছিলেন। তাঁহার কথা এক হিসাবে ঠিক। যখন উত্তরমেরুর তুষার-উষ্ণীষ ইউরোপকে গ্রাস করিয়াছিল, তখন মধ্য-এসিয়া ক্ষেত্রে মেরু-শীতের প্রাদুর্ভাব ছিল। আর্য্যগণ উত্তরাখণ্ডে বাস করায় মেরুদেশের জলবায়ুর অবস্থা উপভোগ করিতেছিলেন। এখন নরওয়ে বা উত্তর-রুষের যে অবস্থা-

তখন পারস্য দেশের ও মধ্য-এসিয়ার সেই অবস্থা ছিল। সুতরাং আর্য্যগণ চিরদিনই আর্য্যভূমিতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, নরওয়ে বাল্টিক উপকূলে ছিলেন না। সে আজ সাত হাজার বর্ষের পূর্ব্বের কথা। তখনই মেরু-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। আর্য্যগণ প্রথমে দক্ষিণ দেশে আসেন; পরে আবার উত্তরদেশে গমন করেন। জলবায়ুর অবস্থাবিপর্য্যয়ের সহিত আর্য্যগণের গতাগতির নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে।

এই সব পরিবর্ত্তনের সূচনা ধীরে ধীরে হয়; কিন্তু প্রলয়কাণ্ড হঠাৎ হইয়া থাকে। প্রলয়ের প্রখর সূচনা মহাপ্লাবনে হইয়া থাকে। মাষ্টোডন, মামথ প্রভৃতি বিলুপ্ত বিরাট জীবগণের কঙ্কাল ও মাংসাস্থিবিশিষ্ট দেহ সাইবীরীয় তুষারস্তরে পাওয়া গিয়াছে। সকল জীবেরই মুখ দক্ষিণ দিকে। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই হয় যে, উত্তর দিক হইতে জলপ্লাবন আসিতেছিল, তাহারা প্রাণভয়ে দক্ষিণে পলাইতেছিল; পরে বিশাল তুষারক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার মেক্সিকো দেশে এমন গাছপালা আছে, যাহা পশ্চিম আফ্রিকায় পাওয়া যায়। সুতরাং মধ্যে আটল্যাণ্টিক-গর্ভে যে একটা বিরাট দেশ নিমজ্জিত আছে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। নহিলে মধ্য-আমেরিকার সহিত মধ্য-আফ্রিকার সকল বিষয়ে এত সাদৃশ্য থাকিবে কেন?

এই ভাবের নানা কথায়, মিষ্টার গস্‌লিং অপূর্ব্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত জ্যোতিষী গণনার পরিচয় দিলাম না। গস্‌লিং সূক্ষ্ম গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমাদের পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব নিতান্ত গাল-গল্প নহে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর অবস্থিত। ব্যাপার এই যে, পৃথিবী আর একটা বড় পরিবর্ত্তনের দিকে যেন দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছে। এ গতির লক্ষণ বুঝা যায়—প্রথম সমাজ-বিপ্লবে, পরে ধরা-বিপ্লবে। সমাজ-বিপ্লবের আরম্ভ হইয়াছে। ধরা-বিপ্লবেরও সূচনা হইয়াছে; কেবল অপেক্ষা প্রলয়কাণ্ডের। এই ত এত হিসাব-নিকাশ; আবার বে-হিসাবের ব্যাপারও আছে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে, বিশাল সৌরমণ্ডলও তেমনই আর একটা কোন অজ্ঞেয় কেন্দ্রের চারি দিকে ঘুরিতেছে। সেই মহামণ্ডলের গতিবিধি মানববুদ্ধির অতীত। সৌরমণ্ডলে যেমন গ্রহগণের আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে, নানা সৌরমণ্ডলেরও তেমনই একটি আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধেরও বিপর্য্যয় ঘটে। বর্ত্তমান কালের জ্যোতির্বিদ্‌গণ গগনমণ্ডলের একটা কেমন-কেমন ভাব দেখিতেছেন। ইহার ফলে কি হইবে, কে জানে!

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। "মাদলিক" একটি ক্ষুদ্র গান। বৈঠকখানায় গুন্ গুন্ করিয়া গাহিলে ক্ষতি ছিল না; সাহিত্যের আসরে চীৎকার করিয়া গাহিবার যোগ্য নয়। কবি ভারতীকে বলিতেছেন,—

"তব বঙ্গমঙ্গলা মূরতিখানি জপিতে শিখাও বর্ষ বরষ!"

কিন্তু ভারতী ভক্ত কবির এই বিষম আবদার শুনিয়া কি মনে করিতেছেন, বলিতে পারি না। মূর্ত্তির ধ্যান বুঝিতে পারি, মূর্ত্তির জপ কিরূপ? যদিও ভারতী শব্দ ও অর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বোধ করি, তিনিও ইহা বুঝিতে পারিবেন না। চারি চরণ সম্পূর্ণ করিতে যখন এতটা ধর্ম্মব্যয় এবং ভাষা ও

ভাবের এমন বিপর্য্যয় করিতে হয়, তখন এ বিড়ম্বনা কেন? "অনুতাপ" শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের রচিত আর একটি গান। বিশেষত্ব নাই। আন্তরিকতার অভাবে রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "নারায়ণী" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গীতার জ্ঞানযোগে" নূতন কথা দেখিলাম না। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী 'ঘুমঘোরে অচেতন' ছিলেন; 'সহসা কোকিলকণ্ঠ' তাঁহাকে 'বসন্তের শুভ আগমন' জানাইয়া দিল, সুতরাং তিনি জাগিয়া দোয়াত কলম সংগ্রহ করিয়া লিখিতে বসিয়া দেখিলেন, তাঁহার "র‍্যাকুল হিয়া দিক্‌বিদিক্ হারাইয়া ডুবে গেল অজ্ঞাত অতলে!" এই ঘুম-ভাঙ্গার কাহিনীটি ছন্দের খাঁচায় পুরিয়া, "আবেশ" এই লেবেল দিয়া ভারতীর কুঞ্জে টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "কুমারজীব" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। "লখ্যা" শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত একটি ক্ষুদ্র কবিতা। এবারকার ভারতীর কবিতায় সুরের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কর্ত্তব্যের সহচরী রমণী দুর্ব্বার, প্রেতাত্মায় পদে তব করি নমস্কার।"

'এড্‌মিরেশন' ও ভক্তির এমন 'হাড়জ্বালানে' অভিব্যক্তি সচরাচর দুর্ল্লভ। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চীনপ্রবাসীর পত্রে"র দ্বিতীয় দফা বহুবিধ 'আগড়ম্ বাগ্‌ড়মে' পরিপূর্ণ। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "উর্ব্বশী ও তুকারাম" নামক ক্ষুদ্র নাটকের যতটুকু এবার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু বিশেষত্ব দেখিলাম না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "কালীকট" নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সেনগুপ্ত "প্রথম বসন্ত" নামক কবিতাটিতে এক নিশ্বাসে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি এই,—

"কাননে প'ড়েছে দাগ শত চুম্বনের?"

আমরা খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু বসন্তের নাক্-খতের চিহ্ন ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই নাই। এমন কবিতার বিষয়ীভূত হইলে অনেককেই নাকে খত্ দিয়া পলাইতে হয়। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শিলাদিত্য" নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লেখকের কলাকৌশল প্রশংসনীয়। 'চলিত ভাষা'র অনাবশ্যক আতিশয্য না থাকিলে গল্পটি বোধ হয় আরও মনোরম হইত।

প্রবাসী। 'বৈশাখের' প্রথমেই শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের রচিত "কুমারী" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাসের কিয়দংশ। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "চিত্রে দর্শন" নামক প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর ওয়াটসের চিত্রকলার পরিচয় দিয়াছেন। সূচীপত্র দেখিয়া জানিলাম, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "যথার্থ প্রেমিক" নামক রচনাটি একটি ক্ষুদ্র গল্প। নতুবা গল্প বলিয়া চিনিতে পারিতাম না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "বৌদ্ধ সংন্যাস" নামক সংকলিত প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সংকলিত "রাসু-পরীক্ষা" নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "অসভ্য জাতির দেবতা" নামক সংকলিত প্রবন্ধটির বিশেষত্ব নাই। লেখক কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, পরিপাক করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "কাউয়েল-কৃত চণ্ডীর অনুবাদ" নামক প্রবন্ধে দেখিলাম, প্রফেসার ই. বি. কাউয়েল কবিকঙ্কণচণ্ডীর অনেকাংশ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণ্যালের অতিরিক্ত সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "অদৃষ্টের পরিহাস" নামক গল্পটির আখ্যানবস্তু তেমন 'ঘোরালো' না

'অমকালো' নয়। সহজ পল্লীজীবনের বৈচিত্র্যহীন সরল কাহিনী। গল্পটির চরিত্র-চিত্র অপেক্ষাকৃত ম্লান বটে, কিন্তু গল্পের রঙ্গভূমি বঙ্গপল্লীর সৌন্দর্য্যের আলোকে সমুজ্জ্বল। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত গবর্ণমেণ্টের নবপ্রচারিত শিক্ষানীতি" নামক সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধটি এযাবৎকার প্রবাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। "প্রবাসী বাঙ্গালী বিদ্বেষ" নামক প্রবন্ধটি হিন্দী মাসিক ও সাপ্তাহিকে আলোচিত হইলে শুভ ফলের ভরসা করা যায়। আশা করি, আমাদের হিন্দী সহযোগিগণ ঐ সকল পত্রে অনুবাদ করিয়া দিবেন। "বালবিধবা" নামক প্রবন্ধে লেখক বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, "সামাজিক পবিত্রতার, করুণার, ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়া সকলকে বলি, লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির ভয় অগ্রাহ্য করিয়া সকলে বালবিধবার বিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।" রচনায় ও রসনায় অনেক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। এখন কাজ চাই। এ দেশে সৎকার্য্যের চেষ্টাই দেখা যায়; সে চেষ্টা কখনও কার্য্যে পরিণত হয় না। বিধবা-বিবাহই বা আমাদের এই সনাতন জাতীয় রীতির বহির্ভূত হইবে কেন? "বর্ষ-আবাহন" শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর একটি কবিতা। ছেলেবেলা 'ঐ ভূজু!' বলিলে যত না ভীত হইতাম, এখন "আসে ঐ নূতন বরষ" শুনিলে তদপেক্ষা অধিক শঙ্কিত হই! কেন না, নব বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার বন্যায় ভাসিয়া যাইবার ভয় থাকে। আলোচ্য কবিতাটি তত ভয়ানক নয়।

"কুলু কুলু ধ্বনি করি স্মৃতির বাহিনী মরি তরঙ্গে রঞ্জিয়া রবিকর,
পিছে রাখি কুয়াসারে ছুটে আসে অভিসারে নব আশে প্রফুল্ল অন্তর।

সুদীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে এই চারিটি চরণ উপভোগ্য। অবশিষ্ট নববর্ষসুলভ মামুলী কবিত্বের সুদীর্ঘ ক্যাটালগ্। দুঃখের বিষয় এই, এমন সুকুমার ভাবটিকে কবি অনুরূপ ভাষায় অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই। "তরঙ্গে রঞ্জিয়া রবিকর" অর্থ কি? তরঙ্গ রবিকরে রঞ্জিত, বা 'তরঙ্গ মাখিয়া রবিকর' ইহাই বোধ হয় কবির অভিপ্রেত। কিন্তু তাঁহার ভাষায় সেরূপ অন্বয় হয় না। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "প্রবাসী"তে বিশেষত্ব নাই। দুনিয়া আমাদের প্রবাসভূমি, ইহা নূতন কথা নয়। বিজয় বাবু সেই পুরাতন কথাটি নূতন করিয়াও বলিতে পারেন নাই। সুতরাং কবিতাটির জন্মই বিফল হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "অভিশপ্তা" নামক কবিতায় বিশ্ববিখ্যাত শকুন্তলার অভিশাপচিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রচনাটি দেখিয়া মনে হয়, শব্দ-চিত্র আঁকিবার অনেক উপকরণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এত ক্ষুদ্র পট্ট এত বড় চিত্র টানিবার শক্তি নাই। লেখকের শব্দসম্পদ আশাপ্রদ।

বঙ্গদর্শন। বৈশাখ। "বিদ্যাপতির প্রকাশিত পদাবলী" নামক প্রবন্ধটি প্রীতিপ্রদ। আদিকবি বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ কাহার না প্রীতিকর? শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের "স্মৃতিমন্দির" সুখপাঠ্য। কিন্তু রচনাটি কোন্ শ্রেণীর? কেহ বলেন, মহারাজার মন্দির দার্শনিক পাথরে গাঁথা। কেহ বলেন, ইহা কবিতার ঈথরে ভাসিতেছে। 'অপ্রকাশিত বিদ্যাপতি' বলিতেছেন,—

"দর্শন কবিতা দুঁহু মিলি গেল।
প্রবন্ধক পদ দুঁহু মাসিকে নেল॥"

মন্দিরের উপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "হনুমান" উপবিষ্ট। আর কোনও উল্লেখযোগ্য রচনা নাই।

(পুস্তক পরিচয়)

মঞ্জুষা।

এই গ্রন্থে তেরটি ক্ষুদ্র গল্প আছে। ইহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। অনেকে তাঁহাকে সুকবি বলিয়া জানেন ও তাঁহার কাব্যের অনুরাগী।

"মঞ্জুষা" গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু কবি তাঁহার কন্যা শ্রীমতী রমা দেবীর সুহস্তে সাদরে ও সোহাগে যে একটি সুন্দর উৎসর্গরূপী ফুলের তোড়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যভাগে একটি কবিতার পদ্মকরবী বসান আছে—তাহা অতি সুন্দর।

রমার বয়স যখন চারি বৎসর, তখন কবি তাহার নামে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। কন্যা-বৎসল পিতা কন্যাকে বলিতেছেন,—"এখন তুই বড় হইয়াছিস্ ও গল্প শুনিতে খুব ভালবাসিস্, তাই এই বইখানা তোকেই স্নেহের উপহার দিলাম।"

আমরা বলি, শুধু রমা কেন—এই দুঃখদৈন্যপরিপূর্ণ মুমূর্ষুকে ছেলে বুড়া, স্ত্রীপুরুষ, অনেকেই "গল্প শুনিতে খুব ভালবাসে।" কিন্তু আমরা গল্পের মত গল্প পড়িতে পাই কই? সেই ত আপশোষ। অন্নচিন্তা ও গোলামী করিতে করিতেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত। আর Art is long and time is fleeting—clarissa Harlowe'র মত Brobdignang স্লাকারের বৃহৎ উপন্যাস পাঠ করিবার না অবকাশ আছে, না প্রবৃত্তি আছে। অতএব, যাঁহারা আমাদিগকে সুরুচিপূর্ণ, মনোজ্ঞ, ভারতীর সুপবিত্র ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য ছোট গল্প দেন, তাঁহারা আমাদের উত্তমর্ণ—আমরা তাঁহাদের কাছে ঋণী।

অদ্য আমরা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথের কাছেও এই জন্য সবিশেষ ঋণী। যাদুকর কবি রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পর এমন সুমিষ্ট ছোট গল্প পাঠ করি নাই। সব গল্পগুলিই সুন্দর—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুন্দর। বইখানি একবার ধরিলে শেষ না করিয়া উঠিতে পারা যায় না। বাস্তবিক আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পাঠ শেষ করিতে ইচ্ছা করে। যে বাটীতে "মঞ্জুষা" প্রবেশলাভ করিবে, আমাদের বিশ্বাস যে, তথায় ছেলে বুড়ো সকলেই কাড়াকাড়ি করিয়া বইখানা পড়িবেই পড়িবে।—রুচিভেদে কেহ বলিবে, "বুড়ী" গল্পটি গল্পের সেরা; কেহ বলিবে, "লাঠির কথা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কেহ বলিবে, "গ্রীষ্টানের আত্মকথা" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ফল কথা, সব গল্পগুলিই সুন্দর। সহৃদয় পাঠক পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিবেন, ইহা অত্যুক্তি নয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য যে, এই রসলীলাময়ী "মঞ্জুষা" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গদ্য লীলাময়, ছন্দোময়। বড় আক্ষেপের বিষয় যে, গদ্য লিখিতে বসিয়া অনেকেই ভুলিয়া যান যে, গদ্যেরও ছন্দ আছে।

বড় গল্পে গোঁজামিলন চলে; ছোট গল্পে তাহা চলে না। বলা বাহুল্য, খুব পাকা হাত না হইলে ছোট গল্প লেখার প্রয়াস করা বিড়ম্বনামাত্র। যে যে মালে মশলায় ছোট গল্প প্রস্তুত হইতে পারে, তৎসমস্তই সুনিপুণ "মঞ্জুষা"-প্রণেতার আয়ত্তাধীন। নিখুঁৎ ছোট গল্পের কি বিশেষত্ব ও তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য কি কি উপাদানের প্রয়োজন,—পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া সে সব লিপিবদ্ধ করিলে প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ ও 'কোটেশনে' কণ্টকাকীর্ণ হইবে, এই ভয়ে তৎপ্রয়াসে বিরত হইলাম।

লেখকের রচনাভঙ্গীতে নূতনত্ব ও মৌলিকতা আছে। উপদেশ দিবার ভান নাই, ধর্ম্মের গোঁড়ামি নাই, অথচ পাঠান্তে মন পবিত্র ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। লেখাগুলি যেন ফুল-গুলি। যেন কতকগুলি শিউলি ফুল সাজির মধ্যে হাসিতেছে।

পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই গার্হস্থ্য চিত্র। তাই সোনায় সোহাগা হইয়াছে; তাই গল্পগুলি আমাদের সহানুভূতি সহজেই আকর্ষণ করে। সহৃদয় প্রকাশক মহাশয় যথার্থ কথাই বলিয়াছেন,—"অল্পপরিসরে আড়ম্বরহীন সহজ ভাষায় একটি সমগ্র চিত্র চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত করিয়া হৃদয়কে দ্রব করিবার ক্ষমতাতেই লেখকের শিল্পনৈপুণ্য ও বাহাদুরী।" আমরাও বলি, সুধীন্দ্রনাথের লেখন জয়যুক্ত হউক।

গ্রন্থের নামনির্ব্বাচনেও বাহাদুরী আছে। অপর কেহ হইলে "উপন্যাসসমষ্টি", অথবা ঐ প্রকারের কোন ক্যামেশ্ কাটকা গোচের নাম দিয়া পাঠককে বিপন্ন করিতেন।

"মঞ্জুষা"র অর্থ বাক্স। কিসের বাক্স? সম্ভবতঃ নামদাতা তাহা জানেন না। এ ক্ষেত্রে কালিদাস অপেক্ষা মল্লিনাথ বড়। আমরা সুধীন্দ্রবাবুকে ও সহৃদয় পাঠকদিগকে 'বাৎলাইয়া' দিতেছি।—"মঞ্জুষা" একটি আঙ্গুরের বাক্স। হাঁ,—আঙ্গুরের বাক্সে যেমন থাকে থাকে আঙ্গুর সাজান থাকে, এই "মঞ্জুষা"তেও তেমনই থাকে থাকে মধুররসপূর্ণ গল্পের আঙ্গুর সাজান আছে। ইহাতে ভাজাল নাই, কারচুপি নাই। সবগুলিই টাট্‌কা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বিবিধ।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ "সাহিত্য-পরিষদে"র বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভাষার ইতিহাস" নামক যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা "ভারতী"তে প্রকাশিত হইতেছে।

পরদিন রবিবার "পরিষদের" মাসিক অধিবেশনে, পরিষদের অন্যতর সহকারী সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র "শ্রীচৈতন্যের উৎকল-যাত্রা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সারদা বাবুর রচনাটি "প্রবাসী" পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

"পরিষদে"র সহকারী সভাপতি স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক বৎসরের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কংগ্রেসওয়ালাদের মত পরিষদ-ওয়ালারাও বলিতে পারেন, গবর্মেণ্ট "সাহিত্য-পরিষদ" হইতে দুই জন হাইকোর্টের জজ নির্ব্বাচিত করিলেন! সারদা বাবু ও আশু বাবু উভয়েই পরিষদের সহকারী সভাপতি।

পরিষদ হইতে কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রকাশিত করিবার কল্পনা ছিল। এত দিনে পরি

বঙ্গের সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত দেখিতেছি। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় কাশীদাসী মহাভারতের সম্পাদনভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারত-মুদ্রণের ব্যয়ভারও তিনি স্বয়ং বহন করিবার আশা দিয়াছেন। পরিষদের ও বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই।

নববর্ষে বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যে নাটকের বন্যা উপস্থিত। শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। এখন পলী পড়ুক, সাহিত্যক্ষেত্র উর্ব্বর হউক, ভবিষ্যতে সাধনার ফল ফলিবে। নাট্য-জগতে সুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ অনেক নাটক-কার নূতন নাটক লইয়া সমাগত। আশা করি, ইঁহাদের চেষ্টায় আমাদের নাট্যশালার শ্রী ফিরিবে।

প্রথমেই সুপ্রথিত নাটক-কার শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষের "সৎনাম" নাটকের উল্লেখ করিতে হয়। "সৎনাম" ক্ল্যাসিক থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল; 'মুসলমান ভ্রাতাদের অনুরোধে' ও তৃতীয় অভিনয় রজনীতে 'নিরীহ' মুসলমান 'মবে'র 'সবিনয় হল্লা'র প্রভাবে "সৎনামে"র অস্তি নয় স্থগিত হইয়াছে। "সৎনামে"র চরিত্রবিশেষের মুখে মুসলমানের গালি ছিল। তাই মুসলমান সাধারণ বিচলিত হইয়াছিলেন।

সহোদর ভ্রাতাকেও সন্দেশের পরিবর্ত্তে গালি খাইতে অনুরোধ করা যায় না। বৈমাত্রেয় মুসলমান ভায়াদিগকেও আমরা কাবাবের পরিবর্ত্তে কাহারও গালি নির্ব্বিবাদে পরিপাক করিতে বলিতে পারি না। গিরিশ বাবুর নাটকের সমালোচনা ও গালিবিচারের এ স্থল নহে। আমরা কেবল গালাগালি বন্ধ করিবার যে উপায়টি মুসলমান-সমাজ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিতেছি। সে উপায়টি সমীচীন ও শিষ্টতাসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কংগ্রেসের কল্যাণে শিখিয়াছি, মুসলমান আমাদের ভ্রাতা; "সৎনামে"র কাণ্ডে জানিলাম, তাঁহারা আমাদের জ্ঞাতিও বটে। উভয় গোষ্ঠীরই মাথার উপর যখন বিদেশীর নিরপেক্ষ চাবুক সমানভাবে সমুদ্যত, তখন কি এরূপ জ্ঞাতিবিরোধ আত্মকলহ শোভা পায়? এই উপলক্ষে মুসলমানী পত্রবিশেষ যে বিষ উদ্গার করিতেছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমানের সখ্যই জর্জ্জরিত হইতেছে। যে পত্রের ও যে প্রসঙ্গের প্রতিবাদ করিয়া আমরা সাহিত্যকে কলঙ্কিত ও আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে কুণ্ঠিত, সেই পত্র ও সেই প্রসঙ্গ যে শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের অভিমত ও অনুমোদিত হইতে পারে, ইহা আমরা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের অনেক বন্ধু এই ঘটনায় দুঃখিত হইয়াছেন, এবং এই শোচনীয় ঘটনার আলোচনা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে সহিষ্ণু হইতে বলি। কোনও সম্প্রদায়েই গালিবিশারদের অভাব নাই। তাহাদের উক্তি "হাসিয়া উড়াইয়া" দিতে হয়। যাহারা শিষ্টতার প্রথম সূত্রেও বঞ্চিত, তাহারা কৃপার পাত্র। এখন আমাদের আত্মকলহে শক্তিক্ষয় করিবার সময় নয়।

শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "কাল-পরিণয়" লিখিয়া নাট্য-জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ক্ল্যাসিক থিয়েটারে তাঁহার নূতন নাটক "পেয়ার" অভিনীত হইতেছে। "পেয়ারে"র অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ তুষ্টিলাভ করিয়াছেন। রামলাল বাবুর সাফল্যে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। "পেয়ার" মুদ্রিত হইতেছে।

ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ইতিহাস-চর্চ্চার অবসরে গল্প লিখিয়া শ্রান্তিবিনোদ করিতেন। এখন তিনি নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "ঔরঙ্গজেব" নাটক ইউনিক থিয়েটারে অভিনীত

হইতেছে। "ঔরঙ্গজেব" মুদ্রিত হইয়াছে। ঔরঙ্গজেবের প্রায় সমগ্র জীবন হরিসাধন বাবু নাটকের বিষয়ীভূত করিয়াছেন! ইতিহাস, উপন্যাস ও নাটক, তিন পথেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার গতি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। দু' নৌকায় পা প্রসিদ্ধ আছে। হরিসাধন বাবুর পক্ষে তিন নৌকা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামীর "সংসার" নামক একখানি নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। শুনিলাম, "সংসারে"র অভিনয়ে সাধারণের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইয়াছে। রঙ্গালয় দর্শকে পূর্ণ হইতেছে। নূতন ব্রতীর পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। "সংসার" মুদ্রিত হইয়াছে। মনোমোহন বাবুর আর একখানি নাটক "মুরলা"ও মিনার্ভায় অভিনীত হইতেছে।

নবপ্রকাশিত নাটকগুলির মধ্যে গিরিশবাবুর "সৎনাম" ও হরিসাধন বাবুর "ঔরঙ্গজেব" ঐতিহাসিক নাটক। রাসলাল বাবুর "পেয়ারে"র আখ্যানবস্তু রোম্যান্টিক। এখানি ট্র্যাজিডী। মনোমোহন বাবুর "সংসার" সামাজিক বা গার্হস্থ্য নাটক। "মুরলা" শুনিতেছি ঐতিহাসিক। অল্প দিনের মধ্যে পাঁচখানি দৃশ্যকাব্যের আবির্ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, রঙ্গালয়ে একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। প্রকাশিত ও অভিনীত নাটকের কথা শেষ হইল। ভাবী নাটকের পরিচয় ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখিলাম।

"উৎকল-চিত্রে"র লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ "সাবিত্রী লাইব্রেরী"র বার্ষিক অধিবেশনে "বিশ্বামিত্রের তপস্যা" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে যাযাবর দের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবিধ সমস্যা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

বসুমতীর সহকারী সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় পাঠকসমাজে সুপরিচিত। দীনেন্দ্র বাবু বঙ্গভূমির সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর চির-উপাসক। বাঙ্গালার পল্লীশ্রীর অনেক চিত্র ও পল্লীবাসীর বিবিধ সুখ দুঃখের বহু কাহিনী এই ভাবুক ভক্তের ঐন্দ্রিজালিক তুলিকার স্পর্শে সমুদ্ভাসিত ও সাহিত্যভাণ্ডারের চিরন্তন সম্পদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ পল্লীচিত্রচয়নে দীনেন্দ্রবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। দীনেন্দ্রবাবুর এই শ্রেণীর রচনাগুলি এতদিন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। সুখের বিষয়, সম্প্রতি দীনেন্দ্রবাবু এইরূপ কতিপয় চিত্র একত্র সঙ্কলিত করিয়া "পল্লীচিত্র" নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। আশা করি, দীনেন্দ্রবাবুর "পল্লীচিত্র" সাহিত্য-সমাজে সাদরে অভিনন্দিত হইবে।

সার চার্লস ষ্টীভেন্স কিছু দিন বাঙ্গালার ছোট লাট ছিলেন। সার চার্লসের দুহিতা কুমারী নিনা ষ্টীভেন্স "The Perils of Sympathy" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইতেছে, অচিরে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকের কিয়দংশে রাজধানীর সমাজের প্রসঙ্গ আছে। কুমারী ষ্টীভেন্স কলিকাতার সমাজে কিছুকাল বাস করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "প্রবাস-চিত্রে"র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। "প্রবাস-চিত্র" সুপাঠ্য সুরুচিসঙ্গত নির্দ্দোষ গ্রন্থ, সুতরাং এ দেশে এত শীঘ্র তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইবার কথা নহে।

উপবেদ ও উপাঙ্গ।

এ দেশে পূজনীয়তায় বেদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোনও পণ্ডিতের মত সেশ্বর হউক, বা নিরীশ্বর হউক, তিনি যদি বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাহা হইলেই তাঁহার মতবাদ আর্য্যসমাজে স্থানলাভ করিল। বেদকে অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও নাস্তিক-নাম লাভ করিতে হইত। প্রাচীন ভাষায় নাস্তিকতার অর্থ Atheism নহে; "অস্তি" লোক, বা পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসের নাম নাস্তিকতা। কিন্তু বেদ অগ্রাহ্য করিলেও লোককে নাস্তিক বলা হইত; কারণ, ঐ ব্রহ্মনিশ্বসিত বাণী হইতেই "অদৃষ্ট" বিষয়ের স্থিতির জ্ঞান উপলব্ধ হয়। এই জন্যই সাংখ্যদর্শন বেদবিহিত ধর্ম্মানুশাসনিরত সমাজে গ্রাহ্য হইয়াছে; এবং ত্রিপিটক উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যে সকল বিদ্যা, শাস্ত্র, বা মতবাদের সহিত বেদের কোনও সংস্রব নাই, যে সকল পৌরাণিক কথা বেদের ভিত্তিতে আদৌ প্রতিষ্ঠিত নহে, এবং যে সকল ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অবৈদিক, সেগুলিকেও কোনও প্রকারে বেদের ছায়াস্পর্শে পবিত্র করিয়া লোকগ্রাহ্য করিতে হইয়াছিল। এই জন্য বৈদিকযুগের বহুপরবর্ত্তী অনেক রচনা বেদের শাখাবিশেষের অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল।

মহাভারতের সময়ে, অথবা মহাভারত গ্রন্থের মধ্যে, যে সকল উপবেদ ও উপাঙ্গের নাম পাওয়া যায়, মনোযোগপূর্ব্বক সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ দেশের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের জন্য অনেক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে।

মহাভারতে তিনটি উপবেদ সুস্পষ্ট উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও গান্ধর্ব্ববেদ। মহাভারতের যে অনুক্রমণিকাটি নানা কারণেই পরবর্ত্তী রচনা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, উহাতে বাস্তবিদ্যার কথা পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ে উপাঙ্গের মধ্যে ঐ বিদ্যাটি স্থাপত্যবেদ নামে অভিহিত হইয়াছে। মহাভারতে কিন্তু উহা উপবেদ বলিয়া স্থান পায় নাই, কেবল বাস্তবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে; যাহাকে স্থাপত্যবিদ্যা বলে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে তাহা ছিল; মহাভারতের পরবর্ত্তী সময়ে উহা উপবেদের মধ্যে গণিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে এত বড় বিদ্যাটা উপবেদ সংজ্ঞা পায় নাই কেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যে স্থলে বিশেষ করিয়া বেদাঙ্গ ও উপবেদের উৎপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেখানে বাস্তবিদ্যার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই।

শান্তিপর্ব্বের ২১০ অধ্যায়ে বৃহস্পতিকে সর্ব্বপ্রকার বেদাঙ্গের কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। উপবেদগুলি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, আয়ুর্ব্বেদের (চিকিৎসা) প্রবর্ত্তক কৃষ্ণাত্রেয়, ধনুর্ব্বেদের (যুদ্ধবিদ্যা) প্রবর্ত্তক ভরদ্বাজ, এবং গান্ধর্ব্ববেদের (সঙ্গীতশাস্ত্রাদি) প্রবর্ত্তক নারদ। ষষ্ঠ ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীতে ভরতকে গান্ধর্ব্ববিদ্যার প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। এই প্রকারের ক্ষুদ্র প্রভেদও লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন আছে।

১ম, আয়ুর্ব্বেদ। শারীরিক প্রকৃতি, বিকৃতি, দ্রব্যগুণ প্রভৃতির কথা মহাভারতে অত্যন্ত অধিকপরিমাণে উল্লিখিত আছে। আস্তিক পর্ব্বের সাগরমন্থন-উপাখ্যান যে পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত রচনা, তাহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ নাই। (১) সমগ্র মহাভারতের মধ্যে অন্য কোনও সাগর-মন্থনের কথা নাই; (২) সাগরমন্থন উপাখ্যানে শিব ও বিষ্ণুর যে সকল চরিত্র ও প্রকৃতির কথা নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ দেবতাদ্বয়ের অন্য স্থলের বর্ণনার সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিরোধ দৃষ্ট হয়; (৩) মূল মহাভারতে মহাদেবের নীলকণ্ঠ হইবার ইতিহাস প্রভৃতি ও দেবতাদিগের অমরত্বের কথা যে ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সাগরমন্থনের কথা প্রচলিত থাকিলে, তাহা অনুল্লিখিত থাকিত না, অথবা অন্যবিধ ইতিহাস প্রদত্ত হইত না; (৪) অনুক্রমণিকার আস্তিক পর্ব্বটাই মহাভারতের অঙ্গ কি নহে বলিয়া স্রোতি নিজে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন; এরূপ স্থলে ঐ পর্ব্বের অন্তর্গত একটা অসংলগ্ন, অপ্রয়োজনীয় ও নিকৃষ্ট ভাষায় রচিত অধ্যায় যখন মূল মহাভারতের বিবৃত কথার বিরোধী, তখন তাহা কদাচ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই সাগরমন্থনকথার মধ্যে ধাতু ভস্ম করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবার বিদ্যা সূচিত হয়; অন্য কুত্রাপি তাহা পাওয়া যায় না। মহাভারতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অন্য প্রমাণের দ্বারা ইহা হয় ত নিশ্চিত হইতে পারে, যে ধাতুভস্ম কোন্ সময় হইতে প্রথম ব্যবহৃত। তাহা জানিতে পারিলে প্রক্ষিপ্ত রচনাটার সময়নির্ণয় হইতে পারে। এ বিষয়ে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কিছু পাইলাম না। সভাপর্ব্বের যে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পণ্ডিতেরা অভিহিত করিয়াছেন, সেই অংশে এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট বা খিলভাগ হরিবংশে, চিকিৎসাশাস্ত্র অষ্টাঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত আছে। অন্য কুত্রাপি ঐ কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাবধানতার জন্য সন্দেহযুক্ত অংশ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াও দেখিতে পাই, যে, মহাভারতের মধ্যে রক্তসংক্রমণ-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্বের ১৮৫ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে;—"প্রস্থিতা হৃদয়াৎ.....বহন্ত্যন্ন-

রসান্ নাড্যঃ।[৪] যে সকল প্রাণবায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ঐ কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া উল্লেখ আছে, সেই বায়ুগুলি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা এ কালের চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদেরা স্থির করিতে পারেন। কিন্তু নাড়ীগুলি হৃদয় হইতে প্রস্থিত অন্নের রস বহন করিয়া লইয়া যায়, ইহা সুস্পষ্ট।

২য় ধনুর্ব্বেদ। প্রাচীনকাল হইতে যাঁহারা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐ বিদ্যাসম্বন্ধীয় সূত্র ও গ্রন্থ নিশ্চয়ই রচিত হইয়াছিল। এ কালে ঐ উপবেদ স্বতন্ত্রভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না বটে, কিন্তু রামায়ণে ও মহাভারতে ঐ বেদ ও বিদ্যার প্রাধান্য যে ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীনকালে উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল, সন্দেহ নাই। মহাভারত ও রামায়ণে যুদ্ধের কথা ও বর্ণনা পড়িলেই এমন অমানুষিক অসম্ভব কথার অবতারণা পাওয়া যায় যে, প্রাচীন যুদ্ধরীতি ও ধনুর্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে কতকগুলি অনুমান করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। যে সময়ে যথার্থই আর্য্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যশস্বী হইতেন, সে সময়কার যুদ্ধপ্রণালী জানিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অতি প্রাচীনকালের দৈববলে বলী পুরুষদিগের যুদ্ধবর্ণনায় যাহা লিখিত হইয়াছে, হয় ত ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে অনৈসর্গিকতা আরোপিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই রচনাকালের যথার্থ যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি কুত্রাপি সুস্পষ্ট হয় নাই।

৩য় গান্ধর্ব্ববেদ। সঙ্গীতের মধ্যে, গীত, নৃত্য বাদিত্র-বাজনা পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া সপ্তস্বর ও তিনটি গ্রামেরও উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত সভাপর্ব্বে ব্রহ্মার সভার বর্ণনায় নাটক অভিনয়ের কথা আছে। গান্ধর্ব্ব-বেদের প্রবর্ত্তক সর্ব্বত্রই যখন নারদ বলিয়া উল্লিখিত, এবং অন্যত্র কোথাও যখন ভরতের কথা ঐ প্রসঙ্গে মহাভারতে পাওয়া যায় না, তখন স্বয়ং নারদ কর্ত্তৃক বর্ণিত সভাকথায়, "নাটক" উল্লিখিত দেখিলে সাবধানপূর্ব্বক মীমাংসা করিতে হয়। নাটক প্রথমতঃ নৃত্য হইতে উদ্ভূত। তাহার পর উহার বিকাশ সূত্রধারের সূত্রসংযুক্ত পুত্তলিকার অভিনয়ে। সূত্রধার-কৃত অভিনয়ের কথা সুবিস্তৃত মহাভারতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাণিনিতে যখন নটসূত্রের উল্লেখ আছে, তখন, সঙ্গীত নৃত্যাভিনয় ও পুত্তলিকা দ্বারা অভিনয় যে মহাভারত-রচনা-কালে অপরিচিত ছিল, তাহা মনে হয় না। মহাভারতে সকল প্রচলিত পুরাণ, আখ্যায়িকা, বিদ্যা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইবে বলিয়া অনুক্রমণিকায় যখন নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন উল্লেখযোগ্য স্থলে নাটকের কোনও উল্লেখ না থাকায়, কালিদাসাদির নাটকের মত জিনিসের তখন সৃষ্টি হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। যে অধ্যায়ে অতিপরবর্ত্তী

সময়ের ৬৪ কলার কথা আছে, তাহা গ্রহণ করিতে গেলে মহাভারতকে অর্ব্বাচীন করিতে হয়। ঐ উল্লেখ যে পরবর্ত্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত, তাহা বিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করিতেছেন।

তাহা হইলে মহাভারতে তিনটি উপবেদের কথাই কেবল পাওয়া গেল। আয়ুর্ব্বেদের কথায় এ কালের কফ পিত্ত শ্লেষ্মাদিভাগ ঠিক তেমনই পাওয়া যায়; এবং অনেক আভ্যন্তরিক জ্ঞান বিশদ ছিল বলিয়া ধরিতে পারা যায়। গান্ধর্ব্ব-বেদের প্রসঙ্গেও নৃত্য, গীত, ত্রিগ্রাম, সপ্তস্বর, সাধারণ বাদ্যযন্ত্র ও তন্ত্রীযুক্ত যন্ত্রের পরিচয় পাইতেছি। ধনুর্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; অথচ সমগ্র মহাভারত বিপুল যুদ্ধের কথা লইয়া রচিত। মল্লযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, খড়্গাদি অস্ত্রযুদ্ধ, বাণনিক্ষেপ, যুদ্ধসময়ে অশ্বযুক্ত-রথ-চালনা প্রভৃতি কথারও যুদ্ধের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক দূর পর্য্যন্ত কল্পনা করা চলে। গোলা বারুদ ব্যবহারের পূর্ব্বে কোন দেশের যুদ্ধের বৃত্তান্ত হইতে এতদধিক কথা পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালের আগ্নেয়াস্ত্র জিনিসটা সত্য কি কল্পনা, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। জিনিসটির যখন বিশেষ বিবরণ নাই, তখন ঐ অস্ত্র সত্য সত্য ছিল কি না, এবং থাকিলেও উহা সাধারণ কোনও অগ্নি-উৎপাদক পদার্থ কি না, তাহার সিদ্ধান্ত করা কঠিন। শুক্রাচার্য্যের নামে প্রচলিত নীতিগ্রন্থের 'নলিকা' কথা লইয়া যে সকল তর্ক বিতর্ক হইয়াছে; তাহা হইতেও কোনও প্রত্যয়যোগ্য সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মৃত্যুমুখে।

১

নিদাঘের দীপ্ত রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন কেবল অপরাহ্নে পরিণত হইয়াছে। একটি বৃহৎ অট্টালিকার অন্তঃপুরস্থ একটি কক্ষে বসিয়া গৃহস্বামিনী ভাবিতেছেন, যখন স্বামী মফঃস্বলে জেলার আদালতে নব্য উকীল ছিলেন, তখন ভাল ছিল, কি এখন ভাল হইয়াছে। তখন অর্থের অভাব ছিল সত্য, কিন্তু স্বামীর অবসরের অভাব ছিল না। মোকদ্দমার অভাবে স্বামীকে প্রায় কোন দিনই আদালত উঠা পর্য্যন্ত আদালতে থাকিতে হইত না। বাড়ীতেও মক্কেল দুর্ল্লভদর্শন ছিল। সেই যৌবন-উষায় শতআশা-মুকুলিত-হৃদয় স্বামী স্ত্রীর অবসরের অন্ত ছিল না।

সংসারেও আর কেহ ছিল না। অর্থ যেমন অল্প ছিল, অবসরও তেমনই সামান্য ছিল। পতি পত্নীর পরস্পরের সঙ্গলাভসুখের সীমা ছিল না। মধ্যে মধ্যে কারণে অকারণে অভিমানে প্রেম কেবল সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত। ইহার পর আর আদালতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, স্বামীর আশাও প্রসার প্রাপ্ত হইল। শেষে আর আদালতের সর্ব্বোচ্চ উকীলের সম্মান আর তাঁহার উচ্চাশাকে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। যে বেষ্টনের সীমালাভ একদিন তিনি অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, ক্রমে সে বেষ্টন একান্ত সংকীর্ণ বোধ করিয়া বাহিরে বৃহত্তর স্থান ও মান-জয়ের আশায় তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আসিলেন। আসিয়া তাঁহার যশ ও অর্থ উভয়ই পর্য্যাপ্তপরিমাণে লাভ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবসরের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। পল্লীগ্রামের সেই অজ্ঞাত যুবক, আজ কলিকাতার ফেনিলাবর্ত্ত-বহুল সমাজের এক জন অলঙ্কার। স্বীয় ক্ষমতায় প্রভাতচন্দ্র আজ কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকীলদিগের মধ্যে এক জন। প্রভাত হইতে গৃহে মক্কেলের ভিড়; তাহার পর আদালত। আদালতের পর সভা, সমিতি, সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করিয়া শ্রান্ত প্রভাতচন্দ্র গৃহে ফেরেন। কিন্তু তখনও বিশ্রাম নাই—কোন কোন নাছোড়বান্দা মক্কেল, তখনও সাক্ষাৎ না করিয়া ছাড়ে না; তদ্ভিন্ন পরদিবসের মোকদ্দমার নথিপত্র ঘাঁটিতে হয়—আইন ও নজীর পাঠ করিতে হয়। এক এক দিন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত না হইলে প্রভাতচন্দ্রের শয়নের অবসর ঘটে না। স্বামীর যশ, অর্থ ও সম্মান,—সবই যথেষ্ট হইয়াছে। লোকে কুসুম-কুমারীর সৌভাগ্যের কথা বলে; স্বামীর সৌভাগ্যে কুসুমকুমারীও আপনাকে সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করেন; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার মনে হয়, স্বামীর অন্য সকল কার্য্য তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। তখন হৃদয় কেমন বেদনাচঞ্চল হইয়া উঠে।

আজ নিদাঘের রৌদ্রতপ্ত দিবসে বৃহৎ অট্টালিকার সুসজ্জিত মর্ম্মরমণ্ডিত কক্ষে বসিয়া কুসুমকুমারী সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় সপ্তবর্ষবয়স্ক পুত্র অশোক ব্যস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা, জামাইবাবু আসিয়াছেন।"

জামাই! যে ধনীর পুত্র জামাতাকে বহুবার নিমন্ত্রণ করিয়াও তাঁহারা প্রায় আনিতে পারেন নাই—যাহার পিতার নিকট গর্ব্বিত প্রভাতচন্দ্রকে উচ্চ শির নত করিতে হইয়াছে, সেই জামাতা আজ বিনা নিমন্ত্রণে অসময়ে স্বয়ং শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে—এ সৌভাগ্যে কুসুমকুমারীর নয়ন আনন্দ-দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার নয়নে সে দীপ্তি ফুটিতে না ফুটিতে, নিদাঘের মেঘে বিদ্যুতের মত মিলাইয়া

গেল। তিনি আপনার কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর কুসুমকুমারী জামাতাকে আনিবার জন্য পুত্রকে পাঠাইলেন।

২

অতি অল্প বয়সেই প্রভাতচন্দ্র ইংলণ্ডে যাইবার দুরাশা হৃদয়ে [illegible] করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন; তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী কে[illegible] ছিলেন না। কিন্তু যে দোষে গুণীর গুণ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য—সকলই অজ্ঞাত রহিয়া যায়, সেই দারিদ্র্য দোষেই তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু প্রভাতচন্দ্রের ইংলণ্ড-গমন সম্ভব না হইয়া উঠিলেও, তিনি আপনার মেজাজটিকে যথাসম্ভব ইংরাজী করিয়া তুলিয়াছিলেন। আপনাকে নেক্‌টাই ও হ্যাটের পরিবর্ত্তে চাপকান ও শামলা পরিতে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি ছেলেদের ইংরাজী বেশেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ছেলেদের ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়াছিলেন, এবং কন্যা নির্ম্মলাকেও ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া পিয়ানো ও পশমের কাজে অভ্যস্তা করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এ দিকে এত করিয়াও শেষকালে বিষম ভ্রম করিয়াছিলেন; বিবাহদানকালে কন্যার শিক্ষা ও সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া "বড়লোকে"র সহিত কুটুম্বিতা-সংস্থাপনের দারুণ দুরাশায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। জামাতা ললিতমোহনের পিতা প্রসিদ্ধ সুদখোর—বণিগ্‌বৃত্তিতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া, তিনি আপনার বাড়ীটি পাড়ার আর সকল বাড়ী অপেক্ষা উচ্চ করিতে ও আপনাকে আর সকলের অপেক্ষা উচ্চ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গভর্মেণ্ট-সংসৃষ্ট ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করিয়া তিনি প্রথমে "রায়বাহাদুর", ক্রমে "রাজা" উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করেন। তিনি আপনাকে অসাধারণ ব্যক্তি মনে করিতেন, এবং বৈবাহিক প্রভাতচন্দ্রকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন শ্বশুরালয়ের অনুমতি ব্যতীত তিনি কন্যাকে কোথাও নিমন্ত্রণাদিতে না পাঠান।

আজ কুসুমকুমারী সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া—স্বামীকেও না জানাইয়া, কন্যা নির্ম্মলাকে প্রভাতচন্দ্রের কোনও বন্ধুর গৃহে একটা বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই কন্যা ফিরিয়া আসিবে; ইহারই মধ্যে যে স্বপ্নাতীত ব্যাপার ঘটিবে—জামাতা আসিবেন, ইহা তাঁহার কল্পনাতেও আইসে নাই। সেই জন্য ভয়ে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

তবুও কুসুমকুমারী প্রকৃত কথা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যেখানে নির্ম্মলাকে নিমন্ত্রণে পাঠাইয়াছিলেন, জামাতা ললিতমোহনও সেই গৃহে নিমন্ত্রণে

গিয়াছিল। ললিতমোহন যখন দ্বারে অবতরণ করিতেছিল, সেই সময়ে যে গাড়ী বাড়ীর অন্তঃপুরের দিকে যাইতেছিল, তাহার অধিকারিণীকে দেখিয়া ললিতমোহনের সন্দেহ হয়;—সেই সন্দেহভঞ্জনার্থই তাহার শ্বশুরালয়ে পদার্পণ।

ললিতমোহন শ্বশুরালয়ে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিল না; কুসুমকুমারীর সযত্ন-জ্বত আহার্য্য "অসময়" বলিয়া আহার করিল না; সত্বরই গৃহে ফিরিয়া গেল। বুঝিল, তাহার সন্দেহ সত্য। কারণ, নির্ম্মলা গৃহে থাকিলে তাহার সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ ঘটিত। অধিকন্তু গাড়ীতে যাইবার সময় শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিলে সরল বালক বলিল, "দিদি নিমন্ত্রণে গিয়াছে।"

উপরের জানালা হইতে কুসুমকুমারী পুত্রের এই উত্তর শুনিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

ললিতমোহন গাড়ীতে উঠিয়া যান-চালককে গৃহে যাইতে আদেশ করিল। কুসুমকুমারী মেজেয় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি কেন এ দুষ্কর্ম্ম করিলাম? না জানি ইহাতে কি অনর্থ ঘটিবে! স্বামী কি বলিবেন? লোকে শুনিলেই বা কি বলিবে? মেঘবৃষ্টি-ভয়ঙ্করী নিশার পার্ব্বত্য পথে পথভ্রান্ত পথিক সহসা বিদ্যুদালোকে সম্মুখে গভীর গহ্বর দেখিলে যেমন শিহরিয়া উঠে, আপনার কৃত কর্ম্মের ফল চিন্তা করিয়া কুসুমকুমারী তেমনই শিহরিয়া উঠিলেন।

৩

গৃহে আসিয়া বস্ত্রাদিপরিবর্ত্তন করিয়া ললিতমোহন সকল কথা বলিবার জন্য জননীর নিকট গমন করিল।

এ দিকে রাজাবাহাদুরের সেদিন কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার কথা। বাড়ীর নিকটে নিমন্ত্রণ; পুত্র নিমন্ত্রণ হইতে প্রত্যাগত হইলে তিনি সেই গাড়ীতে যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। সহিসদের উপর আদেশ ছিল, "কুমারবাহাদুর" ফিরিয়া আসিলে তাহারা ঘোড়া না খুলিয়া সংবাদ দেয়, তিনি গাড়ীতে যাইবেন। সহিস আসিয়া নিবেদন করিল, বড় জুড়ী তিন চার দিন জোতা হয় নাই, আজ বড় ধূপ—অনেকটা ঘুরিয়া আসিয়াছে; আর খাটান নিরাপদ হইবে না। অনেকটা কোথায় ঘুরিয়া আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় সহিস বলিল, কুমারবাহাদুর শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন।

সহিসকে অন্য জুড়ী জুতিবার আদেশ দিয়া রাজাবাহাদুর পুত্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। ভৃত্যললিতমোহনের খাস খানসামার নিকট সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, "কুমারবাহাদুর অন্তঃপুরে।"

পুত্রের নিকট সকল কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "বটে!" এমন সময় রাজা-বাহাদুর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কিছু গম্ভীরস্বরে পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন, "ললিত, তুমি আজ বিনা নিমন্ত্রণে শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলে?"

পুত্রের জননী পুত্রের নিকট শ্রুত বিবরণ বিবৃত করিলেন, এবং বৈবাহিক ও বৈবাহিকার দুঃসাহসের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিলেন।

পুত্র তাঁহার "রাজ"সম্মানের হানি করিতেছে ভাবিয়া রাজাবাহাদুর তাহার প্রতি যে পরিমাণ বিরক্ত হইয়াছিলেন, সে তাঁহার "রাজ"সম্মান-রক্ষায় সচেষ্ট জানিয়া, তিনি তাহার প্রতি সেই পরিমাণ সন্তুষ্ট হইলেন। পিতার আশা হইল, তাঁহার আদর্শে চলিলে পুত্র তাঁহার অর্জ্জিত সম্মান বর্দ্ধিত করিতে না পারিলেও, (কারণ দিনকাল বড়ই খারাপ পড়িয়াছে) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইতে পারিবে। সেই কি সামান্য কথা? বৈবাহিককে পত্র লিখিয়া, পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে ভাবিতে পিতা গৌরাঙ্গদর্শনে গমন করিলেন।

৪

কুসুমকুমারীর বিশেষ ভয় ছিল, স্বামী কি বলিবেন? কিন্তু তাঁহার শঙ্কিত দিক হইতে বিপদ আসিল না। প্রভাতচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া বৈবাহিকের পত্র পাইলেন,—

"আমি আপনাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, আমার অনুমতি ব্যতীত বধূমাতাকে নিমন্ত্রণাদিতে পাঠাইবেন না। শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, আপনি সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন। আমি ইহার জন্য আপনার নিকট কৈফিয়ৎ চাহি। আমার পুত্রের সহিত বিবাহ হওয়ায় আপনার কন্যা, সমাজে আপনার অপেক্ষা উচ্চ স্তরে উন্নীতা হইয়াছেন। আপনি যদি তাঁহার উপযুক্ত সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারেন, এবং আপনা হইতে আমার সম্মানের হানি হয়, তবে আমি আপনার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইব। আপনার অন্যকার অপরাধ ইচ্ছাকৃত, আমি ইহার কারণ জানিতে চাহি।"

পত্র পাইয়া প্রভাতচন্দ্র একান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। গণ্ডারের ক্রোধ যেমন সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই উৎখাত করে, ক্রোধের কারণ পার্শ্বে থাকিলেও তাহাকে স্পর্শ করে না, প্রভাতচন্দ্রের ক্রোধও তেমনই প্রথম যাহাকে পাইত, তাহারই উপর আপনার বেগ ব্যয়িত করিত। অন্য দিন বা অন্য সময় হইলে প্রভাতচন্দ্র পত্নীকেই নিতান্ত অপরাধিনী বিবেচনা করিতেন; কিন্তু আজ এই পত্র পাইয়া তিনি পত্নীর অপরাধ একান্ত মার্জ্জনীয় মনে করিলেন, এবং সমস্ত দোষই বৈবাহিকের স্কন্ধে অর্পিত করিয়া উত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন,—

"আপনার ঔদ্ধত্য ও অবিনয় প্রকাশক পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আপনি পত্রে পদে পদে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। আপনার নিকট আমি কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি—সেরূপ সর্ত্তে কন্যার বিবাহ দিই নাই। আমার কন্যাকে আমার বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণে পাঠানয়, আপনার কোনরূপ অপমান হয় নাই। আমার বন্ধু বা আমি আপনার অপেক্ষা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ দেখি না। আপনি যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া খেতাব পাইয়াছেন, সে পরিমাণ অর্থব্যয়ের ক্ষমতা আমার যে নাই, এমন নহে। তবে আপনার মত তোষামোদে ব্যয় করি, এত দূর আত্মসম্মানজ্ঞানহীন—অধঃপতিত হই নাই। আপনি যে অভিমানে সম্ভবতঃ খেতাবহীন পূর্ব্বপুরুষের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করিবেন, সে অভিমান আমার ও আমার মত অন্য ভদ্রলোকের বিবেচনায় প্রশংসনীয় নহে—পরন্তু বর্জ্জনীয়। আমি আপনার ঈপ্সিত সম্মান ঘৃণায় পরিহার করিবার মত ক্ষমতা ও মানসিক বল রাখি। আপনি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে আমার দুঃখিত হইবার বিশেষ কারণ দেখি না। পত্রে যে অবিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, যদি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সৎসাহস থাকে, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিবেন; নচেৎ আপনার সহিত পত্রব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি না।"

এই পত্র পাইয়া রাজাবাহাদুর একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বৈবাহিকের স্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন,—ভাল, কন্যার পিতার এত স্পর্দ্ধা! সাধিয়া আনিয়া কন্যা আমার বাড়ী রাখিয়া যাইতে হইবে। তখন দেখিব, এত স্পর্দ্ধা কোথায় থাকে!

প্রভাতচন্দ্রও স্থির করিলেন, কন্যা আমার এমনই গলগ্রহ হয় নাই যে, আমি সাধিয়া তাহাকে রাখিয়া আসিব। তাহা হইলে শ্বশুরালয়ে তাহার মান থাকিবে না। সে কার্য্য আমি কিছুতেই করিব না।

কুসুমকুমারীর সামান্য অনবধানতায় যে এত অনর্থ ঘটিবে, তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল?

৫

এক বৎসর কাটিয়া গেল। রাজাবাহাদুর পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন না, এবং বৈবাহিকের দ্বারে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইবার সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া রহিলেন, কখনই যাচিয়া বধূকে আনিবেন না। কেবল 'সাহেব'রা কি বলিবে বলিয়া তিনি পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিতে পারিলেন না।

এ দিকে কুসুমকুমারীর সহস্র অনুরোধ ও অজস্র ক্রন্দনেও প্রভাতচন্দ্রের সঙ্কল্প টলিল না; তিনি কিছুতেই সাধিয়া কন্যাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিতে সম্মত হইলেন না।

কুসুমকুমারীর বক্ষে যেন গুরুভার চাপিয়া রহিল; তাঁহারই দোষে কন্যার এ দুর্দ্দশা!

* * * * *

নির্ম্মলা গৃহে অসিয়া সব শুনিল। শ্বশুরের আদেশের কথা সে জানিত না; জানিলে সে নিমন্ত্রণে যাইত না। একবার তাহার মনে হইল, স্বামীকে লিখিয়া দেয়, তাহার অপরাধ নাই। পরক্ষণেই মনে হইল, কেমন করিয়া সে স্নেহশীলা মাতার স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া আপনার স্বার্থের সন্ধান করিবে? শেষে সে স্থির করিল, স্বামীকে পত্রের উত্তরে প্রকারান্তরে এ কথার উত্থাপন করিয়া ক্রমে সব বুঝাইয়া বলিবে। কিন্তু হায়!—স্বামীর পত্র আর আসিল না।

ললিতমোহনের ইচ্ছা হইয়াছিল, সে পত্নীকে পত্র লিখিয়া জানিবে, নির্ম্মলা জানিয়া অপরাধ করিয়াছে কি না? হায়! সে যুবক, তাহার অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণা সেই সদ্যঃপরিণীতা পত্নীকে বেষ্টন করিয়া ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চে সহস্র মায়ালোকের রচনা করিয়াছিল। কিন্তু কি লিখি, কেমন করিয়া লিখি—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে কয় দিন কাটিয়া গেল। তত দিনে ললিতমোহন বুঝিতে পারিল, স্ত্রী নিরপরাধা হইলেও পিতৃআজ্ঞা ব্যতীত সে তাহাকে আনিতে পারিবে না। তখন সে আপনার কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিল। সে আপনাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া বুঝিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান বাড়িতে লাগিল—অথচ উভয়েই মিলনলালসায় ব্যাকুল। অদৃষ্টের এমনই উপহাস!

নির্ম্মলা দিন দিন শুকাইতে লাগিল—যেন নিদাঘসন্তাপে অচিরোদ্গত মঞ্জরী ম্লান হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, কোনও অসুখ নাই। চিকিৎসকও পরীক্ষা করিয়া কোনও রোগের লক্ষণ দেখিতে পান না; কিন্তু সে দিন দিন শুকাইতে লাগিল। সে রোগ চিকিৎসক ধরিতে না পারিলেও কুসুমকুমারীর মাতৃহৃদয় তাহা বুঝিতে পারিল। কুসুমকুমারী স্বামীকে বলিলেন, "মেয়ের দশা ত দেখিতেছ। আর কি হইবে,—নিজে গিয়া মেয়েকে রাখিয়া আইস।" প্রভাতচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি সাধিয়া দিতে যাইলে যদি তাহারা না লয়, বা লইয়া কথায় কথায় মেয়েকে বলে যে, সে আদরের নহে, অনাদরের,—আমি সাধিয়া তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছি, তবে সে অপমান মেয়ের সহিবে না। আমি সে কার্য্য

করিতে পারিব না।" কুসুমকুমারী নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু মাতৃহৃদয়ে অহরহঃ বেদনা জাগিতে লাগিল। কন্যার মুখ চাহিয়া তিনি কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রভাতচন্দ্র অবসর পাইলেই কন্যার সহিত গল্প করিতেন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন,—সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; কন্যা দিনদিন শুকাইতে লাগিল;—তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসি শরতের বর্ষণশীর্ণ লঘু মেঘে বিদ্যুতের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল—রক্তাভ পূর্ণ গণ্ডে অস্থি দেখা দিল।

এমনই করিয়া আরও এক বৎসর কাটিল। এক বৎসর পরে চিকিৎসকগণ গম্ভীরমুখে বলিলেন, "যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে।" প্রভাতচন্দ্রের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

৬

এই সময় ঈপ্সিত "মহারাজা" খেতাব লাভ করিবার পূর্ব্বেই অপূর্ণসাধ রাজা-বাহাদুরকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। ললিতমোহন পিতৃহীন হইল। যে 'সাহেব'দের সেবায় রাজাবাহাদুর জীবনে যত্নের অবধি রাখেন নাই, তাঁহারা মৃত রাজাবাহাদুরকে বিস্মৃত হইলেন না; যথাকালে ললিতমোহন তাঁহাদিগের নিকট হইতে সান্ত্বনা ও সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র পাইল।

শেষকালে রাজাবাহাদুর পুত্রকে আপনার অভ্যস্ত কার্য্যে যৌবরাজ্যে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই। কোনও কাযেই ললিতমোহনের মন বসিত না। সে বুঝিয়াছিল, তাহার এক দিনের ভ্রমে সে জীবনের সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়াছে,—তাহার জীবন-রসন্তের কুসুম বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যে স্থানে পুষ্পিতক্রমলতাচ্ছাদিত বিহগ-বিরাবিত রম্য উপবন রচনার আশা করিয়াছিল, সে স্থানে অনলশ্বাসী দগ্ধ মরুমাত্র রচিত হইয়াছে। এই দারুণ দুশ্চিন্তায় ললিতমোহনের আর কোনও কাযেই মন বসিত না। নির্ম্মলার সেই সারল্যভূষণ অসঙ্কুচিত মুখচ্ছবি সে মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় হইতে অন্তরিত করিতে পারিল না।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে ললিতমোহন মনে করিতেছিল, প্রভাতচন্দ্রকে পত্র লিখিবে। কিন্তু এতদিন পরে সহসা কি লিখিবে, সে তাহাই ভাবিতেছিল। শেষে সে স্থির করিল, পিতার শ্রাদ্ধের পর যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

শ্রাদ্ধের পরদিন ললিতমোহন প্রভাতচন্দ্রের পত্র পাইল। প্রভাতচন্দ্র নির্ম্মলার স্বাস্থ্যের আশায় সপরিবারে পাহাড়ে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া আশানুরূপ দূরে থাকুক, তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতিই লক্ষিত হয় নাই।

দিন নিতান্তই ফুরাইয়া আসিল। তখন কন্যার শেষ ইচ্ছার কথা শুনিয়া পত্নীর অনুরোধে প্রভাতচন্দ্র ললিতমোহনকে পত্র লিখিলেন। কন্যার পীড়ার কথা, বর্ত্তমান অবস্থা—লিখিয়া প্রভাতচন্দ্র লিখিলেন, "নির্ম্মলার শেষ ইচ্ছা বলিয়া আমি এতদিন পরে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তাহার বাঁচিবার আর অধিক দিন নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। নহিলে তাহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতাম। কিন্তু তাহার আর পথশ্রম সহিবে না। সেই জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে একবার এখানে আসিবে। আশা করি, অবস্থা বিবেচনা করিয়া তুমি এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। আসিবার সময়নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে সংবাদ দিলে ষ্টেশনে আমার লোক তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে।"

পত্র পড়িয়া ললিতমোহনের চক্ষুর সম্মুখে জগতের আলোক যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সে কি তাহার ভ্রমসংশোধনের অবকাশও পাইবে না—মিলনমুখে চিরবিচ্ছেদের অন্ধ অন্ধকার তাহার জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে? সে কীটদষ্ট কুসুমের দশাপ্রাপ্ত পীড়িতা পত্নীর পাণ্ডুর মুখচ্ছবির কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল। হৃদয় দারুণ বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

পর দিবস কাহাকেও আপনার গন্তব্য স্থানের কথা না বলিয়া ললিতমোহন যাত্রা করিল।

৭

ললিতমোহন যখন প্রভাতচন্দ্রের বাঙ্গলোয় প্রবেশ করিল, তখন মেঘহীন গগনে চিত্রার্পিতবৎ গিরিশৃঙ্গমালায় নিদাঘদিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। বর্ণের পর বর্ণ গিরিশৃঙ্গে—নর্ত্তকীর চঞ্চল অঞ্চলের বর্ণমালার মত—আপনার অস্থায়ী সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিয়া যাইতেছিল।

বারান্দায় একখানা আরাম-কেদারায় 'র‍্যাপে' ও 'র‍্যাগে' অঙ্গ আবৃত করিয়া নির্ম্মলা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় মেঘের দিকে চাহিয়া ছিল। ললিতমোহনকে গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার নয়নে আনন্দদীপ্তি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

ললিতমোহন বারান্দায় উঠিল—নির্ম্মলার চেয়ারের পাশ দিয়া গেল। সেই

উষ্ণবসনে আবৃতা রোগিণী যে তাহার সুন্দরী পত্নীর রোগজীর্ণ শীর্ণ অবশেষ, প্রথম দর্শনে সে তাহা বুঝিতে পারিল না,—কল্পনাও করিতে পারিল না।

ললিতমোহন চলিয়া গেল। নির্ম্মলা বক্ষে কেমন বেদনা অনুভব করিল। সে দুই করতলে বক্ষ চাপিয়া ধরিল; নয়ন মুদিত হইয়া আসিল।

প্রভাতচন্দ্র ড্রয়িংরুমে জামাতার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার সহিত অল্পক্ষণ কথা কহিয়াই তিনি বুঝিলেন, জামাতার চঞ্চল চক্ষু কক্ষের চারি দিকে আর কাহারও সন্ধান করিতেছে। "চল, নির্ম্মলাকে দেখিবে"—বলিয়া তিনি উঠিলেন; ললিতমোহন তাঁহার অনুসরণ করিল।

উভয়ে নির্ম্মলার নিকটে আসিলেন। নির্ম্মলা নড়িল না। তখনও তাহার উভয় করতল বক্ষের উপর; নয়নযুগল মুদিত; শীতল ও পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে যাতনাচিহ্ন মুদ্রিত রহিয়াছে। অভাগিনী ব্যর্থসুখস্বাদ জীবনে যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল, সে যখন আসিল, তখন সে সুখদুঃখের অতীত।

তাহার গতপ্রাণ শবদেহপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রভাতচন্দ্র অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার গর্ব্ব অশনিরূপে তাঁহারই হৃদয়ে পড়িয়াছে,—হৃদয় দীর্ণ। ললিতমোহন মনে করিল, তাহাকে দুর্ব্বহ দুঃখভার বহন করিয়া সুদীর্ঘ জীবনপথ অতিবাহিত করিতে হইবে,—জগতের উৎসারিত সুখ-উৎস তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ,—জগতের আনন্দে তাহার অংশ নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বারভুঁইয়া।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের অবসান ও মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইলে, বঙ্গভূমির অধিকার লইয়া মোগল, পাঠান, মগ, পর্টুগীজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে যে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহারই একটি সামান্য চিত্রপ্রদর্শনের জন্য এই প্রবন্ধাবলীর অবতারণা করা যাইতেছে। এই বারভুঁইয়া প্রবন্ধটি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম।

বাঙ্গলা দেশ বহুদিন হইতে বারভুঁইয়ার মুলুক নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মোগলবিজয়ের সময় যে সমস্ত পরাক্রান্ত ভুঁইয়া আপনাদিগের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে কেবল তাঁহাদেরই বিবরণ প্রকটিত হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা বারভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাঙ্গলা দেশ বহুদিন হইতে বারভুঁইয়ার মুলুক নামে কথিত হইয়া থাকে; এবং আসাম প্রদেশেও এই বারভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়। তদ্ব্যতীত ত্রিপুরা ও আরাকাণের অধীশ্বরগণ আপনাদিগকে বারভুঁইয়ার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। (১) যে বারভুঁইয়ার সহিত বাঙ্গলা, আসাম ও আরাকাণ প্রভৃতির সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই জন্য আমরা প্রথমে বারভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

যত দূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ স্থির হয় যে, পালরাজগণের রাজত্বকালে এই বারভুঁইয়ার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত বারভুঁইয়াগণ প্রাচীন রাজনীতিসম্মত রাজমণ্ডলান্তর্গত দ্বাদশ নৃপতির (২) স্থানে পরবর্ত্তী কালে দ্বাদশ সামন্তরাজ-রূপে গণ্য হইয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। সে যাহা হউক, বাঙ্গালার বারভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে;—কোনও এক সময়ে বার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য পশ্চিম প্রদেশ হইতে করতোয়া নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পালবংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত অনুষ্ঠানের সময় অতীত হইয়া যায়, সুতরাং বার বৎসর পর্য্যন্ত তাহার পুনরনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য তাঁহারা উক্ত প্রদেশে প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির

---

(১) "The kings of Aracan and Commillah were constantly striving for the mastery, and the former even conquered the greatest part of Bengal. Hence to this day they assume the title of Lord of the twelve bhuoiyas, bhatties, or principalities of Bengal."—*Wilford*; *Ancient Geography of India. vol XIV., of Asiatic Researches. P. 451.*

(২) মধ্যস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতং। এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
উদাসীনপ্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রসঙ্গতঃ॥ অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ॥
—মনুসংহিতা; ৭ম অধ্যায়।

নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণীখননাদি করিয়া অবস্থান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বারভুঁইয়াগণ অবস্থিতি করিয়া তত্তৎপ্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। (৩) এবং সেই সময়ে পালরাজগণ সমগ্র বঙ্গরাজ্যের একাধীশ্বর থাকায়, সম্ভবতঃ ভুঁইয়াগণ তাঁহাদের অধীনস্থ সামন্তরাজ-রূপেই গণ্য হইতেন। ধর্ম্মমঙ্গলাদি গ্রন্থে পালরাজগণের সঙ্গে বারভুঁইয়াগণের উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহাদের রাজত্ব ক্রমে আসাম ও দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তৃত হয়। বারভুঁইয়াগণ অনেকদিন

(৩) "The Kocchis then gave a line of princes to Kamrup; at this time a part of Upper Assam was under a mysterious dynasty called the Bhara Bhuya, of which no one has ever been able to make anything but it is in all probability connected with the following tradition which Buchanon gives in his Account of Dinajpur :—'On a certain occasion twelve persons of very high distinction and mostly of the Pal family came from the west country to perform a religious ceremony on the Karotya river (the boundary between the ancient divisions of Matsya and Kamrup), but arrived too late, and as the next season for performing the ceremony was twelve years distant, they in the interval took up their abode there, built palaces and temples, dug tanks, and performed many other great works. They are said to have belonged to the tribe called Bhugyas to which the Rajahs of Kasi (Benares) and Bhettiah also belong."—*Dalton's Ethnology of Bengal.*

বুকানন হামিল্টনের মতে, ইঁহারা বর্ত্তমান ভূমিহারগণের সমজাতি। কিন্তু ডাল্টন তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের ভুঁইয়াগণের সহিত একজাতি বলিতে চাহেন। ডাল্টনের সিদ্ধান্ত কত দূর সত্য, বলিতে পারি না; কারণ, উক্ত ভুঁইয়া জাতি আর্য্যবংশীয় কি না সন্দেহ। অথচ বুকাননের মতে, বারভুঁইয়ার অধিকাংশ পালবংশীয় ছিলেন। পালকর্ণীয়গণ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ আর্য্যবংশীয় হওয়াই সম্ভব। বুকানন যে কাশী ও বেতিয়ার রাজাদিগকে বারভুঁইয়াগণের একজাতি বলিয়াছেন, তাহাও বিবেচ্য বটে। বর্ত্তমান ভূমিহারগণকে অনেকে মূর্দ্ধাবসিক্ত বলিয়া থাকেন। মূর্দ্ধাবসিক্তগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন হন। কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ 'বাভণ'ও বলে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আসামের শিলালিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাভণ শব্দ ব্রাহ্মণের অপভ্রংশ তাঁহারা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ হওয়ায় কিঞ্চিৎ হেয়। যদতঃ, বারভুঁইয়ারা সেন-বংশীয় হইলে যে আর্য্যবংশীয় তি, সন্দেহ নাই। পালবংশীয় হইলে তাঁহারা ক্ষত্রিয় হন। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমরা অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। ভুঁইয়া শব্দ, সংস্কৃত ভৌমিক, ভূমিজ প্রভৃতি শব্দ, বা এ ঘুঁটে। পালি ভুমিপো, ভূমিপো, বা ভূমো হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিবেন। আমরা সাধারণ ভুঁইয়া শব্দকে ভৌমিক শব্দেরই অপভ্রংশ মনে করিয়া থাকি।

পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে আপনাদিগের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। আসাম, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকা জেলায় তিন জন প্রাচীন ভুঁইয়ার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। (৪)

পাল-বংশের পর সেন-বংশ ও পরে পাঠানগণ বঙ্গদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বারভুঁইয়াগণের অধিকারে ছিল। কিন্তু সে সময়ে মূল বারভুঁইয়া বংশের লোপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন নূতন ভুঁইয়া নিযুক্ত হন। বোধ হয়, তাঁহাদের সংখ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। তথাপি তাঁহারা বারভুঁইয়া নামেই অভিহিত হইতেন। পাঠান-রাজত্বকালে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন। ইঁহারা রাজকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন; এবং কয়েক জন হিন্দু ভুঁইয়ার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারাও বারভুঁইয়া নামে কথিত হইতেন। মোগল-বিজয়ের সময় উক্ত বার জনের মধ্যে নয় জন মুসলমান ও তিন জন হিন্দু ছিলেন, জানা যায়। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ব্যাপিয়া তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। কিন্তু, পশ্চিম বঙ্গে কোনও ভুঁইয়ার অধিকার ছিল কি না, জানা যায় না। (৫) হিন্দু তিন ভুঁইয়া

---

(৪) "The next rulers we hear of belonged to the Booneahs or Bhuddist Rajahs. Three of the Booneah Rajahs took up their abode in this district, and in that portion of it lying to the north of the Boorigonga and Dulluserry, where the sites of their capitals are still to be seen. Just Pal resided at Moodabpore in the pargunnah of Toollipabed. Harischonder at Cotebarry near Sabar, and Sinopal at Copassia in Bhowal. * * * *

"The Rungpore branch of Booneahs, it is well known, ruled at one time the ancient kingdom of Kamroopa."—*Taylor's Topography of Dacca.*

"The Bhuiya or Buddhist Rajas (founders of the Pal dynasty of the Kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took of their abode in this district, to the north of Booriganga, and Dhaleswari, where the sites of their capitals are still to be seen."—*Hunter's statistical Account of Dacca.*

(৫) প্রতাপাদিত্যচরিত্র-রচয়িতা রাম রাম বসুর মতে, উক্ত বারভুঁইয়াগণের অধিকার বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃতির কথায় বোধ হয়, আসামের প্রাচীন বারভুঁইয়াগণের কথা তখনও বঙ্গদেশে প্রচারিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালার বারভুঁইয়াগণের অধিকার যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না।

শ্রীপুর, বাকলা ও যশোরের অধীশ্বর ছিলেন। মুসলমান নয় জনের মধ্যে খিজিরপুরের ইশাখাঁ মসনদ আলি সর্ব্বপ্রধান; তিনি অপর একাদশ জন ভুঁইয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। বৌটন রোজ ও জেম্‌স্ ওয়াইজ, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও ফতেয়াবাদের মুকুন্দরায়কে বারভুঁইয়ার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে সমস্ত জেসুইট প্রচারক বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, উক্ত বার জনের মধ্যে নয় জন মুসলমান ছিলেন। (৬) এই বার জন ভুঁইয়া অনেক সময়ে মিলিত হইয়া মোগলগণকে বাধা প্রদান করিতেন; এবং তাঁহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মোগলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কখনও কখনও তাঁহারা পরস্পরের সহিতও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের সহিতও যুদ্ধ করিতেন। মুসলমান নয় জনের মধ্যে সকলেই পাঠান ছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার পাঠানগণও বঙ্গভূমিতে অধিকারবিস্তারের জন্য অল্প চেষ্টা করেন নাই। এইরূপে মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর মধ্যে সেই সময়ে বঙ্গরাজ্য লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে মোগলেরাই বিজয়লাভ করে। বারভুঁইয়ার মধ্যে যে তিন জন হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের নাম

(৬) "The king of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengala, until the Mogoll slew their last king. After which twelve of them joined in a kind of Aristocraccy and vanquished the Mogolls (it seems this was in the time of Emmadan paxda) and still notwithstanding the Mogoll's greatness, are great Lords, specially he of Siripur, and of Ciandecan, and above all Moasudalim. Nine of them Mahametans."—*Purcha's Pilgrims, The fourth Part. Book V. P. 511.*

ফার্ণাণ্ডেজের বিবরণে শ্রীপুর ও চণ্ডিবান বা যশোহরের রাজাকে ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং অন্য নয় জনকে মুসলমান বলা হইয়াছে। সুতরাং অবশিষ্ট হিন্দু ভুঁইয়া কে ছিলেন, তাহা বিবেচ্য বিষয়। ডুজারিক সে গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, অপর হিন্দু ভুঁইয়া বাকলার অধীশ্বর।

"According to Dee Janie, the three Hindu princes were those of Sripur, Chandican and Bacala."—*Beneridge's District of Bakarganj. P. 29, Note.*

ফার্ণাণ্ডেজ কেবল ক্ষমতাশালী ভুঁইয়াদের বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে বাকলার রাজা রামচন্দ্র রায় অল্পবয়স্ক হওয়ায় তিনি তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার দলভুক্ত প্রচারক কলসেকার বিবরণ হইতে রামচন্দ্র ও তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়। পরে তাহা লিখিত হইতেছে।

উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই বঙ্গজকায়স্থ। লক্ষ্মণমাণিক্য ও মুকুন্দরাম রায়,—যাঁহারা কাহারও কাহারও মতে ভুঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন,—তাঁহারাও বঙ্গজকায়স্থ ছিলেন। কিন্তু উপরি-উক্ত দুই জন যে বারভুঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন না, আমরা পূর্ব্বেই সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। ভুলুয়ার রাজগণ চিরদিন ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন। এবং আকবরনামায় মুকুন্দরাম রায়কে এক জন জমীদারমাত্র বলিয়া দেখা যায়। বিশেষতঃ, জেসুইট প্রচারকগণ যখন সে সময়ে বাঙ্গলা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নয় জন মুসলমান ভুঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের বিবরণ কোনও মতে অবিশ্বাস করা যায় না। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত বার জনের মধ্যে নয় জন মুসলমান হওয়ায় তাঁহারা সুচারুরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন নাই। (৭) এই নয় জন মুসলমানের মধ্যে ইশা খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইংরাজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ্ কিচ্ ও জেসুইট প্রচারকগণ তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অপর আট জনের বিবরণ জানিবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ ভাওয়ালের গাজী বংশকে অন্যতম ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বৌটন রোজের গ্রন্থে চাঁদপ্রতাপের জোনা গাজী ভুঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জোনা গাজী সম্ভবতঃ সোনা গাজী হইবেন। কিন্তু ওয়াইজ ভাওয়ালের ফজল গাজীকে ভুঁইয়া বলিয়াছেন। ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপ গাজী-বংশের অধীন ছিল। সম্ভবতঃ উক্ত বংশের দুই জন দুই ভুঁইয়া হইতে পারেন। হিজলীর মসনদআলিগণও পরাক্রান্ত ছিলেন। হিজলী তৎকালে ভাটী বা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য হিজলীর মসনদআলিগণ অন্যতম ভুঁইয়া হইলেও হইতে

(৭) "Pimenta commences by giving a short sketch of the history of Bengal, and states that the government of it was at that time in the hands of twelve princes who had formed a secret league among themselves, and had got the better of the Moghals. He adds that the most powerful of the twelve were the lords of Sripur and Chandecan, but above all the Moasa-dali, or Masauddin (?) Perhaps this is Isukhan Masudd-i-Ali of Khizrpur, described by Dr. wise as the most celebrated of the twelve bhuyas. Nine of the twelve, says Pimenta, are Mahomedans, and this circumstance very much retards the work of conversion."—*Beneridge's Bakarganj. P. 29.*

পাইমেণ্টা পোর্ত্তুগীজ পাদরী ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ফার্ণাণ্ডেজ প্রভৃতি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই সমস্ত পত্র পরে প্রকাশ করেন। সুতরাং পাইমেণ্টার বিবরণ ফার্ণাণ্ডেজ প্রভৃতির পত্র হইতেই সংগৃহীত।

পারেন। কিন্তু জেসুইট প্রচারকগণের আগমনের পূর্ব্বে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছিল। তবে মোগলবিজয়ের সময় তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা জেসুইট প্রচারকগণের উল্লিখিত নয় জনের অন্যতম হইতেও পারেন। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ দেখিতে পাই না। উক্ত নয় জনের মধ্যে অনেকে ঘোড়াঘাট বা রহমপুর প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন। কারণ, তৎকালে ঘোড়াঘাট প্রদেশ পাঠানদিগের অন্যতর প্রধান বাসস্থান ছিল, এবং মোগলদিগকে ঘোড়াঘাট জয় করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ফলতঃ, আমরা বিশিষ্ট প্রমাণে কেবল চারি জন ভুঁইয়ার বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। সুখের বিষয়, তন্মধ্যে তিন জন হিন্দুরই বিবরণ জানা গিয়াছে। সেই তিন জন বাঙ্গালী ভুঁইয়া কিরূপে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই কৌতূহল হইতে পারে। আমরা তাঁহাদের যথাযথ বিবরণপ্রদানের চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রথমতঃ আমরা ভুঁইয়াগণের সর্ব্বপ্রধান ইশাখাঁর কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তদ্দ্বারা পাঠানেরা বঙ্গদেশে মোগলদিগকে কিরূপ ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহার বিশদ বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে। ইশাখাঁর বিবরণের পর আমরা তিন জন হিন্দু ভুঁইয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

মায়ার বন্ধন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যূষে রামার মা প্রতিমার ঘরে আসিয়া দেখিল, প্রতিমা নাই।—নীচের বিছানায় লেপ চাদর পর্য্যন্ত নাই; উত্তর দিকের দরজা খোলা; ঘরের মেজেয় লম্বা লম্বা কাদামাখা পায়ের দাগ। রামার মার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে বসিয়া পড়িল; দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকারস্বরে কাঁদিতে লাগিল—"আমার প্রতিমা, আমার চোখের মণি কোথায় গেল! এ আর কারো কাজ নয় গো—সেই হেন্দরি কাজ! কি হ'ল গো!—"

সন্তোষের মা তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়া কহিলেন, "দিদি, এমন করিতেছ কেন? কি হইয়াছে?"

বামার মা দ্বিগুণমাত্রায় কাঁদিয়া কহিল, "হবে আর কি—আমার মরণ হয়েচে আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে! মাখ্‌নার জমীদার বেটা আমাকে শাসিয়েছিল;—আগে কেন তোমাদের বলি নি গো!"

সন্তোষের মা বামার মা'র কথা শুনিয়া এবং ঘরের অবস্থা দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন কি হইয়াছে, তখন তিনিও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। মালতীও আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল।

সন্তোষ ছাতে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। সে হঠাৎ এই কান্নার স্বর শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি হইয়াছে?" মা বলিবার আগে বামার মা কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত খুলিয়া বলিল, এবং মহেন্দ্ররই যে এই কাজ, তাহা বারংবার বলিতে লাগিল।

সন্তোষ প্রতিমার নিকট মহেন্দ্রর দুরভিসন্ধির কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। মহেন্দ্রর প্রতি তাহার সন্দেহ হইল, কিন্তু কিছু স্থির করিবার পূর্ব্বে সে আপনাকে সংযত করিয়া এবং অন্যান্য সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বাড়ীর ঘরগুলা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। কোথাও না পাইয়া অবশেষে বাগানে আসিয়া চারিপাশ ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল,—এমন কি, বাগানে জলসেচনের জন্য যে কূপ আছে, তাহার মধ্যেও লোক নামাইল। নদীর ধারে লোক ছুটিল। কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিলিল না। সন্তোষ তখন চাকর-বাকর দরওয়ানকে ডাকিয়া বকাবকি আরম্ভ করিয়া দিল। সকলে একবাক্যে কহিল, তাহারা কিছু জানে না, রাত্রে কাহাকেও বাড়ীতে আসিতে দেখে নাই।

সন্তোষ নিরুপায় হইয়া বিষণ্ণমনে অবসন্নদেহে লাইব্রেরীতে আসিয়া ভাবিতে লাগিল, "কি করা যায়?" সকলের সমক্ষে যে দুর্ভাবনাকে সে এতক্ষণ অন্তরে চাপিয়া রাখিতে পারিয়াছিল, তাহা এক্ষণে তাহাকে একলা পাইয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার সেই বিচ্ছেদ-বিষাদ, নৈরাশ্য আশঙ্কা সমস্ত আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া এক বৃহৎ আকার করিল। সন্তোষ উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, "পুলিশে খবর দিই।" এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, "প্রেমানন্দ বাবাজী আসিয়াছেন।" সন্তোষ তাঁহাকে ঘরে আনিতে বলিল।

প্রেমানন্দ ঘরে ঢুকিয়া সন্তোষের সেই শুষ্ক বিশুষ্ক উন্মত্তপ্রায় অবস্থা দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া সমস্ত ঘটনা একেবারে খুলিয়া বলিলেন। সন্তোষ ছুটিয়া উপরে গিয়া মাকে সংবাদ দিল। দুঃখের পর সুখের সংবাদে যেরূপ হইয়া থাকে,—সকলে হর্ষ-স্তম্ভিত হইয়া পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল।

সন্তোষ কহিল, "আমি এখনি মঠে চলিলাম।"

মাতা কহিলেন, "আমিও যাইব।"

মালতী কহিল, "আমরাও যাইব।"

ইহার অল্পক্ষণ পরে দুইখানা গাড়ী কর্দ্দমাক্ত পথ দিয়া ঝটিকা-নিক্ষিপ্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ভগ্ন শাখা মাড়াইয়া সশব্দে চলিতে লাগিল।

একখানা গাড়ীতে সন্তোষ ও প্রেমানন্দ, এবং অন্য গাড়ীতে সন্তোষের মা, বামার মা ও মালতী ছিল।

বামার মা কহিল, "আমি কিন্তু শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম,—ঝড়বৃষ্টিতে অত ঠাহর কর্‌তে পারি নি।"

সন্তোষের মা কহিলেন, "আমি অর্দ্ধেক রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিলুম—গা ছম্ ছম্ কর্‌তে লাগ্‌ল।"

মালতী কেবল চুপ করিয়া ছিল। সে বসিয়া ভাবিতেছিল, প্রতিমার সহিত দেখা হইলে তাহাকে কি বলিবে। সন্তোষ থাকিয়া থাকিয়া গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া "জোর্‌সে হাঁকাও! জোর্‌সে হাঁকাও!" বলিয়া কোচ্‌ম্যান্‌কে উৎখাত করিয়া তুলিতেছিল।

গাড়ী মঠে আসিয়া থামিল। প্রতিমা তখন উঠিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। সে যেন কিছু ঠিক্ করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতি যেমন গত রাত্রে ভীষণ প্রলয়খেলা খেলিয়া আর্দ্র সিক্ত শ্রান্ত ভাবে এলাইয়া পড়িয়াছে,—প্রতিমার শিথিল তনুকে আচ্ছন্ন করিয়া তেমনই কি যেন এক স্বপ্নের মত, তন্দ্রার মত চারি দিকে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে চাহিয়া আছে, অথচ কিছুই দেখিতে পাইতেছে না; ভাবিতেছে, অথচ মাথায় কিছু প্রবেশ করিতেছে না। তাহার মুখখানি মলিন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; চোখে কালি পড়িয়াছে; অনিয়ন্ত্রিত চূর্ণকুন্তল অশ্রুসিক্ত মুখের উপর আসিয়া উড়িতেছে। অদূরে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী আনন্দময়ীকে প্রতিমার শুশ্রূষা সম্বন্ধে আদেশ দিতেছিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া বামার মা দৌড়িয়া আসিয়া প্রতিমাকে বুকের মধ্যে লইয়া "মা আমার, তোর কপালে এত দুঃখ ছিল!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্তোষের মাও কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিমার কাছে বসিয়া অঞ্চল দিয়া তাহার মুখ ছোইয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া দিতে লাগিলেন। সন্তোষ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বামার মা হঠাৎ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঐ যে সেই অলপ্পেয়ে লক্ষ্মীছাড়া জমীদারের বেটা!"—

বামার মার কথা শেষ হইতে না হইতে সন্তোষ একলম্ফে মহেন্দ্রর কাছে গিয়া ঘুঁসি তুলিয়া মারিতে উদ্যত হইল।

প্রতিমা কহিল, "উহাকে ক্ষমা করুন, আর মারিবেন না। সকাল হইতে কান্নাকাটা করিতেছে।"

সন্তোষ কহিল, "প্রতিমার কথায় আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম—নচেৎ পাষণ্ড, এখনি তোমাকে মারিয়া ফেলিতাম।"

বামার মা মহেন্দ্রর কাছে আসিয়া কহিল, "তা' হচ্ছে না, প্রতিমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া উহার কাছে মাপ চাও, নহিলে ছাড়িব না।"

মহেন্দ্র প্রতিমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া ক্ষমা চাহিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"সন্তোষ, উহাকে ক্ষমা করিয়া ভাল করিলে। ইহাতে উহার আরও শিক্ষা হইবে।" মহেন্দ্রকে কহিলেন, "জানিও, অধর্ম্মের কখনও জয় হয় না। এমন কাজ আর কখনও করিও না।" ইহার পর সন্ন্যাসী সন্তোষের মাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, "মা, ভাল দিন দেখিয়া উহাদের বিবাহ যাহাতে শীঘ্র হয় চেষ্টা করিবেন।"

সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া সকলে প্রস্থানোদ্যত হইলে সন্ন্যাসী প্রতিমাকে সস্নেহে কহিলেন, "মা, তোমার পদে পদে দুঃখ। ধৈর্য্য হারাইও না। ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকলে সুস্থ হইলে সন্তোষ যখন দেখিল, প্রতিমার কাছে আর কেহ নাই, আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল। প্রতিমা শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

সন্তোষ প্রতিমার কাছে বসিয়া কহিল, "প্রতিমা, আমাদের দোষে তুমি এতটা কষ্ট পাইলে!"

প্রতিমা কহিল, "আপনাদের দোষ কিসে?—আমার অদৃষ্টের দোষ বলুন।"

সন্তোষ। মহেন্দ্র ওরকম লোক জেনে শুনে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল।"

প্রতিমা। কে জানিত—উহার এতটা সাহস হইবে।

সন্তোষ গদগদভাবে কহিল, "প্রতিমা, তোমাকে প্রথম দেখিয়াই আমি ভালবাসিয়াছি। প্রথমদিনেই তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, তোমার অন্তরে সুখ

নাই,—তোমার বিষণ্ণতা আমার প্রাণে বড় বাজিয়াছিল ;—ভাবিয়াছিলাম, আমার এ ভালবাসা দিয়া তোমার বিষাদ-কালিমা মুছিয়া ফেলিতে পারিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এখানে আসিয়া অবধি তোমার সেই দুঃখ, সেই কষ্ট!"

প্রতিমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, কহিল, "অনাথার সুখ কবে! বাপ মাকে যে চক্ষে দেখিল না, পৃথিবীতে যে আত্মীয়হীনা—তাহার অন্তরে ব্যথা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এমন কথা বলিবেন না,—আমি যা' সুখী হইয়াছি, তাহা দেখাইবার হইলে দেখাইতাম! আমি ত এখানে রাণীর হালে সুখভোগ করচি। আপনারা আমাকে যে আদর যত্ন করিতেছেন, নিজের লোকেও এমন করে না! বাপমায়ের অভাব অনেকটা ভুলাইয়া দিয়াছেন। তবে বেশী দিন যে দুঃখভোগ করে, সুখের রেশ তাহার মুখে সহজে প্রকাশ পায় না। আমারও তাই।"

সন্তোষ প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তাহা হইলে প্রতিমা, সত্যসত্যই তুমি আমাকে ভালবাস?"

প্রতিমা কহিল, "সে কথা আর কতবার বলিব।"

সন্তোষ কহিল, "তুমি আমাকে ভালবাস শুনিলে আমার মনে এতটা সুখ হয় যে, নিজেকে সেই সৌভাগ্যের অধিকারী বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না,—তাই শতবার ঐ একই প্রশ্ন, তোমার মুখে ঐ একই কথা শুনিবার বারংবার ইচ্ছা।"

প্রতিমা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তাহা হইলে এক কাজ করুন। আমাকে একটা খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখুন। আমি দিনরাত ঐ একই বুলি আওড়াইব।"

সন্তোষ কহিল, "আমি ত তোমাকে হৃদয়-পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি,—সেইখানে থাকিলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

মালতী দরজার আড়াল হইতে সব শুনিতেছিল। সে ঘরে ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "দাদা, এ রত্নটিকে আর কখনও আল্‌গা রেখো না—বাক্সয় চাবিবন্ধ করে' রেখে দাও।"—তাহার পর প্রতিমাকে কহিল, "আমাদের ত ভাই কেউ চুরি করে না।"

প্রতিমা কহিল, "তোমাদের এখানে এত ছিঁচ্‌কে চোর আছে, তাহা ত জানিতাম না। তোমাদের মত মহামূল্য রত্ন নিলে পাছে ধরা পড়ে, তাই আমার মত সামান্য জিনিসই চুরি করে,—জানে যে, তা' হ'লে খোঁজ হবে না। এতদিন ত কুঁড়েঘরে পড়েছিলুম—কেউ ত তাই চুরি করে নাই।"

মালতী এ কথার কোনও জবাব না দিয়া কহিল, "মা বলিতেছিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমাদের শীঘ্র বিবাহ দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। মা তাই ভট্টাচায্যি মশায়কে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।"

প্রতিমা কথাটা চাপা দিয়া "যাই, মায়ের কাছে গিয়া একটু বসিগে" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। সন্তোষও আনন্দবিহ্বলচিত্তে বাহিরে আসিয়া বসিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাসময়ে ভুঁড়ি দোলাইতে দোলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিধানে থানধুতি; গলদেশে লম্বমান শুভ্র উপবীত; শিরোগিরিশিখরে প্রকাণ্ড শিখাতরু; হস্তে শম্বুক-সম্ভদান। সন্তোষের মা প্রণাম করিয়া আসন-খানি বিছাইয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপবেশন করিয়া এক-চিম্‌টি নস্য গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রয়োজন কি?"

সন্তোষের মা কহিলেন, "এই ছেলের বিয়ে দিব—আর কি।"

ভট্টাচার্য্য। ভাল ভাল, শুভ শুভ; শাস্ত্রেই আছে,—'প্রাপ্তে চ ষোড়শে বর্ষে পুত্রং পরিণায়েৎ।'—অর্থাৎ, ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্ত হইলে পুত্রের পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। শ্রীমান সন্তোষকুমারের বয়স কত হইল?"

মাতা। এই মাঘ-মাস আসিলে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইবে।

ভট্টাচার্য্য। পঞ্চবিংশ বর্ষ! নারায়ণ! নারায়ণ! আর কালবিলম্ব করাপি উচিত নয়। শুভস্য শীঘ্রং।"

মাতা। সেই জন্য ত আপনাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি। এই সপ্তাহের মধ্যে যাহাতে কাজটা হয়—একটা ভাল দিন স্থির করিয়া দিন।"

ভট্টাচার্য্য নস্যগ্রহণান্তর বসনাগ্রভাগে নাসিকা মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "ভাল, ভাল,—অবশ্য আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব। পাত্রী মনোনীত হইয়াছে?"

মাতা। পাত্রী এইখানেই আছে। দেখিতে পরমসুন্দরী, আর গুণের কথা কি বলব?—তবে সংসারে তার মা বাপ আত্মীয় কেহই নাই।

ভট্টাচার্য্য। তাহাতে কিছু ব্যত্যয় ঘটিবে না। শাস্ত্রে আছে,—'অনাথাং সনাথাং কুর্য্যাৎ'—অর্থাৎ, অনাথা যে বালিকা, সে শ্বশুরকুলে আসিয়া সনাথা হয়।

মাতা। মেয়েটির উচ্চবংশে জন্ম; মাথ্‌নায় রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা; কুলশীল সমস্তই ভাল। হ্যাঁ, আমাদের সন্ন্যাসী ঠাকুর কন্যা-সম্প্রদান করিবেন, বলিয়াছেন। তাঁর কাছেই মেয়েটি প্রথম আসিয়া উপস্থিত হয়—তিনি আবার আমাদের কাছে পাঠাইয়া দেন। মেয়েটির আর কেউ নাই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজেই সম্প্রদান করিতেছেন। আহা, ঠাকুরের কি দয়া!

ভট্টাচার্য্য। আমাদের মহানন্দ স্বামীর কথা বলিতেছেন? হাঁ, তিনি অতিশয় দয়াপরতন্ত্র। মনুতে আছে, গৃহী চ সন্ন্যাসী চ অভিভাবকঃ স্যাৎ কন্যাং সম্প্রদদেৎ।—অর্থাৎ গৃহীই বল, সন্ন্যাসীই বল, অভিভাবকস্বরূপ হইয়া সকলেই কন্যাকে সম্প্রদান করিতে পারে। মহানন্দ স্বামী সন্ন্যাসী হইয়াও এতাবৎকাল উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অনায়াসেই সম্প্রদানকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন। রাজীবলোচন ত কুলের মুকুটি—তাহারই কন্যা! সদ্বংশসম্ভবা—অতি উত্তম, অতি উত্তম।

সন্তোষের মা উঠিয়া গিয়া প্রতিমাকে ডাকিয়া আনিলেন। বামার মা মালতীও সঙ্গে আসিল। সকলে প্রণাম করিয়া বসিলে, ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "এই কন্যা? কিঞ্চিৎ বয়ঃস্থা দেখিতেছি। তা' ভাল, ভাল; অম্বে, তোমার হাতখানি একবার দেখি;—অতিশয় সুলক্ষণা, অতিশয় সুলক্ষণা,—পতিকুল উজ্জ্বল করিবে।—কন্যার কোষ্ঠী আছে?"

বামার মা কহিল, "হাঁ, আমার নিকটে এইখানেই আছে;—মেয়ের বাপ আমার কাছে দিয়া গিয়াছিলেন।"

বামার মা কোষ্ঠী আনিল। সন্তোষের মাও সন্তোষের কোষ্ঠী বাহির করিয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য দুই জনের কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ বিস্ফারিতনেত্রে বলিয়া উঠিলেন, "এ যে রাজচটক্ যোগ দেখিতেছি! অতি চমৎকার।—সাধু! সাধু! এমন যোগ কদাচ পরিলক্ষিত হয়!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় নস্যগ্রহণানন্তর সম্মুখস্থিত পাঁজি দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া কহিলেন, "আশ্বিনস্য শুক্লপক্ষে বুধবাসরে ষোড়শ-দিবসে বিবাহের প্রকৃষ্ট দিন আছে। দ্বিপ্রহর রাত্রে লগ্ন। তাহা হইলে আর অষ্ট দিবসমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে সমস্ত আয়োজন করিতে হইবে।"

সন্তোষের মা কহিলেন, "তাহা ঠিক হইবে। তাহা হইলে ঐ দিনই স্থির রহিল?"

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, অবশ্য, অবশ্য,—গুরুদেব! গুরুদেব!

সন্তোষের মা একটি মোহর রাখিয়া পদধূলি লইলেন। ভট্টাচার্য্য মোহরটি ট্যাঁকে গুঁজিয়া "চিরঐশ্বর্যবতী হউন, সাধু! সাধু!" বলিতে বলিতে ভুঁড়ি দোলাইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মহা শব্দে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। বাটীর বহির্দ্দেশে চুণকাম আরম্ভ হইল; বাগানে আট্‌চালা বাঁধিতে লাগিল; ঘরদুয়ার ঝাড়াপোঁছা, ভাঁড়ারঘর ঠিক করা, জিনিসপত্র আনান গোছান,—সমস্তই তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া হইতে লাগিল।

সন্তোষের মাতুল ও পিতৃব্য পত্র পাইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই আসিয়াছেন। ক্রমে আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে ছিল, আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়ীতে যেন মেলা বসিয়া গেল। কোথাও কোন যুবতী ছেলে কোলে করিয়া চেঁচাইতেছে,—"ওগো, ছেলের একটু দুধ দিয়ে যাও;" কোথাও দুই চারি জন প্রৌঢ়া মশলা বাটিতেছে; কোথাও অনেকে জটলা হইয়া সমালোচনা করিতেছে; কোথাও কোনও পতিসোহাগিনী অন্যের নিকট আপনার সুখের কথা কহিতেছে; কোথাও কেহ বা প্রতিমার কাছে আসিয়া "বাঃ! দিব্য মেয়ে হইয়াছে!" মুখে বলিতেছে, কিন্তু মনে মনে কহিতেছে, "ইহার অপেক্ষা আমার বেটার বউ শতগুণে ভাল;" কোথাও কেহ আর কিছু না পাইয়া দাসীর উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইতেছে। সন্তোষের মা পুত্রের ইষ্টার্থ প্রাণপণে সকলকে সমানভাবে আদর যত্ন করিতেছেন।

বহুমূল্যবস্ত্রাদি দাসদাসী সকলকে বিতরণ করা হইল; সামাজিক অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি হইল না; আইবড়ভাতও সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবদারুপত্রশোভিত উচ্চমঞ্চে নহবৎ আনন্দোৎসব ঘোষণা করিতে লাগিল; দ্বারদেশে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল; চতুর্দ্দিক পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত হইল; বেলোয়ারি ঝাড় লণ্ঠনের ঠুং ঠাং শব্দ আরম্ভ হইল; ভারে ভারে দই সন্দেশ আসিতে লাগিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবকেরা নানাবর্ণের বিচিত্র কাপড় পরিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই ব্যস্তসমস্ত ভাব।

লোকজনের সমারোহে, অপরিচিত সহস্র লোকের সকৌতূহল দৃষ্টিপাত ও জিজ্ঞাসাবাদে, এবং অজানা নবীন জীবনযাত্রারম্ভের উৎকণ্ঠায়, ক্লান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, প্রতিমা বিকালের দিকে লুকাইয়া ছাতে চিলের ঘরে আসিয়া একবার বসিল। পুষ্পের মৃদু গন্ধ বাতাসে উপর পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিতেছে; দূর হইতে সানাইয়ের করুণ সুর জনতার কোলাহল ভেদ করিয়া কানে আসিয়া লাগিতেছে; শরতের ক্লান্ত পীত রৌদ্র উদাসভাবে দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া আছে।—প্রতিমা

বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "কাঙ্গালিনী আমি ত রাজরাণী হইতে চলিলাম। কিন্তু আমার এ সুখ আপনার জন কেহই দেখিল না! এত লোক জন আসিল, আমার কেহই নাই! বাপ মা থাকিলে আজ তাঁহাদের কি আনন্দ হইত!"—প্রতিমা একবার আকাশের দিকে চাহিল, মনে মনে কহিল, "হয় ত ঐখান হইতে তাঁহারা আমাকে দেখিতেছেন, আশীর্ব্বাদ করিতেছেন!"—প্রতিমা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশে সহস্রবার প্রণাম করিল; তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে বামার মা কাপড় তুলিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার কাছে বসিয়া কহিল, "কাঁদিস্ নে মা! তোর এমন দেবতুল্য স্বামী হ'ল—তোর সবি ত বজায় রইল মা। আমিও তোর মায়ের মত আছি। আর কেঁদে অকল্যাণ করিস্ নে। চল্!"—এই বলিয়া প্রতিমার চোখ মুছাইয়া দিয়া তাহার হাত ধরিয়া নীচে নামাইয়া আনিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সহস্র দীপালোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ব্যাণ্ড্ বাজিতে লাগিল। সজ্জিত গৃহে কিংখাপমণ্ডিত শয্যায় বরবেশে সন্তোষ আসিয়া বসিল। চারিপাশে কৌচ, চৌকি, সোফা। প্রস্তরমণ্ডিত টেবিলের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে রাশি রাশি ফুলের মালা ও তাম্বূল স্তূপাকারে বিরাজ করিতেছে;—আতরদান গোলাপপাশও রহিয়াছে। দেয়ালে বড় বড় আয়না;—তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া ঘর দ্বিগুণ চতুর্গুণ বড় দেখাইতেছে।

নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্তোষের পিতৃব্য ফুলের মালা আতর গোলাপ দিয়া সকলের যথোচিত সমাদর করিতে লাগিলেন। সোনার রূপার মুখনলদেওয়া বড় বড় আল্‌বোলায় অম্বুরী তামাক চলিতে লাগিল।

আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনা গল্পগুজব চলিতেছে—রাত্রি প্রায় দশটা, এমন সময়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বিলাসগৃহে সেই সহস্র চঞ্চল দীপালোকে সন্ন্যাসীর সেই গম্ভীর অচঞ্চল মূর্ত্তি, তাঁহার সেই নয়নের প্রশান্ত করুণ দৃষ্টিপাত, তাঁহার সেই গৈরিক বসন, সকলের মনে এমনই একটি স্বর্গীয় পবিত্র ভাবের সঞ্চার করিল, যাহা, যাঁহারা প্রাতে সন্ধ্যায় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া রক্তথাল উদয়াস্তের সূর্য্যকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সকলে উঠিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিলেন।

ক্রমে সময় হইয়া আসিল। অন্তঃপুরে বরণক্রিয়া শেষ হইলে সন্তোষের পিতৃব্য সন্তোষের হাত ধরিয়া নীচে পূজার দালানে লইয়া গেলেন। সকলে

সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেল। বামকণ্ঠের হুলুধ্বনি উঠিল। ভাটেরা বংশকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

কন্যার আগমন-প্রতীক্ষায় সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, এমন সময়ে রক্তাম্বর পরিয়া, অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, গলায় ফুলের মালা দিয়া, চন্দনচর্চ্চিতভালে প্রতিমা পীঁড়ার উপর আসিয়া বসিল। সে মুখশ্রী, সে রূপসৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। সন্ন্যাসী একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি স্নেহার্দ্র,—অতিশয় করুণ, অতিশয় কোমল, অতিশয় মধুর,—সে দৃষ্টি পাষাণভেদিনী, মর্ম্মস্পর্শিনী,—সে দৃষ্টি অভ্যাগত সকলকে স্পর্শ করিয়া অচেতন আকাশকেও স্পর্শ করিল।

সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী অর্চ্চনাদি শেষ করিয়া পাত্র ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণহস্তোপরি স্থাপন করিয়া যখন কম্পিতকণ্ঠে "শ্রীমতী প্রতিমা দেবীং এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া অনাথা প্রতিমাকে সম্প্রদান করিলেন, তখনকার সেই দৃশ্যে সভাস্থ সকলকারই চক্ষে জল আসিল।

বিবাহ শেষ হইলে সকলে আহারাদি করিতে বসিলেন। সন্ন্যাসী আর এক মুহূর্ত্তও অবস্থান না করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে সেই নিস্তব্ধ মাঠ ভাঙ্গিয়া মঠের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর বহুদিন ধরিয়া থিয়েটার নাচ যাত্রা চলিল। ফুলশয্যা, পাকস্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

সন্ন্যাসী সঙ্কল্পমত মঠের একপ্রান্তে অনাথা বিধবাদিগের থাকিবার জন্য সাত আটটি ঘর তুলিয়াছেন। সন্তোষ বিবাহোপলক্ষে এই নূতন আশ্রমের জন্য পাঁচ সহস্র মুদ্রা সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। সন্তোষের ইচ্ছামতে সন্ন্যাসী এই আশ্রমের নাম "প্রতিমালয়" রাখিলেন।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দিন সন্ন্যাসী দীনদরিদ্র অনাথা বিধবাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্তোষও পরিবারস্থ সকলকে লইয়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আদরপূর্ব্বক সকলকে আহার করাইল।

আহারান্তে সন্ন্যাসী প্রতিমাকে দেখাইয়া সকলকে কহিলেন, "ইহার নামে আশ্রম উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।" সকলে প্রতিমার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া দুই হস্ত তুলিয়া কহিল, "মা, তুমি চিরজীবী হও।"

উৎসবশেষে সন্ন্যাসী-সন্তোষ ও প্রতিমাকে যোগমণ্ডপে লইয়া গিয়া উভয়কে বসাইয়া এই উপদেশ দিলেন ;—সন্তোষকুমারকে কহিলেন, "বৎস, তোমার পত্নীর সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধনে সতত যত্নবান্ থাকিবে ; সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিবে ; সকল অবস্থাতেই শান্তচিত্ত হইয়া সেই পরাত্মার পাদপদ্মে মন রাখিবে ; অহঙ্কারকে কদাচ মনে স্থান দিবে না ; নিত্য ভগবানের পূজার্চ্চনা করিবে ; সদা সৎকর্ম্মশীল হইবে।"—প্রতিমাকে কহিলেন, "বৎসে, তুমি সদাচারা পতিহিতকারিণী হইবে ; কায়মনোবাক্যে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিবে ; গুরুজনকে ভক্তি এবং তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিবে ; দাসদাসীর প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিবে ; স্নেহভাজনদিগের কল্যাণকামনা করিবে ; ভগবানে মন রাখিবে। বৎসে, তুমি এত দিন যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া আসিয়াছ—অন্যকে সেই দুঃখভাগী দেখিলে তাহার সেই দুঃখমোচন করিতে সতত যত্নশীলা হইবে। আর কি বলিব।"—সন্ন্যাসী উভয়ের মস্তকের উপর হস্তস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্তোষ ও প্রতিমা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিয়া সন্তোষ প্রতিমাকে কহিল, "এ ঘরে যে কত দিন আসি নাই! তোমাকে দেখিয়া অবধি এ ঘর একরকম পরিত্যাগ করিয়াছি।"

প্রতিমা কহিল, "ঘরের কি দোষ হইল ?"

সন্তোষ হাসিতে হাসিতে কহিল, "ঘরের দোষ কিছু নাই, তোমার ঐ মুখের দোষ।"—এই বলিয়া প্রতিমাকে চুম্বন করিল।

দুই জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্তোষ কহিল, "আমি ভাবিতেছি, তোমাতে আমাতে পশ্চিমে কোথাও বেড়াইতে যাই।"

প্রতিমা কহিল, "আর কেহ যাইবে না ? মালতী, মা,—সকলকে লইয়া চল।"

সন্তোষ কহিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দুই চারি দিন পরে সন্তোষ সকলকে লইয়া গিরিধি অভিমুখে যাত্রা করিল।

প্রতিমা পূর্ব্বে কখনও রেলগাড়ীতে চড়ে নাই,—এই তাহার প্রথম যাত্রা। গাড়ী যখন বাঁশী বাজাইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে ষ্টেশন ছাড়িয়া হুহুঃ শব্দে চলিতে লাগিল—প্রতিমার আনন্দ দেখে কে! বাঁশঝাড়, কদলীবন, পানাপুকুর, পর্ণকুটীর, গ্রাম্যচিত্র সে অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু জমীসুদ্ধ তাহারা যে পশ্চাতে

বোঁ বোঁ করিয়া হটিয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনায় কখনও আসে নাই। মাঝে মাঝে বিপরীত দিক হইতে আর একটা ট্রেণ ঝড়ের মত পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যায়;—প্রতিমা ভয়চকিত হইয়া ছুটিয়া গাড়ীর অপর পার্শ্বের বেঞ্চে গিয়া বসে। রিজার্ভ কামরায় তাহাদের সঙ্কুচিত হইবার কোনও কারণ ছিল না।

ক্রমে যখন গাড়ী রাণীগঞ্জের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, পাহাড় দেখিয়া প্রতিমা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ দেখ পাহাড়, ঐ দেখ পাহাড়,—কি সুন্দর!"—কোনও পাহাড় তরুতৃণাচ্ছাদিত হরিৎবর্ণ, কোনটা বা তৃণসম্পর্কহীন দগ্ধ অঙ্গারের মত কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যে মধ্যে কয়লার খনি —ছোট্ট এঞ্জিন, ছোট ছোট কয়লা-বোঝাই গাড়ী লইয়া রৌদ্রদগ্ধ মাঠের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। প্রতিমা দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিল।

গাড়ী মধুপুরে আসিয়া পৌঁছিলে সন্তোষ জিনিসপত্র নামাইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া গিরিধির গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় গাড়ী গিরিধিতে আসিয়া থামিল। সকলে নামিয়া পুনরায় ঠেলা-গাড়ীতে চড়িয়া অর্দ্ধঘণ্টার দারুণ ঝাঁকানির পর আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গলোয় আসিয়া পৌঁছিল। সকলেই শ্রান্ত। জিনিসপত্র যেমন-তেমন করিয়া রাখিয়া, তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া, যে যেখানে পাইল, শুইয়া পড়িল।

পরদিন জিনিসপত্র গুছাইতে কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহার পর পূর্ণবেগে আনন্দ-পর্য্যটন আরম্ভ হইল। কখনও অন্ধকার শালবনের মধ্যে গিয়া লুকোচুরি খেলা, কখনও হরীতকী-বাগানে গিয়া হরীতকী কুড়ান, কখনও বাজি রাখিয়া শুষ্ক বালুময় নদীর উপর দিয়া ছুটিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া, কখনও গিরিশৃঙ্গে ওঠা, কখনও বটগাছের তলায় বসিয়া রান্না করা,—দিনগুলা সুখে জলের মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন পুস্‌পুসে করিয়া সকলে মিলিয়া পচম্বায় গেল, একদিন ঝরণা দেখিতে গেল, একদিন কয়লার খনিতে নামিল।

ক্রমে যখন সমস্ত দেখাশুনা শেষ হইয়া আসিল, তখন মধ্যাহ্নটা ঘরেই কাটিতে লাগিল। সন্তোষ নিজের ঘরে বসিয়া প্রতিমাকে লইয়া কখনও তাস খেলে, কখনও বই পড়িয়া শোনায়, কখনও নির্জ্জনে দু'জনে প্রাণের কথা কহিতে থাকে।—দূর হইতে রাখালের বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসে; আম্রতরুচ্ছায়াখচিত পথ দিয়া পুস্‌পুস ঘট্‌ঘট্-শব্দে চলিতে থাকে; সম্মুখের ঐ পর্ণকুটীরবাসিনী

রাশীকৃত শুষ্কপত্রে আগুন লাগাইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; দীর্ঘচঞ্চু ত্বরত-পক্ষী বৃক্ষ হইতে নামিয়া দরজার কাছে আসিয়া বসে;—কি এক নবীন মাধুর্য্যে আনন্দ-বসে নব-দম্পতীর তরুণ প্রেম সিঞ্চিত হইতে থাকে।

প্রতিমা অপরাহ্ণে অভ্যাসমত শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদসেবা করে, গৃহের কাজকর্ম্ম দেখে, হিসাবপত্র রাখে।

এইরূপে দুই মাস কাটিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহে বামার মা খাওয়ান-দাওয়ান কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই; তাই সে আজ সন্তোষ ও প্রতিমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে,—স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাহা-দিগকে খাওয়াইবে। সন্তোষ ও প্রতিমা সেই জন্য অন্যদিন অপেক্ষা আজ কিছু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়াছে।

পর্য্যটনক্লান্ত উভয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে আসিয়া বসিয়াছে। মালতী আজ বেড়াইতে যায় নাই;—সে একটা শাবল লইয়া সম্মুখের বাগানে ছোট একটা কূপখননের চেষ্টা করিতেছিল। গল-বন্টার শব্দ করিতে করিতে গাভীরা দলে দলে বাগানের সম্মুখস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিয়াছে,—রাখাল তাহাদের সঙ্গে না পারিয়া একবার গর্ত্তে নামিতেছে, একবার রাস্তায় উঠিতেছে; তাহাদের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া সে একেবারে হায়রাণ হইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে দু' একটি গ্রাম্য-স্ত্রীলোক চুবড়ি-মাথায় তরি-তরকারী বিক্রয়ার্থ যাতায়াত করিতেছে।

উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং অলসভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে, এমন সময়ে এক জন সাঁওতাল প্রকাণ্ড একটা ব্যাঘ্রচর্ম্ম লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিমা তাড়াতাড়ি সন্তোষকে কহিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের জন্যে এইটে কেন না—তিনি খুব খুসী হবেন।" সন্তোষ প্রতিমার কথামত তখনই ব্যাঘ্রচর্ম্মটা কিনিয়া সন্ন্যাসীর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

স্নানাহার শেষ করিয়া উভয়ে ঘরে আসিয়া বসিলে বামার মা আসিয়া কহিল, "প্রতিমে, তোর বিয়েতে কিছুই দিতে থুতে পারি নি,—তোর মায়ের চারগাছা মল আমার কাছে ছিল, তোরি জিনিস আবার তোকেই দিলুম—এই নে।" সন্তোষকে কহিল, "বাবা, এই বোতামটা তোমার জন্যে গড়িয়েছিলুম,—গরীব মানুষ, যা' পারলুম, তাই দিলুম।"

প্রতিমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা বাটিতে জল ঢালিল, এবং মল কয়গাছি তাহাতে ডুবাইয়া সেই জলটা অতি ভক্তিসহকারে পান করিল।

সন্তোষ কহিল, "প্রতিমা, ও কি করিতেছ?"

প্রতিমা কহিল, "মায়ের চরণধূলি ত কখনও পাইলাম না, তাই তাঁর পায়ের মল কয়গাছা ধুইয়া চরণামৃত খাইলাম।" প্রতিমা মল কয়গাছি অতি যত্নের সহিত বাক্সর তুলিয়া রাখিল।

সন্তোষ প্রতিমার ভক্তি দেখিয়া অবাক হইল।—বামার মা চলিয়া গেলে কহিল, "প্রতিমা, সত্যি সত্যি আমার একবার মরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, তুমি আমার জন্য কি কর।"

প্রতিমা কহিল, "তা' বই কি! তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া আমিই আগে মরিব।" এই বলিয়া—সন্তোষের কপোলে সজোরে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

এইরূপে দাম্পত্যপ্রেমের মিলনানন্দে দুই মাস কাটিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতে সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে বসিয়া আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছেন,—এমন সময়ে প্রেমানন্দ তাঁহার হাতে একখানি ডাকের পত্র দিল। সন্ন্যাসী চিঠি খুলিয়া পড়িলেন;—"ঠাকুর, আপনা হইতেই আমার সব। আপনার কৃপায় প্রতিমাকে পাইয়াছি। কিন্তু সে যায় যায়; এ যাত্রা বুঝি আর বাঁচিল না। আমার বিপদ আপদ আপনাকে জানান বিধেয়, তাই এই পত্র লিখিলাম। শ্রীশ্রীচরণে কোটি প্রণাম জানিবেন। নিবেদন ইতি।

সেবক শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়।"

সন্ন্যাসীর মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রেমানন্দকে কহিলেন, "আমি এখনই গিরিধি চলিলাম। তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।"

প্রেমানন্দ কহিল, "আজ যে সনাতন-পূজার দিন।"

সন্ন্যাসী রুক্ষস্বরে কহিলেন, "চুলায় যাক! তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

প্রেমানন্দ অবাক হইয়া গেল,—সন্ন্যাসীর মুখে এরূপ তীব্র কথা সে কখনও শোনে নাই।

সন্ন্যাসী আর ঘরে ঢুকিলেন না। প্রেমানন্দকে সঙ্গে লইয়া একেবারে ষ্টেশনে গিয়া টিকিট্ কিনিয়া রওনা হইলেন।

সন্ন্যাসী গাড়ীতে প্রেমানন্দের সহিত একটিও কথা কহিলেন না। গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনে খোঁজ লইয়া খড়ম-পায়ে বাঙ্গলোর অভিমুখে একেবারে ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার সেই তখনকার মুখের ভাব ও ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ান দেখিয়া লোকে হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী বাঙ্গলোয় আসিয়া পৌঁছিলে সন্তোষ তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, আমার এরি মধ্যে সব শেষ হ'তে চ'ল্ল! আমার প্রতিমা—আমার সর্ব্বস্ব গেল যে!—"

বামার মা সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "ঠাকুর, দয়া করুন, রক্ষা করুন, মেয়েকে বাঁচান!"

সন্ন্যাসী সন্তোষকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সন্তোষ কম্পিতকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিল,—"পাহাড়ে উঠিতে গিয়া পড়িয়া মাথায় আঘাত লাগে। তাহার পর হইতে খুব জ্বর। ডাক্তাররা বলে, মাথার ভিতর কিছু হইয়াছে। জ্ঞান আছে, কিন্তু আজ নাড়ী অত্যন্ত মন্দ।"—সন্তোষের আর কথা বাহির হইল না।

সন্ন্যাসী নিঃশব্দে ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, প্রতিমা পাশ ফিরিয়া মালতীর কোলের উপর একখানি হাত রাখিয়া শুইয়া আছে। সন্তোষের মা শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছেন। দূর হইতে প্রদীপের স্তিমিতালোকে সন্ন্যাসী বুঝিলেন, প্রতিমার মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে;—তাহার কোটরগত চক্ষুর চাহনি মন্দ, তাহার ওষ্ঠদ্বয় শ্বেত বিবর্ণ, এই দারুণ শীতে তাহার নাসিকাগ্রভাগে স্বেদবিন্দু।—সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে প্রতিমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমা সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, আপনি এসেছেন!" এই বলিয়া উঠিয়া পদধূলি লইতে গেল—কিন্তু পারিল না,—শুইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যায়, কি এক অসহ্য দারুণ তীব্র বেদনায় তাঁহার হৃদয় শতধা স্ফুটিত হইতেছে। সন্ন্যাসী আর থাকিতে পারিলেন না;—মর্ম্মান্তিক চীৎকার করিয়া প্রতিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "প্রতিমা, বুকের ধন, মা আমার,—আমিই তোর বাবা, আমিই তোর জন্মদাতা! আমি সন্ন্যাসী হইয়াও তোর মায়া কাটাইতে পারি নাই; তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তোকে দেখিতে পাইব বলিয়া তোর কাছাকাছি, আসিয়াছিলাম। দিনরাত তোরই ভাবনা ভাবিয়াছি, তোরই মঙ্গলকামনা করিয়াছি; তাই নিজে তোর বিবাহ দিয়াছি। অসহায় তোকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম, তাই কি ভগবান আমাকে এত শাস্তি দিলেন! মা আমার, ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্, তোর বাবাকে ফেলে যাস্ নে মা!"

সন্ন্যাসী শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতিমা অস্পষ্ট উচ্চারণে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি বাবা! মা কোথায়?—বোসো।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে হাত দিল। খানিকক্ষণ পরে আবার কহিল, "আমি চল্লুম্; ওঁকে দেখো,—কাছে কাছে রেখো।"—প্রতিমার মাথা ঝুঁকিয়া পড়িল, চোখের তারা উপরে উঠিল, শ্বাসরোধ হইল।

ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সন্ন্যাসী ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বাষ্পবিজড়িতকণ্ঠে প্রেমানন্দকে কহিলেন, "হতভাগ্য আমি! আমার সংসারধর্ম্মও হইল না, সন্ন্যাস-ধর্ম্মও হইল না। সব গেল, সব গেল,—আমার সকলই ব্যর্থ হইল।—আমি চলিলাম। তোমার উপর মঠের ভার দিলাম। দেখিও।"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী নিবিড় অন্ধকারে দেখিতে দেখিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। নৈশবায়ু গৃহোত্থিত সেই গগনভেদী ক্রন্দনধ্বনিতে যোগ দিয়া হা-হাঃ শব্দে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন পরে হুগলী ষ্টেশনে যখন মেল ট্রেণ আসিয়া থামিল, একটি কামরা হইতে মলিনবেশে শোকার্ত্ত তিনটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ প্লাটফরমে নাবিল। ইহারা কে, পাঠকবর্গকে আর বলিয়া দিতে হইবে না।

সন্তোষ পরিত্যক্ত লাইব্রেরী-ঘরে পুনরায় আপনাকে নিমজ্জিত করিল। কখনও কখনও তাহাকে অন্ধকার রাত্রে 'প্রতিমালয়ে'র কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। সন্ন্যাসীকে কিন্তু আর কেহ দেখিতে পাইল না।

বর্ষ-নারী।

বসন্ত

ফোটো-ফোটো যৌবন-মুকুল;
অজানা ভাবের ঘোরে হৃদয় আকুল;
এলো-চুলে, হাসি-মুখে, চঞ্চল-চরণে,
খেলে বালা কুসুম-কাননে।

নিদাঘ

তীব্র মদিরার মত ঝাঁঝাল যৌবন!
কটাক্ষে হানিছে বাণ, দহিছে তৃষিত প্রাণ,
অষ্টাদশী-রূপতেজে ঝলসে নয়ন,—
পদপ্রান্তে প'ড়ে আছে মুর্চ্ছিত মদন!

বর্ষা

আহা! কি করুণ আঁখি আনত সজল!
প্রেম-ভরা হৃদি'পরে পয়োধরে ক্ষীর ঝরে,
কোলে শিশু হাসে খল্ খল্;—
সুস্নাতা বিমুক্তকেশী, শোভে চল চল

শরৎ

যৌবন-গৌরব-রবি হেলেছে পশ্চিমে;—
বেশ ভূষা, অঙ্গরাগ
ঢেকেছে উপরিভাগ,
অন্তরে যৌবন-শোভা খেতেছে অস্তিমে।

হেমন্ত

প্রৌঢ়ার অঙ্গের শোভা নহে আর মনোলোভা,
শুষ্কপত্র সম সব যেতেছে ঝরিয়া;
সখেদে পশ্চাতে চায়, অগ্রে চাহি' গিহবার,
মরমে রমণী মরি, মরে গুমরিয়া।

শিশির

শুষ্ক জীবনের ঘনঘটা,
মহিলার শুভ্র শিরে ত্রিদিবের ছটা।
মগ্নপ্রায় ভগ্ন দেহ তরী,
মগ্নপ্রাণ ধ্রুব-তারা বিভু-পদোপরি।

রত্নপরীক্ষা। *

আজকাল বাঙ্গলায় অনেক পুস্তক,—কবিতা, নাটক, নভেল, গল্প বাহির হইতেছে। তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পুস্তক অত্যন্ত অল্প। সেই স্বল্প বৈজ্ঞানিক পুস্তকের মধ্যে আলোচ্য রত্নপরীক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

রত্ন অনেকের ঘরে আছে; না থাকিলেও অনেকেই দেখিয়াছেন, বা তৎসম্বন্ধে কিছু পড়িয়াছেন, বা শুনিয়াছেন। কিন্তু কয় জন রত্ন চিনেন? মুক্তা ভাল কি মন্দ, ঝুটো কি সাঁচ্চা, আগুটীর পাথর হীরা কি কাচ, কোন রঙ্গের পাথর কোথায় বসান যুক্তিযুক্ত, পাথরের কি গুণ, কি দোষ, ও তাহার ফলে মূল্যের কি তারতম্য হয়, রত্ন কিসে ভাল থাকে, বা খারাপ হয়, তাহা কয় জন জানেন? অথচ এই সকল বিষয় ধনীরও জানা উচিত; অধনীরও মনিব, বন্ধু, বা বন্ধুর পরিবারের জন্য জানা আবশ্যক।

রত্নপরীক্ষায় এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। পুস্তকখানি গবেষণাপূর্ণ ও বহুপরিশ্রম-কৃত, সুতরাং বিশ্বসনীয়। লেখক সরকারী কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ও সংস্কৃতের চর্চ্চা রাখেন। সুতরাং মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্রোল্লিখিত বিবরণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাগ্নিতে শোধন করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। বহুমূল্য রত্নাদি ক্রয় করিবার সময় "রত্নের পরীক্ষা" নামীয় অষ্টম অধ্যায় ক্রেতার অনেক সাহায্য করিবে।

"রত্নপরীক্ষা" ২১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ও আট পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত ইহাতে উপসংহার, অনুক্রমণিকা ও বাঙ্গলা পুস্তকে যাহা সুদুর্লভ,—"সূচি" আছে। সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষায় লেখক সুপণ্ডিত, সুতরাং বহুতর উদ্ধৃত শ্লোকাদিতে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। আর, কোনও কোনও বাঙ্গলা লেখকের পথ না ধরিয়া, তিনি নিজের উক্তি ও উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে পার্থক্য রাখিয়াছেন।

রত্নের সংস্কৃত নাম ও তাহার ইংরেজী নাম কি হওয়া সম্ভব, তাহা লেখক ঠিক দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বোধ হয়, তাহা সর্ব্বত্র ঠিক হইয়াছে। স্থানাভাবে উপসংহার হইতে বর্ণানুসারে রত্ন-সমূহের সংস্কৃত নাম ও ইংরাজী প্রতিপদ্ধ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবারিত করিতে পারিলাম না।

এইরূপ পুস্তক যত প্রকাশিত হয়, দেশের ও বঙ্গসাহিত্যের ততই মঙ্গল। এইরূপ গ্রন্থ হইতেই প্রতিপন্ন হয়, বাঙ্গালী জ্ঞানসাগরে সাঁতার দিতে শিখিয়াছে, এবং ডুব দিয়া নিজের পরিশ্রমে রত্নসংগ্রহ করিতে পারিতেছে। বইখানি এত তথ্যে পূর্ণ ও এত উপকারী যে, আশা হয়, শীঘ্র ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইবে। লেখকের নিকট আমাদের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে। ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিবার সময় লেখক তাহার বিচার করিবেন। "রত্নপরীক্ষা" নামে হিন্দীতে আর একখানি পুস্তক আছে, সুতরাং অন্য নাম দিতে পারিলে গোল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ; আদৎ রত্নপরীক্ষা পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদমাত্র। অতএব, রত্নতত্ত্ব, রত্নবিবরণ, রত্নপাঠ, এইরূপ কোনও নাম দিলে গ্রন্থের নাম সার্থক হয়।

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্. এ. প্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ,—রত্নের ইতিহাস ও সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ—ধাতুর ইতিহাস, অনেক পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্র বৈদিক সাহিত্য, তাহা হইতে একটিমাত্র ঋক্ উদ্ধৃত (পৃঃ ১৫৪) হইয়াছে, এবং তাহাও ডাক্তর পি. সি. রায়ের হিন্দু কেমিষ্ট্রি হইতে। কিন্তু রত্ন সম্বন্ধে ও বিশেষ ধাতুসম্বন্ধে চতুর্ব্বেদে অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে হিরণ্য (সুবর্ণ) ও অয়স্ (লৌহ) এই দুই ধাতুর ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে সীসের নাম পাওয়া যায়। আমার স্মরণ হয়, তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে) স্থানে স্থানে মণির উল্লেখ আছে। বেদের ব্রাহ্মণসমূহে মণি ও ধাতুর উল্লেখ কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে রজতের ও পাণিনীয় গণপাঠে রজত, সীস ও লৌহের উল্লেখ আছে।

রামায়ণে, বিশেষতঃ মহাভারতে, নানা মণির নাম ও তৎসংক্রান্ত অনেক কথা আছে; তাহা হইতে বাছাই করিলে রত্নবিচার সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে। এক সভাপর্ব্ব হইতেই আমি তিন চারি স্থানের উল্লেখ করিতে পারি। তৃতীয় অধ্যায়ে ময়-কৃত যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদ-বর্ণনায়, মণি, বৈদূর্য্য, মুক্তা, স্ফটিক ও মহামণির নাম আছে। ভীমের দিগ্বিজয়-যাত্রায় "সাগরতীর প্রভৃতি জলপ্রধানদেশবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নরপতিদিগকে বিবিধরত্ন.....মণিমুক্তা কাঞ্চন রজত বিদ্রুম প্রভৃতি" "কর প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন" (বঙ্গবাসী, ৩০ অঃ, ২৭-৮ শ্লোক)। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে খস, পারদ, তঙ্গন প্রভৃতির ভূপতিগণ "পিপীলিকা-সমুদ্ভূত পিপীলিকা নামক দ্রোণ-পরিমিত রাশি রাশি সুবর্ণ আহরণ করিয়াছিলেন।" (বঙ্গবাসী, ৫১ অঃ, বোম্বাই ৫২ অঃ, ৩—৪ শ্লোক,)। সেই উপলক্ষে "সিংহলেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্যমণি ও মুক্তাকলাপ.....উপহার দিয়াছিলেন" (ঐ, ৩৫—৬ শ্লোক)।

সংস্কৃত সাহিত্যে, অন্ততঃ তাহার মধ্যে যেগুলি প্রাচীন, তাহাতে, স্থানে স্থানে রত্নসম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মৃচ্ছকটিক কাব্যাদর্শের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন। তাহার চতুর্থ অধ্যায়ে বিদূষক বসন্তসেনার গৃহপ্রবেশসময়ে ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে নীলরত্ন, বৈদূর্য্য, মৌক্তিক, প্রবালক, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি রত্নের নাম করিয়াছেন। আর জাতরূপ দ্বারা মাণিক্যের বন্ধন, রত্নসূত্রের দ্বারা মৌক্তিকাভরণসমূহের গ্রন্থন, বৈদূর্য্য মণির ধীরঘর্ষণ, শঙ্খের ছেদন, প্রবালকের শাণে ঘর্ষণ ইত্যাদি ক্রিয়ার বর্ণনা তথায় বর্ণিত আছে। (গাড়বোলের সংস্করণ, ২০০—২ পৃষ্ঠা)। *

বৌদ্ধত্রিপিটকা ও জাতকমালা, জৈনসূত্রাবলী এবং প্রাচীন প্রাকৃত ও পালি পুস্তক হইতে রত্নবিষয়ক কতক বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে। ষষ্ঠজাতকে লিখিত আছে যে, একটি মণির জন্য এক শত নিষ্ক মূল্য প্রদত্ত হয়।

প্রাচীন সময়ে ভারতের স্বর্ণাদি ধাতু ও নানা মণির পাশ্চাত্যে রপ্তানি হইত। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রীক ও রোমক লেখকগণের রচনায় পাওয়া যায়। হিরোডোটসে (পঞ্চম শতাব্দী খ্রীঃ পূঃ) প্রকাশ যে, বাবিলন (Babylon) ভারতবর্ষ হইতে কুকুর ও মণির আমদানি করিত। তাঁহার মতে, পারস্যসম্রাট্-ডেরায়স্ সাম্রাজ্যের ভারতাংশ হইতেই ৩৭০ টালেণ্ট (talents) বা ১,২১০,০০০

* যশস্তিলকচম্পূ কাব্যে লিখিত "শুকনাশ ইব রত্নপরীক্ষাসু" (পৃঃ ২৩৭)। শুকনাশ কে?

পাউণ্ড কর সোনাতে পাইতেন। হিরোডোটস্ মহাভারতীয় স্বর্ণোৎখননকারী পিপীলিকাগণের (gold-digging ants) নাম করিয়াছেন। টেসিয়স্ (৩৯৮ খ্রীঃ পূঃ) ভারতের স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহখড়্গ, পন্তর্ব নামে মণি, রুধিরাখ্য ও পালঙ্কের নাম করিয়াছেন। ডাওডোরস্ মেগাস্থিনিস্ (৩০২ খ্রীঃ পূঃ) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন যে, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ ব্যতীত টিন্ ও অন্যান্য ধাতু ভারত হইতে রপ্তানি হয়।

রোমক সময়ে প্লিনী, পেরিপ্লস্ ও টলেমী ভারতীয় রত্নের বিবরণ দিয়াছেন। পেরিপ্লসে (১ম খ্রীঃ) প্রকাশ যে, হীরক, পালঙ্ক, গন্ধশস্য, আকাশমণি, নীলমণি ও কালিএনস্ (? kalleanos) ভারতীয় পশ্চিম বন্দরসমূহ হইতে রপ্তানি হইত।

ইহা সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, রত্নেতিহাসের পরিচ্ছেদ অনেক বর্দ্ধিত হইতে পারে।

রত্নের সাধারণ ও বিশেষ বিবরণ পরিচ্ছেদেও (২—৭) এইরূপ কতক যোগ চলিতে পারে। হিন্দুস্থানে রত্নসমূহ ফার্সী নামেই প্রচলিত। সুতরাং ফার্সী নামগুলি দিলে হিন্দুস্থানে ও মুসলমানগণের কতক সুবিধা হইতে পারে পুনশ্চ, কলিকাতা, বোম্বাই ও সিংহল রত্নের প্রধান ক্রয়-বিক্রয়-স্থান। এই সকল স্থানের ক্রয়-বিক্রয়-পদ্ধতি, বিক্রয়ের মান, ঠকাইবার সাধারণ উদাহরণ ইত্যাদি গ্রন্থে সংযোগ করিলে গ্রন্থখানি উপকারী ও অধিকতর কার্য্যকর হইতে পারে।

এখানে পাঠককে আমার নিজের একটি ঘটনা বলি। ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে বেড়াইতে যাই। দুইটি মুক্তা কিনিবার সাধ হয়। সেই উদ্দেশে কয়েকটি দোকানে ঘুরি। ছোট ছোট বাড়ী, উপরে দোতালায় দোকান। মুক্তা চাওয়ায় এক এক দোকানে বিশ রকম মুক্তা বাহির করিল। পরস্পরের পার্থক্যনিরূপণ আমার অসাধ্য হইল। দাম ৫০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা। শেষে আমার এক পার্শী আলাপীর আশ্রয় লইলে, তিনি এক জন সুর্ত্তী (surat) জহুরীকে আমার সঙ্গে দেন। তাহার সাহায্যে অনেক দেখা শুনার পর ১৫০৲ টাকার এক যোড়া মুক্তা খরিদ হয়। মুক্তাদ্বয় দেখিতে মাঝারি আকারের চেয়ে ছোট, জাত পারস্যদেশীয়, ঈষৎ লাল, প্রায় গোল। বোম্বাই জহুরীগণের মতে পারস্যদেশীয় মুক্তা অন্যদেশীয় মুক্তার অপেক্ষা গুরুতর, অধিক উজ্জ্বল ও তাহার রঙ্গ অধিককালস্থায়ী। কেহ কেহ বলিলেন যে, পারস্যমুক্তা নূতন হইলে ব্যবহারে ইহার রঙ্গ ঘোরাল হয়। এখন মনে হয় যে, তখন "রত্নপরীক্ষা" থাকিলে অনেক নূতন কথা শিখিতে ও নিজে ভালরকম পরখ করিতে পারিতাম।

কয়েক বিষয়ের সময় সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। মহাভারতের "অধিকাংশ খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের" (পৃঃ ৪) ইহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। হিন্দী পৃথ্বীরাজরাসো চাঁদ-বারদাইর রচনা নয়, সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর নয়; ইহার অনেক প্রমাণ বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণ্যালে প্রকাশিত হইয়াছে। যুক্তিকল্পতরুতে যখন ভোজমতের উল্লেখ আছে, (পৃঃ ৭) তখন একাদশ শতাব্দীর পর হইবে, পূর্ব্বে সম্ভব নয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ অফ্রেক্টের মতে যুক্তিকল্পতরু লক্ষ্মীধর-কৃত ও লক্ষ্মীধর গোবিন্দরাজের আশ্রিত ছিলেন। রসরত্নসমুচ্চয়-লেখক বাগ্‌ভট যদি অষ্টাঙ্গহৃদয়-কার হন, তবে দ্বাদশ শতাব্দীর না হইয়া (পৃঃ ৮) একাদশ শতাব্দীর হইবেন। বাৎস্যায়ন-নামধারী কয়েক জন ঋষি পাওয়া যায়। কামসূত্র-রচয়িতা বাৎস্যায়ন পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী (পৃঃ ১০), এমন কোনও প্রমাণ নাই। কামসূত্রের বর্ত্তমান আকার অনেক আধুনিক।

নবগ্রহ সম্বন্ধে ১৫—১৭ পৃষ্ঠায় নোটে যাহা লিখিত আছে, তাহার কতক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সুবন্ধুর বাসবদত্তায় নায়িকার রূপ-বর্ণনার সময় নবগ্রহের বর্ণনা আছে; যথা,—

"ভাস্বতালঙ্কারেণ চন্দ্রেণ বদনমণ্ডলেন লোহিতেনাধরপল্লবেন সৌম্যেন দর্শনেন গুরুণা নিতম্ব-বিম্বেন বিকচেন নেত্রকমলেন শনৈশ্চরেন পাদেন তমসা কেশপাশেন গ্রহময়ীব।"—জীবানন্দ, পৃঃ৩৫।

সুবন্ধু বাণের পূর্ব্ববর্ত্তী; উদ্যোতকর ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকীর্ত্তির পরবর্ত্তী; অতএব, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ বা সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে অবস্থিত। নবগ্রহজ্ঞান তৎকালের প্রাচীন।

লেখক Ball's Economic Geology of India দেখিয়াছেন কি না, প্রকাশ নাই। ভারতীয় মণি ও ধাতুর বিস্তৃত বিবরণ, বিশেষতঃ তাহাদের আকর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ ঐ পুস্তকে প্রাপ্তব্য।

পুস্তকের উন্নতি-কামনায় দুই চারিটি কথা বলিলাম। পরিবর্দ্ধিত ও পরিসংস্কৃত আকারে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইলে আনন্দিত হইব।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

নিবেদন।

আমারে হরণ করিয়া লও হে
নিখিল-চিত্ত-চোর!
নিগূঢ় কমল-ভুজ-বন্ধনে
বাঁধ হে চিত্ত মোর।
আমার আকাশ, আমার তারা,
আমার স্বর্গ, আমার ধরা,
আমার হরষ, আমার সুখ,
দিবস রজনী মোর,
সকল ব্যাপিয়া সর্ব্বময় হে
নিখিল-চিত্ত-চোর,
বেড়িয়া কোমল ভুজবন্ধনে
মোরে অধিকার করিয়া লও হে
রাজার রাজা মোর,
বিদ্রোহী চিতে করিয়া দমন
প্রেম-শৃঙ্খলে কর বন্ধন,
নিজ অধিকার কর হে প্রচার
দমি' অশান্তি ঘোর!
হে মহারাজা! হৃদয়-রাজা!
রাজার রাজা মোর!
চরণসেবিকা কর হে গ্রহণ
স্বামী মোর, প্রভু মোর!
ব্যর্থ জীবন সফল কর হে
স্বামী মোর, প্রভু মোর!
বহুদিন হ'তে আছি এই আশে,
তোমার রাতুল-চরণ-পরশে—
অনল হইবে তুষারশীতল,
বিভাবরী হবে ভোর,
ফোর না বঞ্চনা জীবন-ঈশ্বর!
স্বামী মোর, প্রভু মোর!

শ্রীমতী সরলাবালা সরকার।

কর্ম্মবীর টাটা।

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গত জানুয়ারী মাস হইতে মিষ্টার টাটা ইয়ুরোপে বাস করিতেছিলেন। গত মে মাসে জর্ম্মাণীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। জামসেটজী নাসেরয়ানজী টাটার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ করা অসম্ভব। বোধ হয়, বর্ত্তমান কালে আর কোনও এক ব্যক্তির মৃত্যুতে ভারতবর্ষের এত ক্ষতি হয় নাই। ভারতভূমি বহু ধ্যানযোগীর প্রসবিনী, কিন্তু ভারতবর্ষের বহুমহাজনের আবির্ভাব-পূত বক্ষে কর্ম্মবীরের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। সেই জন্যই ইহলোকে আমাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য তাঁহার ত্রিশ লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আমরা অনেকেই তাঁহার নাম জানিতাম না। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি দেশের উন্নতির জন্য, দেশের সম্পদবৃদ্ধির জন্য অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন। এক জন লোকের বিরল অবসরে, এক জনের দ্বারা, এত কার্য্যের সম্পাদন স্বপ্নবৎই বোধ হয়।

টাটার নাম দেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিত; য়ুরোপ আমেরিকাতেও অপরিচিত নহে। "ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রের সম্পাদক বড় দুঃখেই বলিয়াছেন,—"There are many cotton mills in India, but there was only one Jamsetji Nusserwanji Tata. There is one Taj Mahal Hotel, and may there be at least one Research Institute." ভারতবর্ষের যে পার্শী সম্প্রদায় মহাজনের খেরোর খাতাকে উপনিষদের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়েই টাটার জন্ম। প্রথম হইতেই তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলা যাইতে পারে,—

"আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ॥"

তাঁহার ব্যবসায়ের কল্পনাও যেমন বিশাল, সিদ্ধিও তেমনই সম্পূর্ণ। বস্ত্রবয়ন, রেশমউৎপাদন, গৃহগঠন, ধাতুতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, জাহাজের ব্যবসায়, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ। কিন্তু তবুও টাটা কেবল ব্যবসায়ী ছিলেন না, তিনি দেশহিতৈষী। তিনি অর্থে প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের মত সম্পদশালী করিবার উপযোগী বিদ্যালাভের পথরচনায় সচেষ্ট ছিলেন। তাই বিদেশে তাঁহার মৃত্যু আমাদের পক্ষে দুঃখের কারণ হইলেও, জর্ম্মাণীতে তাঁহার মৃত্যু সঙ্গত ও শোভন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত নাওশারীতে টাটার জন্ম হয়। পিতা নাসের-য়ানজী টাটা পূর্ব্বে সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, কিন্তু সূতার বাজারে share-mania য় প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েন। আমেরিকার অন্তর্বিদ্রোহে বোম্বাইয়ে তুলার বাজার প্রথম চড়িয়া পরে নিতান্ত মন্দা হইয়া পড়ে। ইহাতে অনেক ক্রোয়পতি সর্ব্বস্বান্ত হয়েন—অনেকের ব্যবসায় বন্ধ হয়। ইহাতেই টাটার সর্ব্বনাশ হয়। পরে আবিসিনিয়ার অভিযানে ঠিকাদারী করিয়া তিনি পুনরায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান নাসেরয়ানজী পার্শীদিগের উপকারার্থ ধর্ম্মমন্দির ও সৎকারাগার নির্ম্মাণে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

পুত্র জামসেটজী ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে শিক্ষার্থ বোম্বাই সহরে নীত হইয়া স্কুলের পাঠসমাপনান্তে এলফিন্‌ষ্টোন কলেজে প্রবেশ করেন। সেই কলেজে চার বৎসর অধ্যয়নের পর উনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতার সহিত সেনাদলের রসদঠিকাদারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হয়েন।

অল্পদিন পরে তিনি ব্যবসায়সৌকর্য্যার্থ চীনে প্রেরিত হয়েন, এবং উত্তরকালে জাপান, হংকং, সাংহাই, প্যারিস ও নিউইয়র্কে শাখা সহিত প্রসিদ্ধ টাটা এণ্ড কোম্পানীর ভিত্তি সংস্থাপিত করেন। চীন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া একটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের প্রয়াস করেন। প্রসিদ্ধ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের তাঁহার অংশী হইবার কথা ছিল। এই সময় পূর্ব্বোল্লিখিত তুলার বাজার মন্দায় টাটার পিতা ও রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ উভয়েরই সর্ব্বনাশ হওয়ায় সে প্রয়াস সফল হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে লব্ধ শিক্ষার ফলে তিনি পরে চিঞ্চপুগ্‌লী তৈলের কল ক্রয় করিয়া তাহা কাপড়ের কলে পরিণত করেন। কিছুদিন ঐ কল চালাইয়া লাভবান হইবার পর, তিনি উহা বিক্রয় করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের বিশেষতঃ অনুসন্ধিৎসু হইয়া পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। ফিরিয়া কল সংস্থাপনের উপযোগী স্থান পরীক্ষা করিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে কোম্পানী গঠন করিয়া নাগপুরে এম্প্রেস মিল্‌স্ স্থাপন করেন। ভারতে আর কোনও কাপড়ের কলে এত লাভ হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই Back Bayতে জমী সংস্থান করিয়া লাভবান হইয়াছিলেন।

ফরাসী উপনিবেশে বৈদেশিক পণ্য আমদানী করিতে হইলে অত্যধিক শুল্ক দিতে হয়। সেই জন্য টাটা ফরাসীর অধিকৃত পণ্ডিচারীতে কাপড়ের কল সংস্থাপিত করিয়া শুল্ক হইতে অব্যাহতিলাভের চেষ্টা করেন। বিশেষ বিবেচনার পর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তিনি ধরম্‌সি মিল্‌স্ ক্রয় করেন। ইহাই এক্ষণে স্বদেশী মিল্‌স্ নামে

ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। টাটাই প্রথমে এ দেশে কলে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন আরম্ভ করেন, তাহাতেই ভারতের সর্ব্বত্র দেশীয় কলের কাপড়ের কাটতির আরম্ভ।

সূক্ষ্মসূত্রের বস্ত্র বয়ন আরম্ভ করিয়া টাটা এ দেশে মিশরের দীর্ঘআঁশ কার্পাস-বপনের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে গভর্মেণ্ট তাঁহার সহিত একমত হইলেন না। শেষে তিনি স্বয়ং মিশরে যাইয়া, ঐ কার্পাসের বপন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিলেন, এবং বিনামূল্যে কৃষকদিগকে বীজ দিতে লাগিলেন। এক্ষণে নাগপুরে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ঐ কার্পাসের চাষ বিশেষ আশাপ্রদ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শবনম্ (ঢাকাই মসলিন) প্রভৃতি সূক্ষ্মসূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত হইত; তাহাতে বোধ হয়, পূর্ব্বে এ দেশে দীর্ঘআঁশ কার্পাস ছিল। ক্রমে সেইরূপ বস্ত্র অনাদৃত হওয়ায় কার্পাসের চাষও উঠিয়া গিয়াছে।

কলের মজুরেরা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই চলিয়া যায়, তখন নূতন লোককে শিখাইয়া লইতে আবার বিলম্ব ঘটে। ইহার প্রতিবিধানার্থ টাটা মজুরদিগকে লাভের অংশ দিবার ও শিক্ষানবীশদিগকে বেতন দিবার প্রথা প্রচলিত করেন।

বোম্বাই কলের বস্ত্রাদি প্রধানতঃ চীনে ও জাপানে বিক্রীত হইত। পি. এণ্ড ও. ষ্টীমার কোম্পানী বোম্বাই হইতে সূত্র ও বস্ত্র লইয়া যাইতে প্রতি টনে ১৭৲ টাকা ভাড়া লইতেন। যখন অষ্ট্রীয়ান লয়েড ও ইটালীর রুবাত্তিনো কোম্পানী বোম্বাই হইতে চীনে ও জাপানে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন, তখন পি. এণ্ড ও. কোম্পানী তাঁহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন;—তিন কোম্পানীই টন প্রতি ১৭৲ টাকা ভাড়া স্থির রাখিলেন। টাটা জাপানের প্রধান ষ্টীমার কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বোম্বাই হইতে জাপানে ষ্টীমার চালাইতে লাগিলেন। সে কোম্পানী টন প্রতি ১৩৲ টাকা ভাড়া স্থির করিলেন। য়ুরোপীয় কোম্পানীগুলি জাপানী কোম্পানীর ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে, টন প্রতি প্রথমে ২৲ টাকা ও পরে ১৲ টাকা ভাড়া নির্দ্ধারিত করিলেন। তবুও জাপানী ব্যবসায়ীরা জাপানী কোম্পানীকেই মাল দিতে লাগিলেন দেখিয়া, পি. এণ্ড ও. কোম্পানী বে-সরকারী ভাবে এ কথা ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে জানাইলেন। জ্যারব, লর্ড রোজবেরী স্বয়ং জাপানী দূতকে বলেন,—এরূপ হইলে ইংলণ্ড জাপানের প্রতি বিরূপ হইবেন। এ কথা জাপানে প্রকাশিত হইলে, জনসাধারণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে, এবং জাপানী সংবাদপত্রসমূহ স্বার্থত্যাগ ও দেশহিতৈষণার জন্য জাপানী কোম্পানীকে রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। পি. এণ্ড ও. কোম্পানী বিলাতী ডাক

বহনের জন্য ভারতীয় রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকেন। সেই অর্থবলে বলী হইয়া কোম্পানীর পক্ষে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতি করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া টাটা এক পুস্তিকা প্রকাশিত, এবং ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রচারিত করেন। তাঁহার আন্দোলনের ফলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় কোম্পানীগুলি নামমাত্র ভাড়া লওয়া ছাড়িয়া জাপানী কোম্পানীর সহিত সমান ভাড়া লইতে আরম্ভ করেন। টাটার জয় হইল; কিন্তু তিনি জাপানী কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের দায়ী ছিলেন; তাঁহার দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল।

টাটা বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানে ভাড়ার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহীশূরে রেশমের চাষ হইত, কিন্তু সে রেশমের বিশেষ কাটতি বা দর ছিল না। বাজারে জাপানী রেশমের আদর দেখিয়া টাটা জাপান হইতে নিজ ব্যয়ে রেশমতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আনাইয়া মহীশূরে রেশমের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন, এবং মহীশূর গভর্মেণ্টের ধন্যবাদভাজন হয়েন।

এ দেশে ভাল হোটেল নাই। টাটা য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভাল হোটেলের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে বোম্বাইয়ে তাজমহল হোটেল সংস্থাপিত করেন। এসিয়ায় এরূপ হোটেল আর নাই। হোটেলের প্রত্যেক বিভাগের জন্য টাটা য়ুরোপের প্রধান প্রধান হোটেল হইতে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী আনিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, টাটা হোটেলের সমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। হোটেল খোলা হইয়াছে বটে, কিন্তু যেদিন হোটেলের সৌধচূড়ায় গম্বুজের শেষ প্রস্তর সন্নিবেশিত হয়, টাটা সেদিন বহুদূরে—মৃত্যুশয্যায়। অল্পদিনে লাভের আশায় টাটা এ হোটেল সংস্থাপিত করেন নাই। এই হোটেলের আদর্শে দেশে এইরূপ উৎকৃষ্ট হোটেল স্থাপিত হইবে, এবং কালে তাঁহারও লাভ হইতে পারিবে, এই আশায় তিনি হোটেল খুলিয়াছিলেন।

প্রায় বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে মধ্যভারতের লৌহে টাটার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। তিনি কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কার্য্য সমাপ্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইবার লোক ছিলেন না। কয় বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যাইয়া তিনি এ বিষয় ভারতসচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টনের গোচরে আনিলে, লর্ড জর্জ্জ এ প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া টাটাকে বলেন, ভারতে ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে অগ্রণী। এ কার্য্যে দেশের বিশেষ উপকার ও উন্নতি হইবে, সুতরাং দেশহিতৈষীর পক্ষে এ কার্য্য সুসিদ্ধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ফলে তিনি

দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। ভারতসচিবের আগ্রহহেতু গভর্মেণ্টের ঔদাস্য ও আপত্তি তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহে পরিণত হইল; সর্ব্বত্র রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার অনুকূল হইয়া উঠিলেন।

টাটার বিশ্বাস ছিল, কার্য্য আরব্ধ হইলে সপ্রমাণ হইবে যে, মধ্যভারতেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য লৌহখনিজ বিদ্যমান। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, এক ক্রোর টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরব্ধ করিলে বৎসরে ন্যূনকল্পে ৩০০ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইতে পারিবে। এই কার্য্যের জন্য তিনি ইংলণ্ডে ও আমেরিকার প্রধান প্রধান লৌহের কারখানার কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে জর্ম্মনীতে লৌহের কারখানায় কাজ শিখাইতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। মধ্যভারতে চান্দা জেলায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাম্রের খনিতে তাম্র উত্তোলিত হইত। টাটা সেই কার্য্যের পুনরারম্ভের আয়োজন করিতেছিলেন। এই দুই কার্য্যের জন্য তাঁহার লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ও হইয়া গিয়াছিল। এই সকল অসমাপ্ত কার্য্য এখন কি হইবে, বলিতে পারি না। তবে ভরসা এই যে, তাঁহার পুত্রদ্বয় কৃতী।

শেষে তিনি আরও দুইটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন;—তদুভয় কার্য্যের ফলের বিষয় আমরা অবগত নহি। তিনি বোম্বাইয়ে সমুদ্রের খাঁড়ি জমা লইয়া তাহাতে মৎস্যের চাষ করিতেছিলেন, এবং বিস্তৃত পতিত জমী লইয়া পাশ্চাত্য প্রথায় গোচারণের মাঠ করিয়া দুগ্ধ পনিয়াদির ব্যবসায় করিতেছিলেন।

যে কার্য্যের জন্য আজ টাটার নাম প্রধানতঃ ভারতবর্ষে ও সভ্য জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, এক্ষণে তাহার কিছু পরিচয় দিব। পার্শী যুবকদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাশ্চাত্যদেশে প্রেরণ করিবার জন্য টাটা কিছু দিন পূর্ব্বে একটি ধনভাণ্ডার সংস্থাপিত করেন। পরে যাহাতে জাতিনির্ব্বিশেষে ভারতবাসিমাত্রই অর্থসাহায্য পাইতে পারেন, তাহার জন্য, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবাসিমাত্রেরই পক্ষে ভাণ্ডারদ্বার মুক্ত করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮এ সেপ্টেম্বর তাঁহার বিজ্ঞানগবেষণা-মন্দির সংস্থাপনের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। টাটা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক অধিবেশনে লর্ড রিয়ে যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতার ফলেই তাঁহার মনে এ কল্পনা উদিত হয়। দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার প্রস্তাবের কার্য্যাধ্যক্ষ মিষ্টার পাদশা এই বিষয়ে য়ুরোপীয় শিক্ষাবিদ্‌গণের পরামর্শ লইতেছিলেন।

গবর্মেণ্ট প্রথমাবধি টাটার প্রস্তাবে সন্দিহান। অন্য যে কোনও সভ্যদেশে শিক্ষাবিস্তারার্থ এক ব্যক্তির ৩০ লক্ষ টাকা দান গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ধন্যবাদের সহিত সাগ্রহে গৃহীত হইত। কিন্তু এই সাত বৎসরে টাটার প্রস্তাবের কথা শেষ হইল না। অথচ বড় লাট লর্ড কর্জ্জন দীর্ঘসূত্রিতার বিরোধী। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি এ প্রস্তাবের অনুকূল নহেন। অনেকের বিশ্বাস, টাটা যদি অর্থ গভর্মেণ্টের হস্তে দিবার প্রস্তাব না করিয়া স্বয়ং বিজ্ঞানমন্দির সংস্থাপিত করিতেন, তবে কার্য্য সম্পন্ন হইত। ভারতবাসীদিগের দ্বারা এইরূপ একটি শিক্ষামন্দির সংস্থাপিত ও পরিচালিত হইলে, সমবেত চেষ্টায় এরূপ অনুষ্ঠানের পরিচালন বিষয়ে ভারতবাসীদিগের যে শিক্ষালাভ হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, পরিণতব্যবসায়বুদ্ধি টাটা এইরূপ শিক্ষাদানের বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। আমাদের অনুমান, টাটার আশা ছিল, তাঁহার অর্থে বিজ্ঞানগবেষণামন্দির সংস্থাপিত হইয়া, দেশীয় রাজন্যবর্গ-দত্ত সাহায্যে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন যখন ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিসৌধসংস্থাপনকল্পে সংগৃহীত অর্থের অংশমাত্রও এই অনুষ্ঠানে দান করিতে অস্বীকার করিলেন, তখনই টাটার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল।

প্রথমাবধিই এই প্রস্তাবে লর্ড কর্জ্জনের সহানুভূতি নাই। ভারতে বড়লাট রূপে প্রথম পদার্পণকালে তিনি টাটার ভাণ্ডারের কার্য্যকারকদিগের অভিনন্দনের উত্তরে বলেন যে, এ দেশে দেশীয়গণ উচ্চ রাজপদ পাইবার আশা করিতে পারে না। সে অবস্থায় এরূপ শিক্ষাগারের উপযোগিতা কোথায়? প্রথমাবধি টাটার ইচ্ছা ছিল যে, প্রথমে য়ুরোপীয়দিগকে শিক্ষকপদে বৃত করা হইবে; পরে যত সত্বর সম্ভব, দেশীয়দিগকে কর্ম্মনিপুণ করিয়া তাঁহাদিগকেই অধ্যাপক করা হইবে। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে ভারতবর্ষীয়গণ অল্পদিনেই নিপুণ হইয়া সর্ব্ববিধ বিজ্ঞানশিক্ষাদানের উপযুক্ত হইয়া উঠেন। লর্ড কর্জ্জন গত বজেট-বিচারকালে ও তাহার পরেও স্পষ্টই বলিয়াছেন, এ দেশে দেশীয়গণ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ পাইবে না। তবে যাহারা নাছোড়বান্দা হইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া প্রতিযোগী পরীক্ষার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের ফিরাইবার উপায় নাই। তিনি যে টাটার প্রস্তাবে অমত করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। যে সকল সর্ত্তে টাটা বিপুল অর্থদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গভর্মেণ্ট সে সকল সর্ত্তে অসম্মত হইয়া বলিলেন, টাটা অর্থ গভর্মেণ্টকে দিন, গভর্মেণ্ট যথেচ্ছ তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

এই ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে টাটা তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া ন্যাস করিবার জন্য গভর্মেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। এ প্রস্তাবও নূতন নহে। ইহার পূর্ব্বে অন্ততঃ দুই জন ধনী পার্শীর জন্য গভর্মেণ্ট এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অথচ এবার গভর্মেণ্ট এই প্রস্তাব লইয়াই বলিলেন যে, টাটা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া শিক্ষাবিস্তারকল্পে টাকা দিতেছেন; সুতরাং অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা না পাইলে গভর্মেণ্ট টাকা লইবেন না। সদুদ্দেশ্যের সততায় এই সন্দেহে টাটা মর্ম্মাহত হয়েন, এবং ভারত গভর্মেণ্টের এই প্রস্তাবের প্রত্যাহার করাইবার জন্য ইংলণ্ডে যাইয়া ভারতসচিবের শরণাপন্ন হয়েন।

এইরূপ একটি ব্যাপারে প্রস্তাবিত শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য স্থির করা প্রধান কার্য্য। তাহাতে মতভেদ উপস্থিত হইল। টাটার ইচ্ছা যে, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠোত্তীর্ণ প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু কয়েক জন ছাত্র এই শিক্ষাগারে নিয়মিত শিক্ষা পাইবে। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে আনীত বিশেষজ্ঞ সার্ উইলিয়ম র‍্যামজে শিক্ষাগারের গতি ও প্রকৃতির যেরূপ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাতে সাধারণ শিক্ষাবিদ্যালয় হইতে এই গবেষণামন্দিরের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তাহাতে গবেষণামন্দিরের বিশেষত্বই থাকে না। এই মতভেদ বড় সাধারণ নহে। টাটার প্রস্তাবমত কার্য্য হইলে ভারতবাসীরা শিক্ষার ফলে আপনাদের শিল্পশিক্ষার উপায় উদ্ভাবিত করিয়া তাহার সার্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতাসাধনে সমর্থ হইত। সার্ উইলিয়ম র‍্যামজে তাঁহার মন্তব্যের শেষভাগে স্পষ্টই বলিলেন যে, গভর্মেণ্টের প্রস্তাবে অসম্মত হইলে মিষ্টার টাটা তখনও আপনার দান প্রত্যাহার করিতে পারেন।

অধ্যাপক র‍্যামজের প্রস্তাবিত শিল্পাগারে গভর্মেণ্ট বার্ষিক পঞ্চদশ সহস্র টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাতে সাধারণ শিল্পবিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে মাত্র—টাটার প্রথমপ্রস্তাবিত উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপায় হইবে না।

মহীশূরের মহারাজা বয়সে নবীন হইলেও, টাটার প্রস্তাবের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে বাঙ্গালোরে শিক্ষামন্দির সংস্থাপিত হইলে, মহীশূর গভর্মেণ্ট গৃহাদিনির্ম্মাণকল্পে প্রথমতঃ এককালীন দান করিবেন, পরেও বর্ষে বর্ষে অর্থসাহায্য করিবেন। অন্যান্য বিষয়েও সুবিধা বলিয়া বাঙ্গালোরেই শিক্ষামন্দির সংস্থাপিত হইবে, স্থির হয়। এখন দাতার মৃত্যুতে প্রস্তাব ত্যক্ত না হইলেই মঙ্গল। ভারতগভর্মেণ্ট টাটার মত এক জন দেশহিতৈষীর বিপুল দানের ও জনহিতকর প্রস্তাবের সততায় সন্দেহ করিয়া তাঁহার জীবনের অন্তিমকাল হতাশাদাবানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ টাটা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এখনও দীর্ঘকালের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই বিশেষ উপযোগী। সচরাচর কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সহিত তাঁহার মতান্তরও হইত না। কিন্তু যখনই তিনি গভর্মেণ্টের কোনও কার্য্য দেশের ধনোন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন, তখনই তাঁহার ক্রোধ তীব্র প্রতিবাদের তপ্ত অগ্ন্যুদ্গমের মত বাহির হইত। যখন টাকশালে সাধারণের জন্য মুদ্রাগঠন বন্ধ করিয়া গভর্মেণ্ট নূতন অর্থনীতির অবতারণা করেন, তখন একবার টাটার প্রচণ্ড ক্রোধ বহ্নিশিখার মত প্রকাশ পাইয়াছিল। গভর্মেণ্ট যখন দেশীয় বস্ত্রের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত করেন, তখন আর একবার কর্ম্মবীরের প্রতিবাদপ্রবাহ ভীমবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। টাটার মতে, এ সকল কার্য্য Adding insult to injury। কেহ কেহ বলেন, শেষোক্ত ব্যবস্থায় টাটাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আটগুণ অধিক শুল্ক দিতে হওয়াতেই এত প্রতিবাদ। কিন্তু স্বার্থহানিকেই প্রতিবাদের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, টাটাই প্রস্তাব করেন, এ দেশে যাঁহাদের বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজারের অধিক, তাঁহাদিগের উপর শতকরা কুড়ি টাকা আয়কর নির্দ্ধারিত হউক।

আজ মৃত্যুর করস্পর্শে কর্ম্মবীরের কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হইয়াছে। সব গেল,—রহিল কেবল স্মৃতি। আর রহিল ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানারূপ কীর্ত্তির পরিচয়। আশা করি, টাটার উপযুক্ত বংশধরগণ বিজ্ঞানগবেষণামন্দিরের কার্য্য শেষ করিয়া, তাহার কীর্ত্তিমন্দিরের স্বর্ণচূড়া সমাপ্ত করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

রোমিও জুলিয়েট।

কবি-চিত্ত-নন্দনের মন্দাকিনীকূলে
কবে উঠেছিলে জাগি' প্রেমের কূজনে
হে দম্পতি, বসন্তের কুসুমে, মুকুলে,
উদ্গলিত পিক-রবে; মলয়-বীজনে,
মধুপ-ঝঙ্কারে মৃদু প্রকৃতি সেদিন
আপনা ভুলিয়াছিল? প্রেমের প্রভায়
নয়ন উজল তার; সরমবিহীন
অসংবৃত কেশরাশি, অঞ্চল লুটায়।
বিশ্ব ভুলি' আত্মদান; নিভৃত মিলনে
বাক্য হ'তে অর্থভরা প্রেমের চুম্বন;
বিকশিত হৃদি-পদ্ম প্রেমের কিরণে,
প্রেম লাগি' সর্ব্বত্যাগী, প্রণয়—জীবন!
জীবনের প্রেমরাশি সম্বল মরণে।
কবির মানস রাজ্যে সার্থক সাধন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মেঘমালা।

১

অঞ্জননীল মঞ্জুল মেঘ-শয়নে
বসি সুন্দরী চিরযৌবন-মধুরা,
হেমঘট ধরি' লীলাচঞ্চলনয়নে
বরষিছে বারি কল্যাণী দিক্‌বধূরা।
রণ রণ রণ কঙ্কণ ঘন বাজিছে,
ঝর ঝর ধারা ঝরিছে পিরষে উরসে;
দোদুল মৃদুল কুন্তলদল নাচিছে,
সরস অঙ্গ শিথিল স্নিগ্ধ পরশে!
স্বপ্নবিবশ হৃদয়ে গভীর তৃপ্তি,
করুণমুগ্ধ আননে মধুর দীপ্তি।

২

কোমল মালতী মালিকা কণ্ঠকলিত,
চরণপদ্মে মঞ্জীর উঠে গুঞ্জরি',
মৃণাল-বলয় ভুজযুগ লতাললিত,
শ্রুতিমূলে ফুটে অভিনব নীপমঞ্জরী!
ফুল্ল কমললোচনে মদির দৃষ্টি,
স্নেহ-ছলছল বিহ্বল দূরগামিনী—
দগ্ধ ভুবনে করিছে অমিয়-বৃষ্টি,
অধরে হাস্য, বিলাসচপলা দামিনী!
বিরেছে অঙ্গ মেঘমায়াময়ী সন্ধ্যা,
চারু করতলে রজত-রজনীগন্ধা!

৩

বিনোদ-অঙ্গ-সঙ্গ-সুরভি নীরদে
হাসে জলধনু সপ্ত উজল বরণে,
সিনান-পুণ্য নীর নিরত, বরষে,
আতপতপ্ত নিখিলের গ্লানিহরণে।
ছায়াপথ ধরি' মায়ারথ তব চলিছে
গুরুগর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া,
মেঘতরঙ্গে রঙ্গে দামিনী জ্বলিছে
বিপুল আলোকে বিশ্বকালিমা হরিয়া!
সকল ভুবন তব অলক্ষ্য ইঙ্গিতে
ধ্বনিয়া উঠিছে মেঘমঙ্গল-সঙ্গীতে!

৪

যেখানে যখন উদিছ দ্যুলোকে ভূলোকে,
দিশি সুরম্য নব অঞ্জনবর্ণে;
কাঁপে অরণ্য সলিল-পরশ-পুলকে,
নীর-নিকণ ক্লান্ত কুসুমপর্ণে!
ঘন-বন-তলে চমকে চপলা হরিণী,
পরজে পবন কিতত বল্লীবিতানে,
হরষমত্তা সরসে সনাথ করিণী,
উতলা উৎস উচ্ছ্বসি' উঠে কি তানে!
ঘনবর্ষণে পঙ্কিল বন সরণী,—
কমলাঙ্কিকা সাজিছে বিপুলা ধরণী।

৫

বরষা-সরসা প্রকৃতি গাহিছে হরষে,
ধারা-সঙ্গীত সুমধুর মেঘমল্লারে;
শিহরে লহরী আতটপূর্ণ সরসে,
হাসিছে সলিল কত কুবলয়-কহ্লারে!
নৃত্যনিপুণ ময়ূর নাচিছে কুঞ্জে—
ঝক ঝক চারু চন্দ্রক শত কলাপে,
দিশি দিশি মিশি' রাজিছে তিমির-পুঞ্জে,
বিরত কোকিল অমৃতগীতি-আলাপে।
নিবিড় বিপিনে সুরভিবিভোরা কেতকী,
ঊর্দ্ধগগনে গাহিছে চাতক-চাতকী!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

অবরোধ-প্রথা।

ভারতের দ্বীপাতি অবরোধপ্রথার জন্য ইংরেজ রমণীগণের পক্ষে এক অজ্ঞেয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের নারীজাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-পদ্ধতির বিষয়ে অনেক ইংরেজরমণী অনেক কথাই লিখিয়াছেন। অনেকে ভারতনারীকে অবরুদ্ধ বিহগীর সহিত তুলিত করিয়া ক্ষোভপ্রকাশ করিয়াছেন; অনেকে তাহাদের লিখনপঠনের অভাব দেখিয়া বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে অধুনা কোনও কোনও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না ইংরেজরমণী অবরোধপ্রথার ও অবরুদ্ধা নারীগণের একটু আধটু প্রশংসাও করিয়াছেন। কুমারী এনা ষ্টীল, কুমারী ষ্টীভেন্স, শ্রীমতী কর্ব্বেট প্রভৃতি অনেকেই ভারতীয়ার প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তদবস্থার তুলনায় সমালোচনা করিয়া ইউরোপীয়া অপেক্ষা ভারতনারীর শ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সম্প্রতি কাউণ্টেস্ জার্সি "পেল্‌মেল ম্যাগাজিনে" ভারতরমণীর মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার সারাংশ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

ভারতে অবরোধপ্রথা হিন্দুগণ মুসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ব্যতীত অন্য সকল মুসলমানের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের কেবল উচ্চশ্রেণীর ও উচ্চ জাতির ভিতরেই অবরোধপ্রথা প্রচলিত আছে। পার্শী রমণীগণ এখন স্বচ্ছন্দে ইংরেজদের সহিত প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কহে। মুসলমান বা হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল নারী পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন, তাঁহারা ইংরেজরমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সুখবোধ করেন। আমি হায়দরাবাদের মৃত স্যর সালার জঙ্গ বাহাদুরের বাটীতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সালার জঙ্গের আবাসভবন রাজপ্রাসাদবিশেষ; যেমন কক্ষ সকলের সাজসজ্জা, তেমনই প্রাসাদের নির্ম্মাণকৌশল সুন্দর। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা নিমন্ত্রণরক্ষার্থ উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সে সময়ে কেহই আসেন নাই। অগত্যা একটি কক্ষে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে গৃহকর্ত্রী আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর দুইটি রমণী ছিলেন। আর সালার জঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুনীর-উল্-মুল্ক ছিলেন। গৃহকর্ত্রীর পরিচ্ছদ অপূর্ব্ব।—দেহে একটি লাল মখমলের জ্যাকেট, তাহাতে উত্তম সল্মাচুমকীর কাজ করা; তাহার উপর একখানি আস্‌মানি রঙ্গের ওড়না; আর পরিধানে লাল রঙ্গের পায়জামা,—হাঁটু পর্য্যন্ত খুব আঁটা ও কসা, উপরে বেশ ঢিলা; ইহাকে চুড়িদার পায়জামা বলে। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদও প্রথমার ন্যায়, কেবল বর্ণের পার্থক্য। এক জনের বেশ লোহিতবর্ণ, অন্যের পীতবর্ণ। এক জন রক্তাম্বরা, অন্যা পীতাম্বরা। আর তৃতীয়া বিধবা, তাই শ্বেতবসনা। অলঙ্কারের কথা কি বলিব, সে ত কত রকমের। মুক্তা, মণি, হীরা, পান্না, নীলা, চুণি স্বর্ণালঙ্কারের সহিত খচিত ও বিজড়িত। চরণ-আভরণটি বড়ই মজার—স্বর্ণনির্ম্মিত বটে, কিন্তু এত ভারী যে, উহা পায়ে দিয়া সহজে দীর্ঘকাল পদচারণা করিবার উপায় নাই। ইহার উপর আর একটা গহনা আছে, প্রতিপাদক্ষেপে তাহা হইতে মধুর শিঞ্জিতধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। এই দুইটিকে পয়রী ও পায়জর বলে।

একটা লম্বা জলচৌকীর মত পাঁচ ছয় ইঞ্চি উচ্চ টেবিলের উপর আহার্য্যসামগ্রী সজ্জিত ছিল। চেয়ারে বসিয়া খাইবার উপায় নাই। গৃহকুট্টিমে পালিচার উপর 'আসন' করিয়া বসিতে হয়। আমার ত তেমন অভ্যাস নাই, সুতরাং সে চেষ্টায় আমাকে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করিতে হইয়াছিল। আমার গতিক দেখিয়া গৃহকর্ত্রী ও তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয় খুব একচোট হাসিয়া লইলেন! ইঁহারা বড় সরল, সদা হাস্যমুখ, সদা আমোদপ্রিয়—সামান্য কথায় হাসিয়া চলিয়া পড়েন। দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা বড় সুখী—সদানন্দময়ী, সরলা, নিত্যতুষ্টা; অবরোধের দুঃখবোধ ইঁহাদের অণুমাত্র নাই। হয় ত বলিতে পার, ইঁহারা অন্তঃসারশূন্যা; কিন্তু ইঁহারা সুখী নিশ্চিত। মেহেদ আলি সাহেবের পত্নীকে আমি দেখিয়াছিলাম। তিনি শিক্ষিতা রমণী। কিন্তু তিনি আনন্দময়ী নহেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় একটা অবসাদের—একটা নৈরাশ্যের ভাব বিদ্যমান। তিনি উদাস ও নিরাশভাবে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কি নারী? আমি পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গী।' আমারও মনে হয়, মেহেদী আলির শিক্ষিতা নারী অপেক্ষা, হাস্যময়ী, আনন্দময়ী নবাবগৃহিণী ও তাঁহার দুই সঙ্গিনী আমাকে অধিকতর আনন্দদান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, দক্ষিণে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে। মুসলমানদের ছোট ছোট মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতেছে। তাহারা একটু ইংরেজী শেখে, একটু অঙ্ক কষে, একটু ভূগোল ও ইতিহাস পড়ে। অনেকের বিশ্বাস, এই অল্প শিক্ষার প্রভাবে মুসলমান-গৃহে ভাল গৃহিণী হইতেছে। অবরোধে অবরুদ্ধা হইলেও ভারতরমণী অধিকারবর্জ্জিতা নহেন। তাঁহাদের অনেক অধিকার আছে, গৃহস্থালীর ব্যাপারে অনন্ত প্রতাপ। ত্রিবাঙ্কুরের রাজ্যে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে হইলে 'রাজমাতা'র অধিকারসূত্রে আরোহণ করিতে হয়। রাজমাতা না থাকিলে রাজমাতা গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বে একবার রাজমাতার অভাবে রাজাকে ইংরেজ গভর্মেণ্টের অনুমতি লইয়া 'রাজমাতা' গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ত্রিবাঙ্কুরে পত্নীত্যাগের ব্যবস্থা বড় কৌতুকাবহ। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যাকে একটি আচ্ছাদনবস্ত্র দিয়া থাকেন, সেইটি ফেরৎ দিলে, বা চাহিয়া লইলে, বিবাহ-সম্বন্ধ কাটিয়া যায়।

মান্দ্রাজে 'হোবাট স্কুল' আছে। এইখানে মুসলমান বালিকাদিগকে লেখাপড়া শিখান হয়। প্রথমে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ অনেকেই করিয়াছিল। কর্ত্তারা ভাবিয়াছিলেন যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া কেবল প্রণয়লিপি লিখিবে, আর প্রাচীরের অপর দিকে ফেলিয়া দিবে। এখন এ ভাবের বিরোধ নাই। এই শিক্ষার প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথার একটু সঙ্কোচ হইয়াছে। আমার কোনও বন্ধু মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি এক অপরূপ দরখাস্ত পাইয়াছিলেন। এক মুসলমান নবাব তাঁহাকে আবেদন করেন, "দোহাই ধর্ম্মাবতার! এ অধীনকে রক্ষা করুন। আমার তিন পত্নী, যে দুইটিকে হউক, আপনি বাছিয়া লইয়া আন্দামান দ্বীপে চালান করিয়া দিন। একাধিক পত্নীর ন্যায় পাপ কি আর আছে!"

হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা কতকটা ভদ্রতার নিদর্শন। নিন্দাভয়ে,—অন্যে কি বলিবে, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা অবরোধপ্রথা প্রচলিত রাখিয়াছেন। আমার কোনও বন্ধু তাঁহার মান্দ্রাজী মুন্সীর বাড়ীর মেয়েদের দেখিতে চাহেন। মুন্সী নিজের বাড়ীতে দেখাইতে পারেন নাই,—প্রতিবেশীদিগের নিন্দাভয়ে। তবে এক নির্জ্জন পথে উভয় পক্ষের দেখাসাক্ষাৎ সংঘটিত করিয়াছিলেন।

ইহাতেই বুঝা যায় যে, হিন্দুদিগের মধ্যে প্রকৃত অবরোধ ছিল না, এখনও নাই। মুসলমান দেশের রাজা ছিল, প্রজার পক্ষে রাজার অনেক ব্যবহার আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকে। মুসলমানের অবরোধ-প্রথা হিন্দুর ভদ্রতার নিদর্শনস্বরূপ হইয়াছিল। হিন্দুরমণীদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা অধিক। তাঁহারা যেন একটু শান্ত ও সংযত। তাঁহারা বেশ সরলভাবে বিদেশীর বস্ত্রাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হাসি বড় মধুর। আমার মনে হয়, ভারতরমণী যেমন হাসিতে পারেন, তেমন হাসি আর কোনও দেশের মেয়েরা হাসিতে পারে না।

ভেরেশ্‌শাগীন।

রুস দেশের সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর,—সভ্যজগতের সর্ব্বজনমান্য চিত্রকর, ভেরেশ্‌শাগীন পিট্রোপাভ্‌লস্ক জাহাজ-ডুবিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জগন্মান্য চিত্রকরের অমন ভীষণ মৃত্যু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় বটে।

ভেরেশ্‌শাগীনের এত প্রখ্যাতি, এত মর্য্যাদা কেন হইয়াছিল? তিনি যুদ্ধের ছবি সুন্দর আঁকিতে পারিতেন। তাঁহার রুস-তুরস্ক যুদ্ধের খানকয়েক ছবি এখনও আদর্শস্বরূপ হইয়া আছে। যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনাটি তিনি নির্দ্দোষ করিয়া আলেখ্যে অঙ্কিত করিতে পারিতেন। বলিতে পার, ফটোগ্রাফেও ত ঐ কাজ হইতে পারে, তবে ভেরেশ্‌শাগীনের এত মান কেন? উত্তরে অনেক কথা বলিবার আছে। ভেরেশ্‌শাগীন ঠিক যেমনটি দেখিতেন, ঠিক তেমনটি আঁকিতেন না। তিনি দেখিতেন অনেক, নিবিষ্টচিত্তে রণক্ষেত্রের নানাবিধ অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, শেষে সর্ব্ববিধ দর্শনের সমবায়ে এমন একটি চিত্রের রচনা করিতেন, যাহা যুদ্ধের সমস্ত ঘটনার,—সুখ দুঃখের, আনন্দ অবসাদের, জয় পরাজয়ের, উৎসাহ উৎপীড়নের, বীরত্বের পশুত্বের একাধারে নিদর্শনস্বরূপ। সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্বজাতির মধ্যে যখন মানুষ মানুষকে মারিতে উদ্যত হয়, তখন যেমন ভাবের ঘটনা সকল অবশ্যম্ভাবী, ভেরেশ্‌শাগীনের চিত্র সকলে তাহাই পরিদর্শিত হইয়াছে। ইহাকে চিত্র-কাব্য বলিতে হইবে। যিনি রণবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ সকল অবস্থায় অভিজ্ঞ, তিনি ভেরেশ্‌শাগীনের চিত্র দেখিয়া উহাতে ভাব্য ও ভাবিত ঘটনানিচয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত, চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইবেন। ইহাই ভেরেশ্‌শাগীনের প্রাধান্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়। দান্তের নরকবর্ণনা যেমন আদর্শ, মিল্টনের পতিত এঞ্জেলগণের ভাবোন্মেষ যেমন আদর্শ, সেক্সপীয়রের লেডী ম্যাক্‌বেথের অনুতাপ যেমন আদর্শ, কালিদাসের শকুন্তলার ব্রীড়া ও সংকোচ যেমন আদর্শ, র‍্যাফেলের ম্যাডোনার মুখভাব যেমন আদর্শ, ভেরেশ্‌শাগীনের সমরচিত্রও তেমনই আদর্শ—জগতের আদর্শ। উহার ভীষণতা, নির্ম্মমতা, নিকটতা,—আবার কারুণ্য, মাধুর্য্য, মালিন্য,—বীর্য্য, শৌর্য্য, স্থৈর্য্য তেমনই সকল রণক্ষেত্রের—অতীত, আগত, অনাগত,—সকল আহবের আদর্শ; কেন না, অবশ্যম্ভাবী।

চিত্রকর মানবচরিত্র ও মানববুদ্ধির পর্য্যাপ্ত বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছেন। মানুষ সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বাবস্থাতেই মানুষ। কেবল পার্থক্য বা বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় দেশ-কাল-পাত্র-প্রভাবে, মনুষ্যত্বের আপেক্ষিক বিকাশে ও সঙ্কোচে। যে কবি বা চিত্রকর মনুষ্যত্বের আধেয়-তত্ত্ব অর্থাৎ মনুষ্যত্বের মূলতত্ত্ব বুঝিতে ও ধরিতে পারিয়াছেন,—ভাবসাগরের তলে ডুবিয়া প্রবালমুক্তাদি আহরণ করিতে পারিয়াছেন, এবং অতলচারী নক্রাদিরও দর্শন পাইয়াছেন,—তিনিই জগতের কবি, মনুষ্যজাতির কবি, সনাতন কবি, বা চিত্রকর। ভেরেশ্‌শাগীন আহবালেখ্যচিত্রণে মহাপ্রতিভাশালী

ছিলেন,—তিনি এ বিষয়ে অদ্বিতীয় ও অতুল্য। তাঁহাকে রণবিষয়ে জগতের চিত্রকর বলিলেও বলা চলে। তাই তাঁহার মৃত্যুতে জগদ্ব্যাপী শোকের মর্ম্মন্তুদধ্বনি শুনা যাইতেছে।

ডাক্তার মোরস্ জোকাই।

হঙ্গেরী অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যের অধীন ও সামন্ত রাজ্য। ডাক্তার জোকাই এই হঙ্গেরী দেশের প্রধান ঔপন্যাসিক। কেবল ঔপন্যাসিকই বা বলি কেন,—কবি, নাট্যকার ও সন্দর্ভলেখক। কেবলই কি লেখক,—রাজনীতিবিশারদ, তেজস্বী, দেশহিতৈষী, কৃতকর্ম্মা বীর। এমন বুঝি আর ইউরোপের কোনও দেশেই নাই। জোকাই ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই জীবনে দুই শত গদ্য পুস্তক লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার রচিত পদ্য ও কাব্য সকলের সংগ্রহপুস্তকের সংখ্যা সাড়ে তিন শত। এত লেখা আধুনিক কোনও লেখক লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। এত লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাব, ঘটনা, বর্ণনা, আখ্যানভঙ্গী, বা চরিত্রবিশেষের পুনরুল্লেখ বা পুনরুক্তি নাই। সবই নূতন, সবই অপূর্ব্ব। ষোড়শ শতাব্দীর হিস্পানী লেখক লোপ-ডা-লা-ভেগা যেমন ভাবের লেখক ছিলেন, ডাক্তার জোকাইও কতকটা সেইভাবের লেখক ও ভাবুক। জোকাই নয় বৎসর বয়স হইতে লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই বয়সে দুইটি পদ্য লিখিয়া কাগজে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি সত্তর বৎসর বয়সে একখানি বিয়োগান্ত নাটক লেখেন।

ডাক্তার জোকাই জীবনে বিবিধ অবস্থাবিপর্য্যয় ভোগ করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধে কখনও বা জয়ী হইয়া সুখভোগ করিয়াছেন, কখনও বা পরাজিত হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। একবার তাঁহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল; তাঁহাকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে গভর্মেণ্ট পারিতোষিক দিবেন, বলিয়াছিলেন। তিনি প্রাণের দায়ে জলাভূমিতে লুকাইয়া ছিলেন। একবার তাঁহাকে দেশত্যাগীও হইতে হইয়াছিল। জোকাই সংসারের অপূর্ব্ব অসাধারণ দুঃখ কষ্টও ভোগ করিয়াছেন,—দুষ্প্রাপ্য ও আরাধ্য সুখভোগও করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর নানা দেশের, নানা অবস্থার, নানা জাতির লোক দেখিয়াছেন। যাহা দেখিয়াছেন, তাহা ভুলেন নাই। গল্পাকারে সে সকল ঘটনা গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাই জোকাইর লেখার ভাব ও ভাষা নিতুই নূতন। জোকাই হঙ্গেরীর জাতীয় লেখক। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাঙ্গালীর ভাবের সহিত ইংরেজী ঢং মিলাইয়াছিলেন, জোকাই তাঁহার ভাব ও ভাষায় সেরূপ খাদ মিলান নাই। তাঁহার ভাষা আবেগময়ী, উচ্ছ্বাসময়ী, অলঙ্কারপ্রাচুর্য্যে রঙ্গভঙ্গময়ী। সে ভাষায় আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়, সে ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

জোকাই বহুভাষাবিদ্;—জর্ম্মণ, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজী, রুস্ প্রভৃতি নানা ভাষা জানিতেন, নানা ভাষার সাহিত্যের পরিচয় রাখিতেন। জোকাই সুরসিক ও ব্যঙ্গরসনিপুণ। একবার ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য জেলে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি জেলে ব্যর্থ বাস করেন নাই; কারণ, জেলের বর্ণনায় ও ঘটনায় তাঁহার একখানি পুস্তক পূর্ণ এবং সে পুস্তক বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত। জোকাইর এই কয়খানি পুস্তক সর্ব্বজনসমাদৃত,—The Lion of Janina, Midst the wild Carpathians, Pretty Michel, Black Diamonds, The Green Book, ইত্যাদি। বিসমার্ক, কসুথ, ভেরেশ্‌শাগীন, মুসো দুমা, লীঅৎ, ইবসেন প্রভৃতি জোকাইর সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া সম্মানিত বোধ করিতেন।

ডাক্তার জোকাই তাঁহার স্বদেশে যেমন সম্মানিত, ইউরোপেও তেমনই সমাদৃত। বিদ্বজ্জনসমাজ তাঁহার রচনায় গুণে মুগ্ধ।

স্পেন্সারের আত্মজীবনচরিত।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার নিজের জীবনবৃত্তান্ত নিজেই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্পেন্সারের জীবনের সকল ঘটনার কথা লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রচারিত হওয়ায় ইউরোপের সুধীমণ্ডলীর মধ্যে তীব্র আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। যিনি বিবর্ত্তনবাদকে দর্শনশাস্ত্রের বিষয়ীভূত করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি ইউরোপের প্রধান ও প্রকৃত দার্শনিক বলিয়া জগন্মান্য, যাঁহার "Synthetic Philosophy" নামক বিরাট গ্রন্থে মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তিনি নিজের জীবনের কথা নিজে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—ইহা একটু বিস্ময়জনক, একটু কৌতূহলোদ্দীপক নহে কি? রহস্য এই,—স্পেন্সার তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ সকলে যে বিশ্লেষণপটুতার পরিচয় দিয়াছেন, নিজের জীবনের ঘটনার উল্লেখ করিতে যাইয়াও সেই বিশ্লেষণপ্রবৃত্তির বিকাশ করিয়াছেন মাত্র।

স্পেন্সার পিতার এক পুত্র ছিলেন; তাঁহার অন্য ভাই ভগিনী ছিল না। স্পেন্সারের পিতা একটু উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি কাহারও আনুগত্য করিতে পারিতেন না; বরং অবসর পাইলেই লোকের কথার প্রতিবাদ করিতেন। স্পেন্সার নিজেই বলিয়াছেন,—"আমি একেই ত পিতামাতার এক পুত্র; তাহার উপর উদ্ধতস্বভাব ও স্বাধীনপ্রকৃতি জনকের পুত্র; আমিও তাই শৈশব হইতেই বড়ই উদ্ধত, 'একগুঁয়ে', মর্য্যাদাবুদ্ধিহীন ছিলাম। ছেলেবেলায় অন্যের সহিত তর্ক করিতে, এবং তর্ক করিয়া অন্য কাহাকেও পরাজিত করিতে আমার বড়ই আমোদ বোধ হইত। আমি কাহারও কোনও কথায় বেনালুম 'সায়' দিয়া যাইতে পারিতাম না; একটা-না-একটা দোষ বাহির করিতাম। এই কারণে, আমার সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হইত। এ সব স্বভাবের দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যাহা সহজ, তাহা অপরিহার্য্য। আবার যদি সহজ দোষ বা গুণ অবস্থাবশে বিকাশের ও পুষ্টির অবসর পায়, তাহা হইলে উহা একেবারেই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।"

এই ভাবে স্পেন্সার নিজেই একটি একটি করিয়া খুঁত বাহির করিয়াছেন, এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্পেন্সার ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে এপ্রেল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পরে আরও পাঁচটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু আট দশ দিনের অধিক কেহই বাঁচে নাই। দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন কেবল স্পেন্সার। ছেলেবেলায় স্পেন্সারকে লেখাপড়া শিখান দায় হইয়া উঠিয়াছিল। একে ত এক সন্তান, তাহার উপর দুষ্ট ও 'একগুঁয়ে', সর্ব্বোপরি অভিনিবেশের অত্যন্তাভাব। পাঠশালায় স্পেন্সার সকল বালক অপেক্ষা জোরে দৌড়াইতে পারিতেন; অন্য বালকদিগের উপর যথেষ্ট প্রাধান্যও করিতেন। শৈশবে স্পেন্সার তাঁহার জননীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার পিতা স্পেন্সারকে স্থানান্তরে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বাড়ীতে মায়ের কাছে থাকিলে স্পেন্সারের যে কিছুই লেখাপড়া হইবে না, তাহা পিতা বুঝিয়াছিলেন। স্পেন্সারের এক খুড়া ডিন্টন নগরে পাদ্রী ছিলেন; স্থির হইল যে, তাঁহারই নিকট স্পেন্সার থাকিবেন। যাইবার সময় স্পেন্সার কোনও কথাই বলেন নাই। প্রথমে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, খুড়া মহাশয়ের নিকট

বেড়াইতে যাইতেছি। বালক স্পেন্সার দশ দিন খুল্লতাতের নিকট আমোদেই ছিলেন। পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে আর মায়ের নিকট যাইতে দেওয়া হইবে না। তখন উদ্ধত বালক মাতৃবিচ্ছেদশোকে অধীর হইলেন, এবং কাহাকেও কোনও কথা না কহিয়া, পকেটে দুই শিলিং সম্বল লইয়া, পদব্রজে বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। প্রথম দিন তিনি আটচল্লিশ মাইল পথ হাঁটিয়া গেলেন, পরদিন সাতচল্লিশ মাইল, এবং তৃতীয় দিনে কুড়ি মাইল পথ হাঁটিয়া বালক স্পেন্সার বাটী যাইয়া পঁহুছিলেন। আগাপোড়া পথটা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছেন, পথে বিশ্রাম করেন নাই! স্পেন্সার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে এই কাণ্ড করিয়াছিলেন। এই এক ঘটনাতেই স্পেন্সারের চরিত্রের একাগ্রতা, উদ্যমশীলতা ও দৃঢ়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

স্পেন্সার যৌবনেও ভাল লেখাপড়া শেখেন নাই। তিনি ইংরেজী ভাষার ব্যাকরণের কোনও সমাচারই রাখিতেন না; কখনও সুশিষ্ট, সংযত ও সাধু গদ্য ইংরেজী লিখিতে পারেন নাই। তিনি ইতিহাস-গ্রন্থও পড়িতে পারিতেন না। কেহ কিছু বলিলে, তিনি উত্তর করিতেন, "পড়িব কি, ইতিহাসে কেবল মিথ্যা কথা পোরা থাকে। বৃথা মিথ্যার আলোচনা করিয়া লাভ? যদি ইতিহাসে মনুষ্যসমাজবিশেষের ক্রমবিকাশের পর্য্যায়-ব্যাখ্যান থাকিত ত পড়া যাইত।" মোট কথা, যাহাকে সচরাচর পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি বলিতে পারা যায়, স্পেন্সার তাহার কিছুই ছিলেন না। কবির মধ্যে শেলী, দার্শনিকের মধ্যে প্লেটো, সন্দর্ভকারের মধ্যে কার্লাইলের একটু আধটু তাঁহার ভাল লাগিত। স্পেন্সার জানিতেন অঙ্কশাস্ত্র; সিবিল এঞ্জিনিয়ারের সহযোগী হইয়া চারি পাঁচ বৎসর তিনি রেল-লাইনে কাজও করিয়াছিলেন—সংসারে আর বড় কাহারও ধার ধারিতেন না।

স্পেন্সার কখনও বিবাহ করেন নাই। বিবাহ না করিবার, বা না হইবার কারণ তিনি নিজেই স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"আমার ভগিনী ছিল না; আমার বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত আমাদের বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না। আমাদের বাড়ীতে, তাই, পত্নীর কোনও যুবতী বা প্রৌঢ়া কখনও আসিতেন না। আমি স্ত্রীজাতির সঙ্গপ্রভাব কখনও অনুভব করিতে পাই নাই। অবস্থাও মন্দ ছিল; বিবাহের ভাবনার তেমন অবসরও ছিল না। পরে যখন অবস্থা স্বচ্ছল হইল, তখন আমার উৎকট শিরঃপীড়া আরম্ভ হইল, তখন আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। পাত্রীরও জোগাড় হইয়াছিল। আমার 'Social Statics' পাঠ করিয়া আমাকে দেখিতে এক যুবতী আসেন। উভয়ে দেখাসাক্ষাৎ হইল, কিন্তু উভয়েই উভয়কে পছন্দ করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম, এমন অত্যন্ত বিদুষী নারী লইয়া আমি কি করিব! ছোট একটু মাথায় এতটুকু মস্তিষ্ক, তাহা অনবরত পরিচালিত হইতেছে। এ যুবতী আমারই মত উদ্ধত, স্বাধীনপ্রকৃতি হইবে। কি জানি, কি করিতে কি হইবে,—এই আশঙ্কায় আমাকে পিছাইয়া আসিতে হইল। যুবতীও আমাকে পছন্দ করেন নাই।" স্পেন্সারের বিবাহোদ্যোগের এই প্রথম ও এই শেষ। এই যুবতী আর কেহই নহেন, মিস্ এভান্স্—মর্জ্জ এলিয়ট্। পরে উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়; এ ঘনিষ্ঠতাটুকু বার্দ্ধক্যেই ঘটিয়াছিল।

হার্বার্ট স্পেন্সার প্রথম যৌবনে নাস্তিক ছিলেন, এবং নাস্তিক্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দার্শনিক কথার আলোচনা আরম্ভ করেন। কাল হ্যিল ও মিল তাঁহার বিশেষ বন্ধু হইয়াছিলেন। স্পেন্সার

কখনও কোনও উপাধি গ্রহণ করেন নাই, কখনও রাজদর্শনে যান নাই, কখনও ধনীর সেবা করেন নাই, কখনও কোনও সভার সভাপতি হন নাই, কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন নাই, কখনও নিজের গ্রন্থ কাহাকেও সমালোচনার জন্য দেন নাই, কখনও সমাজ বা মণ্ডলীবিশেষের নিকট হইতে কোনও সম্মান বা মর্য্যাদার পদ গ্রহণ করেন নাই, কখনও উপযাচক হইয়া কাহারও সঙ্গে আলাপ করিতে যান নাই, কখনও কোনও বন্ধুর নিকট হইতে অর্থসাহায্য বা দান গ্রহণ করেন নাই। সামাজিকতা ও লৌকিকতা তাঁহার এতটুকুও ছিল না। হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত, তিনি কঠোর ও কর্কশ স্বভাবের লোক। কিন্তু মিত্র স্বজনের নিকট তিনি স্নেহময়—ভাবময় ছিলেন। তিনি শিশুদের লইয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসিতেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র আমোদ ছিল।

বার্দ্ধক্যে স্পেন্সার ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। সংসারের অনন্ত কার্য্য-কারণ-পরম্পরার মধ্যে তিনি একটা উদ্দেশ্য দেখিতে পাইলেন। সংসারে যাহা কিছু ঘটে, তাহা যেন কাহার জন্য, কিসের জন্য, আর একটা কি হইবার জন্য, ঘটিয়া থাকে। আর মানুষ যতই মুগ্ধ থাকুক না কেন, তাহার মনে মনে একটা আত্মানুভূতি সদাই জাগরূক থাকে। সে অনুভূতি জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে একটা অনন্তের ব্যাপ্তি বুঝাইয়া দেয়। কেন এমন হয়? এই জিজ্ঞাসা হইতেই স্পেন্সার ঈশ্বরানুভূতি করিলেন, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের উপযোগিতাও বুঝিলেন। কাণ্টের পরে স্পেন্সারের ন্যায় দার্শনিক ইদানীং আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

উন্মত্ততার কারণ।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি উন্মত্তের সংখ্যার অতিবৃদ্ধি হইতেছে। অনেকে ইহার কারণানুসন্ধানে ব্যস্ত। কয়েকখানি মাসিকপত্রে ইহার আলোচনাও চলিতেছে। উন্মত্ততা কোনও প্রকারের দৈহিক রোগ নহে; উহা মস্তিষ্কের সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ঘটিয়া থাকে। এ রোগ যে কেন হয়, এবং কোন পদ্ধতি অনুসারে হয়, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে,—

১। যাহারা অত্যধিক মদ্যপ ও যাহাদের ক্ষুধামান্দ্য হইয়াছে;

২। যাহারা অত্যন্ত লম্পট, এবং লাম্পট্য-চিন্তায় দিনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করে, আর এই কারণে যাহাদের স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছে;

৩। যাহারা হঠাৎ কোনও একটা গর্হিত কাজ করিয়াছে, এবং তাহার চিন্তায় অহর্নিশি অতিবাহিত করিয়াছে;

৪। যাহারা অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মগ্ন থাকে, এবং জীবনে নানা কারণে যাহাদের কোনও আকাঙ্ক্ষাই মিটে নাই;—

তাহারাই প্রায় পাগল হইয়া থাকে। অর্থাৎ, উন্মাদের প্রধান উপাদান অতিস্বার্থপরতা, অতি-সংকীর্ণতা। যে অহরহ কেবল নিজের চিন্তা করে, কেবল নিজের সুখ দুঃখের আলোচনা করে, নিজের দোষ বা ত্রুটি দেখিতে পায় না, যাহার সংসারের কোনও কিছুতেই আস্থা বা বিশ্বাস নাই, প্রায়ই সেই উন্মত্ত হয়। নিতান্ত সংকীর্ণ আত্মসুখলিপ্সা ত্যাগ করিতে পারিলে, নানা দেশে ভ্রমণ করিতে পারিলে, নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারিলে, উন্মাদের ভাব দূর হয়। মাদকতা ও লাম্পট্যজনিত উন্মাদরোগ কিছুতেই আরোগ্য হয় না। মনে মনে অহরহ কুৎসিত চিন্তাতেই উন্মত্ততা

ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে ইংরেজ-সমাজের অভাবের মাত্রা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে; সহসা কেহ আর বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে চাহে না। ইহার উপর ধর্ম্মবিশ্বাস, আত্মসংযম একবারেই নাই। ফলে, লাম্পট্যের বৃদ্ধি, অশান্তি ও উদ্বেগের উৎপত্তি; আর পরিণামে উন্মত্ততা। এক জন লেখক বলেন যে, আবার যদি ইংরেজ ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হন, বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে চেষ্টা পান,—তাহা হইলে বিলাতে নরনারীর মধ্যে উন্মাদের সংখ্যা কমিয়া যায়। সংযম ও সাধনাশূন্য কৌমার্য্য উন্মত্ততার প্রত্যক্ষ হেতু।

যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব কেন?

বিলাতেও যেমন যক্ষ্মারোগের আতিশয্য, ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহার তদ্রোধিক প্রাদুর্ভাব। এই উভয় দেশেই এ রোগ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে হঠাৎ কেন বাড়িল? ল্যান্সেট উত্তর দিতেছেন,—

১। বিলাতী বিলাসের বৃদ্ধি। উষ্ণপ্রধান দেশে অত্যধিক ও অনবরত গাত্রাবরণ ব্যবহার করা দোষের;

২। কায়িক পরিশ্রমের অভাব; পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাব; পরিপাকশক্তির অভাব;

৩। মেহাদি রোগের প্রাদুর্ভাব, এবং ঐ সকলের বিষম বিষের নানা দেহে বিস্তার;

৪। লাম্পট্য—অতিমাত্র শুক্রক্ষয়;

এই কয়টি কারণেই যক্ষ্মা বা টিউবারকিউলোসিস্ রোগ হইয়া থাকে। ইহা একবার হইলে পুরুষানুক্রমে বিসর্পিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রিগণ যতদিন নগ্নদেহে শীতাতপ সহ্য করিয়া বিচরণ করিত, এবং কোঠাবাড়ীতে না থাকিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে কুটীরে বাস করিত, ততদিন তাহাদের ফুস্‌ফুস্ বা ফোসের কোনও রোগই হইত না। ভারতের হিন্দুগণ যতদিন নগ্নদেহে থাকিতেন, নিত্য নদীস্নান করিতেন, দেহে পর্য্যাপ্ত তৈলমর্দ্দন করিতেন, খড়ের ঘরে বাস করিতেন, এবং গ্রামে থাকিতেন, ততদিন তাঁহাদের মধ্যেও এ রোগের আতিশয্য ছিল না। পাকা আঁটা ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বালিয়া রাখিয়া নিদ্রা যাইলে যক্ষ্মাকাশ হয়। অম্লজনিত যক্ষ্মাও হইয়া থাকে। আহার্য্য-সামগ্রী যথারীতি পরিপাক না হইলে, পাকস্থলীতে একটা বিষের উদ্ভব হয়; সেই বিষ মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ দূষিত করিয়া দেয়। আর যক্ষ্মার প্রধান কারণ, বীর্য্যগত দৌর্ব্বল্য—ক্ষয় ও অপচয়জনিত দৌর্ব্বল্য। এই এক কারণ যে কত উৎকট রোগের মূল, তাহা বলা যায় না।

তাই বিলাতের বহুজ্ঞেরা বলেন যে, যদি আবার পুরাতন চালচলন আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই আমাদের রক্ষা সম্ভব। নহিলে কালে আমাদের বংশনাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আমাদের দেহে এত তৈজস পদার্থ নাই যে, এই সভ্যতার ক্ষয় ও অপচয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। বিলাতে এই দুই রোগের নিদান লইয়া খুবই আলোচনা চলিতেছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেব যে পথে পুরীধামে গিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন করিয়া লেখক তদানীন্তন উৎকলের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবিধ তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। বহুকাল পরে সারদা বাবুর ন্যায় কৃতী সাহিত্যিক বঙ্গভাষার সেবায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। সাধারণতঃ প্রবন্ধটির ভাষা মনোজ্ঞ ও বিশুদ্ধ, তবে দুই এক স্থলে আমরা অর্থবোধ করিতে পারি নাই। যথা,—"রূপনারায়ণের জলকল্লোল ও জলবেগ মন্দিরের নিকটে অঙ্গীভূত হয়।" সে যাহা হউক, আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক যেরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু "ঠানা জেলা" প্রবন্ধে বোম্বাই প্রদেশের ঠানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সোম "বলী দ্বীপ" প্রবন্ধে তত্রত্য ধর্ম্ম ও উপাসনার বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন।—"হিন্দুধর্ম্মই বলী দ্বীপের ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ধর্ম্মমত এখানে প্রচলিত। বৌদ্ধদিগের সংখ্যা অল্প; *** শৈবসম্প্রদায় ভিন্ন অপর সম্প্রদায় বলী দ্বীপে নাই; এখানকার শৈবধর্ম্মাচরণ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; পুরোহিতগণের নিত্য নৈমিত্তিক পারিবারিক উপাসনা ও আপামর সাধারণের সম্মিলিত উপাসনা। পণ্ডিতদের গৃহে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম ক্রিয়াকলাপ দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়, তাহারা বৈদিক পূজাপদ্ধতিরই অনুসরণ করে। সূর্য্যসেবন (সূর্য্যপূজা) ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত। *** তাহারা বলে, সূর্য্য মানে শিব। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, তাহারা প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস বিস্মৃত হইয়া এখন সাধারণ শিবপূজাই গ্রহণ করিয়াছে।" নগেন্দ্র বাবুর মতে বলী দ্বীপের শৈবধর্ম্মাচরণ দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু জন ক্রফোর্ড "History of the Indian Archipelago" নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"The followers of Siwa in Bali are, as in weastern India, divided into four great classes or casts, namely, a priesthood, a soldiery, a mercantile class and a servile class respectively called *Brahmana, Satriya, Wisiya and Sudra.*" জন ক্রফোর্ড কর্ম্মসূত্রে যাবা ও সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে ৯ বৎসর বাস করিয়াছিলেন; ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিন্স-অফ্-ওয়েল্‌স দ্বীপে উপনীত হন। তথায় তিন বৎসর বাস করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে যাবায় যে অভিযান হয়, আরল্ অফ্ মিণ্টোর অনুগ্রহে তিনি সেই অভিযানের অন্যতর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সূত্রে তিনি প্রায় ছয় বৎসর যবদ্বীপে অতিবাহিত করেন। ক্রফোর্ডের যাবায় অবস্থিতিকালে বলী দ্বীপে রাজনৈতিক অভিযান প্রেরিত হয়। সেই সূত্রে তিনি স্বয়ং বলী দ্বীপ পরিদর্শন করেন। তাঁহার অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার ফল পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ক্রফোর্ডের গ্রন্থ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এডিনবরায় মুদ্রিত হয়। সে আজ ৮৪ বৎসরের কথা। দেখা যাইতেছে, কিঞ্চিদূন শতবর্ষ পূর্ব্বেও বলী দ্বীপের হিন্দু শৈবগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল। বলী দ্বীপ প্রবন্ধের লেখক

ক্রুকোর্ডের গ্রন্থ দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। এই প্রবন্ধসঙ্কলনে কোন্ কোন্ গ্রন্থ তাঁহার অবলম্বন, প্রবন্ধে তাহাও প্রকাশ নাই। ক্রুকোর্ড-রচিত ইতিহাসের আলোচনা করিলে, লেখক শতবর্ষপূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় দ্বীপের অবস্থা অবগত হইতে পারেন। শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, লেখক যদি স্বীয় প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে, প্রবন্ধটির উপযোগিতা বর্দ্ধিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য "পার্ব্বতনির্ঝর" নামক কবিতায় নির্ঝরকে "দগ্ধ মরুভূমে যেন উর্ব্বর প্রান্তর, অনন্ত গগনে যেন স্নিগ্ধ সুধাকর, উজল অরোরা যেন সুদূর উত্তর ও বিজন বিপিনে যেন পান্থ তরুবরে'র সহিত তুলিত করিয়াই তৃপ্ত হয়েন নাই, অবশেষে কবিত্ব-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"নিরাশার বুকে তুমি স্ফুট পয়োধর।" নবীন কবি বোধ করি পয়োধর দেখিয়াই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন, পয়োধরের ক্ষীরধারা অবধি পঁহুছিতে পারেন নাই। "সুস্মিত ধারায়", 'তৃষাদগ্ধ জীবনের" প্রভৃতি অধুনাতন কবিদের মামুলি বৈভবগুলি "নির্ঝরে'র প্রবাহমধ্যে বন্ধুর শৈলখণ্ডের ন্যায় মাথা তুলিয়া ব্যাসকূটকে উপহাস করিতেছে। হেঁয়ালি ও কবিতার ব্যবধান ক্রমে লুপ্ত হইতে চলিল। শ্রীযুক্ত রাধালাল সরকারের "চীন দেশের বসন্তোৎসব" বিষয়গুণে সুখপাঠ্য। লেখক লিখিতে জানিলে আরও মনোরম হইত। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় "কয়েকটি বৈজ্ঞানিক কথা"র অবতারণা করিয়াছেন। 'কথা'র অপেক্ষা কথার ভাষা গুরুতর। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন বোষের "য়ুরোপপ্রবাসী বাঙ্গালী" নামক প্রবন্ধটি চলনসই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগের "বাবর-রচিত আত্মজীবনের আখ্যায়িকা"য়—উক্ত নামধেয় পুঁথির বিবরণ ; বাবরের কোনও বিবরণ নাই। এই সংখ্যায় গডওয়ার্ডের অঙ্কিত "বিদায়-গ্রহণ" নামক একখানি সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার সেই চিত্রের ভাষ্যস্বরূপ "বিদায়" নামক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। বিজয় বাবু 'মানসীর' 'অকালবোধন' করিয়াছেন, তাহার ফলে চিত্রখানির প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু ছন্দোময়ী প্রতিমায় দেবীর আবির্ভাব হয় নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্যের হইতে "বরুণস্তোত্রে"র অনুবাদ করিয়াছেন। ছন্দে ও ভাষায় বৈদিককবিগণের গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য নাই। "আমার পাখী" একটি কবিতা। "হৃদয় পিঞ্জরে পাখী হিরণ্ময় প্রণয়-শিকলে বাঁধা আছিল," এবং "উদাসী পথিকে দেখি শান্ত বনতলে, আপনি সে ছিল ধরা", তাহার পর এক দিন অলক্ষ্যে নিষধ আসিয়া "শাণিত শায়কে তার নিখিল পরাণ।" সুতরাং "পড়ে আছে সে অবধি শূন্য সে পিঞ্জর"। আর কবি বলিতেছেন, "থেমে গেছে চির তরে প্রণয়ের গান"। বাদ্যযন্ত্রবিশেষের ন্যায় কোনও কোনও গান, বিশেষতঃ এই একঘেয়ে প্রণয়ের গান থামিলেই মিষ্ট লাগে। কিন্তু থামে কৈ? "অসভ্য জাতির পরলোক" এখনও চলিতেছে। লেখকের ভাবময় একেবারে অধিকার নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "আমার জীবন" নামক একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনার ভাষার দুর্দ্দিশার সীমা নাই। সমালোচনার মর্ম্ম ত—'নিহিতং গুহায়াম্'। "সার্কাসওয়ালী" একটি চলনসই গল্প। গল্পটিতে লেখকের নাম নাই। নাম না থাকুক—চারুচন্দ্রালোকে বাউরী দম্পতির চিত্রটি উদ্ভাসিত দেখিয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "চাঁদ" নামক কবিতাটি সদিও কবিবরের কল্পনাবৈভবে বঞ্চিত—তথাপি উপভোগ্য।—

"সাধে কি কুমুদী হাসে হেরিয়া তোমায়?
শিখিপুচ্ছে নাহি হেন রূপ।
সাধে কিহে স্বর্ণপদ্ম তোমারেই চায়,
শিশু-অঁখি-ভ্রমর লোলুপ?"

অতি সুন্দর। দেবেন্দ্র বাবুর একটি চরণ—"সুনীল সাগরে তুমি সোনার কমল" পড়িয়া স্বর্গীয় যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "চন্দ্র" নামক কবিতার "নভ-নীল-হ্রদে তুমি সোনার কমল" মনে পড়িল; পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগে পড়িয়াছিলাম।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। "মাঙ্গল্য" নামক কবিতাটির বিষয় মহনীয়। কবি উপযুক্ত ভাষায় উচ্চ ভাবের আবাহন করিয়াছেন। "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে দেশের লুপ্ত ইতিহাস-উদ্ধারের আশায় শ্রীমতী সরলা দেবী কতকগুলি প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীদাস সান্যালের "স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের শিল্পানুষ্ঠান" নামক প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীমতী স্নেহলতা সেনের "নেহাল ওস্তাদ" নামক অতিপ্রাকৃত ক্ষুদ্র গল্পটি রমণীয়। আখ্যান-বস্তু বিচিত্র, কিন্তু গল্পের একটানা ভাষায় বৈচিত্র্য ও কলাকৌশলের অভাব। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর "শিশুরহস্য" নামক কবিতাটির নামটি সার্থক হইয়াছে। রচনাটি 'শিশু-কবি'র রহস্য-লীলা বলিয়াই মনে হয়। কবি বলিতেছেন, "ভাল মন্দ নাহি বুঝে যা পায় তা খায়!" ইহাও যদি কবিতা হয়, তাহা হইলে গদ্য কি? তাহার পর, "ধর্ম্মের ধার না ধার কৃষ্ণ কিম্বা যীশু" শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ধর্ম্মসংস্থাপক কৃষ্ণ ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশু ধর্ম্মের ধার ধারিতেন না, এ কথা পদ্যে না লিখিয়া গদ্যে লিখিলে লেখকের জন্য মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করিতে হইত। কিন্তু ইহা কবিতা, এবং কবিরা নিরঙ্কুশ। মল্লিনাথ বলিতেছেন, ইহার অর্থ—শিশু কৃষ্ণ কিংবা যীশু কাহারও ধর্ম্মের ধার ধারে না। কিন্তু যাহাদের মল্লিনাথ নাই, তাহাদের উপায়? এরূপ অসম্বদ্ধ অসংস্কৃত রচনা মুদ্রিত করিয়া ফল কি, বলিতে পারি না। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "উর্ব্বশী ও টুকারাম" নামক দৃশ্যকাব্যের দ্বিতীয় সর্গ এবারও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাণহীন অসিত্রাক্ষরে যতির বৈচিত্র্য বা ধ্বনির গাম্ভীর্য্য নাই। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র প্রহরাজ "উৎকল ভাষা ও সাহিত্য" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, উৎকল ভাষা ও সাহিত্য, কাহারও প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। এত ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে বোধ করি তাহা সম্ভবও নহে। আশা করি, প্রহরাজ মহাশয় ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে উৎকল ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় দিবেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গোহ" নামক গল্পটি সুন্দর। ক্ষুদ্র গল্পে এমন সুচারু ও সূক্ষ্ম কারুকৌশল সচরাচর দেখা যায় না। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গসাহিত্যের মাসিক বিবরণী"—সমালোচনার প্রহসন। মূল পালার পরই সং আসে বটে।

বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র "ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্য" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ওকাকুরা রচিত "Ideals of the East" নামক নবপ্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সার-সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদাবলী" ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসুর "ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র" উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

৪ঠা ভাদ্র। সন্ধ্যার পর চুণীবাবুর সহিত মিনার্ভা থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টাখানেক কাটাইলাম। অভিনয়ের বিষয়, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের নূতন নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"। বসিয়া বসিয়া দুইটা অঙ্ক অভিনীত হইতে দেখিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্যও তাদৃশ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। বিরক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। গিরিশবাবুর পৌরাণিক বা ঈশ্বর-ভক্তিমূলক নাটকগুলি মন্দ হইত না। নাটকত্ব তেমন থাক বা নাই থাক; সেগুলি তবু দেখিতে পারা যায়। আর দেখিয়া প্রাণের ভিতর উচ্ছ্বাসও অনুভূত হয়। * * * অদ্যকার অভিনীত নাটকের ভিতর কীচকের মুখে এমন কতকগুলো কথা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা প্রকাশ্য রঙ্গস্থলে কোন মতেই মার্জ্জনীয় নহে। আর কীচক তাহার ভগিনী বিরাটমহিষীর সমক্ষে যেরূপে তাহার কামতৃষ্ণা বর্ণিত করিল, তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। রঙ্গালয়ে অনেক ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়া থাকে; অন্ততঃ তাঁহাদের মুখ চাহিয়াও গিরিশবাবুর এই সকল বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। * * *

৫ই ভাদ্র। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপর এক কবিতা লিখিয়া শ্রাবণ মাসের "নব্যভারতে" প্রকাশিত করিয়াছেন। কবিতাটি তেমন ভাল হয় নাই। বিশেষতঃ, মাইকেলের মৃত্যু উপলক্ষে যে কবির হস্ত হইতে সেই মহান্ স্বর্গীয় সঙ্গীত বহির্গত হইয়াছিল, বর্ত্তমান কবিতা তাঁহারই লেখনীপ্রসূত বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না। "দশমহাবিদ্যা" প্রকাশের পর হইতে হেমবাবুর প্রতিভার অন্তর্ধান না হউক, অধঃপতন যে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরণ প্রতিভার সমান স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি অতি অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটে, স্বীকার করি। কিন্তু, কবির হৃদয়বাসিনী সেই দেবী যাঁহাকে কাঁদাইয়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যান, তাঁহার কি ভীষণ দুর্দ্দশা! যাঁহার সৌন্দর্য্যকিরণে কবির জীবনব্যাধিরূপ দৈত্য ভীত হইয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি অবলম্বন করে; একমাত্র যাঁহার চরণসেবাই কবির স্বর্গসুখ, সেই সৌন্দর্য্যরূপিণীর বিরহে তিনি যে কিরূপে জীবনধারণ করিতে পারেন, ইহাই আশ্চর্য্য। তবে, এ জগতে মরিয়াও বাঁচিয়া থাকার কথা শুনিয়াছি। জীবন্মৃত কথা যদি কাহারও উপর প্রয়োগ করিতে পারা যায়, সে যে এইরূপ প্রতিভাদেবী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কবি, তাহা সুনিশ্চিত। যিনি স্বয়ং জীবিতস্বরূপিনী, তাঁহার বিরহে আবার জীবন কি? হায়! এ জগতের কবিকুলকে কত দুঃখই সহ্য করিতে হয়।

৬ই ভাদ্র। "সাহিত্যের" জন্য রুশীয় কবি কলটসফের একটা কবিতা অনুবাদ করিলাম। অনুবাদের অনুবাদ। সুতরাং ইহা পড়িয়া কলটসফের শক্তির পরিমাণ করা যায় না। তবে, প্রকৃত হৃদয়গত কবিত্বের চিরসহচর যে গাম্ভীর্য্য ও সুমধুর ধ্বনি, তাহা অনেকাংশে অনুভূত হয়। অনুবাদটি এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

(World-weariness.)

জীবন-ভার।

(১)

ঘন ঘোর মেঘ আইল ছাইয়া,
পাগলের মত বহিল বায় ;
ঝটিকা-তাড়িত, শ্রান্তি-শাসিত
দুখ-গুহা-মাঝে পশিনু, হায়।

(২)

বিভীষিকা-ময় এ জরা-জীবন,
চিরদিন তরে ঘুচেছে আশ,
টুটে গেছে মোর প্রভাত-স্বপন,
ভাঙ্গিয়া পড়েছে প্রেমের বাস।

(৩)

দলে দলে শোক আসিছে ঘেরিয়া,
যুঝিবারে নাহি শকতি আর ;
তবু বার বার ভাসিছে জগৎ,
চেয়ে আছি ল'য়ে বাসনা-ভার।

(৪)

গেছে সুখ-নিশি, স্বভাব চপল,
আর কিরে তা'র পাব না দেখা ?
উষা না আসিতে পোহা'ল যামিনী
অভাগারে রাখি ফেলিয়া একা।

(৫)

সাহসে আবার পাখা প্রসারিয়া
চল, চল সেই নিঝর-ধারে,
হয় ত আবার মিলিবে সেথায়
হৃত সুখ গিরি-গহন-পারে।

(৬)

অথবা নীরবে বসি' এই কূলে
তুষারের ঢেউ লাগিছে যথা,
সুখ-প্রেম-হারা, তবুও সাহসে
বীর সম বহ জীবন-ব্যথা।

কবিতাটিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিষাদরূপ বিশেষত্ব বিলক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু, বিষাদ ও অন্ধকারই ইহার পরিণাম নহে। বিপদজালের সহিত যুঝিবার সাহস ও শক্তিও ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং ইহার নীতি প্রশংসনীয়। প্রতিভাশালী মহাজনের লক্ষণ, শক্তিশালিতা। অতএব ইহাই কি কবির শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচায়ক নহে ?

৭ই ভাদ্র। রুশীয় কবি লারমনটফের দুইটি গীতি অনুবাদ করিলাম। কলটসফের ন্যায় ইহাঁরও জীবন দুঃখ-শোকে পরিপূর্ণ। সেই রোদনের সুর নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।—

সংবাদ।

(১)

তব সাথে সখা! মিলিতে আবার
কি বাসনা জাগে পরাণে মোর ;—
শুন, সে বলে আজি অভাগার
ছিঁড়িয়া এসেছে জীবন-ডোর।

(২)

যাবে তুমি কাল স্বদেশে ফিরিয়া,
দু'টি কথা কয়ে দিতেছি তাই ;—
অথবা মিছা এ আশার স্বপন,
মোর কথা কেন শুনিবে, ভাই?

(৩)

তবু, তবু, সখা, প্রিয়জন কেহ,—
নামে কিবা কাজ,—সুধায় যদি,
বোলো, বোলো তা'রে এসেছি দেখিয়া
সমর-শয়নে টুটিত-বিধি।

(৪)

বোলো সে করেছে বীরের মতন
স্বদেশের কাজে জীবন-দান ;
আর বোলো, এক মধুর মূরতি
ছিল সুখে তা'র ভরিয়া প্রাণ!

সাধ।

(১)

জীবনে আমার নাহি কোন সাধ,
অতীতের লাগি বেদনা নাই,
আজিকে ছিঁড়িবে যতেক বাঁধন
বিস্মৃতি-ঘোরে ঘুমাতে চাই।

(২)

নহে সে শীতল সমাধিশয়ন
শোণিতের স্রোত বহে না যায় ;
নিশ্বাস-ভরে হিয়া দুরু দুরু,
কাঁপিয়া উঠিবে পড়িবে তায়।

(৩)

দিবা নিশি এক মধুর সুরব
প্রেম-সংগীতে জুড়াবে প্রাণ ;
চির-পল্লবে ছায়া-ঘন বট
মর্ম্মর-রবে তুলিবে তান।

৮ই ভাদ্র। রবীন্দ্রনাথের "বসুন্ধরা" কবিতাটি মনোযোগসহকারে পাঠ করিলাম। এখন ইহার রচনা-পদ্ধতির বিবিধ দোষ লক্ষিত হইতেছে। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পদ্ধতির এরূপ সম্মিলন বড় সহজসাধ্য নহে। মিলের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া, অমিত্রাক্ষরের প্রধান অবলম্বন ও প্রাণস্বরূপ যে অনায়াস স্রোতোগতি, তাহা রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান কবিতার অনেক স্থলেই স্রোতোভঙ্গ হইয়াছে। এখন বুঝিতেছি, এ বিষয়ে "বসুন্ধরা"র অপেক্ষা "বিদায়-অভিশাপ" শ্রেষ্ঠ। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের ভাষা "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যেই পূর্ণ না হউক, প্রকৃষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ, "চিত্রাঙ্গদা"র মিলের শৃঙ্খলে কবির হস্তপদ বদ্ধ নহে ; তিনি স্বাধীন ভাবে, স্বচ্ছন্দে আপনার শক্তি প্রকাশিত করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন,—নিজের উপরে একটু সংযম ও বন্ধন রাখিবার জন্যই তিনি অমিত্রাক্ষরের সহিত মিত্রাক্ষর মিশাইয়াছেন। সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারিলে, ইহাতে ভালই হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু, সে সাফল্য বহুলসাধনসাপেক্ষ। সে যাহাই হউক,

মান্দ্রাজের "হিন্দু" পত্রে প্রকাশ, বাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার এম্. এ. লণ্ডনের রাজকীয় ঐতিহাসিক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আয়াঙ্গার মহাশয় ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। এই সম্মান তাহারই পুরস্কার। "দক্ষিণ ভারতে চোল রাজ্যের শাসনপ্রণালী" ও "চোল রাজ্যের প্রাধান্য" সম্বন্ধে 'মান্দ্রাজ মেল' পত্রে দুইটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া এই নূতন ঐতিহাসিক যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মায়ার বন্ধন" বাঙ্গালার সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। "মায়ার বন্ধন" স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। 'সাহিত্যে'র অনুরোধে গ্রন্থকার পুস্তকের প্রচার বন্ধ রাখিয়াছিলেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি. এ. "ভারতচন্দ্র"-সম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিতেছেন। এই গ্রন্থে ভারতচন্দ্র-যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার আলোচনা, কবির জীবনচরিত ও তদীয় গ্রন্থের সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

রাজসাহীর প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী বৃদ্ধবয়সে নবীন উৎসাহে পদ্যে রামায়ণের অনুবাদ করিতেছেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রামায়ণের রচনাকাল-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রাজসাহীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য পাণিনিতন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"বাঁশী" নামক গীতিকাব্যের প্রণেতা কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেনের "কল্যাণী" নামক ক্ষুদ্র খানি নূতন গীতিকাব্য মুদ্রিত হইতেছে।

"ত্রিদিব-বিজয়" ও "রাঘব-বিজয়ের" কবি শ্রীযুক্ত শশধর রায় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া একখানি কাব্য রচনা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিতেছেন।

রাজসাহী কলেজে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। এই টোলের একটু বিশেষত্ব থাকিবে।—চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নাহরণ করিয়া পুস্তক রচনা করিতে বাধ্য থাকিবেন। আশা করি, এই পবিত্র উদ্যম সফল হইবে।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও ক্লাসিক থিয়েটারের বর্ত্তমান নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ দুর্ভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার শেষ জীবন ও পলাশীর যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিতেছেন, শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ অজাতশত্রু হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সার' উপাধি লাভ করিয়াছেন। 'সার'-সংযোগে গুরুদাস বাবুর মহিমা বর্দ্ধিত হইবার নহে। বরং তাঁহার নাম-সংযোগে উপাধিরই সম্মানবৃদ্ধি হইল। পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যচর্চ্চায় অবসরকাল অতিবাহিত করিতেছেন। সে দিন বিজ্ঞান-সভায় "বিজ্ঞানের অনুশীলন" বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি স্বাস্থ্যের অনুরোধে মজঃফরপুরে প্রবাস করিতেছেন।

শ্রাবণে।

তুমিই কি রাখনি ভুলায়ে হিমশীর্ণ মৃত্যুর মূরতি ?
তবে কেন ভাবিব তাহারে, যার প'রে ঢেলেছ বিস্মৃতি।
হোক্ শুক্ল কৃষ্ণ কেশদাম, রেখাঙ্কিত হয় হোক্ ভাল,
যত দিন এই আঁখিযুগ্ম রবে দীপ্ত হে বিশ্বভূপাল !
তোমারে হেরিব আঁখি ভরি';এই ভিক্ষা মাগি বিশ্বপতি,
জলে স্থলে কুসুমে শাদ্বলে ওই তব মধুর মূরতি।
বসি' এই নিভৃত কুটীরে, এই ক্ষুব্ধ-নীল-সিন্ধুকূলে,
কে স্মরিবে ত্যামস-মৃত্যুরে? গুপ্ত ফণা থাক্ না সে তুলে!
আঁখি মুদি' অন্ধ-পরকাল ধেয়ান সে মুক্ত যোগী জন,
চেয়ে চেয়ে আমি চিরকাল রচি যেন সুন্দর-দর্শন ;
সে সুপথ ধরি' চলে যারে তর্কশ্রান্ত ক্লান্ত পান্থজন,
পুষ্পবাসে ঘননীপচ্ছায়ে, নিরুদ্বেগে, তোমার ভবন।

আজি প্রাতে মেঘ গেছে কেটে, ঝলমল স্বর্ণময় বায়ি,
পটবাসা পূর্ব্বাশার দ্বারে দিগঙ্গনা লয়ে হেম-ঝারি
ঢালিতেছে কনক-উদক নীলকণ্ঠ শ্রাবণের শিরে,
আর্দ্র করি' ঘন-নীল-জটা, স্বর্ণধারা পড়িতেছে ঝরে!
শ্যামছত্র তালীবনরাজি সিন্ধুশিরে ধরিয়াছে খুলে,
চুলাইছে হরিত চামর নারিকেল, কূলে কূলে দুলে!
হরিত সুপুচ্ছ ঝুলাইয়া ঝাউ-শাখে বসি' শুকদল,
নব-রবি-করে ফুল্লহিয়া, গায় সুখে প্রভাতী-মঙ্গল।
শ্রাবণের সঘন-বর্ষণমুক্ত আজি লঘু মেঘদল
উড়ে উড়ে গগনেতে ফিরে পান করি' কনক তরল।
দূরে নীল আকাশের কোলে ভেসে আসে শুভ্র পোতখানি—
ও পারের সংবাদ কাহার আনিছে এ প্রভাতে না জানি !

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ফিরোজ শাহ তোগলক।

এক জন ইতিহাসলেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দিল্লীর পাঠানরাজত্বকাল অরাজকতার যুগ। এই নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। অধিকাংশ পাঠান নরপতিই দুর্ব্বলচিত্ত ও কুক্রিয়ান্বিত ছিলেন; এই জন্য পাঠান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচার বদ্ধমূল হইয়াছিল। পাঠানগণ হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা দেবালয় ভগ্ন ও দেবমূর্ত্তি বিকলাঙ্গ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন, এবং তরবারির সাহায্যে হিন্দুর জাতিনাশ করিতেন। যাঁহার রাজত্বকালে মোসলমান-কৃত অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাঁহার নাম মহম্মদ তোগলক। মহম্মদ দিল্লীর পঞ্চদশতম মোসলমান নরপতি। তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত ও রক্তপিপাসু ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে পাঠান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র হাহাকারধ্বনি উঠিয়াছিল। মহম্মদের পর ফিরোজ তোগলক দিল্লীর রাজসিংহাসন লাভ করেন। ফিরোজ প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়দর্শী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে বহুকাল পরে হিন্দু প্রজাবর্গ শান্তিলাভ করে।

ফিরোজ মহম্মদ শাহ তোগলকের পিতৃব্যপুত্র। (১) মহম্মদ তাঁহার সঙ্গে ঐকান্তিক প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে তাঁহাকে আপনার

---

(১) ফিরোজ হিন্দু রমণীর গর্ভজাত ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার পরিণয় ব্যাপারে একটু 'রোমান্সে'র গন্ধ আছে। "গিয়াসউদ্দীন তোগলক যখন লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্ত্তা, তখন তাঁহার ভ্রাতা (ফিরোজের পিতা) তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। তিনি রাণামল ভট্টির কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু রাণা এ প্রস্তাবে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। ইহাতে তিনি রাণার রাজ্য আক্রমণ করেন। একদিন সেই রাজকুমারী রাণার মাতাকে বিলাপ করিতে শুনিয়া তাদৃশ বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজমাতা বলিলেন, তোমার জন্য মোসলমান সৈন্যগণ এদেশের অধিবাসীদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতেছে; ইহাই আমার বিলাপের কারণ। তাহা শুনিয়া রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন, যদি আমাকে দিলেই লোকে উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়, তাহা হইলে আমাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন; মনে করিবেন, মোসলমানেরা আপনাদের একটি কুমারীকে বন্দিভাবে লইয়া গিয়াছে। রাণা স্বীয় কন্যার অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়া তাঁহার বিবাহে সম্মত হইলেন এবং তদনুসারে রাজকুমারীকে দিপালপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় মহাসমারোহে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই রাজপুতকুমারীর গর্ভে ফিরোজের জন্ম হয়।"—ভারতবর্ষে মোসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।

উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। (১) কিন্তু ফিরোজের রাজ্যলালসা ছিল না। তিনি মক্কায় গমন ও তথায় ধর্ম্মচর্য্যায় জীবনযাপন করিবার অভিলাষী ছিলেন। এই জন্য মহম্মদের মৃত্যুর পর অমাত্যগণ ফিরোজের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলে তিনি বলেন, "আমি মক্কায় গমন করিব; রাজসিংহাসনের প্রার্থী নহি।" সমবেত অমাত্যগণ তাঁহাকে একবাক্যে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন অমাত্যশ্রেষ্ঠ তাতার খাঁ ফিরোজের হস্তধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। ফিরোজ বলিলেন, "বিপদপূর্ণ বহুযত্নসাধ্য শাসনকার্য্য আমার হস্তে ন্যস্ত করিতেছেন, আপনারা কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করুন; আমি উপাসনা শেষ করিয়া আসিতেছি।" তার পর তিনি তদ্‌গতচিত্তে নমাজ পাঠ করিলেন, এবং উপাসনান্তে অবনতমস্তকে অশ্রুসিক্তলোচনে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, রাজ্যের স্থায়িত্ব, শান্তি ও শৃঙ্খলা মানুষের উপর নির্ভর করে না। তোমার আদেশেই রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর, তুমিই আমার আশ্রয়স্থল ও বলবিধানকর্ত্তা।" উপাসনা শেষ হইলে অমাত্যগণ তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিলেন।

ফিরোজ রাজপদ-গ্রহণকালে যে সুদৃঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন, রাজ্যশাসনকালেও তাহা কিঞ্চিন্মাত্র শিথিল হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা নিরলসভাবে রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। কিন্তু কখনও তিনি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইতেন না। রাজনীতি বা বিলাসিতার জন্য তিনি এসলামশাস্ত্রের বিরোধী কার্য্যে প্রশ্রয় দিতেন না। (২)

ফিরোজ বিলাসী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাব ছিল না। সুদৃশ্য প্রাসাদাবলী ও উদ্যানমালার নির্ম্মাণে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের ভগ্নপ্রায় সমাধিমন্দিরসমূহের আমূল সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে বহুসংখ্যক সরোবরের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল। সুলতান আলতমাসের বিপুলায়তন শিক্ষামন্দির ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছিল। ফিরোজ তাহা পুনর্নির্ম্মিত করেন। পুরাতন দিল্লীর মসজীদ-ই-জামি নামক বিখ্যাত উপাসনামন্দির ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। ফিরোজের সময়ে এই মসজিদও পুনর্নির্ম্মিত হয়। ফলতঃ, তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লী নগরী মনোহর প্রাসাদে, সমুচ্চ মসজিদে, কারুকার্য্যখচিত

(১) মহম্মদের পুত্রসন্তান ছিল না।

(২) *Tarikh-i-Firoz-Shahi.*

সমাধিমন্দির ও নির্ম্মলবারি সরোবরে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সজ্জিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনবৃত্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"ঈশ্বর যে সকল গুণে আমাকে ভূষিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমারত-নির্ম্মাণের বাসনা অন্যতর। আমি বহুসংখ্যক শিক্ষামন্দির, মসজিদ ও সজ্জ নির্ম্মাণ করাইয়াছি। এই সকল স্থানে পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ভক্ত ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরোপাসনা করিয়া নির্ম্মাতাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। * * * পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতান ও আমীর ওমরাহগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভগ্নপ্রায় এমারত-সমূহের সংস্কার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে সুমতি দিয়াছিলেন। এ জন্য আমি প্রথমে ঐ সকল এমারতের সংস্কার সম্পন্ন করিয়া, পরে নূতন এমারত সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছি।"

আর একটি কার্য্য সুলতানের অতি প্রিয় ছিল। মৃগয়ায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি অনেক সময় মৃগয়ায় লিপ্ত থাকিতেন; এবং তাহাতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন।

কিন্তু লোকহিতসাধনই ফিরোজের জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। তদীয় স্বরচিত-জীবনবৃত্ত-ধৃত নিম্নলিখিত কবিতানিচয়ে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।—

Labour to earn for generous deeds a name,
Nor seek for riches to extend thy fame.
Better one word of praise than stores of gold,
Better one grateful prayer than wealth untold.
The practice of the great should be,
To Succour honest man;
And when a good man dies, to see
His children find a friend.
Kings should make their rule of life
To love the great and wise:
And when death ends this mortal strife
To dry their loved ones' eyes.

এই লোকহিতপরায়ণ শাসনকর্ত্তার আমলে বহুসংখ্যক বৃদ্ধ কর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল কর্ম্মচারী বার্দ্ধক্যবশতঃ রাজকার্য্য-নির্ব্বাহে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই জন্য অন্যতম দেওয়ান মালিক ইসাফ তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে সুলতান উত্তর করেন, "এমন কথা বলিও না। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বৃদ্ধ বলিয়া কাহাকেও অন্নদানে

বিরত নহেন। অতএব আমি তাঁহার সৃষ্ট জীব হইয়া কিরূপে আমার জরাগ্রস্ত কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করিতে পারি?" রাজধানীতে কেহ কর্ম্মপ্রার্থনায় উপস্থিত হইলেই তাহাকে রাজসকাশে উপস্থিত করিবার আদেশ ছিল। কেহ কর্ম্ম-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ফিরোজের দয়ালুতার আর একটি প্রমাণ দিতেছি। মহম্মদ শাহ তোগলক দেব-গিরিতে রাজধানীস্থাপনের কল্পনায় দিল্লীর অধিবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক তথায় লইয়া যান। কিন্তু পরে তাহাদিগকে পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ করেন। এইরূপ যাতায়াতে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত মহম্মদ শাহ বহু অর্থ ঋণপ্রদান করেন। ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই ঋণ আদায় করিবার আদেশদান করেন। কিন্তু তিনি পরে শুনিলেন, রাজাদেশ প্রতিপালিত হইলে ঋণী প্রজাবৃন্দের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। তখন তিনি প্রজাবৃন্দকে ঋণদায় হইতে একবারে অব্যাহতি দান করিলেন। মহম্মদ তোগলকের নৃশংসতায় অসংখ্য লোকের হস্ত পদ নাসা কর্ণ ছিন্ন হইয়াছিল। ফিরোজ তাহাদিগকে অর্থবলে বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারা সন্তোষজ্ঞাপক লিপি লিখাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি এই সকল লিপি একটি ভাণ্ডমধ্যে স্থাপিত করিয়া মহম্মদের সমাধির শিরোদেশে রাখিয়া দেন। ফিরোজের বিশ্বাস ছিল যে, এই কার্য্যে ঈশ্বর প্রীতিলাভ করিয়া মহম্মদের নৃশংসাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, এবং অত্যাচারপীড়িত প্রজাগণ মহম্মদের অপরাধ বিস্মৃত হইবে। তিনি মহম্মদের নিকট দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন। উপকারের প্রতিদানকামনায় তিনি পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সৈন্যগণের সহিত ব্যবহারকালেও সুলতানের পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি নবতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পালন করিতেন। সৈন্যগণকে নিজব্যয়ে অশ্ব রাখিতে হইত। অনেকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার সময় নিকৃষ্ট অশ্ব লইয়া আসিত। রাজকর্ম্মচারিগণ সেই সকল নিকৃষ্ট অশ্ব কার্য্যোপযোগী বলিয়া গণ্য করিয়া লইতেন। এই সকল কথা সুলতানের কর্ণগোচর হইলেও তিনি কিছু বলিতেন না। সৈন্যগণকে বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া স্ব স্ব অশ্ব দেখাইতে হইত। যে সকল সৈন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অশ্ব প্রদর্শন করিতে পারিত না, তাহাদিগকে আর দুই মাস সময় দিবার নিয়ম ছিল। একবার এক জন অশ্বারোহী সৈন্য অশ্ব প্রদর্শন করিতে না পারিয়া আক্ষেপ করিতেছিল। সুলতান গোপনে তাহার আত্মগোক্তি শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং

তাহাকে কেরাণীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। প্রত্যুত্তরে সৈনিক বলিল, আমার অর্থের অভাব; নতুবা একটি সুবর্ণতঙ্কা হইলেই এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। ফিরোজ তাহার উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহাকে একটি সুবর্ণতঙ্কা প্রদান করিলেন।

ফিরোজ সাম্রাজ্যের সুশাসন ও এসলামশাস্ত্রের মর্য্যাদা-রক্ষাকল্পে কতিপয় অভিনব নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া মোসলমান-সমাজের প্রশংসাভাজন ও অক্ষয়-কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

১ম। ভারতবর্ষের মোসলমান সুলতানগণ সৈনিকদিগকে পারিশ্রমিকস্বরূপ জায়গীর প্রদান করিতেন। আলাউদ্দীন নগদ অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। ফিরোজ শাহ আলাউদ্দীনের নিয়ম রহিত করিয়া পুনর্ব্বার প্রাচীন প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

২য়। কোনও সেনানায়কের মৃত্যু হইলে তদীয় শূন্য পদে তাঁহার পুত্রকে, পুত্রের অভাবে তাঁহার জামাতাকে, জামাতার অভাবে তাঁহার গোলামকে, গোলামের অভাবে তাঁহার নিকটতম আত্মীয়কে, তদভাবে তাঁহার স্ত্রীকে নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার নিয়ম ছিল।

৩য়। দেওয়ান-ই-খয়রাত নামক একটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। কন্যার বিবাহকালে নিঃস্ব প্রজাকে অর্থসাহায্য করাই এই বিভাগের কর্ত্তব্য ছিল।

৪র্থ। মোসলমান রাজত্বকালে অপরাধীকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে নাসাচ্ছেদ, কর্ণ-কর্ত্তন প্রভৃতি নানারূপ নিষ্ঠুর দণ্ড দিবার প্রথা ছিল। ফিরোজ এই সকল বর্ব্বর দণ্ড রহিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনবৃত্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—

Thanks for God's mercies I will show,
By causing man nor pain nor woe.

তিনি এসলাম ধর্ম্মবিশ্বাসীকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার নিয়ম করেন। কাহারও অপরাধ প্রতিপন্ন হইলে, অপরাধীর প্রতি শাস্ত্রানুমোদিত দণ্ড বিহিত হইত।

৫ম। ফিরোজ নিজ নামের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণের নামে খোতবা পাঠ করিবার আদেশ প্রচারিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনবৃত্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—

Would'st thou enjoy a lasting fame ?
Hide not the merits of an honoured name.

৬ষ্ঠ। ফিরোজ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ প্রকার রাজকর তুলিয়া দেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনবৃত্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—

Better a people's weal than treasures vast,
Better an empty chest than hearts downcast.

৭ম। ফিরোজ শাহের পূর্ব্বে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ৪/৫ রাজকোষে গ্রহণ করিয়া ১/৫ লুণ্ঠনকারী কর্ম্মচারীকে প্রদান করা হইত। এই নিয়ম এসলামশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তিনি শাস্ত্রের অনুশাসনানুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ১/৫ রাজকোষে গ্রহণ ও ৪/৫ অংশ লুণ্ঠনকারী কর্ম্মচারীকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন।

৮ম। পর্ব্বদিনে মোসলমান মহিলাগণ পাল্কীতে অথবা অন্য কোনও প্রকার যানে আরোহণ করিয়া সমাধিমন্দিরে গমন করিতেন। এই প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ছিল। লম্পটদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিবার অনুকূল বলিয়া ফিরোজ এই প্রথা রহিত করেন।

৯ম। ফিরোজের পূর্ব্বে আমীর ওমরাহের বেশ স্বর্ণখচিত রেশমী বস্ত্রে প্রস্তুত হইত। এই প্রকার বস্ত্রের ব্যবহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এ জন্য সুলতান শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত পরিচ্ছদ পরিধান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

ফিরোজ শাহ এই সকল অভিনব নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হন নাই; প্রজার হিতার্থ বিবিধ সদনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন। তিনি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্ত্তৃত্বাধীনে বহুসংখ্যক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সকল চিকিৎসালয়ে প্রজাবর্গ ঔষধ ও পথ্য প্রাপ্ত হইত। সুলতান চিকিৎসালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ন্যূনাধিক এক শত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জের সুবিধার্থ দেশের সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহ স্থানে স্থানে সরাই, বিদ্যালয়, মসজিদ, স্নানাগার, সেতু, উদ্যান, কূপ, বাঁধ, সরোবর ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত করিয়া প্রজাহিতৈষণার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত পূর্ত্তকার্য্যের ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। এই সকল ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিলে, তদীয় পূর্ত্তকার্য্যের বিপুলতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি কৃষিকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত একটি খাল খনন করাইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। যমুনা যেখানে পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমতলভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে স্থান হইতে সূচিত হইয়া কারনাল

অতিক্রম করিয়া এই কৃত্রিম প্রবাহ হালসী ও হিসার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শতদ্রু ও ঘগ্‌ঘরার সহিতও উহা সংযুক্ত ছিল।

ফলতঃ, ফিরোজের যত্নে ও চেষ্টায় সুবিস্তীর্ণ মরুতুল্য দেশ শস্যশ্যামল হইয়াছিল। এই সকল ভূমির করে রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। দিল্লীর আফগান-বংশীয় কোনও নরপতিই রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে রাজস্বসম্বন্ধীয় কার্য্য বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য কার্য্য-সৌকর্য্যের অনুরোধে স্বতন্ত্র রাজস্ব-কার্য্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল।(১)

রাজস্বের এইরূপ উন্নতি ও বৃদ্ধি প্রজার বৈষয়িক স্বচ্ছলতার ফলস্বরূপ বলা যায়। সুলতানের ঐকান্তিক যত্নে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল; প্রকৃতিপুঞ্জ সুখে কালযাপন করিত। তাঁহার রাজত্বকালে দেশের সর্ব্বত্রই জীবনধারণের উপযোগী সামগ্রীসমূহের প্রাচুর্য্য ছিল। তাঁহার ত্রিংশৎবৎসরব্যাপী রাজত্বকালের মধ্যে কখনও দুর্ভিক্ষের করালছায়াপাতে প্রকৃতিপুঞ্জের সমুজ্জ্বল সমৃদ্ধি মলিন হয় নাই। আলা-উদ্দীনের সময়েও দ্রব্যাদি সুলভ ছিল। কিন্তু দ্রব্যাদি সুলভ রাখিবার জন্য তাঁহাকে বিবিধ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ফিরোজের শাসনকালে সুশাসন ও প্রকৃতিদেবীর অনুগ্রহে শস্যাদি স্বতঃই সুলভমূল্যে বিক্রীত হইত; তজ্জন্য কোনও রূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার আমলে শস্যাদি এরূপ সুলভ ছিল যে, দিল্লী নগরীতে চারি জিতলে এক মণ যব, আট জিতলে এক মণ গম ও চারি জিতলে এক মণ দাল পাওয়া যাইত। সকল প্রকার বস্তুই সুলভমূল্যে বিক্রীত হইত। সমস্ত দোয়াব প্রদেশ ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। এই প্রদেশের একখানি গ্রামও দুর্দ্দশাপন্ন ছিল না; এক বিঘা জমিও পতিত ছিল না। সমগ্র দোয়াব ৫২ পরগণায় বিভক্ত ছিল; এই ৫২ পরগণাই সমৃদ্ধ ছিল। অন্যান্য প্রদেশের অবস্থাও এইরূপ ছিল। সামান্য জেলায় এক ক্রোশের মধ্যে চারিখানি ধনধান্যপূর্ণ গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইত। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ এত সুলভ ও প্রচুর ছিল যে, অতি দরিদ্র ব্যক্তিও বাল্যকালেই কন্যার বিবাহ দিতে পারিত।

ফিরোজের রাজত্বকালে, কি ধনী কি নির্ধন, সকলের অবস্থারই উন্নতি হইয়াছিল। সুলতান আমীর ওমরাহ ও সৈনিকদিগকে প্রচুরপরিমাণে বৃত্তি প্রদান করিতেন। উজীরের বৃত্তির পরিমাণ ১৩ লক্ষ তঙ্কা ছিল। উজীরের পুত্র,

(১) The revenues of the Doab in this reign amounted to 80 laks of tankas, and under the fostering care of this religious sovereign, the revenues of the territories of Dehli were six krors and eightyfive laks of tankas.—*Shams-i-Siraj Afif.*

আত্মীয় স্বজন ও অনুচরগণের নিমিত্ত পৃথক বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। অন্যান্য আমীর ওমরাহগণের বৃত্তির পরিমাণও এইরূপ হারেই নির্দ্ধারিত হইত। কাহারও বৃত্তির পরিমাণ চারি লক্ষ তঙ্কার ন্যূন ছিল না। মজলিস-ই-খাস বিভাগের নায়েব আমীর মালিক সাহিন নানা মৃত্যুকালে পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত রাখিয়া যান। এই নগদ অর্থ ব্যতীত তাঁহার ভাণ্ডারে প্রচুরপরিমাণ মণি-মুক্তাও সঞ্চিত ছিল। ইমাদ-উল্-মুল্কের বিপুল বৈভবের কথা প্রবাদবাক্যের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল।

সুলতান ফিরোজ শাহের মত ন্যায়দর্শী ও জনহিতৈষী নরপতির রাজত্বকালেই দেশের উন্নতি সম্ভবে। কিন্তু তাঁহার ন্যায় নরপতিও ধর্ম্মের নামে প্রজাপীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিলেন, এসলাম ধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষাকল্পে তাদৃশ উৎপীড়ন আবশ্যক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি স্বধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য এক জন ব্রাহ্মণকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া বধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এক জন ব্রাহ্মণ দিল্লী নগরীতে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকাশ্যভাবে পূজা অর্চ্চনা করিতেন। এই দেবমন্দিরে বহু লোকের সমাগম হইত। কোনও কোনও মোসলমানরমণীও পারত্রিক-কল্যাণ-কামনায় হিন্দুর দেবমন্দিরে আগমন করিত। এই সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ব্রাহ্মণকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ কাজির হস্তে অর্পণ করেন। কাজি মত প্রকাশ করেন,—এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে অপরাধী ব্রাহ্মণের অপরাধের খণ্ডন হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মপরিত্যাগে অস্বীকৃত হন। তখন কাজি তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিয়া তদীয় অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবার ব্যবস্থা দিলেন। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মপরিত্যাগ অপেক্ষা প্রজ্বলিত পাবকে দেহত্যাগ শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন। সুলতানও তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া বধ করিলেন। ফিরোজের পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণ ব্রাহ্মণ জাতিকে জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ ব্রাহ্মণ জাতিই পৌত্তলিকতার উৎসস্বরূপ মনে করিয়া, তাঁহাদিগকে জিজিয়া করভারে উৎপীড়িত করিতেন। দেবালয়সমূহ ভূমিসাৎ করিয়া তদুপরি মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেন,—তাহার বিবরণে তদীয় স্বরচিত জীবনবৃত্ত পূর্ণ রহিয়াছে। সুলতান যে একমাত্র হিন্দুকেই ধর্ম্মের নামে উৎপীড়িত করিতেন, তাহা নহে; ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত মোসলমানগণের উৎপীড়নেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। ফিরোজ সুন্নিমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার সময়ে শিয়ামতাবলম্বী মোসলমানের মাথা তুলিবার ক্ষমতা ছিল না। সুলতান তাহাদিগকে নির্য্যাতিত করিবার উদ্দেশ্যে একবার শিয়াসম্প্রদায়ের পুস্তকাবলী বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। আহম্মদ বহারী নামক

এক জন শাস্ত্রজ্ঞ মোসলমান তাঁহার সময়ে অভিনব ধর্ম্মমতের প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সুলতান তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন, এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে দূরদেশে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। তিনি রোকন উদ্দীন ও মারু নামক দুই জন ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যুও বিধান করেন। ফলতঃ তিনি স্বমতের বিরুদ্ধবাদী হিন্দু, মোসলমান, সকলের সাধ্যমত নির্য্যাতনের ত্রুটী করেন নাই। সুলতান বিরুদ্ধবাদীদিগের নির্য্যাতন করিয়াই আপনার ধর্ম্মবুদ্ধি চরিতার্থ করেন নাই; নিজের বিশ্বাসানুগত সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিরুদ্ধবাদীদিগের মধ্যে বিকীর্ণ করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত-জীবনচরিতের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"আমি বিধর্ম্মী প্রজাদিগকে পয়গম্বরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছি; যে সকল হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এসলাম ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইবে, তাহাদিগকে জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে, এই ঘোষণা প্রচারিত করিয়াছি। এই সংবাদ প্রকৃতিপুঞ্জের কর্ণগোচর হইলে বহুসংখ্যক হিন্দু উপস্থিত হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক গৌরবলাভ করে। প্রত্যহ বহুসংখ্যক হিন্দু সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি ও সঙ্গে সঙ্গে রাজসম্মান ও রাজদত্ত উপঢৌকন লাভ করিয়াছে।"

রাজ্যশাসন, প্রজারঞ্জন, পূর্ত্তকার্য্য, ধর্ম্মচর্য্যা, ধর্ম্মপ্রচার ও তথাকথিত অপধর্ম্মাবলম্বী পাষণ্ডদিগের দলনেই ফিরোজের সমগ্র রাজত্বকাল অতিবাহিত হয় নাই। সন্ধিবিগ্রহেও তাঁহার রাজত্বকালের কিয়দংশ যাপিত হইয়াছিল। তাঁহাকে বাঙ্গলা, গুজরাট ও ঠাঠ প্রভৃতি দেশে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। তিনি ঠাঠে সৈন্য প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে প্রধান অমাত্যের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রিবর যে দুইটি কারণে তথায় সৈন্যপ্রেরণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন, আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।—

১ম। জাঁহাপনা সুলতান মহম্মদের উত্তরাধিকারী। তাঁহার ঠাঠ বিজয় করিবার প্রবল বাসনা ছিল। অতএব, তাঁহার রাজ্যের ন্যায় এ বাসনাতেও জাঁহাপনার উত্তরাধিকার বর্ত্তিয়াছে, এবং এ সম্বন্ধেও উত্তরাধিকারীর কর্ত্তব্য পালন করাই সঙ্গত।

২য়। দেশজয় করাই রাজধর্ম্ম। কারণ সাদি বলিয়াছেন,—'ধার্ম্মিক ব্যক্তি একখানি রুটীর অর্দ্ধখণ্ড আহার করিয়া অপর খণ্ড ভিক্ষুককে দান করেন। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াও এক জন নরপতির তৃপ্তি হয় না; তিনি জয় করিবার উদ্দেশ্যে আর একটি পৃথিবীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন।' শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

দর্শনশাস্ত্র ও মহাভারত।

১। মহাভারত-সংহিতার সময়ে মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শন অতীব প্রাচীন ছিল। সাংখ্য-কার কপিল দার্শনিকদিগের মধ্যে পুরাতন ও মহর্ষি বলিয়া পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং অগ্নি;—"অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ।" (বন, ২২১, ২১)। তিনি শিব;—(শান্তি, ২৮৫, ১১৪; অনুশা, ১৭, ৯৮, ও ১৪, ৩২৩); তিনি বিষ্ণু;—(বন ৪৭, ১৮ ও ভীষ্ম ইত্যাদি); এবং তিনি প্রজাপতি; (শান্তি, ২১৮, ৯-১০)।

মহাভারত-সংহিতার পরবর্ত্তী সময়েও অনেক দিন পর্য্যন্ত কপিলের এই সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। মীনাদি দশাবতার কল্পিত হইবার পূর্ব্বে, যখন চারি যুগে বিষ্ণুর চারিটি অবতার কল্পিত হইয়াছিল, তখন কপিলকেই আদি-অবতার-রূপে পাই। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে যে, বিষ্ণু সত্যযুগে কপিল-রূপে জ্ঞানদাতা, ত্রেতায় চক্রবর্ত্তি-রূপে দুষ্টদমনকারী, দ্বাপরে বেদব্যাস-রূপে বেদবিভাগকর্ত্তা, এবং কলিতে কল্কি-রূপে ধর্ম্মসংস্থাপক।

২। যোগজ্ঞান, যোগদর্শন ও যোগশাস্ত্রের কথাও মহাভারতে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। কিন্তু কপিল যেমন সাংখ্যদর্শনের কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সেইরূপ ভাবে যোগশাস্ত্রকর্ত্তা বলিয়া পতঞ্জলির নাম পাওয়া যায় না। শান্তিপর্ব্বের ৩৫০ অধ্যায়ে, যেখানে কপিলকে সাংখ্যকর্ত্তা বলা হইয়াছে, ঠিক সেই স্থলেই যোগ-কর্ত্তার নাম রহিয়াছে হিরণ্যগর্ভ। আমার মনে হয় যে, মহাভারত-সংহিতার সময়ে যোগানুশাসনকর্ত্তা পতঞ্জলির নাম, অতি প্রাচীনতার মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া, এইরূপ ঘটিয়াছে। শান্তিপর্ব্বের ৩৫০ অধ্যায়ের ৬৪ ও ৬৫ শ্লোক পড়িলে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, যোগশাস্ত্রকর্ত্তা অন্য লোকের নামের সহিত রচয়িতা পরিচিত ছিলেন; নহিলে এ কথা লিখিলেন কেন যে, যোগশাস্ত্রকর্ত্তা অন্য কোনও ব্যক্তি নহেন, তিনি স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ? 'অন্য কেহ নহেন' বলিলে অন্য ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই সূচিত হয়েন; এবং এই প্রকার উল্লেখ হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, সকল প্রকার জ্ঞানের দৈব-উৎপত্তি-প্রদর্শনের জন্যই হিরণ্যগর্ভের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। (বঙ্গবাসীর সংস্করণে এইটি ৩৪৯ অধ্যায়)।

৩। সভাপর্ব্বের নারদ-সংবাদে বৈশেষিক দর্শনের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে; কিন্তু ঐ অংশ অর্ব্বাচীন ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। আদিপর্ব্বের ৭০ অধ্যায়ের

৪৩-৪৪ শ্লোকেও কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের কথা পাওয়া যায়। কেন না, তত্রত্য উল্লিখিত 'সমবায়' বৈশেষিক দর্শনের 'সমবায়' বলিয়া পণ্ডিতেরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন।

৪। শান্তিপর্ব্বের ৩২১ অধ্যায়ে, সৌম্য, সাংখ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন বলিয়া যে পাঁচটি বিভাগ আছে, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের বিভাগের সহিত অভিন্ন বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। ন্যায়শাস্ত্রে উহাদের যে প্রকার সংজ্ঞা আছে, মহাভারতের সংজ্ঞাও তদনুরূপ। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী অনুবাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় দেখাইয়া দিয়াছেন, যে মহাভারতে 'প্রয়োজনে'র যে সংজ্ঞা আছে, তাহা গৌতমের সূত্রের অনুরূপ। গৌতম হইতে উদ্ধৃত সূত্রটি এইরূপ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে ;—"যৎ অর্থং অধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্"। "নির্ণয়" কথাটির সংজ্ঞাও গৌতমসূত্রের অনুরূপ। "ন্যায়" শব্দটি মহাভারতে সাধারণ অর্থেও ব্যবহৃত আছে, এবং বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্র অর্থেও উল্লিখিত আছে। (আদি, ৭০অ, ৪২ ; শান্তি, ১৯ অ, ১৮ ; ঐ ২১০ অ, ২২)। শান্তিপর্ব্বের ১৮ অধ্যায়ে আত্মার ইচ্ছাদি আরোপিত হইবার মতটি সুস্পষ্টভাবে ন্যায়দর্শনের মত, ইহা দর্শনজ্ঞ সমালোচকেরা বলিয়াছেন।

৫। পূর্ব্বশাস্ত্র বা পূর্ব্বমীমাংসায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অর্থ ও প্রয়োজন প্রদর্শিত আছে। শান্তিপর্ব্বের ১৯ অধ্যায়ে যেখানে হেতুমন্তা নাস্তিক পণ্ডিতদের নিন্দা করা হইয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও পূর্ব্বশাস্ত্রের বিরোধী বলা হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বমীমাংসার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়।

৬। অনুশাসনপর্ব্বে সূত্রকার ও সূত্রাদির কথা অনেকবার উল্লিখিত আছে। গীতায় স্পষ্টতঃ ব্রহ্মসূত্রের নাম রহিয়াছে। কিন্তু গীতা মহাভারত-সংহিতা রচিত হইবার পরে মহাভারতে সংযুক্ত বলিয়া, গীতার উল্লেখের প্রতি লক্ষ্য করিব না। মহাভারতে বেদান্তের নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত দেখিতে পাই। কিন্তু উহাতে ব্রহ্মসূত্র সূচিত হয়, সাহস করিয়া এরূপ বলিতে পারা যায় না। গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে ও মূল মহাভারতে বেদান্ত-শব্দে উপনিষদ গ্রন্থগুলি বুঝায়, এমন প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। শাস্ত্রাদির কথা বিশেষ করিয়া শান্তিপর্ব্বেই বলিবার সুবিধা হইয়াছে ; ঐ শান্তিপর্ব্বে বেদান্তশব্দ যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উপনিষদ-গ্রন্থাবলী ব্যতীত স্বতন্ত্র একখানি জ্ঞানশাস্ত্রই সূচিত হয়। (শান্তি, ৩০২ অ, ৭১ ; বঙ্গবাসী সং ৩০১ অধ্যায়)।

বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেন যে, বিনা ভাষ্যে বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। বেদান্তের শঙ্করভাষ্য আছে, রামানুজের ভাষ্য আছে, এবং বেদান্তের

নামে আরও কত প্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। কাজেই মূল বেদান্তসূত্র ঠিক কি অর্থ বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হয় ত আর বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই। মহাভারতে বেদান্ত-তত্ত্ব বলিয়া যাহা উক্ত আছে, তাহার সহিত শঙ্করভাষ্যের মিল নাই। মহাভারতের স্থানে স্থানে যে ব্যাখ্যা পাই, তাহাই কি আদিম অর্থ?

মহাভারতের দার্শনিকতত্ত্বে মানব-আত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র; মানব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্য; মানব মুক্তি বা সদ্‌গতির প্রার্থী, এবং ব্রহ্ম করুণা করিয়া তাহার বিধান করেন। আপনার আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া চিনিয়া বা অনুভব করিয়া লইবার অর্থ মুক্তি নহে। ঈশ্বরের করুণা হইলেই মানব তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে। "যস্য প্রসাদং কুরুতে, স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হ" ইতি (শান্তি ৩৩৭, ২০)। গীতায়ও কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। সাংখ্যের মুক্তি "কেবলত্বং"; প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে "অস্তিত্বং কেবলং", তাহাই মুক্তি। প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে একতা লাভ করিয়া নহে। স্বতন্ত্র হইয়া অস্তিত্বমাত্রলাভই এই কেবলত্ব। যোগশাস্ত্রেও মানব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রণিধান দ্বারা মনুষ্যের বা আত্মার যে যোগপরিচর্য্যা, তাহারই ফলে কৈবল্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কুত্রাপি ঈশ্বর ও মনুষ্যের আত্মা এক বলিয়া কথিত হয় নাই, অথচ ঈশ্বরপ্রণিধানের কথা, শক্তিলাভের কথা ও মুক্তিলাভের কথা আছে। সকল প্রকার লক্ষ্যহীন গুণাদিশূন্য হইয়া আপনার আত্মাতে আপনার অবস্থিতিই কৈবল্য বা Isolation মুক্তি। "পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি"।

সংসার বা জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝি, উহা আমার স্বীয় মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তিমাত্র, আমার মন ছাড়া উহার অস্তিত্ব নাই; অতএব মায়াময় আমিই বিকৃত ব্রহ্ম, বা ঈশ্বর, বা জগৎস্রষ্টা; এ তত্ত্ব মহাভারতে নাই। এই দর্শনটা বৌদ্ধদের দর্শনের উপর কেবল "আত্মা" জুড়িয়া দেওয়া মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের এই বেদান্তদর্শন, শঙ্করের নিজের নূতন দর্শনশাস্ত্র। এই জন্যই এ দেশের অনেক প্রাচীন পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন।

মহাভারতের দর্শনে ঈশ্বর মায়ামুক্ত, এবং সেই মায়াতীত ব্রহ্মই সকল পদার্থের স্রষ্টা। "সর্ব্বভূতানুপাদায় তপসশ্চরণায় হি। আদি কর্ত্তা স ভূতানাং তমেবাহুঃ প্রজাপতিম্॥" ইত্যাদি। শান্তিপর্ব্বের ২০৭ অধ্যায়েও গোবিন্দকে সর্ব্বভূতের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি ও স্রষ্টা, মহাভারতের সর্ব্বত্র স্বীকৃত

মহাভারতে যে "মায়া" পাওয়া যায়, তাহা শঙ্করাচার্য্যের মায়া নহে। মায়া কথাটা সাধারণ ভ্রান্তি, ছল, ছদ্ম প্রভৃতি অর্থে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। ঈশ্বর মায়া অবলম্বন করিয়া মনুষ্যরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন; মায়া করিয়া যে জিনিসটি যেমন নয়, তেমনই করিয়া দেখাইলেন; মায়া করিয়া শত্রুবধ করিলেন; ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত আছে। মায়াটা যেন ঠিক যাদুকরের ভেল্কী। (উদ্যোগপর্ব্ব, ১৬০ অ; বঙ্গবাসী ১৫৯, ৫৪-৫৮; এবং দ্রোণপর্ব্ব ১৪৬ অধ্যায়, ইত্যাদি)

দ্রৌপদী বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে, ঈশ্বর তাঁহার মনকে মায়া দ্বারা অভিভূত করিয়া (মোহয়িত্বা), কার্য্যক্ষমতাহীন করিয়াছেন। মানুষ যাহা করিতে চাহে, ঈশ্বর তাহা (ছদ্ম কৃত্বা) অন্যরূপ ঘটাইয়া দেন। বালকেরা যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে, ঈশ্বর তেমনই মনুষ্য লইয়া খেলা করেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এমন কথা বলিও না; কেন না, ঈশ্বরের করুণাতেই মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে।" (৩১ অ—৪২)। যুধিষ্ঠিরের বিবেচনায় এ সকল "দেবগুহ্যানি"; কেন না, "গূঢ়মায়া হি দেবতাঃ" (৩১ অ, ৩৫—৩৭)।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এবং মায়া কথাটার প্রথমপ্রদর্শিত অর্থই সূচিত হয়।

গীতা মহাভারতের পরবর্ত্তী গ্রন্থ হইলেও, উহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই জন্য ঐ গ্রন্থের শঙ্করভাষ্য গ্রহণ করা উচিত নহে বলিয়া অনেক পণ্ডিত অভিমতি দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে এখানে অধিক কথা বলা চলে না।

মহাভারতে যে পাশুপত (শৈব) এবং ভাগবত (বৈষ্ণব) মত বিবৃত আছে, তাহাতেও ঈশ্বর ও মনুষ্য স্বতন্ত্র; এবং ঈশ্বর উপাস্য ও মুক্তিদাতা, আর মনুষ্য উপাসক ও মুক্তিপ্রার্থী।

পরবর্ত্তী যুগেও সুপণ্ডিত কবিরা আমি ও ঈশ্বর এক বলিয়া বেদান্তের তত্ত্ব বুঝেন নাই। "বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং" ইত্যাদি শ্লোকে মুমুক্ষু ব্যক্তি যোগ-বলে আপনার আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিয়া মুক্তিলাভ করিতে চাহিতেছেন। শঙ্করের অর্থ প্রচলিত থাকিলে, বলিতে পারা যাইত যে, বেদান্তে যাহাকে আমি হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন, এবং যথার্থ জ্ঞান হইলে যাহাকে আমি বলিয়া বুঝিয়া খালাস পাই, ইত্যাদি কথা থাকিত। পূজ্য-পূজক ভাব থাকিত না। "ব্যাপ্য স্থিতং" কথাও থাকিতে পারিত না। কারণ, ঐ সকল শব্দ দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্ট আত্মার পার্থক্য বুঝায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ। *

সিংহলে।

অনুরাধপুর।

এই ত সেই ভারতবর্ষ; সেই অরণ্য; সেই জঙ্গল।

দিনের অভ্যুদয়ে, শাখা-পল্লবময়, তৃণ-গুল্মময় একটি নূতন জগৎ যেন আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। চির-হরিতের অসীম সমুদ্র, অনন্ত রহস্য, অনন্ত নিস্তব্ধতা দিগন্তের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমার পদতলে প্রসারিত হইল।

সাগর-সম্ভূত ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের ন্যায়, ধরণী-সমুত্থিত এই ক্ষুদ্র শৈল-শিখর হইতে, আমি এই হরিতের নীরব অসীমতা সন্দর্শন করিতেছি। এই সেই মেঘাম্বরা ভারতভূমি, অরণ্য-সঙ্কুলা ভারতভূমি—জঙ্গলাকীর্ণা ভারতভূমি; সিংহল মহাদ্বীপের কেন্দ্রবর্ত্তী এই সেই স্থান, যেখানে গভীর শান্তি বিরাজিত,—যাহা তরুশাখার দুর্ম্মোচনীয় জটিল বন্ধন-জালে সর্ব্বদাই সুরক্ষিত। এই সেই স্থান, যেখানে প্রায় দ্বিসহস্র বৎসরাবধি, অনুরাধপুর নামক একটি পরমাশ্চর্য্য নগর, ঘননিবিড় শাখাপল্লবের নৈশ-অন্ধকারের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

বৃষ্টি-ঝটিকার উদ্ভব-ক্ষেত্র সেই নীলাকাশ ভেদ করিয়া দিবার অভ্যুদয় হইতেছে। এই সময়ে আমাদের ফরাসীদেশে দ্বিপ্রহর রাত্রি। ধরণী পুরন্ধ্রী, সূর্য্যালোকের সাহায্যে, সেই ধ্বংস-রাজ্যের চিত্রটি আর একবার আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—সেই ধ্বংসরাজ্য, যাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

এখন সেই অদ্ভুত নগরটি কোথায়? * * * জাহাজের মাস্তুল-মঞ্চ হইতে বৈচিত্র্যহীন সাগর-মণ্ডল যেরূপ দৃষ্ট হয়, আমি সেইরূপ এখান হইতে চারি দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি;—কুত্রাপি মনুষ্যের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইতেছি না। কেবলই গাছ—গাছ—গাছ। গাছের মাথাগুলি সারি সারি চলিয়াছে—সব এক সমান—সব প্রকাণ্ড। সেই তরুপুঞ্জের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ, সীমাহীন দূরদিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। ঐ অদূরে কতকগুলি হ্রদ দেখা যাইতেছে, যেখানে কুম্ভীরগণের একাধিপত্য, এবং যেখানে সায়ংকালে বন্যহস্তিগণ দলে দলে আসিয়া জলপান

* গিয়ের-সোটি-কৃত।

করে। ঐ সেই অরণ্য—ঐ সেই জঙ্গল, যেখান হইতে বিহঙ্গগণের প্রাভাতিক আহ্বান-সঙ্গীত সমুত্থিত হইয়া আমার অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সেই পরমাশ্চর্য্য নগরটির চিহ্নমাত্রও কি আর দেখিতে পাইব না? * * *

কিন্তু এ কি দেখি?—কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়—অতীব অদ্ভুত, তরু-সমাচ্ছন্ন, অরণ্যের ন্যায় হরিৎবর্ণ—কিন্তু একটু যেন বেশী সুষমা-বিশিষ্ট—কোনটা বা পিরামিডের ন্যায় চূড়াকার, কোনটা বা গম্বুজাকার—ইতস্ততঃ সমুত্থিত; আর সমস্ত পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পল্লবপুঞ্জের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

* * * এইগুলি পুরাতন মন্দিরসমূহের চূড়াদেশ—প্রকাণ্ড "দাগোবা"। খৃষ্টের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে এইগুলি নির্ম্মিত হয়। অরণ্য ইহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে নাই—স্বকীয় হরিৎ-শ্যামল শব-বসনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র;—উহাদের উপর অল্পে অল্পে, মৃত্তিকা, শিকড়, ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম ও কপিবৃন্দ ক্রমশঃ আনিয়া ফেলিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগে যেখানে ভক্তগণ আরাধনাদি করিত, এই "দাগোবা"-গুলি তাহারই মুখ্য নিদর্শন; সেই স্থান—সেই পুণ্য নগরীটি আমার নিম্নদেশে পল্লব-মণ্ডপ-তলে প্রচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে।

আমি যে ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহাও একটি পবিত্র দাগোবা। যিনি যীশুর ভ্রাতা ও অগ্রদূত, সেই মহাপুরুষের লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ, তাঁহার মহিমার উদ্দেশেই, এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করে। প্রস্তর-খোদিত কতিপয় হস্তী ও পুরাকালীন দেবমণ্ডলী ইহার তলদেশ রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বে, প্রতিদিনই এখানে ধর্ম্মসঙ্গীতের কলধ্বনি শ্রুত হইত; এবং উহাই তখন প্রার্থনা ও আরাধনার শান্তিময় আনন্দাশ্রম ছিল।

"অনুরাধপুরে অসংখ্য দেবালয়, অসংখ্য অট্টালিকা। উহাদের গম্বুজ, উহাদের মণ্ডপ সকল সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত। রাজপথে, ধনুর্ব্বাণধারী এক দল সৈন্য; গজ অশ্ব রথ, লক্ষ লক্ষ মনুষ্য, অবিরত যাতায়াত করিতেছে। তাহার মধ্যে বাজিকর আছে, নর্ত্তক আছে, বিভিন্ন দেশের বাদক আছে। এই বাদকদিগের ঢাক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত।"

কিন্তু এখন এখানে কেবলই নিস্তব্ধতা, তিমির-ছায়া, হরিৎময়ী রজনীর পূর্ণ আবির্ভাব। মানুষ চলিয়া গিয়াছে, অরণ্য ইহার চারি দিক বেষ্টন করিয়াছে।

পৃথিবীর সুদূর অতীতে, সেই আদিম মহারণ্যের উপর যেরূপ প্রশান্তভাবে প্রভাতের অভ্যুদয় হইত, এই সদ্যোবিনষ্ট নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর এক্ষণে সেইরূপ প্রশান্ত প্রভাত সমুদিত।

* * * *

ভারত-মহাদেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে, সিংহল দ্বীপের কোন সদাশয় পরম-কৃপালু মহারাজার নিকট হইতে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আমাকে কিছুদিন এখানে থাকিতে হইল। আমি তাঁহার বাটীতে অতিথি হইয়া থাকিব, এইরূপ কথা ছিল। যতদিন না সেই উত্তর পাই, ততদিন এই স্থানেই থাকিব, স্থির করিলাম; কেন না, উপকূলবর্ত্তী সার্ব্বজাতিক নগরগুলির প্রতি আমার আন্তরিক বিতৃষ্ণা।

যে পথটি ধরিয়া আমি এখানে আসিয়াছি, তাহার আলোচনা ও উদ্যোগ-আয়োজন অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল। এই স্থানের শোভা-সৌন্দর্য্য উপভোগের পক্ষে এই পথটিই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল।

"কান্দি" হইতে পূর্ব্বাহ্নেই ছাড়িতে হইল। এই কান্দি নগর প্রাচীন সিংহল-রাজদিগের রাজধানী ছিল। যাত্রার আরম্ভভাগে, সুপারি-নারিকেল-ভূয়িষ্ঠ প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। বিষুব-রেখাবর্ত্তি-প্রদেশ-সুলভ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য আমার সম্মুখে এক্ষণে পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইল। তাহার পর অপরাহ্নে, দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল। নারিকেল ও সুপারির প্রসারিত শাখা-পল্লবরাজি অল্পে অল্পে দৃষ্টিপথ হইতে তিরোহিত হইল। আমরা এইক্ষণে নাতি-উষ্ণ-প্রদেশ-সীমায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখানকার অরণ্য, অনেকটা অস্মদ্দেশের অরণ্যের ন্যায়।

অবিশ্রান্তধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; বৃষ্টির জল উষ্ণ ও সুরভিত; ভিজা মাটির রাস্তা দিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ডাক-গাড়ীটি চলিয়াছে; প্রায় প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদ্‌লি হইতেছে; আমরা ঘোড়াদের ইচ্ছামত চলিয়াছি। ঘোড়া চার-পা তুলিয়া ছুটিতেছে, মাঝে মাঝে লাথিও ছুঁড়িতেছে। অনেকবার গাড়ী হইতে আমাদিগকে লাফাইয়া পড়িতে হইয়াছে, দুই একটা "অ-ভাঙ্গা" বুনো ঘোড়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলিতে উদ্যত;—উহারা গাড়ী টানার কাজে সবেমাত্র শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিয়াছে। এই দুষ্ট ঘোড়াদের ক্রমাগত বদ্‌লি করা হইতেছে; ইহাদের চালাইবার জন্য দুই জন ভারতবাসী নিযুক্ত। এক জন রাশ ধরিয়া থাকে, আর এক জন তেমন তেমন বিপদ উপস্থিত হইলে, ঘোড়ার মাথার উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আর এক জন তৃতীয় ব্যক্তি আছে, সে ভেঁপু বাজায়; ভেঁপু বাজাইয়া শ্লথ-গতি গরুরগাড়ীগুলাকে পথ হইতে সরাইয়া দেয়; অপরা,

নারিকেল-কুঞ্জ-প্রচ্ছন্ন কোন গ্রামের মধ্য দিয়া যখন গাড়ী চলে, তখন গ্রামবাসী-দিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। আট ঘণ্টার মধ্যে আমাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবে, এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ায়, আমাদের ক্রমাগত বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার দিকে, গ্রামের বিরলতা ও অরণ্যের নিবিড়তা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, এক দল মানুষ যাইতেছে, দেখিয়াছিলাম। মহাশক্তিমান তরুকুঞ্জের মধ্যে উহারা কি ক্ষুদ্র!—উহারা যেন তাহাদের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভেঁপুওয়ালার কোন কাজ নাই। লোক নাই ত কাহার জন্য ভেঁপু বাজাইবে?

তালজাতীয় তরুগণ এইবার স্পষ্টরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। দিবাবসান-সময়ে যাত্রা আরম্ভ করিলে মনে হয় যেন, এই অনন্ত গ্রীষ্মের মধ্যে আমাদের য়ুরোপীয় পল্লীগ্রামের কোন বিজন বনময় প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। তবে, এখানকার অরণ্যগুলি অপেক্ষাকৃত বিপুলায়তন, এবং ইহার লতা-গুল্ম-বন্ধন-জাল আরও জটিলতর। কিন্তু সময়ে-সময়ে যখন শেয়ালকাঁটার গাছ দেখিতে পাই, সরোবরে রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত দেখি, কিংবা যখন দেখি,—একটি অপূর্ব্ব প্রজাপতি আমার যাত্রা-পথের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, আর বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ্গের কোন একটি পাখী তাহার অনুসরণ করিতেছে, তখন আবার বিদেশভূমিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার, আমাদেরই সেই পল্লীগ্রাম, আমাদেরই সেই অরণ্যভূমি—এইরূপ বিভ্রম উপস্থিত হয়।

সূর্য্যাস্তের পর, গ্রাম পল্লী আর দেখা যায় না, মনুষ্যের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কবোষ্ণ বৃষ্টিজলের স্নেহ-স্পর্শ উপভোগ করিতে করিতে, গভীর অরণ্যের অফুরন্ত পথ দিয়া আমরা অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছি। চারি দিকেই গভীর নিস্তব্ধতা।

ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই নিস্তব্ধতাকে ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া কীট-সঙ্গীত সমুত্থিত হইল। আর্দ্র অরণ্য-ভূমির উপর সহস্র সহস্র ঝিল্লীর পক্ষ-স্পন্দন-জনিত অনুরণন-ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। পৃথিবীর আরম্ভকাল হইতে প্রতিরাত্রিই এই সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। * * *

ক্রমে ঘনঘোর অন্ধকার; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতক্ষণ ধরিয়া আমরা অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছি। ক্রমে চারি দিকের দৃশ্য ঘোরতর গম্ভীরভাব ধারণ করিল। লতাবন্ধন-জালে আপাদ-জড়িত দুই সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া আমরা

চলিয়াছি। নগর-উপবনে যেরূপ একজাতীয় বড়-বড় বৃক্ষ দেখা যায়, সেইরূপ বৃক্ষ একটার পর একটা আসিতেছে—তাহার আর শেষ নাই।

কতকগুলি স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ পশু অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। তাহারা আমাদের পথরোধ করিয়াছিল। এই বুনো গরুগুলা নিতান্ত নিরীহ ও নির্ব্বোধ; চীৎকার শব্দ করিয়া দুই চারিবার চাবুক আস্ফালন করিবামাত্রই উহারা ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িল। আবার পথের সেই বৈচিত্র্যহীন শূন্যতা; আবার সেই নিস্তব্ধতা—যাহা কেবল ঝিল্লীর আনন্দ-রবে মুখরিত।

অরণ্যের এই মহা-নিস্তব্ধতার মধ্যে, নৈশজীবনের স্পন্দন ও বিকাশ বেশ অনুভব করা যায়। এই অরণ্য কত শত মৃগের বিচরণভূমি;—কেহ বা শঙ্কাভরে সতর্ক হইয়া চারি দিক নিরীক্ষণ করিতেছে, কেহ বা আহার-অন্বেষণে প্রবৃত্ত। একটু ছায়া নড়িলেই না জানি কত মৃগের কান খাড়া হইয়া উঠে—কত মৃগের চক্ষু-তারা বিস্ফারিত হয়। * * * এই রহস্যময় বনপথটি বরাবর সিধা চলিয়াছে; ইহা ম্লান ধূসর-বর্ণ, আর ইহার দুইধারে কৃষ্ণবর্ণ তরু-প্রাচীর। উহার সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দ্দিকে যোজন-ব্যাপী দুর্ভেদ্য জটিল শাখাজাল বিস্তৃত হইয়া অরণ্য-ভূমিকে কিরূপ পীড়ন করিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রজনীর অন্ধকারে আমাদের চক্ষু এখন অভ্যস্ত হইয়াছে; তাই স্বপ্নের মত অস্পষ্ট কখন-কখন দেখিতে পাই, ইঁদুর-জাতীয় একপ্রকার জীব মথ্‌মল-কোমল-পদ-বিক্ষেপে নিঃশব্দে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়াই আবার অন্তর্হিত হইতেছে।

অবশেষে প্রায় ১১টার সময় দেখা গেল, স্থানে স্থানে অল্প অল্প আগুন জ্বলিতেছে, ভস্মাবশেষের দীর্ঘায়তন গুরুভার প্রস্তর-ফলকসমূহ পথের দুইধারে বিকীর্ণ; এবং গাছের মাথা ছাড়াইয়া, দাগোবা-সমূহের প্রকাণ্ড ছায়া-চিত্র আকাশ-পটে অঙ্কিত। এগুলি যে পর্ব্বত নয়—ভূগর্ভনিহিত নগরের মন্দির-চূড়ামাত্র—তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম।

আজ রাত্রে, এইখানকার একটি কুটীরে আশ্রয় লইলাম। নন্দন-কাননের ন্যায় সুন্দর একটি ক্ষুদ্র বাগানে এই কুটীরটি অবস্থিত। যাইবার সময় ল্যাণ্ঠানের আলোকে দেখিতে পাইলাম, ফুল ফুটিয়াছে।

* * * *

এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে। আমি যে স্থানে আছি, তাহার নীচে, অরণ্যের মধ্যে বিহঙ্গগণের জাগরণ-কোলাহল শুনিতেছি। আমি এই মন্দির-চূড়ার উপরে, কোমল-সুলভ তৃণ-গুল্মে পরিবেষ্টিত। আমি আসিয়া চামচিকাদিগের আস্তিভঙ্গ

করিয়াছি—তাহারা এক্ষণে প্রভাতের আলোকে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা ধ্বংস-স্থানেরই জীব; ইহাদের ডানাগুলা ছাইরঙ্গের। আর, কতকগুলি কাঠবিড়ালী তরুপল্লবের অন্তরাল হইতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে; উহাদের কি চটুলতা! কি শোভন গতিভঙ্গি! বড়-বড় গাছগুলা এই মৃত নগরের শবাচ্ছাদনরূপে বিরাজমান। কিন্তু উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষ, আমার পাদ-দেশে, বসন্তোৎসবের সাজসজ্জায় সুসজ্জিত;—রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, গোলাপী বর্ণের ফুল সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সকল সুন্দর পুষ্পিত তরুশিরের উপর পর্জ্জন্য-দেব তাড়াতাড়ি এক-পস্‌লা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াই দূরত্বের করাল-গর্ভে মিলাইয়া গেলেন। কিন্তু প্রচণ্ড সূর্য্য শীঘ্রই আবার মেঘ ও বৃষ্টির পশ্চাতে উদিত হইয়া আমার মস্তককে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। যেখানে কতকগুলি মনুষ্যের বসতি আছে,—সেই অরণ্যের নিম্নস্থ একটি ছায়াময় প্রদেশে—হরিৎ-শ্যামল রাজ্যের মধ্যে এইবার আমরা প্রবেশ করিব। এখানকার একটি শাখা-সোপান দিয়া আমি নীচে নামিতেছি।

* * * *

নীচে, লোহিত মৃত্তিকার মধ্যে, আঁকা-বাঁকা সর্পের মত অদ্ভুতাকার পিকড়-জালের মধ্যে, এই ধ্বংস-জগৎটি অবস্থিত। ধ্বংসাবশেষের ভাস্বাচুরা দ্রব্য সকল বিশৃঙ্খলভাবে এক স্থানে স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে।

শত শত দেবতার ভগ্ন প্রতিমা, প্রস্তরময় হস্তী, যজ্ঞবেদিকা, কল্পনা-প্রসূত কত কি মূর্ত্তি—সেই মহাধ্বংসের সাক্ষ্য দিতেছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মালা-বার-প্রদেশবাসী আক্রমণকারীরা এই সুন্দর নগরটিকে ভূমিসাৎ করে।

এই সকল দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও পূজার্হ, সেই সমস্ত, একালের বৌদ্ধেরা, অবিনশ্বর দাগোবার চারিধার হইতে ভক্তিভাবে সযত্নে কুড়াইয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন-মন্দিরের সোপান-ধাপের দুইধারে পুরাতন দেবতাদিগের ভগ্ন প্রতিমাগুলি সারি-সারি সাজাইয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে পুরাতন যজ্ঞবেদিকা-গুলি বিলুপ্তমুখশ্রী ও অঙ্গহীন হইলেও, তাঁহাদেরই যত্নে কোন প্রকারে ভূমির উপর খাড়া রহিয়াছে। এখনও ভক্ত বৌদ্ধেরা ভক্তিসহকারে প্রতিদিন প্রাতে এই বেদীগুলি সুন্দর ফুল দিয়া সজ্জিত করে, এবং তাহার উপর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পূজা-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। তাহাদিগের চক্ষে অনুরাধপুর পুণ্যতীর্থ; অনেক দূর হইতে যাত্রিগণ এখানে আসিয়া সমবেত হয়, এবং শান্তিময় তরু-ছায়াতলে বাস করিয়া পূজা অর্চ্চনা করে।

গুরুভার প্রস্তর-ফলক-সমূহ সারি সারি পড়িয়া রহিয়াছে; মন্দিরচূড়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্তম্ভশ্রেণীগুলি ক্রমশঃ বনের মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে;—এই সমস্ত নিদর্শনের দ্বারা সুবৃহৎ ভজনা-শালার আয়তন ও রচনা-প্রণালী কতকটা অনুমান করা যায়। অসংখ্য বহির্দালান পার হইয়া তবে সেই ভজনা-শালায় উপনীত হওয়া যায়। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নিকৃষ্ট দেবতারা ঐ দালানগুলির রক্ষিরূপে অবস্থিত। দেবতাদের এই পাষাণ-প্রতিমাগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, আরও শত শত ভগ্ন চূর্ণ মন্দির ও প্রাসাদের চিহ্ন সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। বৃক্ষকাণ্ডের সহিত অসংখ্য প্রস্তর-স্তম্ভ এই অরণ্য-গর্ভে নিহিত; এবং সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে আবার সেই অনন্ত অসীম হরিৎ-রাজ্যে মিশাইয়া গিয়াছে।

অশ্বৎ-যুগের প্রারম্ভে, রাজকুমারী—"সঙ্ঘমিত্তা", যিনি একজন মহাযোগিনী ছিলেন—তিনি মহাবোধি-বৃক্ষের একটি শাখা—(যাহার তলায় বসিয়া বুদ্ধদেব বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন) ভারতের উত্তর-খণ্ড হইতে আনাইয়া এইখানে রোপণ করিয়াছিলেন। সেই শাখাটি এক্ষণে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; এবং বটবৃক্ষের নিয়মানুসারে তাহার শাখা প্রশাখা হইতে অসংখ্য শিকড় নামিয়াছে। এই বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে পুরাতন বেদিকাসমূহ স্থাপিত; তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূজা-প্রদীপ দিবা-রাত্রি জ্বলিতেছে, এবং নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম বিকীর্ণ রহিয়াছে। প্রতিদিনই এইখানে টাট্‌কা ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

যখন দেখি, এই অরণ্যের মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বারপথগুলি সাদা মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত ও ভাস্করের সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যে আচ্ছন্ন; যখন দেখি, স্বাগত-স্মিতমুখে দেবতারা কত কত সোপান-ধাপের উপর দাঁড়াইয়া আছেন; যখন দেখি, এই দ্বারপথগুলি দিয়া কোথাও উপনীত হওয়া যায় না, তখন মনোমধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়।

গৃহগুলি সম্ভবতঃ কাঠের ছিল। কিন্তু এত শতাব্দীর পর, তাহাদের কোন চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল সোপানের ধাপ ও দ্বারদেশগুলি রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই বিলাসময় সুসমৃদ্ধ দ্বারপথগুলি বরাবর প্রসারিত হইয়া গাছের শিকড়, লতা-গুল্ম ও মৃত্তিকায় গিয়া শেষ হইয়াছে।

কিয়ৎ বৎসর হইতে, অনুরাধপুরের এক কোণে, একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বসিয়াছে; সেখানে কতকগুলি লোক বাস করে। গ্রামটি তেমন বর্দ্ধিষ্ণু নয়—উহা একটি গোপ-পল্লী মাত্র। ভগ্নাবশেষ নগরটির ন্যায় এই গ্রামটিও তরুশাখায় আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানেও সেই বিষাদের রাজত্ব। যে সকল ভারতবাসী এই ধ্বংস-নগরে

আসিয়া আবার বাস করিতেছে, তাহারা অরণ্যের বৃহৎ বৃক্ষগুলিকে ছেদন করে নাই; পরন্তু, আগাছা ও কণ্টক গুল্ম প্রভৃতি কাটিয়া সাফ্ করিয়া, দিব্য শাদ্বল-ভূমি বাহির করিয়াছে। সেখানে এখন তাহাদের গো মহিষ ছাগল প্রভৃতি পালিত পশুগণ ছায়াতলে সুখস্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়ায়। মন্দিরসংলগ্ন ভূমিতে বিচরণ করে বলিয়া সেখানকার লোকেরা ইহাদিগকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করে।

যে সকল ভারতবাসী এই পবিত্র ভগ্নাবশেষের মধ্যে জীবনযাপন করে, এই সকল ভগ্নপ্রাসাদসংলগ্ন পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহাদের বিশ্বাস, রাজা ও রাজ-কুমারদের "ভূত" সন্ধ্যার সময় এখানকার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; এই জন্য তাহারা জোৎস্না-রাতে বড়-বড় দাগোবার ছায়াতলে কিছুতেই দাঁড়াইতে চাহে না।

তা ছাড়া, এই সুচ্ছায় স্থানটিকে তপস্যা ও ধ্যান ধারণার অনুকূল, পবিত্র আশ্রম বলিয়া উপলব্ধি হয়। দেবালয়-সুলভ একটি শান্তির ছায়া এই সকল পথের উপর, এই সকল গালিচা-বৎ তৃণভূমির উপর বিরাজমান। একজাতীয় বড়-বড় ফুল ইহার উপর বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়িতেছে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার ভগ্ন পাষাণমূর্ত্তিদিগের সম্মুখে, অরণ্যের মধ্যে, ছোট-ছোট প্রদীপ অষ্ট প্রহর জ্বলিতেছে; বহু পুরাতন পাষাণের উপর টাট্‌কা ফুল প্রতিদিন নিত্য-নিয়মিত স্থাপিত হইতেছে—এই দৃশ্যটি কি মর্ম্মস্পর্শী!

ভারতবর্ষে, দেবতাদিগকে ফুলের তোড়া উৎসর্গ করা হয় না; পরন্তু যূথী জাতি মল্লিকা মালতী প্রভৃতি শুভ্রবর্ণ ও সুগন্ধি পুষ্পরাশি পূজা-বেদিকার উপর অজস্র বিকীর্ণ হইয়া থাকে,—তাহার উপর দুই-চারিটি বঙ্গদেশীয় গোলাপ ও রক্তজবাও ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

এই পূজোপহার ভগ্ন চূর্ণ মন্দিরের প্রস্তর-ফলকের উপর স্থাপিত হয়—যে প্রস্তরফলকগুলি ধীরে-ধীরে মৃত্তিকা-গর্ভে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বারভুঁইয়া।

ইশা খাঁ।

বাঙ্গালার শেষ পাঠান নরপতি দায়ুদের অবসানের পর যদিও মোগলেরা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া বঙ্গরাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পাঠানেরা ও

অন্যান্য ভুঁইয়ারা প্রথমে তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এই সময়ে উড়িষ্যায় এবং পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গে পাঠান-বংশীয়েরা আপনাদিগের ক্ষমতাসঙ্কোচের কোনপ্রকার চেষ্টা করেন নাই। উক্ত পাঠান-বংশীয়গণের মধ্যে উড়িষ্যার কোতল খাঁ ও বঙ্গের ইশা খাঁই প্রধান। ইশা খাঁর পিতা প্রথমে হিন্দু ছিলেন, তাঁহার নাম কালীদাস গজদানী। ইহারা বাইশ রাজপুত শ্রেণী। (১) হোসেন খাঁর রাজত্বসময়ে তিনি অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। পরে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সালিমান খাঁ নামধারণ ও এক পাঠানরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের (২) অধীশ্বর হন। সেলিম খাঁ ও তাজখাঁ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইলে, তাঁহার পুত্রদ্বয় ইশা ও ইস্মাইল দাসরূপে বিক্রীত ও দূরদেশে নীত হন। (৩) সাউয়েসা নামে তাঁহার এক কন্যারও উল্লেখ দেখা যায়। ইশা ও ইস্মাইল খাঁ পরে তাঁহাদের মাতুল কুতুবউদ্দীন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হন। ক্রমে ইশা আপনার প্রতিভা ও ক্ষমতার বলে পূর্ব্ববঙ্গের ভুঁইয়া হইয়া উঠেন, এবং খিজিরপুর পরগণার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি হোসেনশাহ-বংশীয়া ফতেমা খানম নাম্নী কোনও রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের

---

(১) Elliot's History of India, also Blochman's Ain-i-Akbari.

(২) ভাটি সম্বন্ধে আকবরনামায় যাহা লিখিত আছে, ইলিয়টের ইতিহাসে তাহার এইরূপ মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে।—

"Bhati is the low-lying country and is called by that Hindi name, because it lies lower than Bengal. It extends nearly 400 kos from east to west, and nearly 300 from south to north. On the east lies the sea and the country of Jessore; on the west lies the hillcountry south of Tanda; on the north the Salt sea, and the extremities of the hills of Tibet."—*Elliot's History of India*, Vol. VI. ভাটির চতুঃসীমা-পাঠে নানারূপ গোলযোগ বোধ হয়, সেই জন্য বেভারিজ Tandaর স্থলে Landa ও Jessore এর স্থলে Jesa বলিতে চাহেন। লাণ্ডা রিয়াজুস সালাতিন গ্রন্থে উড়িষ্যার সীমা বলিয়া কথিত হইয়াছে। জেসা আইন-আকবরীতে জয়ন্তীয়ার স্থলে লিখিত আছে।—*Journal of the A. S. of Bengal Vol. LXXIII. Pt I. No I.—1904—P. 62.* Grant সাহেব সুন্দরবন ও তন্নিকটস্থ নিম্নভূমি সকলকে ভাটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিজলীও উক্ত ভাটির অন্তর্গত ছিল।

(৩) বেভারিজ সাহেব বলেন যে, ইশার পিতা হিন্দুই ছিলেন; কারণ, মুসলমান-পুত্র দাসরূপে মুসলমান কর্ত্তৃক বিক্রীত হইত না।

একাধীশ্বর হইয়া অপর একাদশ জনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। (৪) ইশা খাঁ প্রথমতঃ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি করিমদাদ ও ইব্রাহিম প্রভৃতি আফগানগণের সহিত মিলিত হইয়া ভাটি প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মোগল সুবেদার খাঁজেহান আর কতকগুলি আফগানের সাহায্যে ৯৮৬ হিজরী (১৫৭৮ খৃঃ অব্দে) ভাটি প্রদেশ অধিকার করেন। (৫) তাহার পর হইতে ইশা মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা-প্রকাশের চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে মাশুম খাঁ কাবুলী বিদ্রোহী হইয়া ভাটি প্রদেশে উপস্থিত হন, এবং ইশার সাহায্য গ্রহণ করেন। আজিম খাঁর সুবেদারীর সময়ে তার্সন খাঁ মাশুম খাঁর দমনের জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু তিনি তাজপুরের দুর্গে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইলে, সাহাবাজ খাঁ কুম্বুর প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন। আজিম খাঁর পরে সাহাবাজ খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি তার্সন খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ১৫৮৫ খৃঃঅব্দে মাশুম খাঁর অনুসরণ করিয়া ইশার অধিকারে উপস্থিত হন, এবং মাশুমকে ধৃত করিয়া পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে বলিয়া পাঠান। ইশা সেই সময়ে কুচবিহার-অধিকারে গমন করিয়াছিলেন। (৬) সাহাবাজ খাঁ খিজিরপুরের নিকট নদীতীরস্থ দুইটি দুর্গ অধিকার করিয়া সোনারগাঁ প্রভৃতি হস্তগত করিলে, মাশুম একটি দ্বীপে আশ্রয় লয়। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁ প্রভৃতি মাশুমকে প্রায় ধৃত করিয়াছিলেন,

(৪) "Isa by his intelligence and prudence, acquired a name, and he made twelve zemindars of Bengal to become his dependants."—*Elliot's History of India. Vol VI. Akbornama.*

আকবরনামার বিবরণে বোধ হয়, যেন ইশা খাঁ বারভুঁইয়া হইতে পৃথক। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বারভুঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন।

(৫) Blochman's Ain-i-Akbari.

(৬) Gait সাহেব ১৮৯৩ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় Koc Kings of Kamrup নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ও আকবর মিলিত হইয়া 'গৌড় পাশা'কে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিলারায় পূর্ব্ব ও মানসিংহ পশ্চিম হইতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। গেট সাহেব উক্ত গৌড় পাশাকে দায়ুদ শাহা বলিতে চাহেন। বেভারিজ তাঁহাকে ইশা খাঁ স্থির করেন। দায়ুদের সময়ে মানসিংহ আসেন নাই। অধিকন্তু ইশা কোচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণের বিরোধী পাটকুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সহিতও মিলিত হইয়াছিলেন। ইশার সহিত কোচবিহার-রাজের যে বিবাদ ঘটিত, শাহাবাজ খাঁর সময়ে ইশার কোচবিহার হইতে প্রত্যাগমন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু সহসা ইশা কুচবিহার হইতে অনেক সৈন্য ও রসদ লইয়া উপস্থিত হইয়া মাশুমের সাহায্যে প্রবৃত্ত হন। বাদশাহী সৈন্যেরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। তাহারা জলপথ ও স্থলপথ উভয় পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হয়। তার্সন খাঁ মাশুম খাঁ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া হত হইলে, সাহাবাজ খাঁ বিপক্ষগণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। ইশা খাঁ প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে স্বীকৃত না হওয়ায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। সাত মাস ব্যাপী যুদ্ধের পর বাদশাহী সৈন্যেরা জয়লাভ করিলে বিদ্রোহীরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে ওমরাদিগের সহিত সাহাবাজ খাঁর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, বিপক্ষগণ ১৫ স্থানে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ বাঁধ কাটিয়া দেওয়ায়, বাদশাহীসৈন্যশিবির জলে প্লাবিত হইয়া যায়। পরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিগণের নেতা বন্দুকের গুলিতে হত হয়। অবশেষে তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

ইশা সুযোগ বুঝিয়া বন্দী হোসেনের দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। সাহাবাজ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। সন্ধিতে এইরূপ স্থির হয় যে, ইশা বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিবেন, সোনার গাঁয়ে এক জন দারোগা নিযুক্ত হইবেন, এবং মাশুম মক্কায় গমন করিবেন; বাদশাহের নিকট রীতিমত কর প্রেরিত হইবে। ইহার পর বাদশাহী সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিলে ইশা খাঁ পুনর্ব্বার নূতন প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সুতরাং আবার উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁর সহিত ওমরাগণের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হন। পরে আগরায় যাইবার ইচ্ছা করিলে বাদশাহ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া সৈয়দ খাঁকে তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। অবশেষে তাঁহারা পুনর্ব্বার ভাটির দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইশা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন; তিনি নিজে স্বরাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিয়া মাশুমকে সেরপুরের অভিমুখে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইলে, মাশুম তথা হইতে ভাটি, পরে উড়িষ্যার অভিমুখে পলায়ন করে। বাদশাহী সৈন্যেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ত্রিবেণীতে তাহাকে পরাস্ত করে। এই সময়ে ইশা কিছু দিনের জন্য শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎকালে ওয়াজির খাঁর হস্তে বাঙ্গলার শাসনের ভার প্রদান করিয়া সাহাবাজ বিহারের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ওয়াজির একাকী বাঙ্গলার বিদ্রোহদমনে

অশক্ত হইলে, বাদশাহ সাহাবাজ খাঁকে পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় যাইতে আদেশ দেন। সেই সময়ে ১৫৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে ইশাও পুনর্ব্বার স্বাধীনতা-অবলম্বনের প্রয়াস পান। এক দল বাদশাহী সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে, তিনি বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাদশাহ-দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মাশুমও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর কিছু দিনের জন্য বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপিত হয়। ইহার পর মানসিংহের সুবেদারীর সময়েও ইশা আপনার প্রভুত্ববিস্তারের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার সহিত নৌযুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ পরাস্ত ও হত হইয়াছিলেন। ১০০৮ হিজরী বা ১৫৯৯—১৬০০ খৃষ্টাব্দে (১) তাঁহার মৃত্যু হইলে উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গের পাঠানেরা শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। (২) আমরা ইতিহাস হইতে ইশা খাঁ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে আমরা দুই একটির উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে, তিনি শ্রীপুরের চাঁদ রায়ের কন্যা সোনাই বা স্বর্ণময়ীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণময়ী পরে সোনা বিবি নামে অভিহিত হন। ইশা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার রাজ্যরক্ষার জন্য শ্রীপুর, ত্রিপুরা ও আরাকাণের অধিপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; পরে মগদিগের আক্রমণে আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ তাঁহার অধিকারস্থ এগারসিন্দুর দুর্গ অধিকার করিলে, ইশা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। মানসিংহ নিজে যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া স্বীয় জামাতাকে প্রেরণ করেন। জামাতা যুদ্ধে হত হইলে ইশা খাঁ তাহা জানিতে পারেন। পরে তিনি মানসিংহকে তিরস্কার করিয়া স্বীয় শিবিরে চলিয়া যান। মানসিংহ পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন। প্রথম যুদ্ধে মানসিংহের হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া যায়; ইশা তাঁহাকে স্বীয় তরবারিপ্রদানের ইচ্ছা করিলে মানসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন, ইশাও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হন। মানসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। ইশাকে বন্দী না করায় মানসিংহের অনুচরেরা ও তাঁহার রাণী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। অনন্তর ইশা মানসিংহের

(১) Elliot's History. vol. VI. Inayatulla's Takmilla-i-Akbar-namaর মতে ১০০৭ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আকবরনামার মতে ১০০৮ হিজরী।

(২) Blochmann's Ain-i-Akbari.

অনুরোধে তাঁহার সহিত আগরায় গমন করেন। বাদশাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, পরে এগারসিন্দুর যুদ্ধের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন; এবং দেওয়ান ও মসনদ আলি উপাধি ও অনেক পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। মানসিংহের জামাতৃবধের প্রবাদ সম্ভবতঃ তৎপুত্র দুর্জ্জন সিংহের নিধন হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় প্রবাদ এই যে, প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক বসন্ত রায় সবংশে নিহত হইলে, তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র রাঘব রায় বা কচুরায় পলায়ন করিয়া ইশা খাঁর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ইশা খাঁকে রামরাম বসু হিজলীর মসনদ-আলি বলিয়াছেন। কিন্তু হিজলীতে ইশা খাঁ নামে কোনও মসনদআলি ছিলেন না। উক্ত ইশা খাঁ যে সুপ্রসিদ্ধ ইশা খাঁ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইশা খাঁ সমস্ত ভাটি বা সুন্দরবনের একাধীশ্বর হওয়ায় ও অন্যান্য ভুঁইয়ারাও তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করায়, তাঁহারই নিকট রাঘব রায়ের সাহায্যার্থ উপস্থিত হওয়াই সম্ভব। আমরা প্রতাপাদিত্য প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। ইশা খাঁ যেরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন, সেইরূপ মহানুভবও ছিলেন। ইংরাজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সোনার গাঁয়ে উপস্থিত হন। তিনি ইশা খাঁর মহত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে তদানীন্তন সোনার গাঁ প্রদেশের অবস্থার বিষয়ও অনেকপরিমাণে অবগত হওয়া যায়। (১) আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, খিজিরপুর পরগণা ইশা খাঁর জমীদারী ছিল। খিজিরপুর সরকার সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত। কিন্তু তিনি উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অনেক স্থানে আপনার

---

(১) "Sonargao is a town six leagues from Serripore where there is the best and finest cloth made of cotton, that is in all India. The chief king of all these countries is called Isacan, and he is chief of all the other kings, and is a great friend to all christians. The houses here as they be in the most part of India, are very little and covered with strawe, and have a fewe mats round about the walls. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh nor kill no beast. They live on rice milke and fruits. They go with a little cloth before them, and all the rest of their bodies is naked. Great store of cotton cloth goeth from hence, and much rice, where with they serve all India, Ceilon, Pegu, Malacca, Sumatra, and many other places."—*Harton Ryley's Ralph Fitch P. 118.*

অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কত্রাভূ নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, তিনি বক্তারপুরে বাস করিতেন। (১) এই কত্রাভূ বা বক্তারপুর কোথায়, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বেভারিজ সাহেব সাবারের নিকটস্থ ক্ষেতবাড়ীকে কত্রাভূ বলিতে চাহেন। খিজিরপুর হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে বক্তারপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও অট্টালিকাদির চিহ্ন নাই। ইশার পুত্র দায়ুদও কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া মানসিংহকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা ইশা খাঁ সম্বন্ধে যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। পরে তিন জন হিন্দু ভুঁইয়া সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

১৩১০ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ।

১৩১০ সালের ভাদ্র মাসের "সাহিত্যে" ১৩০৯ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার ১৩১০ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। এবারেও কোন পুস্তকের সমালোচনা করি নাই। তাহা প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট নহে। প্রতিবর্ষে সাহিত্যের গতি ও পুষ্টি কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাহার আলোচনাই আমাদের অভিপ্রেত।

১৩০৯ সালের সাহিত্য-বিবরণে এ সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম, এই এক বৎসরে তাহার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাহা বোধ করি সম্ভবও নহে। তথাপি, গত বর্ষের তুলনায় এ বর্ষে সাহিত্যের প্রবাহে যে যৎসামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই নির্দ্দেশ করিবে।

বাঙ্গলা সাহিত্য এক প্রকার স্থিতিশীল। ইহার গতি নাই বলিলেও চলে। গত বর্ষেও সাহিত্যের যে কয় বিভাগে যে ভাবের গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, এবারেও ঠিক সেই সেই বিভাগে তেমনই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং অনুমান করিতে হয়, বাঙ্গলা-গ্রন্থকারগণ নূতন বিষয় লইয়া পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত নহেন। অনুকরণ অনেক সময়ে উন্নতির পথ-প্রদর্শক বটে, কিন্তু অনেক স্থলে আবার ব্যর্থ অনুকরণচেষ্টায় উন্নতির গতি প্রতিহত হইয়া থাকে। উপকারী

(১) ইলিয়ট Katrapur বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া, অভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সংশোধনের অবকাশ লক্ষ্য করিয়া নূতন নূতন বিষয়ের অনুকরণ করিলে; সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে। আমাদের বাঙ্গালীসমাজে এ ভাবের অনুকরণ অত্যন্ত বিরল। সাহিত্যেও অনুকরণের সেই দুর্দ্দশা, তাহা না বলিলেও চলে।

কাব্য-নাটক-উপন্যাসের প্রণেতা বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক আছেন; দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যাও বাড়িতেছে; কিন্তু অনেকেই উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন না। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের ব্যর্থ অনুকরণেই অনেকে ব্যস্ত। সূক্ষ্ম-সমালোচকের সমালোচনার অস্ত্রে এই ভাব যত দিন না দূরীভূত হয়, ততদিন সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতির আশা করা যায় না।

পরিষদের পুস্তকালয় আছে। সেই পুস্তকালয়ের বার্ষিক বিবরণও লিখিত হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস, পরিষৎ-পুস্তকালয়ের বিবরণের সহিত বাঙ্গলা সাহিত্যের বার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। পরিষৎ-পুস্তকালয়ের যিনি গ্রন্থ-রক্ষক, তাঁহারই হস্তে, আমার মতে, এই বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণ লিখিবার ভার থাকা উচিত।

এই বিবরণ সুসম্পন্ন করিবার পক্ষে যাহা প্রধান অন্তরায়, যাহার কথা আমি গত বৎসরেও উল্লেখ করিয়াছিলাম—অর্থাৎ নবপ্রচারিত সমস্ত পুস্তক দেখিবার উপায়ের অভাব—এবারেও সে বাধা অন্তরিত হয় নাই। গত বর্ষের ন্যায় বেঙ্গল লাইব্রেরীর প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা ও সাময়িক পত্রাদির সমালোচনাস্তম্ভের বিবরণাদি ব্যতীত আর কোনও উপাদান আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

গতবর্ষে যে কারণে ১৩০৯ সালের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের পুস্তকাদির বিবরণ দিতে পারি নাই, এ বৎসরেও সেই কারণে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। গত বৎসরে নয় মাসের পুস্তকের বিবরণ দিয়াছিলাম; এ বৎসর গত বর্ষের অবশিষ্ট তিন মাসের বিবরণসহ বারো মাসের, অর্থাৎ ইংরাজী ১৯০৩ সালের (পূর্ণ এক বৎসরের) বিবরণ দিব। গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও আমি পুস্তক-গণনায় কেবল প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলিই ধরিয়াছি; একাধিক সংস্করণ, নূতন সংস্করণ, সংশোধিত সংস্করণ, বা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের পুস্তকাদি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। গত বারের ন্যায় খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার-সমিতির পথে বিতরণীয় পুস্তিকাগুলিও ধরি নাই।

এইরূপ গণনায় গত বৎসরে মোট ৭৫৫ খানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে,—

বিশুদ্ধ বিমিশ্র বাঙ্গলায়	৫৪৭	বাঙ্গলা, উর্দ্দু ও ইংরাজীতে	১
মুসলমানী বাঙ্গলায়	১৯	বাঙ্গলা, উর্দ্দু, হিন্দী ও ইংরাজীতে	১
বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে	৭২	বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে	৭৬
বাঙ্গলা ও উড়িয়াষ	১	মুসলমানী বাঙ্গলা, উর্দ্দু ও আরবীতে	১
বাঙ্গলা, হিন্দী ও সংস্কৃতে	২	মুসলমানী বাঙ্গলা ও পারসীতে	২
বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে	২০	মুসলমানী বাঙ্গলা ও আরবীতে	৩
বাঙ্গলা, ইংরাজী ও পারসীতে	১	বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও পালিতে	১
বাঙ্গলা, হিন্দী ও ইংরাজীতে	১	মোট—৭১৫ খানি পুস্তক	

প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিমিশ্র বাঙ্গলা, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজী, এবং বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে প্রকাশিত ৭১৫ পুস্তকের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে,—

কলাবিদ্যায়	৩	চিকিৎসায়	২৫
জীবনচরিতে	১৭	দর্শনে	৬
নাটকাদিতে	৪২	কবিতায়	৮৫
উপন্যাসে	৫৯	ধর্ম্মবিষয়ে	৯০
ইতিহাস-ভূগোলে	১২	বিজ্ঞান বিষয়ে	৩৭
সাহিত্যে	১৫৯	বিবিধ বিষয়ে	১৭০
আইনে	৬	ভ্রমণ বিষয়ে	৪
		মোট ৭১৫ খানি	

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে,—

ইতিহাস ও ভূগোলের ১২ খানির মধ্যে	১১	বিজ্ঞানের ৩৭ খানির মধ্যে	৩৭
সাহিত্যের ১৫৯ খানির মধ্যে	১৫৯	বিবিধবিষয়ক ১৩২ খানির মধ্যে	৫৭
কবিতার ৮৩ খানির মধ্যে	১২	মোট ২৭৬ খানি	

স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। এই স্কুলপাঠ্য ২৭৬ খানি গ্রন্থ বাদ দিয়া যে ৪৭৯ খানি গ্রন্থ অবশিষ্ট থাকে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প। যাহা হউক, যে শ্রেণীতে যেগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলির নাম ও তাহাদের রচয়িতার নাম উল্লিখিত হইতেছে।—

(ক) কলাবিদ্যা—এই শ্রেণীর ৩ খানি গ্রন্থই উল্লেখ যোগ্য।

১। পিয়ানো-হারমোনিয়ম-শিক্ষা	পার্ব্বতীচরণ দাস।
২। সূচী-শিল্প	মিসেস মেরী।
৩। সঙ্গীত-প্রবেশিকা	মুরারিমোহন গুপ্ত।

গত বৎসরে কলাবিদ্যায় কেবল তৌর্য্যত্রিক শিক্ষার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বৎসর অন্যবিধ কলা সম্বন্ধেও একখানি শিক্ষাপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

সূচী-শিল্পের লেখিকা বিদেশিনী।—ভিন্নদেশীয়া মহিলারাও আমাদের মাতৃভাষায় গ্রন্থ লিখিতেছেন, এবং তাহা সূচী-শিল্পের শিক্ষা দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে, ইহা আনন্দের বিষয় বটে। মুরারিমোহন গুপ্তের গ্রন্থখানি বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত, ত্রিবিধ ভাষার মিশ্রণে লিখিত। সঙ্গীত-প্রবেশিকার রচয়িতা হিন্দু-সঙ্গীতের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না, জানি না। তিন সংখ্যামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে এক জন সুদক্ষ পাখোয়াজ-বাদক ছিলেন। ইংরাজীতে চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। অন্যান্য কলাবিদ্যা সম্বন্ধেও ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থের অভাব নাই। সে কালে ভারতবর্ষে এই সকল কলাবিদ্যার আদর ছিল। সেকালের চতুঃষষ্টিকলার বিবরণ তাহার নিদর্শন। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'। মৌলিক পুস্তক না হউক, ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ করিয়া ঐ সকল কলাবিদ্যার আলোচনা স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। মুরশিদাবাদ, কাশী ও কটক অঞ্চলে রেশমের বিস্তৃত কারবার আছে। রেশম রঞ্জিত করিবার নানাপ্রকার দেশীয় প্রথা আমাদের দেশে অদ্যাপি বিদ্যমান। যদি এই রঞ্জন-শিল্পের দেশীয় প্রথার বিবরণ সঙ্কলিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে মাতৃভাষার ও মাতৃভূমির প্রভূত উপকার হইতে পারে।

(খ)। জীবন-চরিত,—এই বিভাগের ১৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১২ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	মহাপুরুষ মহম্মদের জীবনচরিত	রেভঃ গিরিশচন্দ্র সেন।
২।	অদ্বৈতবিলাস	বীরেশ্বর প্রামাণিক।
৩।	আনন্দী বাঈ	সখারাম গণেশ দেউস্কর।
৪।	ওমর-চরিত	মৌঃ আলাউদ্দীন আহম্মদ।
৫।	বিশ্বাসী সাধক গিরীন্দ্রনাথ রায়	রেভঃ গিরিশচন্দ্র সেন।
৬।	স্বর্গীয় মহাত্মা রামচরণ বসুর জীবনচরিত,	লোড়শীবালা দাসী।
৭।	ঝান্সীর রাণী	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮।	মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র	নবকৃষ্ণ ঘোষ।
৯।	বীরাঙ্গনা	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
১০।	মহর্ষির আত্মজীবনচরিত	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১।	শঙ্করাচার্য্য-চরিত	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
১২।	৺রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত ও বাঙ্গালী সমাজ	শিবনাথ শাস্ত্রী এম্. এ.
১৩।	দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত	কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।

এতদ্ব্যতীত "বিশ্বজীবন" নামক চরিতাবলী-প্রকাশক খণ্ডশঃপ্রকাশ্য সাময়িক পুস্তকে উইলিয়ম কেরী নামক বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম ইংরাজ বন্ধুর জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইতেছে। উল্লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রথম দুইখানি ও চতুর্থখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ঝান্সীর রাণীতে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু কতক নূতন তথ্য প্রদান করিয়াছেন। গত বারের উল্লিখিত ৺পিয়ারীচরণ সরকারের জীবনচরিতের প্রণেতা নবকৃষ্ণ বাবু এ বৎসর আবার আর এক জন ধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মবীরের জীবনচরিত সাধারণকে উপহার দিয়াছেন। রেভারেণ্ড গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় অনেকগুলি জীবনচরিত লিখিয়াছেন। সখারাম বাবুর লিখিত আনন্দীবাঈ-এর জীবনবৃত্তে মহারাষ্ট্রমহিলার কর্ম্মজীবনের সুন্দর চিত্র আছে। শেষ গ্রন্থখানি, অর্থাৎ মহর্ষির আত্মজীবনচরিত শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ধর্ম্মময় জীবনের প্রথমাবস্থার স্বলিখিত ইতিহাস। নিজের জীবনের ঘটনা নিজে বিবৃত করিবার প্রথা এ দেশে নূতন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং নিজের জীবনচরিত লিখিবার সূত্রপাত মাত্র করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। মহর্ষির জীবনের ইতিহাসও অসম্পূর্ণ।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়ের আত্মজীবনচরিত লইয়া আমরা এই সাহিত্যে দুইখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাইলাম।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের শঙ্করাচার্য্যচরিতে অনেক ঐতিহাসিক জ্ঞাতব্য কথা আছে। রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় সত্যবীরের জীবনচরিত লিখিয়া পণ্ডিত শিবনাথ বাঙ্গালী সমাজের একটা অভাব দূর করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত অসম্পূর্ণ রহিল। শিবনাথ বাবু প্রায় কথোপকথনের ছন্দে এই জীবনচরিত লিখিবার চেষ্টা করিয়া ভালই করিয়াছেন; কিন্তু কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার বিচার করিবার স্থান ইহা নহে। লোকবিশেষের জীবনচরিত লিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তির সমসাময়িক সামাজিক বিবরণ লিখিবার চেষ্টা করিয়া শিবনাথ বাবু এই গ্রন্থে আর এক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ জীবনচরিত-লেখকেরা শিবনাথ বাবুর অনুসৃত পথের অনুসরণ করিলে বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ সঞ্চিত হইতে থাকিবে।

যাহা হউক, এ বৎসরও জীবনচরিত বিভাগে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ। নাটকাদি বিভাগে ৪২ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১৪ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	প্রতাপাদিত্য	শীতলাদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
২।	তারা বাই	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
৩।	কালপরিণয়	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪।	বিদ্বশালভঞ্জিকা	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫।	ধাবল্য-বিজয়	
৬।	রজত-গিরি	
৭।	সরোজ	মনোমোহন গোস্বামী।
৮।	কমলকিশোর	যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৯।	ইন্দু	কাঙ্গালীকৃষ্ণ দত্ত।
১০।	সুরলা	উমাকান্ত হাজরা।
১১।	নিরুপায়ে চিকিৎসক	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২।	হবি-দা	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩।	পরিতোষ	সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।
১৪।	তেজোময়ী	কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

নাট্য-সাহিত্যের গতি ও পুষ্টি সম্বন্ধে দু এক কথা বলিব। গত বৎসর প্রতাপাদিত্য নাটকের অভিনয়ে রঙ্গালয়ে সুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তারা বাই প্রভৃতির অভিনয়েও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দর্শক বা পাঠকের রুচি এখনও একবারে বিকৃত হয় নাই। ব্যর্থ-অনুকরণে লিখিত অপ্রাসঙ্গিক নৃত্য গীত ও 'সং'এ পূর্ণ নাটকাদির পরিবর্ত্তে মৌলিক ও ঐতিহাসিক নাটকাদি রচিত ও অভিনীত হইলে, তাহাও যে সাধারণের বরণীয় হয়, তাহা প্রতাপাদিত্যের সফল অভিনয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষেও জ্যোতিরিন্দ্র বাবু আর দুইখানি সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। গত-পূর্ব্ব বৎসরে তিনি একখানি ফরাসী দৃশ্য-কাব্যের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ বৎসর "রজত-গিরি" নামক একখানি ব্রহ্মদেশীয় নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার সার্থক লেখনীর কৃপায় বাঙ্গলা সাহিত্য বিভিন্ন ভাষার অনেকগুলি রত্নের অধিকারী হইয়াছে। গত বৎসরে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একখানি ফরাসী দৃশ্যকাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি যে গ্রন্থখানির অনুবাদ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার আরও অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত "গোবৈদ্য", শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্তের "যেমন রোগ তেমনি রোঝা" ও শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্রের "অল্পমধুর" ঐ একই পুস্তকের অনুবাদ। ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা" উপন্যাসের প্রথমাংশ নাটকাকারে পরিণত হইয়া ষ্টার থিয়েটারে "সরলা" নামে অভিনীত

হইবার পর হইতেই বাঙ্গালীর গৃহচরিত্র-অবলম্বনে অনেকগুলি সুপাঠ্য সামাজিক নাটক প্রণীত হইয়াছে। গত বৎসরেও এরূপ সামাজিক নাটকের অভাব হয় নাই, এবং সুখের বিষয়, গত বৎসরের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলি ব্যর্থ অনুকরণে লিখিত নহে। গত বৎসরে উল্লেখযোগ্য প্রহসনাদি প্রকাশিত হয় নাই। আজ-কাল যে সকল প্রহসন লিখিত হয়, তাহা কেবল অভিনয়ের জন্য, সমাজের জন্য বা দর্শক-পাঠকের জন্য নহে। নাটক অপেক্ষা প্রহসনগুলিতে আজ কাল অনুকরণ-প্রবৃত্তিটা বেশী ফুটিতে দেখা যায়। সম্প্রদায়-বিশেষের উপর টিটকারী বা ব্যক্তি-বিশেষের উপর আক্রোশ প্রকাশ করাই যেন আজ-কালকার প্রহসনগুলির প্রধান বর্ণনীয় ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। যাত্রার পালা-রচনায় যে সকল লেখক ব্রতী আছেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। গত বৎসরে প্রকাশিত কয়েকখানি গীতাভিনয়ের উল্লেখ করিতেছি; তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, পালা-রচয়িতারা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, যা' তা' বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া গানের পালা বাঁধিতেছেন। তাঁহাদের উপযোগিতার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই।—যথা,—পরশুরামের মাতৃহত্যা-গীতাভিনয়, মগধ-বিজয়-গীতাভিনয়, পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ-গীতাভিনয় ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে গত বৎসরেও হাস্যজনক নামের একখানি নাটক বাহির হইয়াছে;—সেখানি শ্রীজগবন্ধু হাজরা মোক্তার প্রণীত বেশ্যার সতীত্ব-রক্ষা নাটক—জন্ম বর্দ্ধমানে।

ঘ।—উপন্যাস—এই শ্রেণীর ৫৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১১ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	উড়িষ্যার চিত্র	ক্ষতীন্দ্রমোহন সিংহ।
২।	কর্ম্মফল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩।	মহিমময়ী	দীনেন্দ্রকুমার রায়।
৪।	জীবনতরহস্য	পাঁচকড়ি দে।
৫।	শান্তিলতা	প্রেমলতা-রচয়িত্রী।
৬।	লক্ষ্মী বউ	বিধুভূষণ বসু।
৭।	সতী শোভনা	পাঁচকড়ি দে।
৮।	স্নেহময়ী	সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।
৯।	মোহিনী	রাধানাথ মিত্র।
১০।	পরিণয়-কাহিনী	ভবানীচরণ ঘোষ।
১১।	সাবিত্রী	সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

গত বৎসর একখানিও উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রবাবুর কর্ম্মফল উপন্যাস নহে, দৃশ্যকাব্য বলিলে বরং সঙ্গত হয়। গত বৎসর উপন্যাসের

মধ্যে ডিটেক্‌টিভ গল্পেরই প্রাধান্য গিয়াছে। করাসী-গোয়েন্দা, আমেরিকান-গোয়েন্দা, গুপ্তচর, দারোগার দপ্তর, এবং মনোরমা, প্রভাতকুমারী, লুকোচুরি, দিনে-ডাকাতি, হত্যাকারী কে? প্রভৃতি পুস্তকই তাহার প্রমাণ। বর্ত্তমান উপন্যাসরাশিতে দিন দিন কুৎসিত প্রেমের গল্প অজস্র প্রচারিত হইতেছে; তাহার ফলে উপন্যাসের আদর্শ কতকটা অধঃপাতে গিয়াছে; তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের নাম করিতেছি। প্রেমের-চাতক, যুবতী বা বিষাদরাশি, গুপ্তপ্রেম, গুপ্তচুম্বনের প্রতিফল, ইত্যাদি। ভ্রমকরণপ্রিয়তা উপন্যাস বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একই গল্প বিভিন্ন নামে যে কত শতবার ছাপা হইতেছে, তাহার হিসাব নিকাশ দুর্ঘট! একই রকমের চরিত্র প্রতি পাঁচখানি উপন্যাসের মধ্যে বোধ হয় দশটা পাওয়া যায়। কোনও একখানা তথাকথিত উপন্যাসের দু এক পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই মনে হয়, এইরকম গল্প বা এইরকম একটা ছবি কোথাও পড়িয়াছি। কাজেই প্রতিবৎসর উপন্যাসের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেও প্রকৃত পুষ্টি হইতেছে না। উপন্যাস সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিবার আছে। প্রত্যেক উপন্যাসে তরল ভাষায় কেবল প্রেমের বর্ণনা, বাঞ্ছিতের আশা, বিরহ-মিলনের বর্ণনা, হতাশ প্রেমিকের আক্ষেপ পরিস্ফুট। প্রেমের দায়ে সামাজিক বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিবার কৌশল পড়িয়া মনে হয়, যেন বাঙ্গালীর মনে দাম্পত্য সুখের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরেই এই সকল কদর্য্য গ্রন্থের বিষ অধিকমাত্রায় বিকীর্ণ হইতেছে; ইহার পরিণাম কখনও শুভাবহ হইতে পারে না। এই সকল কদর্য্য গল্প পাঠ করিয়া সাধারণের রুচি এত বিকৃত হয় যে, তাহাদের অন্যবিধ গ্রন্থ-আলোচনায় প্রবৃত্তি থাকে না।

আধুনিক অনেক সমালোচক সেকালের সাহিত্য-সমালোচনায় বলিয়া থাকেন, সেকালে বিদ্যাসুন্দর-জাতীয় সাহিত্যেরই আদর ছিল, তাহারই প্রসার হইয়াছিল, সুতরাং তখনকার লোকের রুচি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত ছিল। এখনকার অনেকগুলি উপন্যাস সম্বন্ধে যদি কোনও অপক্ষপাতী ভ্রমালোচক ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে যে নিশেষ অন্যায় হয়, এমন বোধ হয় না। এখনকার কোনও উপন্যাসে বিহারবর্ণনা না থাকিলেও, যে-ভাবে পূর্ব্বরাগ, বিশ্রম্ভালাপ, গোপনে চুম্বনাদি বর্ণনার আতিশয্য লক্ষিত হয়, এবং সমাজ-বিগর্হিত-প্রথায় নায়ক-নায়িকার প্রেমের দায়ে গৃহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশ থাকে, তাহা যে প্রাচীন সাহিত্যের অশ্লীলতা অপেক্ষা অধিকতর দোষাবহ, অমঙ্গলের আকর, বিকৃত রুচির পরিচায়ক, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। সেকালের কাব্যাদিতে

বিদেশী নায়ক ও বিদেশিনী নায়িকার মধ্যে দৈব-ইচ্ছা, জন্মান্তর-দাম্পত্য প্রভৃতি কোনও না কোনও অনৈসর্গিক কারণে কেবল রূপজ মোহ হইতেই প্রেমের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এখনকার উপন্যাস পড়িলেই মনে হয়, যেন কাহারও বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটার রাখিবার উপায় নাই, প্রতিবেশী সুদর্শন যুবকের গ্রামে থাকা চলে না; কারণ তাহা হইলেই, গৃহকর্ত্তার কন্যাটি নির্ব্বিচারে অকস্মাৎ প্রেম করিয়া বসেন! আর তাহার সহিত মিলনের বাধা ঘটাইতে পারিলেই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু গাঢ়তর হইয়া থাকে। মিলন না হইলেই, হয় সূর্য্যমুখীর ন্যায় গৃহত্যাগ করেন, নয় ত আয়েষার মত বলিয়া বসেন, "এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর"।

অক্ষম লেখকেরা ধৈর্য্যসহকারে বিবেচনা করিয়া বা বিজ্ঞজনের উপদেশ লইয়া লিখিতে চাহেন না, বা পারেন না। ক্ষমতাশালী লেখকেরাও আপনাদের লেখার গুণে পাঠক গড়িয়া লইতে আজকাল যেন প্রস্তুত নহেন।

৬। ইতিহাস ভূগোল। এই শ্রেণীর ১২ খানি গ্রন্থের মধ্যে স্কুলপাঠ্য ১১ খানি বাদে একখানিমাত্র গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১। শ্রীচৈতন্যের ইতিহাস — শ্রীমোহিনীমোহন দাসগুপ্ত।

আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে বাঙ্গালী লেখকেরা কোনও চেষ্টা করেন নাই। এই বিংশ শতাব্দীতে উপকরণ নাই, এরূপ উক্তি শোভা পায় না। ইতিহাস-ভূগোল সম্বন্ধে মৌলিক অনুসন্ধান নিতান্ত দুরূহ বা দুঃসাধ্য নহে। সুদূর মফস্বলস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষেও যে অসম্ভব নহে, তাহা কালীপ্রসন্ন বাবু বাঙ্গলার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। যাহা হউক, যাঁহারা ইতিহাস ভূগোলের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের আলোচনার ফলে মাতৃভাষার আশানুরূপ পুষ্টি হইতেছে না, ইহাও অল্প আক্ষেপের কথা নহে। আমার মনে হয়, যাঁহারা ঐতিহাসিক সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারা যদি অন্ততঃ বহুবিধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদ-প্রকাশেরও চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও মাতৃভাষার প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। গুপ্তরাজগণ, পালরাজগণ, গঙ্গাবংশীয় ও কেশরিবংশীয় উৎকলরাজগণ, কলিঙ্গরাজগণ, কাছাড়রাজগণ, মণিপুর, আরাকান, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতির রাজগণের বিবরণ, আসামের আহম ও হিন্দু রাজগণের ইতিহাস ও নেপালের লিচ্ছবি রাজগণের ইতিহাসের ইংরাজীতে অভাব নাই; কিন্তু বাঙ্গলায় কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৈলাস বাবুর জৈন-রাজগণের ও লিচ্ছবিরাজগণের সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানি মাত্র পুস্তক আছে। এক

বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধেই এতগুলি রাজবংশের বিবরণ লিখিবার আছে। অন্ততঃ এতৎসম্বন্ধীয় ইংরাজী ইতিহাসগুলির অনুবাদ করিলেও চলিতে পারে। খোদিত লিপি ও মুদ্রালিপি হইতে যে সকল ঐতিহাসিক কথা ইংরাজীতে বিদেশীয় ঐতিহাসিকেরা প্রকাশ করিতেছেন, বাঙ্গালায় তাহার কয়টার কথা আলোচিত হয়? দিন কয়েক মাসিকপত্রগুলিতে এইরূপ প্রবন্ধের আধিক্য দেখা গিয়াছিল। আজ ৫।৬ বৎসর কোথা হইতে ক্ষুদ্র গল্পের স্রোত আসিয়া পড়িয়াছে, এখন অনেকের অক্ষম-লেখনী-প্রসূত গল্পাবলীতেই মাসিকপত্রগুলি প্লাবিত হইতেছে। বাঙ্গালী লেখকেরা এ বিষয়ে অবহিত না হইলে ঐতিহাসিক সাহিত্যের উন্নতি সুদূর-পরাহত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চ। সাহিত্য,—এই শ্রেণীর ১৫৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১৫৮ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ বাদ দিলে একখানিমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেখানিও প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্য-গ্রন্থ নহে, স্কুলের ছাত্রদিগের উপযোগী অভিধানমাত্র। তাহার রচয়িতা বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, গত বর্ষের তালিকায় খাঁটি গদ্যসাহিত্য আদৌ নাই। প্রবন্ধ-পুস্তক একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সাহিত্যিক-সমালোচনা সম্বন্ধেও কোনও পুস্তক বাহির হয় নাই। যে দেশের লেখক পাঠক সকলেই মহা বিজ্ঞ সমালোচক, সে দেশে যে প্রকৃতপ্রস্তাবে একখানিও সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে! পূর্ণ বাবুর "কাব্য-সুন্দরী" ও "দেবসুন্দরী", ৺গিরিজা বাবুর তিন খণ্ড "বঙ্কিমচন্দ্র", বীরেশ্বর বাবুর "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত", যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণির "মেঘনাদবধ প্রবন্ধ" ব্যতীত নাম করিবার মত সমালোচনার গ্রন্থ আর নাই বলিলেও চলে। গিরীশ বাবু, রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতির নাটকাবলী, রবীন্দ্রনাথ, ৺হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্য ও কবিতা, দামোদর বাবু, রমেশ বাবু প্রভৃতির উপন্যাসাবলীর সমালোচনা-গ্রন্থ কেন যে প্রকাশিত হয় না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই সকল মনীষী লেখকের রচনার সমালোচনা হইলে সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতীত মার্জ্জনাও হইতে পারে। ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "সাহিত্য-মঙ্গলে"র মত প্রবন্ধপুস্তকও আর প্রকাশিত হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ছ। চিকিৎসা—এই শ্রেণীর ২৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৭ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	পশুচিকিৎসা	শশিভূষণ পাল।
২।	রসেন্দ্রসারসংগ্রহ	উপেন্দ্রনাথ সেন।
৩।	শার্ঙ্গধর	ঐ

৪। উপদংশিক রোগচিকিৎসা। (হোমিওপ্যাথী)	বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়।
৫। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যাবলীর সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়	চন্দ্রশেখর কালী।
৬। খোকার-মা	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৭। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা মন্তব্য, অত্যাগ্নি তরুণ জ্বর	প্রভাতচন্দ্র সেন।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে রোগবিশেষের চিকিৎসা-শিক্ষার বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিন এক ওলাউঠা ভিন্ন অন্য কোনও রোগের চিকিৎসা বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক অধিক প্রকাশিত হয় নাই। এখন দু এক-খানি হইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ। শারীর-তত্ত্বের গ্রন্থ সম্বন্ধে এবারেও কেবল নাড়ী-বিজ্ঞান অনেকগুলি ছাপা হইয়াছে। ইংরাজী শারীরতত্ত্বের পুস্তকগুলির অনুবাদ আবশ্যক। যাহা হউক, চিকিৎসাবিষয়ক-গ্রন্থ-প্রণয়ণে অনেক কৃতবিদ্য বিজ্ঞ ডাক্তার কবিরাজ যত্ন লইয়া থাকেন, ইহা আশাপ্রদ বটে।

ঞ। দর্শন,—এই বিভাগের ৬ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৪ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১। পঞ্চমবর্ষীয় শ্রীগোপাল মল্লিক ফেলোশিপের লেকচার	মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
২। সাংখ্যতত্ত্বালোক	
৩। ন্যায়শাস্ত্র (সটীক)	নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।
৪। সৌভাগ্যস্পর্শমণি	মৌল্বী মহম্মদ ইউসুফআলি।
৫। সরল বেদান্তদর্শন	সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এতদ্ভিন্ন সাংখ্যদর্শন ও বেদান্তদর্শনের অনুবাদাদি দুই একখানি প্রকাশিত হই-য়াছে। আনন্দের বিষয় এই, এ বৎসর এক জন মুসলমান দার্শনিক বাঙ্গলা ভাষায় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে লেখনীধারণ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের ফলে মুসলমান শাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব বাঙ্গলা ভাষায় দেখিতে পাইব, এরূপ আশা করিতে পারি।

ঝ। কাব্য ও কবিতা,—এই বিভাগের ৮৫ খানি পুস্তকের মধ্যে ১২ খানি স্কুল পাঠ্য বাদে ৭৩ খানির মধ্যে ১৬ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১। অমৃতমদিরা	অমৃতলাল বসু।
২। বঙ্গদর্পণ	শশধর রায়।
৩। বৈরাজিকা	ইন্দুপ্রভা।
৪। গাথা	রমেশচন্দ্র সিংহ।
৫। বঙ্গের কলঙ্ক কাব্য	কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
৬। রাধিকা	ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। ঝঙ্কার	সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।
৮। অভিমন্যুবধ	মধুসূদন সাহা।

৯। কাননিকা।	ইন্দুপ্রভা।
১০। হজরত মহম্মদ	মোজাম্মেল হক।
১১। রাঘবরিজয় কাব্য	শশধর রায়।
১২।—অজ্ঞাতবাস কাব্য	যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
১৩। যোগ ও বিয়োগ	মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
১৪। ধবলেশ্বর কাব্য	নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
১৫। পরিত্রাণ কাব্য	শেখ ফজলল করিম।
১৬। স্মৃতি	পাঁচুরাণী দাসী।

গত বারে কাব্য সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়াছিলাম যে, বিষয়-বিশেষ লইয়া বিস্তৃত কাব্য-রচনার প্রথা যেন লুপ্ত হইয়াছে। এবার সে আক্ষেপের অবকাশ অল্প। উপরিলিখিত ১৬ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৭ খানি বিস্তৃত কাব্য। মুসলমান-কবিশ্রেষ্ঠ মুন্সী মোজাম্মেল হক্ সাহেব যে "হজরত মহম্মদ" নামক একখানি বৃহৎ কাব্য লিখিয়াছেন। খণ্ডকবিতাময় কাব্যের সেই একটানা স্রোত চলিয়াছে। অমৃত বাবুর "অমৃত-মদিরা" কোষ-কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অনেক কবিতা পড়িয়া সেকালের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সরলতা, প্রাঞ্জলতা স্মরণ হয়। গত বর্ষে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু, দিল্লী দরবার, অভিষেক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "বাঘা তেঁতুল"ও বাহির হইয়াছে! গত বৎসর একখানি সৎকাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি;—ঈশান বাবুর "যোগেশ" আবার ছাপা হইয়াছে। গত বৎসর প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে নরোত্তম দাসের কবিতাবলী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও রাধারমণের পালা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কাশীদাসের মহাভারত, শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা, গদাধর দাসের জগৎমঙ্গল, উদ্ধবসংবাদ, সঙ্গীতরঙ্গ, নরোত্তমের আশ্রয়নির্ণয়, জগদ্রামের রামায়ণের প্রথমাংশ, ও সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তর-কাণ্ড উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবাসী ছাপাখানা হইতে এবারেও কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ ভাল কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

ঞ। ধর্ম্ম-বিষয়ে ২০ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১৪ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১ম ভাগ)	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
২। ধম্মপদ	চারুচন্দ্র বসু।
৩। শ্রীচৈতন্যচরিত	কালীহর বসু।
৪। মৌলুদ শরিফ	মীর মশরিফ হোসেন।
৫। অদ্বিতীয় উপদেশ—প্রাণপ্রিয় তাপস	সৈয়দ মুন্সী আপতাবউদ্দীন আহম্মদ।

৬।	ইস্‌লাম-দর্পণ	সৈয়দ আবদুল গফুর।
৭।	সোঽহং-তত্ত্ব	পরমহংস সোঽহং স্বামী।
৮।	তীর্থসম্বন্ধে শাস্ত্রমত	শঙ্করনাথ পণ্ডিত।
৯।	সাধনরহস্য	কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী।
১০।	ভক্তিযোগ	পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু।
১১।	ব্রতমালাবিধান	বীরেশ্বর কাব্যতীর্থ।
১২।	হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ	পূর্ণচন্দ্র বসু।
১৩।	বীরভক্তদীপিকা	কবিরাজ গোস্বামী।
১৪।	তীর্থতত্ত্বচিন্তামণি	কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে খণ্ডশঃপ্রকাশ্য গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। "মৌলুদশরিফে" মহম্মদের জন্মকথার ইতিহাস ও তত্ত্বকথার আলোচনা আছে।

এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানি "ধম্মপদ"। এখানি পালিভাষায় রচিত। গীতা যেমন হিন্দুর পূজ্য, ধম্মপদ বৌদ্ধের তেমনই পূজ্য। ইহার উপদেশগুলির অধিকাংশ অসাম্প্রদায়িক। চারুবাবু এই গ্রন্থের সংস্কৃত পাঠ, অন্বয় ও বাঙ্গলা অনুবাদ দিয়া, মূল সহ প্রকাশ করিয়া, বাঙ্গলা ভাষার যেমন পুষ্টি-সাধন করিয়াছেন, সমাজেরও তেমনই উপকার করিয়াছেন।

ট। বিবিধ বিষয়ের ১৬৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৫৭ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ বাদে ১১২ খানির মধ্যে ৩৮ খানি উল্লেখযোগ্য,—

১।	প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	স্বামী বিবেকানন্দ।
২।	জিজ্ঞাসা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
৩।	ভারতবর্ষে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪।	আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ	যোগেশচন্দ্র রায়।
৫।	রত্নপরীক্ষা	ঐ
৬।	বেতালে বহু-রহস্য	চন্দ্রনাথ বসু।
৭।	ধর্ম্মানন্দপ্রবন্ধাবলী	ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
৮।	সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ও ভাষাপরিচ্ছেদ	রাজেন্দ্র শাস্ত্রী।
৯।	সহানুভূতি	তারিণীচরণ সেন।
১০।	বঙ্গে পল্লিকা-সংস্কার	সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
১১।	মহম্মদী ও মজহবী	সত্যমোহন দে।
১২।	বৌদ্ধকাহিনীসংগ্রহ	নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া।
১৩।	বিবাহ	আচার্য্য বিনোবিহারী রায়।
১৪।	প্রেমের বিকাশ	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১৫।	মৃত্যুপরীক্ষা	উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
১৬।	বিনয়বোধ	চন্দ্রনাথ ঘোষ।
১৭।	পারিবারিক জীবন	প্রসন্নভাময়ী গুপ্তা।
১৮।	বঙ্গদেশ ও বঙ্গমঙ্গল	মহেন্দ্রনাথ অগ্নিহোত্রি।
১৯।	জাতকবিজ্ঞান	প্রসন্নচন্দ্র সিংহ।
২০।	তীর্থদর্শন	যতীন্দ্রমোহন দাস।
২১।	অদ্ভুত প্রশ্নবিদ্যা	জগন্নাথ জ্যোতির্ভূষণ।
২২।	কৃষিপ্রণালী	ভুবনচন্দ্র কর।
২৩।	অকলঙ্ক যোগ	কৃপানাথ শর্ম্ম বিশ্বাস।

পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সানুবাদ ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী প্রকাশ করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতির অনেক প্রাচীন সংস্কৃত মূল, অনুবাদ ও নূতন দার্শনিক গ্রন্থ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ন্যায়দর্শনের দুরূহতা ও দুরবগাহতাবশতঃ এত দিন ইহার কোন গ্রন্থের অনুবাদপ্রকাশে কেহ প্রবৃত্ত হন নাই। শাস্ত্রী মহাশয় সে অভাব দূর করিলেন। অপর দর্শনাদির গ্রন্থেরও এইরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুনিয়াছি, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয় মীমাংসা-দর্শন সম্বন্ধে বাঙ্গলায় গ্রন্থ লিখিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন জাতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়খানি গ্রন্থও এই সঙ্গে গণনীয়,—

১। কায়স্থতত্ত্বতরঙ্গিণী। ২। ক্ষত্রিয়বংশতালিকা। ৩। জাতিতত্ত্ববারিধি। ৪। আদি-কৈবর্ত্ত ইতিহাস। ৫। মাহিষ্য-দীধিতি। ৬। গন্ধবণিক্-তত্ত্ব। ৭। হালিক দাস বা সাহিষ্য জাতি। ৮। জাতিতত্ত্বজ্ঞানদায়িনী। ৯। যোগিতত্ত্বনির্ণয় (জুগী)। ১০। যোগিতত্ত্বসার (জুগী)। ১১। তাম্বূলবণিক্। ১২। কায়স্থ মহাসভায় চারি শ্রেণী মিলন সম্বন্ধে বক্তৃতা। ১৩। কায়স্থ-কুলপদ্ধতি। ১৪। বঙ্গীয় কায়স্থনামাজ। ১৫। মাহিষ্য-দীপিকা। ১৬। জাতিসম্বন্ধনির্ণয়। ১৭। জাতিতত্ত্ব (বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য)।

৮। ভ্রমণ-বিষয়ক চারিখানি গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য।

১।	ভারত-প্রদক্ষিণ	দুর্গাচরণ রক্ষিত।
২।	অধ্যাপক বসুর ভ্রমণবৃত্তান্ত	প্রিয়নাথ বসু।
৩।	দার্জ্জিলিঙ্গে দিন দুই	গোপালনারায়ণ মজুমদার।
৪।	পুরী যাইবার পথে	ডাঃ চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর।

মুসলমান-শিক্ষা-সমিতি ও বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি মুসলমানী বাঙ্গলা ভাষার প্রচার রহিত করিবার যতই চেষ্টা করিতেছেন, আমরা দেখিতেছি, ততই এই

ভাষায় নব্য ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দিন দিন অধিক প্রকাশিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে

উপন্যাস বিভাগে—

১। কমলা পরীর পুথি	মহম্মদ আবদুল গণি।
২। দেলশাদ	জামালুদ্দীন মিঞা।
৩। সহিবিচ্ছেদ প্রকাশ	মুন্সী মুকিম।
৪। শিরি ফরহাদ ও শিরি খসরু	মহম্মদ আবদুলগণি।
৫। সাহ ঠাকুর বরের কেচ্ছা	নসিমুদ্দিন।
৬। ত্রিলোকসুন্দরী পরী	নিজামুদ্দীন আহম্মদ।
৭। বিশ্বম্ভরবধের বিবরণ	মৈজুদ্দীন মুন্সী।
৮। সাহারুক বাদশা ও তুলাপতি কন্যার পুথি	দৌলত আমেদ মজুন্দার।

ধর্ম্মগ্রন্থ বিভাগে—

১। ছহি গঞ্জে সহিদ-এ-কারবালা	সৈয়দ সাদ আলি।
২। কাছুটি	মহম্মদ আব্বাশি আলি।
৩। বাহারুস্থানে রৌফী বা স্বর্গসোপান	আবদর রৌফ।
৪। সহিদনামা	সেখ জনাব আলী।
৫। মেহতাহ-উল্-কাবা	সদরুদ্দীন।
৬। সহি রেদায়ে এলাহি	মহম্মদ এলাহিবক্স।
৭। এরশাদে-ই-খালেকি বা খোদা প্রাপ্তিতত্ত্ব	মৌঃ আবদুল করিম।
৮। সহি তহফিক নসলেসিন	নাজির আলী টেণ্ডেল।
৯। হেদায়ে তস্ সাহে লোবিন	মুন্সী নসিমুদ্দীন।

বিবিধ-বিষয় বিভাগে—

১। জীবনহত্যা	এনাজুদ্দীন।
২। রেঙ্গুণের কাব্য কবিতা	নাজির আলী টেণ্ডেল।

প্রভৃতি নব্যলেখকের লিখিত নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উপর আরবী ও মুসলমানী বাঙ্গলায়,—সহি-রদ্দাত-ই-তকলিদ, নেশাভঞ্জন, ধর্ম্মকার্য্যের হিতোপদেশ; আরবী, মুসলমানী বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতে,—মুফিদল আহ্নাক্; মুসলমানী বাঙ্গলা ও পারসীতে—তহ্ফিক-উল-হক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তক বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় প্রচারিত হইলে, বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-সমাজে তাহা সমাদৃত হইবে কি না, বলা যায় না। পশ্চিমের মুসলমান, যাঁহারা অল্প বাঙ্গলা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ভাষা দ্বিভাষীর কার্য্য করে। মুসলমান-শিক্ষাসমিতির ও বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ইহা বিবেচ্য হওয়া উচিত।

বাঙ্গলা ও উড়িয়া ভাষায়—মনোহর ফাসিয়াড়া বা রঙ্গলতা-পালা অর্থাৎ মনোহর ফাঁসুড়ে (ঠগ) ও রঙ্গলতার কথা নামে একখানি, বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে সপ্তরত্ন নামে একখানি ও বাঙ্গলা, ইংরাজী ও উর্দ্দুতে, ধর্ম্মের লাঠি নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আরবী, উর্দ্দু, উড়িয়া, পারসী বা হিন্দী ভাষার সদ্‌গ্রন্থের একখানি অনুবাদও প্রকাশিত হয় নাই; কেবল হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণের একখানি অনুবাদ বিশুদ্ধ বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। কান্দীর হরিনারায়ণ মিশ্র এই অনুবাদ করিয়াছেন।

গতবর্ষে মোট ৬৫ খানি বাঙ্গলা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে গুরুদর্পণ, ময়মনসিংহ, নবনূর, বঙ্গভাষা, ধূমকেতু, যমুনা, বার্ত্তা, মহম্মদী, পারিজাত, স্বভাব, গৌড়ভূমি, পল্লীসুহৃদ, রেণু ও হিতবার্ত্তা, এই কয়খানি নূতন। নূতন মুসলমান পত্র "নবনূর" ও ত্রিপুরার "বঙ্গভাষা" উল্লেখযোগ্য।

গতবর্ষের বাঙ্গলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। বাঙ্গলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের গতি সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা পরিষদের মতামত বলিয়া কেহ গণনা করিবেন না।

উপসংহারে একটি নিবেদন আছে। যদি পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সভা হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যের বার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বা অঙ্গহীন হইলে চলিবে না। অথচ বিস্তৃতভাবে বিবরণ লিখিতে হইলে, সমস্ত নবপ্রকাশিত পুস্তক পরিষদের পুস্তকালয়ে আসা চাই। পরিষদের গ্রন্থকার সভ্য, পুস্তক-প্রকাশক সভ্য, সম্পাদক সভ্য, ছাপাখানার অধিকারী সভ্য ও হিতৈষী সভ্যের অভাব নাই। ইহাঁরা সকলে অনুগ্রহ করিয়া স্বরচিত, স্বপ্রকাশিত, স্বসম্পাদিত, স্বমুদ্রিত ও স্ব স্ব বন্ধুবান্ধবের মুদ্রিত পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া পরিষদে পাঠাইয়া দিলে, অনায়াসে এ অভাব বিদূরিত হইতে পারে। গুরুদাসবাবুর ন্যায় প্রকাশক মনে করিলেই অর্দ্ধেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। *

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তোফী।

প্রায়শ্চিত্ত।

১

পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলা ও আজিকার বাঙ্গলা, এ উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। বাঙ্গালী-জীবনও এখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। "না জাগিলে যত

* সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

ভারতললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না"—এই মর্ম্মের গান তখন পথে ঘাটে শুনিতে পাইতাম। এক দিকে ব্রাহ্মসমাজের যেমন উৎসাহ, অন্য দিকে গীতাও তেমনই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তখনও ইংরাজের অনুকরণের মোহ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইংরাজীশিক্ষিত ডেপুটী হরিশচন্দ্র সান্যাল যে Mr. Horace C. Sandell নামগ্রহণ পূর্ব্বক হ্যাট কোট ও টাই কলারের সম্মানরক্ষা করিতেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ ছিল না। হোরেস্ স্যাণ্ডেল সাহেবকে যাহারা নামে মাত্র জানিত, তাহারা তাঁহাকে জল-বৃষেরই বংশাবতংশ বলিয়া মনে করিত। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিল, ডেপুটী সাহেবের বর্ণ ও বাক্য হইতে তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তিনি 'নেটিভ' ক্রিশ্চিয়ান।

ডেপুটী সাহেব কখনও শ্বেতদ্বীপে পদার্পণ না করিলেও তাঁহার সাহেবিয়ানার ত্রুটী এ দেশের সাধারণ সাহেব বা বাঙ্গালীর চক্ষে ধরা পড়িত না। আসল সাহেবিয়ানার লক্ষণ কি, তাহা তাঁহার জুরিসডিক্সনের জমীদার হইতে পেয়াদা পর্য্যন্ত জানিত না, এবং তিনি যে সকল সাহেবের সহিত আত্মীয়তাস্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, তাহারাও আবশ্যক হইলে পৃষ্ঠে জয়ঢাক তুলিয়া লইতে পারিত।

তিনি বাড়ীতে, সার্কিট-হাউসে বা তাম্বুর মধ্যে যে পরিমাণ সাহেবিয়ানা করিতেন, তাহার সহিত সাধারণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহার সে সাহেবিয়ানায় খানসামা ও আরদালীর দলই সময়ে সময়ে বিপন্ন হইত। কিন্তু তিনি আদালতে যে আঠারআনা সাহেবিয়ানা করিতেন, তাহাতে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের গল্পই মনে পড়িত। তিনি সাক্ষীর জবানবন্দী-গ্রহণের সময় ইংরাজীতে প্রশ্ন করিতেন; পেস্কার সেই প্রশ্নের বঙ্গানুবাদ সাক্ষীর কর্ণগোচর করিত; আবার সাক্ষী যাহা বলিত, তাহা হাকিম বাহাদুরকে ইংরাজী করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইত; নতুবা তিনি সাক্ষীর কথা বুঝিতে পারিতেন না!—বাঙ্গালী খৃষ্টানেরা ত বঙ্গভাষায় এমন অনভিজ্ঞ হয় না; তবে তিনি বাঙ্গলাটা এমন করিয়া ভুলিবার সুবিধা কোথায় পাইলেন? ইহার উত্তরে স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের মোক্তার ভজহরি ভৌমিক বলিয়াছিলেন, ডেপুটী সাহেব বাল্যকালে গাধার দুধ খাইয়া মানুষ হইয়াছিলেন, মাতৃস্তন্যের আস্বাদন কখনও তিনি পান নাই। যাহা হউক, সাহেবিয়ানার উপসর্গগুলি কখনও হাকিম বাহাদুরের ধৈর্য্য নষ্ট করিয়াছে,—এরূপ শুনি নাই।

নিজের অন্তঃপুরেও তিনি সমাজসংস্কারের দীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারই প্রখরালোকে ডেপুটী-গৃহিণী শাড়ী ও মল ফেলিয়া গাউন ও জুতা বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চি চিরকালই দৃঢ় হইয়া থাকে। ডেপুটী বাবুর একমাত্র আদরিণী দুহিতা সুমতি ওরফে সোফী, বিবিয়ানার পিতা মাতাকেও পরাস্ত করিয়াছিল। সহিস, কোচম্যান, আর্দ্দলী, বেহারা, সকলের কাছেই সে "মিস্ বাবা।" টেবিলে না বসিলে সোফীর আহার হইত না, কাঁটা চাম্‌চে ভিন্ন মুখের গ্রাস মুখে যাইত না; রেলের গাড়ীর গার্ডোয়ান ও নীল-কুঠীর প্রহরী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সাহেব-ললনাদিগের আদর্শে সোফী এমন মেম বনিয়া গিয়াছিল যে, সে মনে করিত, সাবান ঘসিয়া পোড়া রংটাকে যদি কোনও রকমে বদলাইতে পারে, তাহা হইলে কোনও ইংরাজী উপন্যাসের নায়িকার মত প্রেমের অভিনয়ে কত নীল-কুঠীর সাহেবদের টুপিসমেত মাথাগুলা ঘুরাইয়া দিতে পারিবে।

২

বাঙ্গালীর মেয়ে হাজার মেম সাজুক, আর শুইয়া বসিয়া নবেল পড়িয়া দিন কাটাক, যৌবন তাহার দেহে আপনার আধিপত্যের চিহ্ন রাখিয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। মিস্ সোফী যখন সতের বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল, তখন একদিন সান্যাল-গৃহিণীর হৃদয়ে বাঙ্গালিনীসুলভ চাঞ্চল্যের উদয় হইল। তিনি কিঞ্চিৎ অনুযোগের স্বরে ঝঙ্কার দিয়া ডেপুটী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখতে দেখতে মেয়েটি কলাগাছের মত বেড়ে উঠেছে, ওর বিয়ের কি করচো?" স্যাণ্ডেল সাহেব সে সময় একটি গরু চুরীর মামলার রায়ে নিজের বিদ্যাপ্রকাশের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি গৃহিণীর ঝঙ্কারে তাঁহাকে গরুচোর অপেক্ষাও অধিক নিশ্রভ হইয়া পড়িতে হইল।

তাহার পরই সোফীর বিবাহের জন্য বরের সন্ধান আরম্ভ হইল। ডেপুটী বাবু অনেক চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বি. এল্. ও পাঁচটি এম্. এ. বর সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু সোফী একে একে সকলকেই নামঞ্জুর করিল। সে তাহার মায়ের সঙ্গে তর্ক করিতে বসিল,—একটি বি. এল্. তিন বৎসর আদালতে গর্দ্দভের রোঁয়া বহিয়া বিশেষ সুকৃতি থাকে ত মুন্সেফী লাভ করিতে পারে; একটি এম্. এর মূল্য এক শত টাকা, (এখন অনেক কম) এ অবস্থায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীমাত্রসম্বলবিশিষ্ট কোনও 'ইয়ংম্যান'কে তাহার জীবনের 'পার্টনার' করিতে পারে না। ইহাতে তাহার লাইফ্‌টাই 'ব্লাষ্টেড্' হইয়া যাইবে।—যথাকালে এ কথা ডেপুটী সাহেবের কর্ণগোচর হইল।

তখন অগত্যা ব্যারিষ্টারের দিকে স্যাণ্ডেল সাহেবকে দৃষ্টিপাত করিতে হইল। কলিকাতার হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী নামক মানস সরোবরের সহিত তাঁহার ন্যায় মফস্বলবাসী ক্ষুদ্র ডেপুটীর কোনও পরিচয় ছিল না। তিনি সে টক্ আঙ্গুরের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আদালতে মামলা করিবার জন্য কোনও কোনও ধনবান মক্কেল দুই এক জন জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের আমদানী করিত। সেই জুনিয়ার যদি 'ব্যাচিলার' হইতেন, তাহা হইলে স্যাণ্ডেল সাহেব তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ত্রী কন্যার সহিত তাঁহার পরিচয় না করাইয়া ছাড়িতেন না। বাবুর্চিদের কাজ অনেক বাড়িয়া যাইত, এবং মুসলমানপল্লীতে মুরগী ও আণ্ডা দুর্লভ হইয়া উঠিত। কিন্তু ডেপুটী সাহেবের অর্থব্যয় ভিন্ন তাহাতে আর কিছু ফল হইত না। তাঁহারা সোফীর সহিত শিষ্টাচারসুলভ করমর্দ্দন করিয়াই আতিথ্যের সম্মানরক্ষা করিতেন।

অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া মিঃ স্যাণ্ডেল এক বৎসরের ফার্লো গ্রহণ করিয়া কিছু দিনের জন্য কলিকাতার বাসেন্দা হইয়া বসিলেন। বিলাতফেরত যুবকদের সঙ্গে যে সকল ক্লবের অধিক ঘনিষ্ঠতা, সেই সকল ক্লবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন; বিলাতফেরতদের সঙ্গে বন্ধুতাস্থাপন করিয়া অনেককে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেও ত্রুটী করিলেন না। এই উপলক্ষে তাঁহার এক মাসের বেতন দশ দিনে খরচ হইতে লাগিল। কিন্তু বৃথা ব্যয়! বিলাতফেরত সিভিলিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার, বা ডাক্তার দূরের কথা, প্রোফেসারের মত নিরীহ প্রাণীরাও মিস্ সোফীর আইবুড়ো নাম ঘুচাইতে অগ্রসর হইলেন না। দুই একটি ব্রিফ্ শূন্য ব্যারিষ্টার ও রোগিশূন্য ডাক্তারকে তিনি একটু প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা চক্ষুলজ্জায় হাঁ না কোনও জবাবই দেন নাই; শেষে বাধ্য হইয়া বন্ধুমুখে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার মেয়েটি বর্ণে ও সামাজিক শিষ্টাচারে ভদ্রসমাজে অচল। হতাশ হইয়া মিঃ স্যাণ্ডেলের ক্রোধ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

এক বৎসরের ফার্লো শীতকালের বেলার মত দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল।

অবশেষে ডেপুটী সাহেবের মাথায় একটি নূতন ফন্দি গজাইল। তিনি বুঝিলেন, তৈয়ারী ব্যারিষ্টার পাওয়া কঠিন, অতএব ব্যারিষ্টার তৈয়ারী করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। তিনি ষ্টেট্‌সম্যান ও ডেলি নিউসে বিজ্ঞাপন দিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনও উচ্চশিক্ষিত যুবক তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, তাহাকে তিনি ব্যারিষ্টারী শিখিবার জন্য নিজব্যয়ে বিলাতে পাঠাইবেন। বিজ্ঞাপনটি তিনি নিজের নামে প্রকাশ করিলেন না, A. B. C. C/o Manager এই ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে, বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত ছিল।

এইবার ডেপুটী সাহেব আশানুরূপ ফল লাভ করিলেন। বেকার গ্রাজুয়েটগণ দলে দলে দরখাস্ত পাঠাইতে লাগিল। সোফী স্বয়ং স্বামিনির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করিল। অনেকেই উমেদার-বেশে ডেপুটী সাহেবের গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমান্ অখিলভূষণ বাগ্‌চী এম্. এ.র ভাগ্য প্রসন্ন হইল; অনেক দেখিয়া শুনিয়া সোফী তাঁহাকেই স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মত হইল।

বিবাহটা হিন্দু মতে হইল, কি ব্রাহ্ম মতে হইল, বলিতে পারি না। অখিলভূষণের সঙ্গে মিস্ সোফী অর্থাৎ কুমারী সুমতির বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ হইল বটে, কিন্তু মিলন হইল না। মিসেস্ বাগ্‌চী তাঁহার এম্. এ. স্বামীকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সামাজিক হিসাবে তিনি মিসেস্ বাগ্‌চী নাম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বামী ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে না। মিঃ বাগ্‌চী এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ না করিয়া এক পক্ষের মধ্যেই ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। মিঃ স্যাণ্ডেল কর্ম্মস্থান যশোহরে যাত্রা করিলেন। বিবাহটা কলিকাতাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

৩

এমন গোরার মত মেজাজের ধর্ম্মপত্নীলাভ ভাগ্যে আছে, শ্রীমান অখিলভূষণ তাহা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই; পারিলে হয় ত এ বিবাহে তিনি সম্মত হইতেন না। তিনি দেখিয়াছিলেন, মেয়েটি একটু কালো, কিন্তু দশ হাজার টাকা মূল্যে এমন কালো মেয়ে ক্রয় করা খুব ঠকা নয়। কিন্তু সেই কালো মেয়ে যে শেষে তাঁহার সঙ্গে দাম্পত্য সম্বন্ধ পর্য্যন্তই অস্বীকার করিয়া বসিবে, ইহা কে জানিত? অখিলভূষণের নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, ঢাকা জেলায়; সুতরাং তিনি এ অপমান সহজে ভুলিতে পারিলেন না; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথা কাহাকেও জানিতে দিলেন না।

জাহাজে পা দিয়াই অখিলভূষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি এ অপমানের প্রতিশোধ দিবেন। কিরূপে যে প্রতিশোধ দিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। তখন মন একটু প্রসন্ন হইল।

বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য খরচের অভাব হইল না, ডেপুটী সাহেব নিয়মিতরূপে মাসে মাসে তাঁহাকে আড়াই শত টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। অখিলভূষণ আন্তরিক যত্নের সহিত আইনশাস্ত্রের অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিলেন।

সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে অখিলভূষণ ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া স্ত্রীকে দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে সোফী তাঁহাকে জানাইয়াছিল,

তাহার পিতা তাঁহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন; এখন তাহার মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার পূর্ব্বে সে তাঁহার নিকট হইতে প্রেমপত্র পাইবার জন্য উৎসুক নহে। অখিলভূষণ যথাসময়ে সেই পত্র পাইলেন। তিনি পত্রখানি সযত্নে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিলেন; সে পত্রের উত্তর লিখিলেন না। সোফীও তাঁহাকে আর পত্র লিখিল না। ডেপুটী সাহেব মাসান্তে একখানি পত্রে সংক্ষেপে তাঁহার পারিবারিক কুশলবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেন।

দুই বৎসর পরে মিঃ বাগ্‌চী বিশেষ প্রশংসার সহিত ব্যারিষ্টারীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ভারতীয় সংবাদপত্রে পরীক্ষাফল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি শ্বশুরকে তার করিয়া সে সংবাদ জানাইলেন; এবং দেশে ফিরিবার খরচ চাহিয়া পাঠাইলেন। মিঃ স্যাণ্ডেল সেইদিনই টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

পরের মেলে সোফীর এক পত্র বাগ্‌চী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। তখন তিনি ইংলণ্ড হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিতেছেন। অখিলভূষণ হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিলেন, সোফীর পত্র। পত্রপ্রাপ্তি তিনি দুই-চারিবার উল্টাইয়া দেখিলেন, তাহার পর খামের উপর লাল কালি দিয়া মোটা হরফে লিখিলেন, "Refused—A. Buckchie" কলিকাতার ডেড্ লেটার আফিসের চৌকা মোহর ঘাড়ে লইয়া পত্রখানি যখন সোফীর নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন সে একবার কল্পনাও করিতে পারিল না, তাহার সুদীর্ঘ প্রেমপত্রের এমন শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে। যাহা হউক, ডেড্ লেটার আফিসের বাদামী রঙ্গের লেফাফাখানি ছিঁড়িতেই সোফী তাহার বাঁকা বাঁকা অক্ষরে ভূষিত অখিলভূষণের নিরোনামাঙ্কিত পত্রখানি বাহির হইয়া পড়িল। সোফী মনে করিল, এ পত্র বিলাতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অখিলভূষণ স্বদেশ-যাত্রা করিয়াছেন, তাই পত্র তাঁহার হস্তগত হয় নাই। কিন্তু সে ভ্রম অধিক কাল স্থায়ী হইল না; পত্রের উপরে লাল কালিতে মোটা মোটা অক্ষরে "Refused" ও তাহার নীচে A. Buckchie নাম স্বাক্ষর দেখিয়াই সোফীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। অখিলভূষণের নামের সেই সাহেবী-মার্কাধারী সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি যেন এক সারি দাঁত বাহির করিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

সোফী পত্রখানি হাতে লইয়া স্খলিতপদে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পদতলে পৃথিবী ঘুরিতেছিল; চক্ষুর সম্মুখে জগতের আলো নিবিয়া গিয়াছিল।

সোফী পত্রখানি বিছানার উপর ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে বাতায়নপথে চাহিয়া থাকিল। সোফীর পিতা তখন সবডিবিজনের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী হাকিম। নদীতীরে বাঁধের উপরেই সবডিবিজান অফিসারের বাঙ্গলো। সে দিন শারদীয় সপ্তমীর প্রভাত, পীত রৌদ্র নদীজলে পড়িয়া তরঙ্গের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে; নদীতীরস্থ পথ দিয়া কত পুরুষ ও রমণী গল্প করিতে করিতে হাটে যাইতেছে; প্রবাসী বিদেশ হইতে আশাপূর্ণহৃদয়ে নৌকাযোগে গৃহে ফিরিতেছেন; গোলব কুসুমদলে সমাচ্ছন্ন একটা শিরীষ গাছের ডালে বসিয়া কতকগুলি পাখী বিচিত্র কলধ্বনি করিতেছে; আর দূরে পূজাবাড়ীতে ঢাকের শব্দে এক একবার উৎসবের বার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু কোনও দিকে সোফীর দৃষ্টি নাই; কোনও শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যে সকল চিত্তবিমোহিনী আশার কুসুমে সে তাহার বিশ বৎসরের অপরিতৃপ্ত যৌবনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনাগত সুখের মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়াছিল, অদৃষ্টদেবতার এক নিশ্বাসে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে।

৪

দুই তিন মাসের মধ্যে ব্যারিষ্টার অখিলভূষণের কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। ডেপুটী সাহেব বড় চিন্তিত হইলেন। লণ্ডনপ্রবাসী দুই তিন জন আইনপরীক্ষার্থী বাঙ্গালী যুবকের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, অখিলভূষণের সংবাদ পাঠাইবার জন্য তাহাদিগকে Prepaid টেলিগ্রাফ করিলেন। যথাসময়ে উত্তর আসিল, অখিলভূষণ দুই মাস হইল লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছেন; যদি তিনি দেশে না ফিরিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতেছেন। কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণে তাঁহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহারের সম্ভাবনায় মিঃ স্যাণ্ডেল বড় ক্ষুণ্ণ ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে একদিন ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের একটি স্তম্ভে পাঠ করিলেন, তিন দিন পূর্ব্বে অখিলভূষণ বাগ্‌চী নামক একটি যুবক মার্শেলিস্ হইতে 'মিসিল' জাহাজে চড়িয়া বোম্বে নগরে অবতরণ করিয়াছেন। এই সংবাদপাঠে ডেপুটী সাহেব অনেকপরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কৃতবিদ্য জামাতার অভ্যর্থনা করিবার জন্য বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে স্ত্রী কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন।

কিন্তু কলিকাতা রূপ সমুদ্র হইতে অখিলভূষণ নামক রত্নটি বাছিয়া বাহির করা সহজ নহে। অখিলের একটি আত্মীয় চাঁপাতলায় একটা মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িতেন, ডেপুটী সাহেব হ্যাটকোটে সজ্জিত হইয়া সেই মেসে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে শুনিতে পাইলেন, পূর্ব্বদিন প্রভাতে বোম্বে মেলে অখিলভূষণ কলিকাতায় পঁহুছিয়াছিলেন, এবং সেই মেসেই আহারাদি শেষ করিয়া সেই রাত্রেই গোয়ালন্দ মেলে ঢাকায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দাদা বিনয়ভূষণ বাবু ঢাকার কালেক্টরের অধীনে কেরাণীগিরি করিতেন।

ডেপুটী শ্বশুরের কর্ম্মস্থানে না গিয়া অখিলভূষণ ঢাকায় তাহার সহোদরের সঙ্গে আগে দেখা করিতে চলিয়াছে শুনিয়া ডেপুটী সাহেবের সর্ব্বাঙ্গে যেন কে সবলে বেত্রাঘাত করিল। জামাতার অকৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিবিড়শ্মশ্রুশোভিত কৃষ্ণবর্ণ মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। এ মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ভ্রমে পড়িয়া গত তিন বৎসরে সাড়ে দশ হাজার টাকা জলে ফেলিয়াছেন। কতদিনের উপার্জ্জনে তিনি সে টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, এবং টাকাগুলি এ ভাবে অপব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা কোম্পানীর কাগজ কিনিলে বাৎসরিক কি পরিমাণ সুদ তাঁহার পকেটে আসিত, তাহা সহসা তাঁহার মস্তিষ্কে সমুদিত হওয়ায়, তিনি দুর্ভাগিনী কন্যার কষ্টের কথাও বিস্মৃত হইলেন।

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ে মর্ম্মাহত হইয়া নববর্ষদিবসে ডেপুটী সাহেব কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। পত্নী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই কোথা?", তখন তাঁহার সুবিপুল ডেপুটী-গর্ব্ব একেবারে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জামাই বোম্বাই হইতে আজও কলিকাতায় পৌঁছেন নাই।" সোফীর মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

৫

ঢাকা বিভাগে ডেপুটী সাহেব অনেকদিন হাকিমী করিয়াছেন। ঢাকায় কালেক্টরীতে অনেকের সঙ্গেই তাঁহার আনাগুনা ছিল। একটি বন্ধুকে অখিলভূষণের গতিবিধির বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি একখানি পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের উত্তরে তিনি যে সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কে পিনাল কোডের সকল ধারা একত্র জমাট বাঁধিয়া গেল। তিনি জানিতে পারিলেন, অখিলভূষণ নাগরী তাঁহার দাদার গৃহে ফিরিয়া হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তিনি চটিজুতা পরেন, এবং সর্ব্বাঙ্গে হ্যাটকোট চড়াইয়া বসিয়া থাকেন না। বিলাতফেরতের এমন শোচনীয় অধঃপতনবার্ত্তা পূর্ব্বে কখনও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই, সুতরাং অখিলভূষণের প্রকৃতিস্থতায় তিনি অত্যন্ত সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি যখন শুনিলেন, অখিলভূষণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে

সম্মত আছেন, এবং তাঁহার দাদা সুন্দরী কন্যার সন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন তিনি প্রায়শ্চিত্তপ্রথার ও চটিজুতার উপর হাড়ে চটিলেন; কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ দেখিতে পাইলেন না।

সেইদিন ডেপুটী সাহেব অখিলভূষণের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। বাঙ্গালা ভাষায় পত্রখানি লিখিত হইলেও ডেপুটী সাহেব তাহা পড়িবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি পাঠ করিলেন,—

"শ্রীচরণেষু,

"সবিনয় নিবেদন,—

"শাস্ত্রানুসারে আপনি আমাকে কন্যাসম্প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং সামাজিক হিসাবে আপনি আমার শ্বশুর, আমার পূজনীয় ব্যক্তি; সেই জন্য আপনাকে দেশীয় প্রথা অনুসারে শ্রীচরণেষু পাঠ লিখিয়া যদি পাশ্চাত্যসভ্যতাসুলভ শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি আমার সে ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। আপনার অনুগ্রহেই আপনার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সাহায্যে আমি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছি, এ জন্য আমি আপনার নিকট চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

"কিন্তু আমার ব্যবহার আপনার নিকট কিছু অকৃতজ্ঞের ন্যায় বোধ হইবে থাকিবে, সেই জন্য আমার একটা কৈফিয়ত দেওয়া উচিত; আমার কথাগুলি শুনিলে আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।

"আপনি যখন আপনার কন্যার বিবাহের বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত করেন, সে সময়ে যদি আপনি বিজ্ঞাপনে এ কথাও লিখিতেন যে, আপনার নির্দ্ধারিত জানাতা ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আপনার কন্যার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না, তাহা হইলে আপনার বিজ্ঞাপিত প্রলোভন সত্ত্বেও বোধ করি কোনও ভদ্রসন্তানই আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইত না। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে আমি সে কথা জানিতে না পারিলেও, বিবাহের পর সেই রাত্রেই তাহা জানিতে পারিয়াছি;—আপনার সুশিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না তেজস্বিনী কন্যা আমাকে স্পষ্টাক্ষরে এ কথা জানাইয়াছেন। তখন ফিরিবার পথ ছিল না।

"ফিরিবার পথ থাকিলে হয় ত ফিরিতাম। দাদার অনুমতি না লইয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণের অজ্ঞাতসারে গোপনে আপনার কন্যাকে যে বিবাহ করিয়াছিলাম, সে কেবল বিলাতে যাইবার প্রলোভনে। দরিদ্রের সন্তান আমি, আমার

সেই আশা পূর্ণ হইবার আর কোনও উপায়ই ছিল না। উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়েই টাকা লইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছিলাম; তাহাই যথেষ্ট আত্মাবমাননা, তাহার উপর আপনার কন্যা-কৃত এই অপমান;—সকল দিক চাহিয়া আমি নীরবে এ অপমান সহ্য করিয়াছি।

"এ অপমান সহ্য করিয়াছিলাম বলিয়াই ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া আপনার কন্যাকে দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। যাহাকে আমি শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিয়াছি, তাহার বুদ্ধির কোনও ত্রুটী থাকিলে উদারভাবে তাহা মার্জ্জনা করিয়া ভবিষ্যৎজীবনের সুখের পথ একটু প্রশস্ত করিবার আগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। স্নেহে ও প্রেমে, কোমলতায় ও সহানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ করিবার চেষ্টা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া আমার মনে হয় নাই। কিন্তু আপনার কন্যা আমাকে আমার পত্র পাইয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, আজ প্রায় তিন বৎসর তাহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। সে পত্র আজ আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনার কন্যার শিক্ষা ও শিষ্টাচারের এই নিদর্শনটি নানা কারণে আপনার নিকট পাঠাইতে সঙ্কুচিত হইলাম না। আমার বয়স হইয়াছে, লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছি, কিন্তু আমার প্রধান অপরাধ, আমি দরিদ্র। আমার এই দরিদ্রতার প্রতি ভাগ্যবানের দুহিতার এইরূপ মর্ম্মান্তিক উপহাস আমি নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিব, এতখানি উদারতা আমার নাই।

"আপনি আমার বিলাত-প্রবাসের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে কয়েক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, আমি তাহার কড়া ক্রান্তির হিসাব রাখিয়াছি। আমি যত শীঘ্র পারি, এই টাকা বার্ষিক শতকরা চারি-টাকা হারে সুদসমেত পরিশোধ করিব।—এই সঙ্গে যথারীতি হাণ্ডনোট পাঠাইলাম। আপনার ঋণপরিশোধের জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

"শাস্ত্রানুসারে আপনার কন্যা আমার পরিত্যজ্যা নহেন; আমি তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দায়ী। যদি তিনি আমার গৃহে আসিয়া হিন্দুমহিলার মত থাকিতে সম্মত হন, হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক নীতির লঙ্ঘন না করেন, তাহা হইলে আমি প্রসন্নমনে আমাদের দরিদ্রকুটীরের এক অংশে তাঁহাকে স্থানদান করিতে সম্মত আছি। আর যদি তিনি দরিদ্রের ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতে অসম্মত হন, বা তাঁহার শিক্ষা ও শিষ্টাচারসুলভ রুচির পরিত্যাগে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আমি আমার অবস্থানুসারে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিব।—আমি দরিদ্রের সন্তান—যাহাকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে পারি, সে

আমাকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিবে না, এরূপ কোনও গৃহস্থকন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইব। দাদাও তাহারই আয়োজন করিতেছেন।

"আমি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি; বিলাতী পোষাক ত্যাগ করিয়া দেশী ধুতী চাদর পরিতেছি; বিজাতির ও বিধর্ম্মীর নামের নকল-করা নাম পরিত্যাগ করিয়া পিতা মাতার প্রদত্ত শ্রীঅখিলভূষণ বাগ্‌চী নাম গ্রহণ করিয়াছি। আপনার গাউনপরিহিতা কন্যা সম্ভবতঃ এ সকল সহ্য করিতে পারিবেন না। গরীব গৃহস্থের বধূর মত লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়া পরিজনবর্গের সেবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত থাকিলে, আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি নাই,—এ কথা আপনি তাহাকে বলিতে পারেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

"প্রণত

"শ্রীঅখিলভূষণ বাগ্‌চী।"

পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া ডেপুটী সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত করতলে মস্তক-স্থাপন করিয়া কি ভাবিলেন; তাহার পর পোষাক বদলাইয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। একটু অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া আবার ফিরিলেন, এবং আরদালীর হস্তে পত্র দুইখানি দিয়া তাহা সোফীকে প্রদান করিতে বলিলেন।

স্থানীয় পোষ্টআফিসে উপস্থিত হইয়া তিনি টাকায় টেলিগ্রাফ্ করিলেন,—যেন তাঁহার জামাতা এক সপ্তাহ কাল বিবাহ বন্ধ রাখেন।

দুই তিন ঘণ্টা নদীতীরে পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক একটু শীতল হইলে ডেপুটী সাহেব বাঙ্গলোয় ফিরিলেন। ধীরে ধীরে সোফীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘরে একটা হারিকেন-লণ্ঠন মিট্ মিট্ করিতেছে—সোফী বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে; তাহার মাতা বিবন্নভাবে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছেন।

কোনও কথা না বলিয়া ডেপুটী সাহেব একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সোফীর শিয়রে বসিলেন, এবং ধীরে ধীরে সোফীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সোফী সেই স্নেহকরস্পর্শে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ডেপুটী সাহেব করুণার্দ্রস্বরে বলিলেন, "কাঁদিস্ কেন মা? তোর তো কোনও দোষ নাই। যদি কেহ অপরাধী হইয়া থাকে ত সে আমি। তুই এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিস্?" সোফী প্রথমে কোনও উত্তর দিল না। ডেপুটী সাহেব পুনর্ব্বার অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সোফী মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে ঢাকাতেই যাইতে হইবে।"

ডেপুটী বলিলেন,—"তোমাকে মেমসাহেব করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তোমার জন্মকাল হইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালী গৃহস্থকন্যার—গৃহস্থবধূর শিক্ষা তোমাকে দিতে পারি নাই। অখিল যেমন চায়, সে ভাবে চলিতে পারিবে?"

সোফী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

পরদিন প্রভাতে অখিলভূষণের নিকট টেলিগ্রাম গেল,—"আমরা যাইতেছি; তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।"

সুতরাং অখিলভূষণের আর বিবাহ করা হইল না। যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে শ্রীমতী সুমতি দাসী শাঁখা ও শাড়ী পরিয়া সিঁথায় সিঁদুর দিয়া অবগুণ্ঠনবতী হিন্দু-বধূর ন্যায় পাকস্পর্শের ভোজে কুটুম্বগণের পাতে অন্নব্যঞ্জন দিতে লাগিল।

মিঃ হোরাস স্যাণ্ডেল অতঃপর হ্যাট কোট ছাড়িয়া চোগা চাপকান ধরিয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি আর অখাদ্য খান না, এবং মাথায় একটি প্রকাণ্ড টিকি রাখিয়াছেন!

কিন্তু সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মিঃ হোরাস স্যাণ্ডেল পঞ্চদশ-বৎসরের সার্ভিসের পর গবর্মেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—সার্ভিস-লিষ্টে তাঁহার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন নাম বসান হউক—"বাবু হরিশচন্দ্র সান্যাল।"

শ্রীজলধর সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজ ও সামাজিকতা।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশে ও ইউরোপের অধিকৃত প্রায় সকল উপনিবেশে জন্ম ও মৃত্যুর সামঞ্জস্য থাকিতেছে না; অর্থাৎ, যত লোক প্রতিবৎসর দেহত্যাগ করিতেছে, তত শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে না। আবার যত শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহাদের দশ আনা ভাগ অতি শৈশবেই কালকবলিত হইতেছে। সমাজে যাহাদের স্বচ্ছল অবস্থা, তাহারাই সন্ততিবৃদ্ধির বিরোধী; যাহাতে সন্তানোৎপাদন অল্প হয়, অথবা একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়, সে পক্ষে অনেকেরই চেষ্টা। এই কারণে সমাজতত্ত্বজ্ঞ লোকহিতৈষী অনেকেই চিন্তিত হইয়াছেন। এই ভাবে চলিলে, তাঁহাদের আশঙ্কা যে, কালে জাতির লোপ সম্ভব হইতে পারে। সুস্থ সবলকায় নরনারীর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে, জাতির পুষ্টি সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, দারিদ্র্যের ভাবনাও আছে। ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ ব্যক্তিগত বিলাসবৃদ্ধি ও ভোগায়তন দেহের ভোগপুষ্টি। কাজেই লোকসংখ্যার বৃদ্ধি

হইলেই ব্যক্তিগত বিলাসের সঙ্কোচসম্ভাবনা ঘটে। এই সঙ্কোচের ন্যূনাধিক্যে দারিদ্র্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। ফলে, ইউরোপের সুসভ্য নরনারী বংশবৃদ্ধির প্রতি একেবারেই উদাসীন হইয়াছেন। এই ঔদাস্যের জন্য ইউরোপের সকল প্রদেশেই লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে কমিতেছে, সেনাবিভাগে যোগ্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তির অভাব অনুভূত হইতেছে, সেনাসংগ্রহের কার্য্যে বৎসরে বৎসরে নানা বাধা বিঘ্ন ঘটিতেছে। তাই, ইউরোপের সর্ব্বপ্রদেশেই এবং বহু উপনিবেশেই এই বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে।

সম্প্রতি ইউরোপে এই কথা লইয়া চারিখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারিখানি বহি লইয়া খুব আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে।

(১)—Eugenics, paper read before the Sociological Institute by Francis Galton.

(২) The Confessions of a Physician, by V. Veresaeff.

(৩) The Fertility of the Unfit, by W. A. Chapple.

(৪) Unconcious Therapeutics, by Dr. Schoefield.

উপরে ইংরেজীতে চারিখানি বহির নাম প্রদত্ত হইল। লেখক চারি জন ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ও দেহতত্ত্ববিদ্ বলিয়া পরিচিত।

নানা প্রদেশের জনসংখ্যার সংকোচক্রমের হিসাব দেখাইয়া বুঝাইব, কেমন করিয়া প্রতিপ্রতিতে ইউরোপের লোকসংখ্যার হ্রাস হইতেছে।

হাজারকরা জনসংখ্যার হিসাব।

	১৮৭৫।	১৮৯৯।	সঙ্কোচ।	
জর্ম্মনী	৪০	৩৫.৯	৪.১	
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স	৩২	২৬.৩	৫.৭	প্রতি
স্কটলণ্ড	২৬	২২.৯	৩.১	প্রতি
ফ্রান্স	২৬	২১.৯	৪.১	
	১৮৮০।	১৮৯০।		
স্কাণ্ডিনেভিয়া দেশ	৩৬	৩০	৬.০	
		১৯০০।		
নিউজীলণ্ড	৩০.৮	২৫.৬	১৪.৩	
	১৮৮০।	১৯০২।		
কুইন্সলণ্ড	৪৭.৮	২৭.৭	২০.১	
	১৮৮৮	১৯০৩		
এডিলেড	২৭.৭২	২২.২৮	৫.৪৪	

কেবল জনসংখ্যার যদি এমন হ্রাস হইতে থাকিত, তাহা হইলে তেমন ভাবনার কথা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর হার খুব বাড়িয়া যাইতেছে; দুর্ব্বলদেহ, রুগ্ন, প্রমাদগ্রস্ত, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি অপটু

জনের সংখ্যা বাড়িতেছে। সেনাবিভাগের জন্য লোকনির্ব্বাচন করিতে গেলে শতকরা চল্লিশ জন বাদ পড়িতেছে। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোককেই চিন্তিত হইতে হইয়াছে।

এইবার চারিখানি পুস্তকের পরিচয় দিব। উহার চারি জন লেখক চারি-জাতীয়। প্রথম ইংরেজ; ডাক্তার গ্যাল্টন এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ও শারীরতত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসক। দ্বিতীয়, রুসীয়; ডাক্তার ভারসেক ইউয়োপবিখ্যাত চিকিৎসক, এবং নির্ভীক স্বাধীনচেতা পুরুষ; তৃতীয়, নিউজীল্যাণ্ডের ইংরেজ; ডাক্তার চ্যাপ্‌ল্, এনাটমী ও চিকিৎসা শাস্ত্রে দেশপ্রসিদ্ধ। চতুর্থ, মার্কিন দেশের হইলেও, জাতিতে জর্ম্মণ; ডাক্তার শফিল্ড মার্কিণে সর্ব্বজনপ্রশংসিত নিদানবিদ্ ও লক্ষণজ্ঞ বলিয়া পরিচিত।

ডাক্তার গ্যাল্টন বলেন, আমরা গো-অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের বংশবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ যত্নবান, আর মনুষ্যবংশবৃদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন। জীবসৃষ্টি পশু ও মানুষের পক্ষে এক নিয়মে পরিচালিত; কারণ, উহা জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। ফরাসী পণ্ডিত লামার্কের জীবতত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি যদি সর্ব্বজনমান্য হয়, তবে উহা মনুষ্যোৎপত্তি বিষয়ে প্রযোজ্য হইবে না কেন? লামার্কের সিদ্ধান্তানুসারে, তথা ইংরেজ প্যারী নিস্‌বেটের নির্দ্দেশ মত, গো-অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুজাতির পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হইতেছে; মানুষেরও ঠিক সেইভাবে হওয়া উচিত। গ্যাল্টন বলেন যে, মানুষ সামাজিক জীব, জন্মপারম্পর্য্য হিসাবে মানুষের অস্তিত্ব অনাদি বলিলেও চলে; মানুষ চিরজীবী হইয়া থাকিতে চাহে, চিরসুখী হইয়া থাকে। জীবন ও সুখভোগ দেহের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সুসন্তান-উৎপাদন মানুষের প্রধান ধর্ম্ম ও একমাত্র কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে, মানুষ সমাজের দ্বারে দায়ী—ভগবানের দৃষ্টিতেও পাপী। বিবাহ এই কর্ত্তব্যসাধনের প্রশস্ত উপায়। এই বিবাহপদ্ধতি সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া লামার্কের সিদ্ধান্তানুসারে নরনারীকে সম্মিলিত হইতে দিলে, অচিরে মনুষ্যসমাজে সবলকায় লোকের প্রাদুর্ভাব হইবে।

রুসীয় ডাক্তার ভরসেক ও নিউজীল্যাণ্ডের ডাক্তার চ্যাপ্‌ল্ এই দুই জনের প্রায় এক মত। তবে কার্য্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র। ডাক্তার ভরসেক বলেন যে, বিলাসের অতিমাত্র বৃদ্ধিতে সমাজের এমন দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। সুরাপানে ও অসংযত ও অবাধ ব্যবহারে বংশপরম্পরায় কত রকমের উৎকট রোগ যে সমাজদেহে প্রসারিত হইয়া যায়, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। সুরাপানে উন্মাদ, অপস্মার, যক্ষ্মা, দৃষ্টিহীনতা, মন্দাগ্নি, শিরঃপীড়া, যকৃতের দোষ, উদরাময়, প্লীহাবৃদ্ধি ও হৃদরোগ জন্মে। সুরাপায়ীর বংশে হাবা, কালা, বোবা, ক্রোধন, নিত্যশঙ্কিত ও বিহ্বল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অবাধ ও অসংযত সহবাসবিলাসে বিবিধ কুৎসিত রোগ, কুষ্ঠ, উন্মাদ, অন্ধরোগ, যক্ষ্মা, উদরাময়, বিস্ফোটক, দৃষ্টিহীনতা, যকৃত ও প্লীহার বিকার, অনিদ্রা, স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, বাধক, পুংস্বহানি, অন্ধবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। জম্পটের বংশে ন্যুব্জদেহ, খর্ব্বকায়, চিররোগী, দুর্ব্বলচিত্ত, খিত্রী, কুষ্ঠী জন্মিয়া থাকে। ডাক্তার ভারসেফ বলেন, এই সকল রোগগ্রস্ত লোকের সন্ততি সকল অবশ্যই অল্পভোগী, অল্পায়ু হইবে। এই যে অভিমাত্রায় শিশুর মৃত্যু ঘটিতেছে, 'ইন্‌ফ্যান্টাইল্ লীভারে'র প্রকোপ বাড়িয়াছে, ইহার কারণই পিতামাতার অত্যাচার। এই ভাবে যাহারা মরিবার, তাহারা মরিবেই; চিকিৎসায় তাহাদের বাঁচাইয়া রাখা চলিবে না। চিকিৎসক শত চেষ্টা করিলেও, এমন অপূর্ণ বিকৃত মানুষের শ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন না। সৈন্যসংগ্রহ করিবার সময়ে সেনাবিভাগে এখন শতকরা চৌদ্দ জন যোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়। কাজেই বাকি

সুতরাং আপাতঃ অনেককে সমাজের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে। প্রকৃতি দেবীও নিজের অনতিক্রমণীয় ব্যবহারানুসারে অযোগ্যকে বাদ দিতেছেন। যে বিষ সমাজদেহে অনুস্যূত হইয়াছে, তাহা আপনা-আপনি নিঃসৃত না হইলে, মানুষ এখন নিজের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারিবে না। তবে দেহের বল ও গঠনপ্রণালী বুঝিয়া পৈতৃক রোগের অল্পাধিক্যের সামঞ্জস্য বুঝিয়া, নর-নারীকে সম্মিলিত হইতে দিলে, কালে মনুষ্যসমাজ উন্নত হইতে পারে। বিবাহটা খাস 'লভে'র ও লোভের বিষয় না রাখিয়া, উহা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার অধীন করিলে, মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

ডাক্তার চাপ্‌ল্ উল্লিখিত মতের সহিত একমত হইলেও, জাতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এক নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রথমে নারী জাতিকে রক্ষা করিতে হইবে। অযোগ্য, রুগ্ন, বা বিকৃতবুদ্ধি দরিদ্র স্বামীর হস্তে যে নারী পড়িবে, তাহাকে জোর করিয়া বন্ধ্যা করিতে হইবে। তাহার পক্ষে বংশবৃদ্ধি করা সামাজিক হিসাবে মহাপাপ। তিনি একরূপ অস্ত্রচিকিৎসা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন; উহার নাম Tubo-ligature of The Fallopian Tubes. অর্থাৎ. জরায়ু-পুষ্পের বিশোষন; ভবিষ্যতে আর যাহাতে নারী-জরায়ু হইতে জীব-জন্মহেতু জীব-পরাগ (ovum) বাহির হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গবর্মেণ্ট এ ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বে ডাক্তার ভারসেক সুরাপান ও অতিলাম্পট্যপ্রসূত যে সকল রোগের কথা তুলিয়াছেন, সেই সকল রোগ যে সকল নর বা নারীর দেহে আছে, সন্তানোৎপাদন ও গর্ভধারণ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহার উপর যাহারা সহজেই চুরী ডাকাতী প্রভৃতি পাপকার্য্যে রত, যাহারা উপার্জ্জনে অক্ষম ও স্বভাবতঃ অলস ও স্থূলবুদ্ধি, তাহাদিগকেও বাদ দিয়া রাখিতে হইবে।

ডাক্তার শফীল্ড বলেন, এক পক্ষে সমাজে অতি ধনবৃদ্ধি, এবং অন্য পক্ষে অতি দারিদ্র্যই এই ভয়াবহ অবস্থার মূলীভূত কারণ। যাহারা অতি ধনী, তাহারা অতি বিলাসী; সুতরাং তাহারা কর্ত্তব্যভার বর্দ্ধিত করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। যাহারা অতি দরিদ্র, তাহারা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, পেটের দায়ে তাহারা সব করিতে পারে, সব করিয়া থাকে। তাহাদের কর্ত্তব্যও নাই, কর্ত্তব্য-বোধও নাই। তাহারা একরকম সুখে দিনের পর দিন কাটাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করে। যে সমাজে মানুষ কর্ত্তমানে মুগ্ধ, সে সমাজে সমাজিকতা হীন হইয়া পড়িলেই। ধর্ম্মই কেবল মানুষকে ভবিষ্যৎদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারে; ধার্ম্মিক না হইলে আশুতৃপ্তিকর ও পরিণামবিরস বিষয় হেলায় কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। মানুষ এখন প্রবৃত্তির তৃপ্তির দিকেই অধিক মনোযোগী; কেন না, উহাতে আশুতুষ্টিবোধ আছে, সুতরাং মানুষ যতক্ষণ না বর্ত্তমান সুখে উপেক্ষা করিয়া ভাবী ও ভাব্য কর্ত্তব্য ও সুখের প্রয়াসী না হইবে, ততক্ষণ সেই কিছু কর না, এ অধঃপতনের স্রোত কেহই বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। ডাক্তার শফীল্ড হাসিয়া, যেন বিদ্রূপ-ছলে বলিতেছেন,—ইউরোপীয়গণ কি মনে করেন, তাঁহাদের এই বিলাসপ্রধান, নশ্বর সভ্যতা চিরকাল জগতের আদর্শ হইয়া থাকিবে? আর একটাও ওল্‌ট পাল্‌ট হইবে না? তবে একটা উপায় আছে,—মানসশক্তি। মনঃশক্তির বৃদ্ধি করিতে পারিলে আপনা-আপনি সব ঠিক্ হইয়া যাইবে। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব মনঃশক্তিতেই পরিস্ফুট হইয়াছে; নহিলে মানুষ আর পশু এক জীব। মনঃশক্তির প্রভাবে আপনা-আপনি অনেক উৎকট রোগ আরোগ্য হয়, আপনা-আপনি বংশবৃদ্ধি

হয়, বংশরক্ষা হয়। ডাক্তার শর্কীল্ড আরও বলেন যে, পিতৃত্বের (Heredity) হিসাব বুঝিয়া কথা কহিতে হইলে, দুই তিন পুরুষের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিলে চলিবে না। পিতৃত্ব-প্রবাহ অনাদি; উহার ক্রমবিকাশও অনাদি। দ্বিতীয় চার্লসের সময় প্রধিকা নেলগুইন ইংলণ্ডে ছিলেন। চারি শত বৎসর পরে তাঁহারই বংশে ঠিক সেই নেলগুইন আবার জন্মগ্রহণ করিল। সেই চেহারা, সেই প্রকৃতি, সেই হাবভাব,—সবই এক। এই এক ঘটনায় ত পিতৃত্বের বিজ্ঞান তৈয়ারি হয়; কিন্তু এমন অপরিলক্ষিত কত ঘটনা ত আছে! দুই পুরুষ হইতে ইউরোপের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে; পূর্ব্বে ত ভাল ছিল। সেই ভাল অবস্থার বিকাশ সমাজে ত অসম্ভব নহে। মনঃশক্তি এই অতীতগর্ভস্থ অথচ বর্ত্তমানে সংসৃষ্ট মানব-প্রকৃতির নানা ভাবভঙ্গী পুনরুত্থিত করিতে পারে। দৃষ্টান্ত,—বর্ত্তমান গ্রীস ও ইতালী, মিশর ও জাপান। শেষে মার্কিন্ ডাক্তার বলেন, যে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিস্ফোটক, তাহার এক একটা বিস্ফোটক লইয়া স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসা করিলে চলিবে না; সে ক্ষেত্রে যাহাতে শোণিত শুদ্ধ হয়—ভিতর হইতে একটা ক্রিয়া হয়, তাহাই করিতে হইবে। ইচ্ছাশক্তি বা মনঃশক্তি এই আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া।

এই ব্যাপার লইয়া সমগ্র ইউরোপখণ্ডে বিষম বাদ-প্রতিবাদের আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন পরে প্রকৃত সমাজ ও সামাজিকতা কি, তাহা ইউরোপবাসী বুধগণ বুঝিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এ বিষয়ের আলোচনা আমাদের মধ্যেও হওয়া উচিত। কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় ফল আমরাও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

জরাণু।

জরা রোগের—বার্দ্ধক্যেরও একটা 'ব্যাসিলস্' বা 'মাইক্রোব' আছে। এই জীবাণুকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে জরা মনুষ্যদেহকে আর জীর্ণ করিতে পারিবে না, বার্দ্ধক্যপ্রভাবে মনুষ্যদেহ আর স্থবিরতা প্রাপ্ত হইবে না। ফরাসী রাজধানী পারী নগরের পাস্তুর বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেচ্‌নীকফ সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, জীবদেহ তথা মনুষ্যদেহে নানাবিধ জীবাণুর যুদ্ধক্ষেত্র। মনুষ্যদেহে অহরহ একটা সংগ্রাম চলিতেছে। এক প্রকারের মাইক্রোব অন্য প্রকারের ব্যাসিলস্‌কে খাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে,—এ চেষ্টা সামান্য চেষ্টা নহে, প্রাণান্তপণ চেষ্টা। ফ্যাগোসাইট নামক এক প্রকারের কীটাণু আমাদের দেহে নিত্য বিরাজমান; দেহরক্ষার পক্ষে ইহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। বাহিরের নানা প্রকারের জীবাণু দেহে প্রবেশলাভ করিলে; ফ্যাগোসাইট, উহাদের তাড়া করিয়া,—রাঢ়াতুরীর পদ্ধতি-অনুসারে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলে। ফ্যাগোসাইট দেহে আছে বলিয়া আমরা অহরহ রোগাক্রান্ত হই না। কিন্তু এই ফ্যাগোসাইট প্রথমে আমাদের দেহরক্ষার হেতু হইলেও, ইহারাই পরে উহার নাশের কারণ হইয়া উঠে। ফ্যাগোসাইটের দুইটি স্বতন্ত্র জাতি আছে। এক মাইক্রোফেজ, অপর ম্যাক্রোফেজ। ম্যাক্রোফেজ ফ্যাগোসাইটই মানুষকে বার্দ্ধক্যে উপনীত করে। উহাদের প্রকৃতি রাক্ষসসদৃশ; নরদেহে উহাদের আহার্য্য না পাইলে শেষে উহারা নরদেহকেই ভক্ষণ করিতে বসে। প্রথমে মস্তিষ্কের কক্ষগুলিতে উহারা গিয়া আড্ডা করে। উহাদের প্রভাবে স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য ঘটে। তখন উহারা যৌবনমাসর্য্যসূচক সকল পদার্থই আহার করিতে থাকে। ইহাই মনুষ্যদেহে বার্দ্ধক্যের কারণ।

ম্যাক্রোফেজ ত রাক্ষস, কিন্তু মাইক্রোফেজ রক্ষক। মাইক্রোফেজ নরদেহ রক্ষা করিবার সবিশেষ চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলেই মানুষ সহজে বৃদ্ধ হইতে চাহে না, এই চেষ্টার জন্যই মানুষের অহংসা বার্দ্ধক্যবোধ হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি বার্দ্ধক্যের প্রতিকূল। তাহা হইলেই বলিতে হয়, জরারোগ চিকিৎসার অধীন, বা বিনষ্টীভূত অবস্থা। এখন কথা হইতেছে, এই ম্যাক্রোফেজগুলিকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে নরদেহে আর জরার অবস্থান সম্ভব হয় না। অধ্যাপক মহাশয় এই কীটাণুগুলিকে মারিবার উদ্‌যোগে আছেন। যদি উহাদিগকে মারিবার প্রকৃষ্ট উপায় বাহির হয়, তাহা হইলে মানুষ আর বৃদ্ধ হইবে না। প্যারী নগরের পুরুষদিগের মধ্যে এই বিষয় লইয়া অল্পবিস্তর আলোচনা হইতেছে, কিন্তু নারীসমাজে অধ্যাপক মেচনীকফের কথা লইয়া খুব আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। যাহা হউক, শীঘ্রই পাস্তর ইনষ্টিটিউট হইতে মেচনীকফের এই সিদ্ধান্তের আলোচনা হইবে।

সমাজসংস্কার।

মিঃ এস্. এচ্. সুইনী "পব্লিসিটি" রিভিউ" পত্রে ভারতের সমাজসংস্কারচেষ্টার সমালোচনা করিয়াছেন। কোনও বিদেশী ইউরোপীয়কে এমন সকল দিক দেখিয়া—সর্ব্বসামঞ্জস্য করিয়া কথা কহিতে আমরা শুনি নাই। শ্রীযুক্ত সুইনী বলেন, ভারতের হিন্দুদিগের মধ্যে সমাজসংস্কারচেষ্টা এমন মন্থরগতিতে চলিতেছে কেন? হিন্দুদিগের সমাজসংস্কার চারি পাঁচটি কার্য্যে—শেষ হইয়া যায়। বিধবাবিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিভেদের উচ্ছেদ, বাল্যবিবাহবিরোধ ও আন্তর্জাতিক বিবাহ। এই কয়টি ব্যবস্থা অনায়াসে হিন্দুসমাজে চালাইতে পারা যায়। কিন্তু একটা বড় অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা সমাজসংস্কারক, তাঁহারা ইংরেজী প্রেমে সদা প্রমত্ত। তাঁহারা ইংরেজসমাজের সকলই ভাল দেখিয়া থাকেন, এবং ইংরেজসমাজের আদর্শে নিজেদের সমাজ গড়িতে চাহেন। তাঁহাদের এই ইচ্ছা সাধু ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু এই মনোগত ভাব হিন্দু সামাজিকগণের নিকটে প্রকাশ করিলে ফল বিপরীত হয়। সকল জাতিরই একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ববোধ আছে। এই অস্তিত্বজ্ঞানে জাতীয় অহঙ্কারের পুষ্টি হইয়া থাকে। হিন্দু প্রাচীন জাতি; দীর্ঘ অতীতের সুখ দুঃখের স্মৃতি জাতীয়তা-স্পর্দ্ধাকে সুপুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ইংরেজ যেমন নিজের জাতীয় সকল পদ্ধতিকে সুন্দর দেখিয়া থাকেন, হিন্দুও তেমনই নিজের জাতীয় পদ্ধতি মমতার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। সুতরাং ইংরেজের সমাজশৃঙ্খলাকে সুন্দরতম বলিয়া পরিচিত করিলে হিন্দুর জাতীয়স্পর্দ্ধাবুদ্ধিতে একটু আঘাত লাগিবেই। ফলে সমাজসংস্কারকের চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। মিষ্টার সুইনী আরও বলেন যে, হিন্দু যতই কেন ইংরেজী শিখিয়া সভ্য ভব্য হউক না, হিন্দুসমাজ এখনও সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বপ্রকারে ব্রাহ্মণশাসিত। এই ব্রাহ্মণশাসন কেবল ধর্ম্মকর্ম্মে—পারলৌকিক মঙ্গলচেষ্টায় পরিক্ষুট নহে; সংসারের তাবৎ সুখদুঃখজনক কার্য্যেই পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজের বন্ধনপ্রথা অপূর্ব্ব; উহাতে বিষয় ও ধর্ম্মকর্ম্ম পৃথককৃত নহে। বিষয় ও ধর্ম্ম এক পারলৌকিক বন্ধনে বিজড়িত। কাজেই ব্রাহ্মণশাসনকে সহসা কেহ ব্যাহত করিতে পারে না। আরও একটু কথা আছে। হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত অধিকার চুক্তিজাত নহে;—সহজাত। জাতিভেদ এই সহজাত অধিকারের অভিব্যক্তিমাত্র। এই সহজাত অধিকার পিতৃত্বের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। ব্রাহ্মণগৃহে, ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণের অধিকারে অধিকারী হওয়া যায়। যোগ্যতা এই

অগ্নিদ্বারের বিস্তারপক্ষে সহায়তা করে বটে, কিন্তু যথোপযুক্ত উহার তেমন সঙ্কোচ করিতে পারে না। সকল দেশের সকল সমাজে এই সহজাত অধিকারপ্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু হিন্দুসমাজে উহা পদ্ধতীকৃত; তাই অতি দৃঢ় ও বিচ্ছাতিসহাননাপুষ্ট।

এই সব বিষয় ভাবিয়া দেখিয়া শেষে মিষ্টার সুইনী বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে এখন রাজনীতিক সাম্যের আন্দোলন হইতে থাকিলে, পরে আপনা-আপনিই সমাজসংস্কারের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। তিনি সংস্কারকগণকে দেশীয়ভাবাপন্ন ও দেশাচারপরায়ণ দেখিতে চাহেন। তিনি বলেন, হিন্দুর আদর্শেই হিন্দুসমাজের সংস্কার কর্ত্তব্য।

নূতন আবিষ্কার।

মিশর দেশে বট্‌লার প্রমুখ জন কয়েক ইংরেজ ও ফরাসী পণ্ডিত পুরাতন স্তূপ সকল উৎখাত করিয়া অনেক নূতন সামগ্রীর আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম আবিষ্কার,

যীশুর লুপ্ত বাণী।

যীশুখ্রীষ্ট বাইবেলে যে সব কথা কহিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ছাড়া তাঁহার অনেক উপদেশ লুপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ, বর্ত্তমান বাইবেল পুস্তক অসম্পূর্ণ,—পুরাতন বৃহদ্ভার গ্রন্থের ছিন্নাংশমাত্র। মিশর দেশের স্তূপ সকল হইতে পুরাতন ভূর্জ্জপত্রে লিখিত যীশুর যে সকল উপদেশকথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রচলিত বাইবেলের উক্তি সকল হইতে পৃথক ভাবের না হইলেও, উহাতে বেদান্তের মায়াবাদের ছায়া যেন পরিস্ফুট আছে। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বাধারত্ব এবং সৃষ্ট জগতের নশ্বরত্ব এমন ভাবে বলা আছে যে, যাঁহারা ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যার কথা জানেন, তাঁহারা দুই উক্তির সৌসাদৃশ্য বেশ দেখিতে পাইবেন। এই সকল ভূর্জ্জপত্রলিখিত অতি প্রাচীন যীশুবাণী লইয়া বিলাতে ও জর্ম্মণীতে দুইখানি সুন্দর সন্দর্ভপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। জর্ম্মণ লেখক যীশুর হিন্দু দর্শনের অনুগতির কথা প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সচেষ্ট; ইংরেজ লেখক যীশুর স্বাতন্ত্র্য ও সার্ব্বভৌম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যস্ত। এখনও সকল উৎখাত ভূর্জ্জপত্রের সকল বাণীর অনুলিপি বাহির হয় নাই।

দ্বিতীয় আবিষ্কার।

এই খনন-ব্যাপারে আর এক নূতন ব্যাপার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরে গুপ্তজাতীয় এক বৈদ্য ছিলেন; তিনি নরদেহের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দেখা যায়। শোণিতের গতি, হৃৎপিণ্ডের গতি, পরিপাকক্রিয়া, ফুসফুস্ ও ক্লোমের ক্রিয়া প্রভৃতি বহু বিষয়ের তিনি প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-তত্ত্ব আমাদের আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধান্তের অনুকূল। ঔষধপ্রণয়নপদ্ধতি, অস্ত্রচিকিৎসা, রোগের নিদান-বিচার প্রভৃতি চিকিৎসা কার্য্যের সকল ব্যাপারই হিন্দুর চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুযায়ী বলিয়া মনে হয়। যে সকল ভূর্জ্জপত্রলিখিত চিকিৎসাতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অনুমান হয় যে, মিশরের গুপ্ত কবিরাজ হয় আত্রেয় আয়ুর্ব্বেদ আনিতেন, নয় আমাদের আয়ুর্ব্বেদ মিশর হইতে আসিয়াছে। মিশরের এই চিকিৎসক প্রথমকে দেবতুল্য জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে; তাঁহার নামাঙ্কিত পদ্ম একটা মহাদেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে।

যাহা হউক, মিশরের এই উৎখাত ভূর্জ্জপত্রলিখিত সকল বিষয়ের যতই অধিক আলোচনা হইতেছে, ততই ইহা পরিস্ফুট হইতেছে যে, পুরাকালে ভারতের হিন্দুদিগের সহিত মিশরের গুপ্তগণের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। খনন কার্য্য এখনও চলিতেছে; নিত্য নূতন নূতন ভূর্জ্জপত্র পাওয়া যাইতেছে।—খনন কার্য্য শেষ হইলে, তখন যে আমরা কত নূতন কথা জানিতে পারিব, তাহা অনুমান করা যায় না। অতীতের অবগুণ্ঠনে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার এখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

বর্ষা।

হাসিমুখে নাহি হাসি—নয়নে বারি।
আনোদিনী! সেজেছ কি বিষাদ-নারী?
সান্ধ্যস্তী-বসনখানি চাঁদিনীর আঁশ্‌খানি
দূরে ফেলি' নেছ টানি ধূসর শাটী।
অধোমুখী, আঁখিজলে ভিজিছে মাটী।

ভ্রমরীকবরীগুচ্ছ দিয়াছ খুলে;
কণ্ঠে কোকিল-কুহু গেছ কি ভুলে?
বিরাগে বিভলচিত্ত শিখীরে শিখালে নৃত্য,
ফেলে দিলে অঙ্গরাগ কপোল-তুলি,
কদম্ব-কেতকী তাই তরুতে ঝুলি।

নিবিড় কুন্তলে তোর নিবিড় নিশি,
তাইত অশ্রু ঝরিতেছে দিবসনিশি;
তোরি বেদনার বাণী দূর গুড়ু গুড়ু ধ্বনি,
তুমি শিহরিলে নভে বিজরী চমে।—
প্রাবৃট্ তুমি কি—না এ নয়ন ভ্রমে?

এ কি সাজে এলে আজ বসন্তবধূ।
আননে আননি কেন আনোদ-মধু?
কুশকাশভূষা করি' এলে নন্দনের পরী,
কোথা তোর মালাকার মদন-রতি?
ব্যথিতে মরম কেন এ বেশে সতী?

খোল খোল বর্ষাসাজ লো যাদুকরী,
অশোক-কোটান দুটি চরণে ধরি।
বসন্তবধূর বেশে, এস-তুমি হেসে হেসে,
এ ঘোর বরষা যাক্ পলকে টুটি,—
অন্তরে বাহিরে থাক্ বসন্ত ফুটি'।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী।—আষাঢ়। "আমার কাচনির্ম্মাণশিক্ষা" উল্লেখযোগ্য। "মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত বাগ্‌লে খ্রি. অ. গত ১৮৯৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কাচের কাজ শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। তিনি সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া কলিকাতার সন্নিকটস্থ টিটাগড়ে কাচের কারখানা খুলিবার প্রস্তাব করিতেছেন। তিনি যেরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সহিত সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাচ-নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার নিজ মুখে তাহা তত্ত্ববরণী উপন্যাসের

স্থায় কৌতূহলপ্রদ।" "ভারতী"-সম্পাদিকা সেই বিবরণ প্রবন্ধে পরিণত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ওয়াগ্‌লে উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ, প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রেও ওয়াগ্‌লের এই অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "মহর্ষির জন্মোৎসব" পারিবারিক সম্পত্তি। পিতৃভক্ত পুত্রের ভাবোচ্ছ্বাস সমালোচনায় তোলে ওজন করিবার নহে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "বেদান্ত" নামক ক্ষুদ্র দার্শনিক প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভাষার ইঙ্গিত" নামক প্রবন্ধটি ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "শূন্যবাদ" নামক প্রবন্ধে বৌদ্ধদর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাকরণ" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—"ধনী ব্যক্তির সুসজ্জিত গৃহের পরিষ্কার কক্ষে ধূলিমাখা পা লইয়া কোন ইতর ব্যক্তি প্রবেশ করিলে সভ্যগণ যেরূপ বিরক্ত ও বিস্মিত হন, অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চলিত বাঙ্গলা ভাষার কোন রূপ প্রশ্রয় দেখিলে তেমনই চমৎকৃত ও বিরক্ত হইয়া উঠেন, এ ক্ষেত্রে [রবীন্দ্র-বাবুর 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধ-পাঠের আসরে] কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকরণের সাপক্ষতা করিতে যাওয়া নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল।" ইহাই কি চলিত বাঙ্গলার নমুনা? "ভাষার প্রশ্রয় দেখিলে" ব্যাপারটা কি? "সাপক্ষতা" কি চলিত বাঙ্গলার দেবোত্তর, না দীনেশ বাবুর মৌরসী? স্বীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবু যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রসঙ্গ না তুলিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষসমর্থন অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারিত। সুতরাং বলিতে হইতেছে,—"বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষসমর্থন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক" না হউক, নিতান্ত অক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছিল। দীনেশ বাবুর এই ওকালতী দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আশা করি, অতঃপর রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা-সভায় দীনেশ বাবু আর কাহাকেও প্রতিবাদ-রূপ অপ্রাসঙ্গিক অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে দিবেন না। দীনেশ বাবু যে ভাষায় প্রবন্ধটির রচনা করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, ঔষধ দিবার স্থান নাই। সাহিত্যের দরবারে এমন অপরূপ অপভাষার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সঙ্কোচ হয় না, তাঁহারাও যখন ভাষার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 'অশ্রুজলৈর্ধৌতনমভিবিঞ্চন্' রোদন করিতে থাকেন, তখন বিষ্ণু শর্ম্মার কুলীরকের অশ্রুজল মনে পড়ে। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে "বাঙ্গলা ভাষার স্বাধীন উদ্দাম গতি" নামক একটি অভূতপূর্ব্ব পদার্থের উল্লেখ দেখিলাম। দীনেশ বাবুর রচনাতেই এই "স্বাধীন উদ্দাম গতি"র সন্ধান ও পরিচয় পাইয়াছি, এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্গদর্শন। প্রথমেই সম্পাদকের "নৌকা ডুবি।" তাহার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।" ওকাকুরার গ্রন্থে যাহা সূত্রাকারে বিদ্যমান, অক্ষয় বাবু তাহাই কেনাইয়া সুবিস্তৃত প্রবন্ধে পরিণত করিয়াছেন। তদতিরিক্ত কোনও নূতন তথ্যের সমাবেশ নাই। আমাদের আশা ছিল, অক্ষয়-বাবুর নিজের অনুসন্ধানের ফল এই প্রবন্ধেই দেখিতে পাইব। সে আশা পূর্ণ হইল না। "প্রার্থনা" প্রবন্ধে লেখক-মানবের 'যথার্থ প্রার্থনা'র সন্ধান করিয়াছেন। এই বিপুল ও জটিল বচন-গহনের মধ্যে 'যথার্থ-প্রার্থনা'র লক্ষণ খুঁজিয়া পাইলাম না। শিরোবেষ্টন-পূর্ব্বক লেখক অনেকবার নাসিকা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহার ফলে হেঁয়ালিটি ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, এবং বক্তব্য বিষয়টি বিশদ না হইয়া ভাষার ঘূর্ণাবর্ত্তে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব

উপাধ্যায় "বেদান্তের প্রথম কথা"র অবতারণা করিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান,—বেদান্ত-ব্যবসায়ী সার্ব্বভৌমিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এইবার বেদান্তবাগীশ মহাশয় বঙ্গদর্শনে "খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম কথা"র সূত্রপাত করুন। "সাময়িক প্রসঙ্গ—য়ুনিভার্সিটি বিল" প্রবন্ধে অপর্য্যাপ্ত হতাশের আক্ষেপ আছে। আপাততঃ আমরাই য়ুনিভার্সিটি গড়িয়া তুলিব, এবং সেই য়ুনিভার্সিটি গবর্মেণ্টের মার্কামারা য়ুনিভার্সিটির স্থান গ্রহণ করিবে, ইহা কবির স্বপ্ন। প্রবন্ধটি ভাবের স্রোতে ভাসমান,—ইহাতে উক্তির সমর্থনে যুক্তির বদলে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং অতিরিক্ত বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

প্রবাসী। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের রচিত "কৃষ্ণলীলা"র অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সকল সিদ্ধান্ত প্রত্নবিৎসমাজে পরিগৃহীত না হউক, তাঁহার সত্যনির্দ্ধারণচেষ্টা প্রশংসার্হ। লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত,—"পৌরাণিকযুগে যখন আর্য্য-অনার্য্য মিশ্রণের প্রয়োজন হইয়াছিল, নিম্নস্তরের ধর্ম্ম উচ্চস্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তখনই শ্রীকৃষ্ণ দেবতাবর্গে স্থানলাভ করিয়াছিলেন।" প্রমাণ কি? লেখক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিপুল প্রতিপাদ্যের অবতারণা করিয়াছেন, এই জন্য অনেক স্থলে কেবলমাত্র সামান্য ইঙ্গিত করিয়াই তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ইঙ্গিতের ভিত্তির উপর এমন গুরুতর সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আশা করি, এ বিষয়ের পর্য্যাপ্ত প্রমাণসংগ্রহে তিনি কার্পণ্য করিবেন না। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য,—শাস্ত্রের ন্যায় সুপথ্য। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "পূর্ব্ববাঙ্গালায় সাসস্থপথা" উল্লেখযোগ্য। "অনভ্য জাতির পুরোহিত" চলননই। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের রচিত "তিব্বতে ছদ্মবেশী নিকলস্ সাহেব" নামক প্রবন্ধটি লিপিকৌশলশূন্য হইলেও কৌতুকাবহ।

নাথ রায়চৌধুরীর "হিমালয় দেখিয়া" একটি বিস্তৃত কবিতা। প্রমথ বাবুর যোগ্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "তেজা সিংহ" নামক ক্ষুদ্র গল্পে বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত ম "জামদেদজী নসেরবাঞ্জী তাতা" প্রবন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সাহিত্যের ইতিপূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কর্ম্মবীর টাটা" প্রবন্ধে অবগত টুকু নূতন, উপসংহার হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

বসায়ের সুবিধা খুঁজিবার জন্য এমন দেশ অল্পই ছিল যাহা তিনি দেখেন নাই। শুধু তাঁহার দেখিবার যোগ্য চোখ ছিল, ধারণা করিবার যোগ্য মন ছিল। কত দেশের র সঙ্গেই না তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি বিনীতভাবে যখন এই সকল ভ্রমণ-ন, তখন শুনিতে বড়ই কৌতূহল বোধ হইত। ইংলণ্ডকে তিনি যেরূপ জানিতেন ক ইংরাজও তদ্রূপ জানে না; তাঁহার পারিসের জ্ঞান দেখিয়া মনে হইত তিনি নাগরিক; নিউইয়র্কে থাকিয়া তিনি মনে করিতেন যেন বোম্বাইয়ে আছেন। ক্লব-ঘরে বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেই তিনি ভালবাসিতেন। তাঁহার ক-জমক দেখিয়া মনে হইতে পারে, তিনি এক জন বিলাসী ছিলেন; কিন্তু তাহা চাল চলনে বড়ই সাধাসিধা ছিল। সহজ পরিচ্ছদ পরিয়া 'পঁচিশী' খেলিতে যখন হাসিতেন, যখন (তখন?) সেই বিলম্বিতশ্মশ্রু বলিষ্ঠকায় চিত্তাকর্ষক

পুরুষকে দেখিয়া কোনও অপরিচিত লোক মনে করিতে পারিত না যে, তিনি এক জন এত বড় লোক। লোক তাঁহাকে বড়মানুষ বলিয়া জানুক বা বড়মানুষ বলুক, এরূপ লঘুচিত্ততা তাঁহার ছিল না। তিনি কাহারও তোষামোদ করিতে জানিতেন না।"

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর ভাষ্য-রচনায় নিযুক্ত আছেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় এক্ষণে স্বগ্রামে—কুরিদপুরের অন্তর্গত প্রাণপুরে বাস করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার কবিবর হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের স্মৃতিসভা দুই শত টাকা মূল্যে প্রবন্ধটি ক্রয় করিয়াছেন। রচনাটি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

শুনিতেছি, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র-নন্দী বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদ হইতে "উপাসনা" নামে একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় উপাসনার সম্পাদক হইবেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কতকগুলি গীতিকবিতা "লেখা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরিষদ হইতে কাশীরাম দাসের মহাভারতের যে সংস্করণ প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার আয়োজন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এই সংস্করণে পঞ্চাশখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার দুইখানি উপন্যাস লিখিয়া রাখিয়াছেন। এ সংবাদ অনেকের পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইবে। সরকার মহাশয় উপন্যাস দুইখানি মুদ্রিত করিতেছেন না কেন?

চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থের সম্পাদক সুপণ্ডিত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রায় এক বৎসর রোগভোগ করিতেছেন। আশা করি, তিনি সত্বর নিরাময় হইয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে প্রভুপাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার নিকট আমরা অনেক আশা করি।

বঙ্গবাসী-সম্পাদক ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি উপন্যাস লিখিতেছেন, শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পাঁচকড়ি বাবুর নূতন উপন্যাসের নাম "সাগরের বৌ"। দক্ষিণসাবাজপুরের সমুদ্রপ্লাবন অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার আখ্যানবস্তুর কল্পনা

সুপ্রসিদ্ধ নাটক-কার শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ একখানি পঞ্চাঙ্ক সমাপ্ত করিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারে 'মহুলা' চলিতেছে; শীঘ্র

মে মাসের "ইণ্ডিয়ান নাইট শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'মুরারীদীনি" নামক গল্পের অনুবাদ করিয়াছেন। গল্পটি প্রথমে "ভারত হইয়াছিল। আমরা—গল্পটির পারি নাই। 'ভিন্নরুচির্হি লোক

আনন্দের বিষয়, "উড়িষ্যা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ এ উপন্যাস লিখিতেছেন।

রামচন্দ্র কবিভারতী।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়দেশের (বঙ্গদেশের) বেরবতী গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র কবিভারতীর জন্ম হয়। বেরবতী গ্রামের বিষয় কিছুই জানা যায় না। কথিত আছে, উহা বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত ছিল। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে কাত্যায়ন গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই কাত্যায়ন-গোত্র-সম্ভূত ছিলেন না; অতএব রামচন্দ্র উক্ত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের বংশধর নহেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব্বেও বঙ্গে ব্রাহ্মণ জাতির বাস ছিল। সম্ভবতঃ রামচন্দ্র কবিভারতী সেই আদিম বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গে সেই সকল আদিম ব্রাহ্মণের সবিশেষ অভাব ছিল না। যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য কবি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। তিনি তথায় বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র ব্যাকরণ, অলঙ্কার, পুরাণ ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। যখন দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু সিংহলে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীযুক্ত প্রমথর জয়বর্দ্ধনপুরে উপস্থিত হন। পরাক্রমবাহু ১২৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে হয় নাই। পর্য্যন্ত সিংহলে রাজত্ব করেন। অতএব, রামচন্দ্র কবিভারতী ঐ নগেন্দ্রচন্দ্র সো সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। তৎকৃত বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা-পাঠে পাঠকগণ তাহ ১৩৫-খৃষ্টাব্দে তিনি লঙ্কায় উপস্থিত ছিলেন।
হইয়াছেন। ৫

"বাণিজ্য ব্য র সিংহলের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাহুল সংঘরাজের সহ রামচন্দ্র কবি-
কি দেখা? ৎ হয়। তিনি শ্রীরাহুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট সমগ্র
কত বড়লোক অধ্যয়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত
বৃত্তান্ত বলিতের আশ্রয়গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ভক্তিশতক নামে একখানি
বোধ হয় অন্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাকৌশল দেখিয়া রাজা পরাক্রমবাহু
এক জন পারিষদ, এবং গ্রন্থকারকে "বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী" এই উপাধি প্রদান করেন।
তাঁহার নিজের তাঁহাকে একখানি সুবর্ণপদক প্রদান করেন, এবং তাঁহাকে স্বীয়
বাসভবনের জা পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।
নহে। তাঁহার
খেলিতে তিনি পরে তিনি বৃত্তমালা নামে একখানি ছন্দোগ্রন্থের প্রণয়ন করেন।
হরণস্বরূপ তিনি যে সকল শ্লোকের রচনা করিয়াছেন, তাহার

প্রায় সমস্তই মহানেত্রপ্রসাদ নামক ভিক্ষুর জীবনচরিত অবলম্বনে লিখিত। শ্রীকেদারভট্ট-প্রণীত বৃত্তরত্নাকর নামে যে ছন্দোগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, রামচন্দ্র কবিভারতী তাহারও এক সুন্দর টীকা বিরচিত করেন। এই টীকার নাম বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা।

ভক্তিশতক গ্রন্থের উপসংহারে কবি আপনার এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"দেদীপ্যমান সূর্য্যবংশে আদিত্যস্বরূপ রাজাধিরাজেশ্বর লঙ্কাধিপতি পরাক্রমবাহু যখন সুনীতিপূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে গৌড়দেশীয় ব্রহ্মিণ ও পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র কবিভারতী শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্মার্থমোক্ষপ্রদায়ক ভক্তিশতক গ্রন্থের রচনা করেন।" (১)

বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা গ্রন্থে কবি স্বীয়পরিচয়প্রদানচ্ছলে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ত্রিপিটকাচার্য্য পূজ্যপাদ গুরু শ্রীরাহুলের নিকট যিনি নির্ম্মল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রত্নত্রয়ের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি লঙ্কেশ্বরের নিকট হইতে বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ শ্রীমান্ রামচন্দ্র কবিভারতী বৃত্তরত্নাকরের এই ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন।" (২)

শ্রীরাহুলের প্রতি রামচন্দ্র কবিভারতীর অত্যন্ত ভক্তি ছিল। তিনি বৃত্তরত্নাকর-টীকায় লিখিয়াছেন,—

"বিদ্বান, ষড়ভিজ্ঞ, ত্রিপিটকধারী, মৌর্য্যকুলচন্দ্র রাহুল নামক মুনি জন্মে জন্মে আমার মিত্র (গুরু) হউন।" (৩)

---

(১) ভাস্বদ্ভানুকুলাম্বুজন্মনিহিরে রাজাধিরাজেশ্বরে
শ্রীলঙ্কাধিপতৌ পরাক্রমভুজে নীত্যা মহীং শাসতি।
সদ্গৌড়ঃ কবিভারতী ক্ষিতিসুরঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ সুধীঃ
শ্রোতৃণামকরোৎ স ভক্তিশতকং ধর্ম্মার্থমোক্ষপ্রদম্॥

(২) শ্রীমদ্রাহুলপাদত্রিপিটকাচার্য্যাদ্ গুরোর্নির্ম্মলং
বৌদ্ধং শাস্ত্রমধীত্য যস্য শরণং রত্নত্রয়ং শিশ্রিয়ে।
যো বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তিপদবীং লঙ্কেশ্বরাল্লব্ধবান্
স শ্রীমানিহ সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণো ব্যাখ্যামিমাং ব্যাতনোৎ॥

(৩) রাহুলনামা মুনিরিতি বিদ্বান্ ষড়্গুণভারী ত্রিপিটকধারী।
মৌর্য্যকুলাব্ধিপ্রভবসুধাংশু র্জন্মনি জন্মন্যপি মম মিত্রম্॥—বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা।

রাগচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের চিরন্তন সংস্কারসমূহ তাঁহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। তিনি ভক্তিশতক গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—

"যাঁহার জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী, যাঁহার বাক্য নির্দ্দোষ, যাঁহাতে রাগ দ্বেষ ও মোহ বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নাই, যাঁহার অসাধারণ কৃপা অসংখ্য জীবের প্রতি কারণ-নিরপেক্ষ হইয়া প্রসৃত হইয়াছে, তিনি বুদ্ধই হউন, অথবা শিবই হউন, তিনিই ভগবান; তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি।" (১)

বৃত্তমালা গ্রন্থের পথ্যার্য্যা ছন্দের উদাহরণে কবি লিখিয়াছেন,—

"বুদ্ধরূপ নির্ম্মল পদ্মের জয় হউক। এই পদ্ম সদ্ধর্ম্মরূপ মধু দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি ভ্রমর দ্বারা সতত সমাবৃত।" (২)

ভক্তিশতক গ্রন্থে তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

"ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ, বা শিবপদ লাভ করিয়া লোক সকল একান্তদুঃখপরিপূর্ণ এই সংসারে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন করিয়া থাকে। দুঃখ-পরিপূর্ণ ও আদ্যন্তবিশিষ্ট এই সকল পদ লাভ করিয়া জীবগণের কি ফল হয়? অতএব, আদি-মধ্য-অন্ত-পরিশূন্য নিত্য বৌদ্ধপদ (নির্ব্বাণ) প্রার্থনা কর।" (৩)

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

"পরস্ত্রীকে যিনি মাতা বলিয়া বিবেচনা করেন, পরধনে যাঁহার স্পৃহা নাই, যিনি মিথ্যাকথা বলেন না, মদ্যপান ও প্রাণিহত্যা করেন না, যিনি মর্য্যাদালঙ্ঘন বিষয়ে সর্ব্বদা ভীরু, যাঁহার হৃদয় করুণাপূর্ণ, এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ

---

(১) জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচো
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্যাহেতুরনন্তসত্ত্বসুখদানল্পা কৃপামাধুরী-
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে॥—ভক্তিশতক।

(২) শ্রীঘনকমলজমমলং অয়তাং সদ্ধর্ম্মপুরমধুপূর্ণম্।
হরিহরহিরণ্যগর্ভপ্রভৃতিভ্রমরাবৃতং সততম্॥—বৃত্তমালা।

(৩) ব্রাহ্মং বৈষ্ণবমৈশ্বরঞ্চ বহুধা লব্ধ্বা পদং হেতুতঃ
সংসারে বত সংসরন্তি পুনরপ্যেকান্তদুঃখাস্পদে।
কিন্ত্বেতে হ্যভূতাস্পায়বহুলৈরাদ্যন্তবদ্ভিঃ পদৈঃ
তস্মান্নিত্যমনাদিমধ্যনিধনং বৌদ্ধং পদং প্রার্থ্যতাম্॥—ভক্তিশতক।

করিয়াছেন, হে ভগবন্ সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিই আপনার পাদপূজা করিতে সমর্থ হয়।" (১)

বুদ্ধের প্রতি রামচন্দ্র কবিভারতীর অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাঁহার ভক্তিশতক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—

"জগতের উপকারবিধানই বুদ্ধের পূজা, এবং উহার অপকারসাধনই বুদ্ধের পীড়া। আমি জগতের অপকারী। হে জিন! তথাপি আপনার পাদপদ্ম-ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে আমি লজ্জিত হইতেছি না কেন? (২) নানাবিধ সংসারদুঃখ অবলোকনে ভীত হইয়া আমি অনেকবার আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমি গুরুতর তৃষ্ণা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। অতএব, হে জিন! কৃপাহস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আমাকে ধরুন।" (৩)

রামচন্দ্র কবিভারতী যে প্রকার ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক বটে, কিন্তু উহা প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসসূচক। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম। প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব জ্ঞান ও তদনুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের সার। ভক্তির প্রাধান্য প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। যে সময়ে বুদ্ধদেব জগদীশ্বর বলিয়া পরিগণিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রতি জ্ঞান ও কর্ম্মনিরপেক্ষ ভক্তি প্রদর্শনেই জীবের মুক্তি হয়, এইরূপ মত প্রচারিত হইল, তখন মূল বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছিল, বলিতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

---

(১) মাতেবাসীৎ পরস্ত্রী ভবতি পরধনে ন স্পৃহা যস্য পুংসো
মিথ্যাবাদী ন যঃ স্যাম্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ।
মর্য্যাদাভঙ্গভীরুঃ সকরুণহৃদয়স্ত্যক্তসর্ব্বাভিমানো
ধর্ম্মাত্মা তে স এব প্রভবতি ভগবন্ পাদপূজাং বিধাতুম্॥—ভক্তিশতক।

(২) জগদুপকৃতিরেব বুদ্ধপূজা
ভদপকৃতিস্তব লোকনাথ পীড়া।
জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে
গদিতুমহং তব পাদপদ্মভক্তঃ॥

(৩) প্রণতিরিয়মনেকশস্তবাহং বহুভবদুঃখমবেক্ষ্য ভীতিভীতঃ।—
ধর গুরুতরতৃষ্ণয়া প্রতপ্তং জিন মম দেহি কৃপাকরাবলম্বম্॥—ভক্তিশতক, ৩০।

ভারতচন্দ্রের যুগ।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা।

প্রাচীন ভারতের কথায় ওল্ডেন্‌বর্গ বলিয়াছেন,—The liturgical conscience was stronger than the historical—if, indeed, that complete indifference with which men in India have at all times regarded literary and historical authenticity will allow us in this case to speak of an historical conscience.

—প্রাচীন ভারতবর্ষ বলিতে আমরা কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের ভারতবর্ষ বুঝি না; সে 'কাল' বিস্তৃত ও অনির্দ্দিষ্ট। প্রাচীন ভারতে যাহা ছিল, বা যাহা ছিল না, তাহা কোন্ কালে ছিল, বা কোন্‌কালে ছিল না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। অনুসন্ধান নিষ্ফল হইবেই, এমন বিশ্বাসের কারণও নাই। ভারতবাসী চিরদিনই ইতিহাসবিমুখ, এই—অপবাদ আমরা স্বদেশী ও বিদেশী সকলের নিকট শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু শুনিলেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, কোন প্রাচীন জাতি নব্যরীতির অনুমোদিত ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছে? ভারতবর্ষের যে ইতিহাস নাই, তাহার জন্য প্রাচীন ভারতবাসীদিগকে অপরাধী না করিয়া আমাদিগকে অপরাধী করাই সঙ্গত। কারণ, শিল্পে ও সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান আছে। কোনও জাতির, কোনও সভ্যতার, কোনও যুগের সকল চিহ্ন বায়ুহিল্লোলের মত অন্তর্হিত হয় না। ভারতের ইতিহাসের যে পরিমাণ উপাদান বর্ত্তমান, তদপেক্ষা অনেক অল্পপরিমাণ উপাদান লইয়া অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ মিশরের, গ্রীসের, রোমের ইতিহাসরচনা করিয়াছেন। অত্যল্প উপাদানের সাহায্যে বিলুপ্ত হেটিট সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সভ্যতার তত্ত্ব স্বভাবতঃ ভারতবাসীরই সহজবোধ্য। কিন্তু কয় জন ভারতবাসী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আলোচনায় মন দিয়াছেন?

প্রাচীন ভারতে কর্ম্মবাদই প্রচলিত ছিল। যে সকল ধ্যানযোগী ভক্তি-ভাগীরথীর প্রবাহে কর্ম্মবাদ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের আবির্ভাবকালের আলোচনা করিলে দেখা যায়, তখন পর্ব্বত ও সমুদ্র দ্বারা অন্যদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের সুজলা সুফলা ভূমি ভারতবাসী আর্য্যদিগকে দার্শনিক আলোচনায় ইহকাল হইতে পরকালে লইয়া গিয়াছে; মানব-প্রতিভা অনন্তের তত্ত্বসন্ধিৎসু হইয়া অকূলে কূল—

পাইতেছে না। ক্রমে জন্মান্তরবাদ ভারতবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে ধরাপৃষ্ঠে মানবের জীবনকাল সিন্ধুসৈকতে বালুকাবিন্দুর মত সামান্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জীবনে মানবের কৃত কর্ম্ম জলে জলবিম্বের মত তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চিন্তাশীলদিগের চিন্তা ইহলোককে অতিক্রম করিয়া পরলোকের তত্ত্বে উৎসৃষ্ট হইল। তখন হইতে ভারতবাসীর ইতিহাসবিমুখতা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে সময়ের ইতিহাসের উপাদান যে নাই, এমন নহে। কিন্তু তখন হইতে ভারতবাসী ইতিহাসবিমুখ।

আমাদের দেশে জীবনচরিতের অভাব এই ইতিহাসবিমুখতারই পরিচায়ক। বাল্যকাল হইতে য়ুরোপীয় শিক্ষকদিগের রচনায় আমরা চরিতের উপযোগিতার কথা পাঠ করিতেছি, এবং আপনাদের অভাবে আপনারাই লজ্জিত হইতেছি। এই লজ্জার আতিশয্যহেতু চরিতের অভাবের কারণ সন্ধান করিতেও বিস্মৃত হইতেছি। মানবমাত্রেরই জীবনচরিত রচিত হয় না কেন? যাঁহাদিগের জীবনে সাধারণ মানবজীবন হইতে কিছু স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান, তাঁহাদিগেরই চরিত রচিত হয়। আদর্শ জীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য—লোকশিক্ষা। ভারতবর্ষে যেমন চিন্তার স্রোত ইহকাল হইতে পরকালে প্রবাহিত হইয়াছিল, তেমনই আদর্শচরিত্র-মাহিমাকীর্ত্তনেরও স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সাহিত্যে পদে পদে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় প্রদর্শিত। অতিবিখ্যাত লেখক হইতে নগণ্য লেখক পর্য্যন্ত সকলেরই রচনার সেই উদ্দেশ্য। যে দুই মহাকাব্য বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবাসীর দুঃখশোকতাপতপ্ত বক্ষে স্নিগ্ধশান্তির সঞ্চার করিয়াছে, হতাশহৃদয়ে আশার অরুণকিরণ বিকশিত করিয়াছে, চঞ্চলকে স্থির ও শোকাতুরকে শান্ত করিয়াছে, সংসারের ঘনান্ধকারে ধর্ম্মের পথে আলোক দেখাইয়াছে, প্রতিকার্য্যে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিয়াছে, সে দুই মহাকাব্যেই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় প্রদর্শিত—আদর্শ চরিত্রের মহিমা কীর্ত্তিত। পিতৃসত্যপালন হেতু রাজ্যভোগসুখত্যাগী বনবাসী রামচন্দ্রের পার্শ্বে পতিগতপ্রাণা ধরণীর দুঃখিনী দুহিতার আদর্শচরিত্র যেমন সমুজ্জ্বল, ভ্রাতৃপ্রেমবশে তরুণ যৌবনে সর্ব্বসুখত্যাগী, স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসব্রতাচারী ঊর্ম্মিলাবিলাসীর আদর্শ চরিত্রও তেমনই সমুজ্জ্বল। স্বার্থান্ধ কৌরবদলের তুলনায় ধর্ম্মভীরু পাণ্ডবদিগের আদর্শ চরিত্র সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মগতপ্রাণ পঞ্চ ভ্রাতার দুঃখদুর্দ্দশার অমানিশাশেষে যখন সুখসম্পদের তরুণতপনকিরণ ফুটিয়া উঠিল, তখনই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় ঘোষিত হইল। 'মহাভারত'-রত্নাকরে সন্ধান করিলে সামান্য শ্রমেই চিরকুমার ভীষ্ম হইতে

উর্ব্বশীপ্রত্যাখ্যানক্ষম তৃতীয় পাণ্ডব পর্য্যন্ত বহু আদর্শচরিত্র লক্ষিত হইবে। এই সকল আদর্শপুরুষ ও রমণী 'রামায়ণে'র ও 'মহাভারতে'র অমৃতকথার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে গৃহে গৃহে একান্ত পরিচিত। ভারতবর্ষে আদর্শ চরিত্রের অভাব অনুভূত হয় নাই বলিয়াই চরিত-রচনার প্রচলন হয় নাই। গঙ্গার প্রবাহকূলে বাস করিয়া ভারতবাসী কূপের আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। আজ পরিবর্ত্তিত সমাজে স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ, জঠরজ্বালা প্রভৃতির নব্য দিয়া মনুষ্যত্বের পথে যাত্রীর সংখ্যা একান্ত অল্প; ইহকালের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া ভারতবাসীর ইহলোকে দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে; তাই আজ মহতের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে সাফল্যলাভসৌভাগ্যশালীরও চরিত রচিত হইতেছে।

ভারতচন্দ্র প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের অতিপ্রধান কয়টি ঘটনার কথামাত্র আমরা জানিতে পারি। আর সবই কাল বিস্মৃতির অন্ধকার অতলে লইয়া গিয়াছে—সে স্থানে মানবের গতি নাই। কেবল কাল তাঁহার মধুর রচনা লুপ্ত করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার যশঃসৌরভে বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জ সুরভিত।

কবির কাব্য বুঝিতে হইলে কবির সময়ের আলোচনার আবশ্যক হয়। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আদর্শ ভিন্ন হয়। কবি যে সময়ের লোক, তিনি সে সময়ের উপযোগী না হইলে, তাঁহার দুর্দ্দশা ঘটে; তিনি যে সমাজভুক্ত, সে সমাজের প্রভাব তাঁহার জীবনে ও রচনায় লক্ষিত না হইয়া যায় না; তিনি যে শিক্ষায় শিক্ষিত, সে শিক্ষা তাঁহার কল্পনা ও আদর্শ উভয়কেই বিশেষত্ব দান করে। ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। সুতরাং ভারতচন্দ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুই যুগের সন্ধিস্থলে আবির্ভূত। তখন বিলাসব্যসনবিপন্ন মোগলসম্রাটের শিথিল কর হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইতেছে। ছলে, বলে, কৌশলে আকবর যে রাজ্য সংগঠিত করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের ভ্রান্তনীতি তাহার ধ্বংসানলশিখা জ্বালাইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানের সমবেত-শক্তির উপর কৌশলী আকবর মোগল-সিংহাসন সুদৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আকবরের সেই নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করেন; মোগলের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দিনান্ততপনের মত তেজোহীন হইয়া পড়ে।

ভারতচন্দ্রের জন্মের পঞ্চবর্ষমাত্র পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অগ্নিবর্ষণে বিপন্ন ও বিদ্রূপবাণবিদ্ধ মোগলবাহিনী দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল। বিংশবর্ষাধিককালব্যাপী যুদ্ধের পর—শাহজাহানের সঞ্চিত ভাণ্ডার শূন্য করিয়া, রণক্ষেত্র

সহস্র সৈনিকের রুধিরে সিক্ত করিয়া, শেষে অসাফল্যমলিনবদনে মোগলসম্রাট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। (১) তখন মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচারে মোগলসাম্রাজ্য বিপন্ন। এ দিকে তাঁহার ব্যবহারদোষে রাজপুত প্রভৃতি হিন্দুগণ বিরক্ত। তাঁহার ভ্রান্তিবশে মুসলমান রাজ্যের দুইটি শক্তিস্তম্ভ—বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা বিধ্বস্ত। শরীর কঠোর আচারে দুর্ব্বল। (২) শত্রুজয়ের আশা নির্ম্মূল। পুত্রদিগের প্রতি বিশ্বাস নাই।—১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব আমেদনগরে মৃত্যুর কৃপায় সকল যন্ত্রণামুক্ত হইলেন; মৃত্যুশয্যায় ভগ্নহৃদয়ের করুণ বিলাপ উঠিল—"অনেক পাপ করিয়াছি। জানি না, কি শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে পুত্রগণ সিংহাসনলাভাশায় পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের শান্তিপ্রস্তাবে উদ্ধত আজেম উত্তর করিলেন, "এক সিংহাসনে দুই জন নৃপতির স্থান হয় না।" (৩) আগ্রার নিকটে যুদ্ধক্ষেত্রে আজেম নিহত হইলেন। হায়দ্রাবাদের সন্নিকটে যুদ্ধে আহত হইয়া কামবক্সও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন মুয়াজেম বাহাদুরশাহ নাম লইয়া ভ্রাতৃরক্তসিক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

বাহাদুরশাহ রাজ্য সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনও ফল ফলিল না। তিনি রাজপুতদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু তখন ঘরে বাহিরে শত্রু। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে বাবর নদনদী সন্তরণে পারি হইয়াছিলেন। যুবক আওরঙ্গজেবের সহচর আমীর ওমরাহগণ পাল্কীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন। (৪) আবার দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ফল যুদ্ধে সেনাদল শ্রান্ত। কাজেই বাহাদুরশাহ সেনাবলে বলী হইতে

(১) কাফী খাঁর বিবরণ (Elliot—Vol. VII.)

Manouchi শাহজাহানের ধনলিপ্সার কথা পুনঃপুনঃই বলিয়াছেন। Elphinstone শাহজাহানের সমৃদ্ধিকালকেই ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির চরম উৎকর্ষের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকের মতে, শাহজাহানের ধনাগারে সঞ্চিত ধনরাশির মূল্য ২৭০০০০০০০ টাকা। (Thomas' Revenue Resources of the Moghal Empire প্রথম দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা, তৎকালে রাজস্বই মোট ৪০৫০০০০০০ টাকা ছিল।) আওরঙ্গজেব এই বিপুল ধনরাশি ব্যয় করিয়াছিলেন—ইহাই ঐতিহাসিক মত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যের ধনবল ও জনবল উভয়েরই সর্ব্বনাশ হয়।

(২) Tavernier.

(৩) Seir Mutaqherin.

(৪) Hunter—*India of the Queen.*

পারিলেন না। (১) এ দিকে শিখগণ প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। গুরুগোবিন্দের স্বজনগণের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল, বন্দা তাহার শতগুণ অত্যাচার করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। মসজেদ লুণ্ঠিত ও নগরবাসীরা নিহত হইতে লাগিল। বাহাদুরশাহ স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য পরাজিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল।

তখন মোগলশক্তির চিতা কেবল ধূমোদ্গিরণ করিতেছে। এ দিকে চক্রবাল-রেখায় ইংরেজের সৌভাগ্যসূর্য্য কেবল সমুদিত হইতেছে—মেঘাচ্ছন্ন গগনে সেই তরুণ-অরুণ-কিরণ তখনও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন দুই যুগের সন্ধি।

বাহাদুর শাহের মৃতদেহ শীতল হইতে না হইতে আজেম উস্‌সান পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু সেনাপতি জুলফিকার খাঁ তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন না। তিনি মৃত বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মইজেদ্দিনকে সিংহাসন দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আজেম উস্‌সান নিহত হইলে অর্থবিভাগ লইয়া আর কয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ বাধিল। ধেজিস্তা আখ্‌তার যুদ্ধে জয়ী হইয়াও জুলফিকারের কৌশলে নিহত হইলেন। তখন পলায়িত মইজেদ্দিন বারাঙ্গনা লালকুয়রকে লইয়া শিবিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। রণশ্রমশ্রান্ত সেনাদল বিশ্রামলাভের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করিল। মইজেদ্দিন সুরাপানে ও নর্ত্তকীর নাগলীলাদর্শনে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস অপর ভ্রাতা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন মইজেদ্দিন সুরাপানে চেতনাহীন, অসম্বৃতবেশ। সেই অবস্থায় তাঁহাকে করিপৃষ্ঠে তুলিয়া জুলফিকার যুদ্ধ করিলেন, এবং জয়ী হইয়া অপদার্থ মইজেদ্দিনকেই সিংহাসন দান করিলেন। মইজেদ্দিন ইতিহাসে জেহান্দার শাহ নামে পরিচিত।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহের পুত্র আজেমউস্‌সান বঙ্গদেশে ছিলেন। তিনি গুরুভার লঘু করিবার অভিপ্রায়ে আজিমাবাদের (বিহারের) শাসনভার হোসেন আলি খাঁকে ও ইলাহাবাদের শাসনভার হোসেন আলির ভ্রাতা আবদোলমা খাঁকে প্রদান করেন। জাফর খাঁ (মুরশিদকুলি) বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন—সৈন্যভারও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। পিতার সাহায্যার্থ আজেমউস্‌সান যখন বঙ্গদেশ হইতে গমন করেন, তখন তিনি রাজমহলে

(১) Lane—*Mediæval India.*

সুলতান সুজার প্রাসাদে পুত্র ফরোকশিয়ারকে ও অন্তঃপুরচারিকাদিগের জন কয়েককে রাখিয়া আইসেন। জেহান্দার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফরোকশিয়ারকে বন্দী করিতে উদ্যত হইয়া জাফর খাঁকে সেইরূপ আদেশ করিলেন। কিন্তু জাফর খাঁ মৃত প্রভুর পুত্রের প্রতি নির্দ্দয় হইতে পারিলেন না।—পরিশেষে হোসেন আলি খাঁর ও আবদোল্লা খাঁর সহায়তায় ফরোকশিয়ার জেহান্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রথমে জেহান্দারের পুত্র এজেদ্দিনকে ও পরে স্বয়ং জেহান্দারকে পরাজিত করিয়া ফরোকশিয়ার সিংহাসন অধিকার করিলেন। নির্দ্দয় নরহত্যায় তাঁহার অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল।

ফরোকশিয়ার হিন্দু রাজা অজিৎসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সম্বন্ধ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া হিন্দুদিগকে তাঁহার পথভুক্ত করিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ, তিনি অত্যন্ত কুক্রিয়াসক্ত ছিলেন। যাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত তিনি সিংহাসনলাভ করিতে পারিতেন না, ফরোকশিয়ার অল্প দিনেই তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আবদোল্লা খাঁর দেওয়ান রতনচাঁদের ব্যবহারে দুই পক্ষে অসন্তোষ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শেষে এক দিন সেনাদল দুর্ভাগ্য ফরোকশিয়ারকে অন্তঃপুর হইতে বলে টানিয়া বাহির করিল। যে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন।

তাঁহারা প্রথমে জেহান্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র রাফিএদ্দর জাটকে সিংহাসনে বসাইলেন। ক্ষয়কাশ রোগে তিন মাসের পরই তাঁহার মৃত্যু হইলে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় তদীয় ভ্রাতা রাফিয়েদ্দৌলাকে সিংহাসন দিলেন। কিন্তু তিনিও অল্প দিনেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই আগ্রায় নিকোশিয়ারকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা হয়। যাহা হউক, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রফিয়েদ্দৌলার মৃত্যুর পরই খেজিস্তা আখতারের পুত্র রোসেন আখতারকে দিল্লীর সেলিমগড় দুর্গ হইতে আনাইয়া মহম্মদশাহ নামে সিংহাসনে বসান হইল।

তখন ক্ষমতাশালী রাজপ্রতিনিধিবর্গ সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইতেছেন। মহম্মদশাহ কখনও এক জনের, কখনও আর এক জনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কোন রূপে সিংহাসনে স্থির ছিলেন। হোসেনআলি হত ও আবদোল্লা বন্দীকৃত হয়েন। আসফজা স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনিই হাইদ্রাবাদের নিজামবংশের বংশপতি। হিন্দুদিগের প্রতি বিশেষ ঔদার্য্য দেখাইয়া শেষে জেহি সিংহের অনুরোধে ত্যক্ত হয়। আসফজা ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মুর্শিদকুলি খাঁ মহম্মদকে অভিনন্দন করেন, এবং মুর্শিদকুলি নজর ও

রাজস্ব পাঠাইয়া দেন। মহম্মদশাহ বিচারপ্রার্থীদিগের সুবিধার জন্য প্রাসাদের দ্বারে ঘণ্টা টাঙাইয়া তাহাতে বদ্ধ শৃঙ্খলের অগ্রভাগ বাহিরে রাখিতেন। প্রার্থীরা সেই শৃঙ্খলাগ্র আকর্ষণ করিলেই তিনি জানিতে পারিতেন। রাজধানীতে শৃঙ্খলা-সংস্থাপনের জন্য আসফজাকে মন্ত্রিপদে বৃত করা হয়। কিন্তু তাঁহার গাম্ভীর্য্য মহম্মদের পক্ষে যেমন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, মহম্মদের চাপল্যও বুদ্ধিমান বৃদ্ধের পক্ষে তেমনই বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, সম্রাটের সহচরগণ তাঁহার বেশ ও ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াও বিদ্রূপ করিত। বিরক্ত হইয়া তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন। বস্তুতঃ যে সম্রাটের রাজকার্য্যে তাঁহার অনুগৃহীতা বারাঙ্গনাও হস্তক্ষেপ করিতে পারে, আসফজার মত লোকের পক্ষে তাঁহার কার্য্য করা সম্ভব নহে।

মহম্মদশাহের শাসনকালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—নাদীরশাহের ভারত-আক্রমণ। দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতর রাজধানী দিল্লীর রাজপথ নরশোণিতসিক্ত হইল; দারুণ অত্যাচারে পীড়িত প্রজা বাধ্য হইয়া আপনার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারীকে অর্পণ করিয়া মান ও প্রাণ বাঁচাইল। দেশে হাহাকার উঠিল—গৃহে গৃহে ক্রন্দনধ্বনি ধ্বনিত হইল। প্রায় দুই মাস কাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়া লুণ্ঠন সম্পূর্ণ করতঃ নাদীর দিল্লী ত্যাগ করিলেন। তাঁহার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মূল্য প্রায় ৪৮০০০০০০৲ কোটী টাকা হইবে। এই সকল দ্রব্যাদির মধ্যে শাহজাহানের লোকপ্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসনেরই মূল্য টেভার্নিয়ারের মতে ৯ কোটী টাকা হইবে। নাদীরের এই অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী ফল দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে পূর্ব্বাবস্থ হওয়া সহজ হইল না। কারণ, মোগল সাম্রাজ্য তখন একান্ত দুর্ব্বল—দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত। হাইদ্রাবাদে আসফজা ও অযোধ্যায় সর্দত খাঁ প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়াছেন। বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাও মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া হিন্দু প্রাধান্যের পুনরুদ্ধারের কল্পনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"দুর্ব্বল কাণ্ডে আঘাত করিলে নাথা আপনিই যাইবে।" আসফজাও বাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে 'চৌথ' দিতে স্বীকৃত হইলেন। গাইকোবার, হোলকার, সিন্ধিয়া, ভোসলা—সকলেই প্রাধান্যসংস্থাপনে উদ্যত। এই অবস্থায় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সুসংবাদ পাইলেন, পুত্র আমেদ-শাহকে পরাজিত করিয়াছেন। 'মুতাক্করীণ'-লেখক সত্যই বলিয়াছেন, মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর হইতে সম্রাট ও সাম্রাজ্য শূন্যগর্ভ শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

ইহার পর বৃত্তিভোগী মোগলপুত্তলগণ সম্রাট নাম লইয়া কেবল অন্তঃপুর-বাহুল্যেই নিয়ত ছিলেন। মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আমেদশাহ সম্রাট

হইলেন। আসফজার পুত্র গাজিউদ্দিন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে জেহান্দারের পুত্রকে দ্বিতীয় আলমগীর নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। তিনি লাহোর জয় করিলে প্রতিশোধগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প আমেদশাহ দুরাণী পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করিয়া দিল্লীবাসীর দুর্দ্দশার একশেষ করিলেন। নাদীরের অত্যাচারের পুনরভিনয় হইল।

তিনি ফিরিতে না ফিরিতে গাজিউদ্দিন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তায় পুনরায় পঞ্জাব হস্তগত করিলেন। ক্রোধান্ধ আমোদ পুনরায় সেনাবাহিনী ভারতাভিমুখে প্রধাবিত করিলেন। পাণীপথে বাবর ও আকবর দুইবার ভারতসাম্রাজ্যের জন্য ভাগ্যপরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেই পাণীপথেই ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আমেদের সেনা ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা পরস্পরের সম্মুখীন হইল। প্রথমে মহারাষ্ট্রীয়দিগেরই জয়ের সম্ভাবনা লক্ষিত হইল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে মুসলমানের আক্রমণে মহারাষ্ট্রীয়গণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দশ ক্রোশ পথ জেতৃদল বিজিতদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার কথা হইয়াছিল, তিনি নিহত হইলেন। সিন্ধিয়া আহত হইলেন। হোলকার ও নানা ফড়ণবীশ পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিলেন। প্রচলিত মত এই যে, এই যুদ্ধে দুই লক্ষ মহারাষ্ট্রীয়ের জীবননাশ হয়। হিন্দুসাম্রাজ্যসংস্থাপনের আশা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গেল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ হইতে ইংরাজাধিপত্য আরব্ধ হইল। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তৈমুরের বংশের অভিনয় শেষ হইল; মোগলের সৌভাগ্যসূর্য্য দুর্দ্দশার ঘনান্ধকারে অস্ত গেল।

কর্ণাটে, মহীশূরে ও বঙ্গে, মুসলমান ইংরাজের গতিরোধের প্রয়াস পাইয়াছিল; ভারতের অন্য সকল স্থানেই হিন্দুকে পরাজিত করিয়া ইংরাজ বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন।

এই সময়ের বঙ্গদেশের অবস্থার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আজেমউস্‌সান পিতার সাহায্যার্থ দিল্লী গমন করিলে বাঙ্গলার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ও নাজেমী উভয় ভারই কিরূপে মুর্শিদকুলি খাঁর হস্তে আইসে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুজা খাঁ মুর্শিদকুলির জামাতা। শ্বশুরে ও জামাতায় মনান্তর উপস্থিত হয়। মনান্তরের প্রধান কারণ, মুর্শিদকুলির কন্যা জিনেতউন্নিসা স্বামীর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। শ্বশুর

জামাতাকে দূরে প্রেরণ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে উড়িষ্যার প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জিনেতউন্নিসা পুত্র সরফরাজ খাঁকে লইয়া মুর্শিদাবাদে পিতার নিকটেই রহিলেন। সুজা উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন।

মুর্শিদ দৌহিত্র সরফরাজকে বঙ্গের দেওয়ানী কার্য্য দিলেন, এবং তাঁহার দেহান্ত হইলে দৌহিত্র যাহাতে নেজামতী পদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুজা খাঁও স্বয়ং বাঙ্গলার ও উড়িষ্যার দেওয়ান ও নাজেম হইবার চেষ্টা করিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে মীর্জ্জা মহম্মদআলি (আলিবর্দ্দী খাঁ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কার্য্যদক্ষতায় তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর পরামর্শ মত দিল্লীতে সম্রাটের নিকট, উজীরের নিকট ও ক্ষমতাশালী খাঁ দুরাণের নিকট লোক প্রেরিত হইল।

মুর্শিদকুলির অন্তিমকাল উপস্থিত, এই সংবাদ পাইয়া, সুজা খাঁ মুর্শিদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং পথে দিল্লী হইতে দত্ত অভীপ্সিত সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। মুর্শিদাবাদে উপনীত হইয়া তিনি চেহেলসুতুন গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনাকে বাঙ্গলার দেওয়ান ও নাজেম বলিয়া প্রচার করিলেন। আপনাকে বাঙ্গলার দেওয়ান ও নাজেম জানিয়া উৎফুল্ল সরফরাজ তখন রাজধানীর উপকণ্ঠে বৃক্ষবাটিকায় আনন্দোৎসবমত্ত। চেহেলসুতুন হইতে উত্থিত বাদ্যধ্বনিতে বিস্মিত হইয়া তিনি কারণের অনুসন্ধান করিলেন। তখন আর উপায় কি? তিনি অগত্যা যথারীতি পিতৃপদ চুম্বন করিয়া পিতার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। এই সময় বিহারের শাসনকর্ত্তার মৃত্যু হইলে খাঁ দুরাণ সুজাকেই সেই পদ প্রদান করিলেন। সুজা খাঁ পুত্র সরফরাজকে তথায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু পত্নীর আপত্তিতে শেষে আলিবর্দ্দীকেই সেই পদ প্রদান করিলেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রজারঞ্জক ন্যায়পরায়ণ সুজা খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন; পিতার মৃত্যুতে তিনিই পিতার সকল অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

চপলমতি সরফরাজ অল্পদিনেই দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। আলিবর্দ্দী অপমানিত হইয়া দিল্লীতে পত্র লিখিলেন যে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, তিন প্রদেশের দেওয়ানী ও নেজামতী পাইলে, এবং যুদ্ধ করিয়া সরফরাজের হস্ত হইতে ক্ষমতা লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, তিনি দিল্লীতে বার্ষিক এক কোটী টাকা রাজস্ব দিবেন,—এবং তদতিরিক্ত—সরফরাজের সমস্ত সম্পত্তি ও এক কোটী টাকা নজর দিবেন। সুজা খাঁর মৃত্যুর এগার মাস পরে

তিনি দিল্লী হইতে প্রার্থিত আদেশ পাইলেন। জগৎশেঠ আলিবর্দ্দীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন।—গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা, তিন প্রদেশের দেওয়ান ও নাজেম্ হইলেন।

মসনদে বসিবার পূর্ব্বেই আলিবর্দ্দী প্রভু সুজার পত্নী,—সরফরাজ-জননীর দ্বারস্থ হইলেন, এবং "অদৃষ্টে যাহা ছিল হইল; আপনার এই অপদার্থ ভৃত্যের কৃতজ্ঞতার কথা কখনও ইতিহাস হইতে অপনীত হইবে না"—এইরূপ বিনীত-বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি এক দিনের জন্যও সুজার পত্নীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। আলিবর্দ্দীর যথেষ্ট সদ্‌গুণ ও শাসনক্ষমতা ছিল। উড়িষ্যাবিজয় প্রভৃতি কার্য্যে আলিবর্দ্দীর অনেক সময় গিয়াছিল সত্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধই তাঁহার রাজত্ব-কালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। তিনিও কয়বার মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করেন; মহারাষ্ট্রীয়গণও বহুবার তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ করে। মেদিনীপুরের নিকটে ভাস্কর পণ্ডিতের সেনাদলে বেষ্টিত হইয়া তিনি যেরূপে কাটোয়ায় উপনীত হয়েন, তাহাতে তাঁহার সাহসের ও রণকৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পঞ্চ সহস্র বঙ্গ-সেনার সেই প্রত্যাবর্ত্তনকাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নাই। অনবরত দশ বৎসর যুদ্ধে আলিবর্দ্দী শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আলিবর্দ্দীর বয়স তখন ৭৫ বৎসর। বৎসর বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগের লুণ্ঠনে প্রজার অবস্থা অতি শোচনীয়। বর্ষে বর্ষে গ্রাম ও নগর ধ্বংসমুখে পতিত হয়। জননীরা বর্গীর ভয় দেখাইয়া শিশু পুত্রকন্যাদিগকে ঘুম পাড়ান। আলিবর্দ্দী দেশের মঙ্গলকামনায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কারণ, দেশের যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে দিল্লীতে প্রেরণোপযোগী রাজস্বও সংগৃহীত হয় না। এ দিকে মহারাষ্ট্রীয়গণও বহুবার পরাজিত হইয়া সন্ধি করাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

অবশেষে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইল। মহারাষ্ট্রপক্ষীয় মীর হবিব উড়িষ্যার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা হইলেন। কথা রহিল, ঐ প্রদেশের রাজস্ব হইতে তিনি রঘুজী ভোঁসলার সেনাদলের পূর্ব্বপ্রাপ্য পরিশোধ করিবেন। প্রকারান্তরে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের করতলগত হইল। স্থির হইল, এ রাজস্ব ব্যতীত, আলিবর্দ্দী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বার্ষিক দ্বাদশ লক্ষ টাকা দিবেন। সুবর্ণরেখা নদী বাঙ্গালার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। মহারাষ্ট্রীয়গণ কদাচ ঐ সীমা উলঙ্ঘন করিয়া আসিবেন না, অঙ্গীকার করিলেন।

বর্গীর হাঙ্গামায় স্বদেশের দুর্দ্দশার একশেষ হইল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দীর মৃত্যু হইলে, তদীয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। চপলচিত্ত সিরাজের দুর্ব্ব্যবহারে দেশের প্রধানগণ পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন সে বিরক্তির কারণ আরও বর্দ্ধিত হইল। সাধারণ জনগণও তাঁহার অত্যাচারে কাতর হইয়া উঠিল। শেষে দেশের প্রধানগণ ইংরাজের সহিত চক্রান্ত করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী ক্ষেত্রে সিরাজদ্দৌলা পরাজিত ও ইংরাজ জয়ী হইলেন। নূতন যুগের আরম্ভ হইল।

আকবর যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করেন, তাহার ধ্বংসের কারণ তাঁহার সংস্থাপনপ্রণালীতেই নিহিত ছিল। আওরঙ্গজেবের শাসননীতি মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসানলশিখা প্রজ্বলিত করে। তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের বিলাসব্যসনায় তাহাতে ইন্ধনযোগ হয়। আকবরের সযত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ আওরঙ্গজেবের সময়েই জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার পর যে পারিল, জীর্ণ প্রাসাদের প্রস্তররাশি গৃহচ্যুত করিয়া লইয়া গেল।

মুসলমান সম্রাটগণ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে স্বাধীনতা দিতে হইত। তখন পথ প্রায় ছিল না; যাহা ছিল, তাহাও ভাল নহে—বর্ষাকালে কর্দ্দমে দুর্গম হইয়া উঠিত; পার্শ্বপার্শ্বে শ্বাপদসঙ্কুল কানন; পথে দস্যু তস্করের উপদ্রব। দেশে শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশ স্থলেই রক্ষক ও ভক্ষক—উভয়ই।

দেশাচারের প্রতি ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্থানীয় বিশেষত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া বিশাল ভূখণ্ড এক সাম্রাজ্য বলিয়া সর্ব্বত্র একই শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন তখনও প্রচলিত হয় নাই। তখন জাতীয় জীবনে যেমন বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব ছিল, শাসনকর্ত্তাদিগেরও তেমনই বিচার বিবেচনার অধিকারে স্বাধীনতা ছিল; শাসনপ্রণালী তখনও রাজধানীর মন্ত্রণা-সভার অনুমোদিত যন্ত্রমাত্রে পরিণত হয় নাই। এক কথায় ভারতবর্ষে তখনও প্রাচ্য শাসনপ্রণালী প্রচলিত। হিন্দুস্থানে তখনও হিন্দু বিচার, শাসন ও সৈনিক বিভাগে প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। সর্ব্বত্রই মুসলমানের অধীন হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু শাসনকর্ত্তা, হিন্দু সেনাপতি প্রভৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঙ্গে সিরাজদ্দৌলার সময়েও "রাজা মোহনলাল সেনাপতি ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা রাজা রায়দুর্লভ কোষাধ্যক্ষ, রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা, এবং রাজা রামরামসিংহ মেদিনীপুরের

শাসনকর্ত্তা।" (১) বঙ্গের জমীদারদিগেরও স্ব স্ব জমীদারীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতাপ ছিল। শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর আজেম উস্সান যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের "তিন সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্ত সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল।" (২)

প্রজাবর্গের সহিত জমীদারদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; প্রজারা জমীদারকেই রাজা বলিয়া মনে করিত। জমীদার প্রভৃতি প্রধানগণের কিরূপ ক্ষমতা ছিল, তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। দিল্লীতে যেমন মোগলের অধঃপতনদশায় এক এক জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা এক একটি ক্ষমতাশালী পরিবার এক সম্রাটকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া আর এক জনকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন— সম্রাট-পুত্তল লইয়া খেলা করিয়াছেন, বাঙ্গালাতেও তেমনই জমীদার প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় দেওয়ান ও নাজেম করিয়াছেন। জগৎশেঠ প্রভৃতির সহায়তায় আলিবর্দ্দী অনায়াসে সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। কেবল দিল্লীর সনন্দবলে কিছুই হইত না। তাঁহারাই আবার অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করিতে অগ্রসর হয়েন, তখন ভবানন্দ মজুমদার তাঁহার সহগামী ছিলেন। আবার সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজকে রাজ্য দিবার জন্য যে রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়, ভবানন্দের বংশধর কৃষ্ণচন্দ্রই সেই বিপ্লবের "প্রবর্ত্তক, মন্ত্রী ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।" জগৎশেঠের যে গৃহের ভগ্নাবশেষ এখন ভাগীরথীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই গৃহে বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আলোচিত হইত। দেশের লোকের তখন এমনই ক্ষমতা ছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে তখন দেশীয়দিগের হস্তে যে ক্ষমতা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে আমরা সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না। মুসলমান সম্রাট ও শাসনকর্ত্তা বুঝিতেন, দেশের হিন্দু ও মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদিগের সন্তোষের উপর সংস্থাপিত না হইলে সিংহাসন দৃঢ় হইবে না। তাঁহাদিগের ক্ষমতার বিষয় সম্রাটের ও শাসনকর্ত্তাদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের সন্তোষবিধানে সচেষ্ট হইতেন।

মুসলমান সম্রাট ও শাসনকর্ত্তারা ভারতবাসী ছিলেন। যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিতেন, তাঁহারাও ভারতবর্ষেই স্থায়ী হইতেন। রাজায় প্রজায়, শাসকে শাসিতে স্বার্থসংঘর্ষণ উপস্থিত হইত না। হিন্দু ও মুসলমান বিজেতা ও বিজিতের

(১) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "বাঙ্গলার ইতিহাস"।

(২) "ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত"।

ভাব বিস্মৃত হইয়া, একই উদ্দেশ্যে, একই স্বার্থে, একই সমবেদনায় কার্য্য করিতেন। যে স্থানে সম্রাট বা শাসক সেই নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, সেই স্থানেই বিপদ ঘটিয়াছে।

বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে বিলক্ষণ সম্প্রীতি ছিল; সখ্য সময় সময় ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে পরিণত হইত। পরস্পর পরস্পরের অনেক আচারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজেও ইহার প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

সিংহলে।

২। শৈল-মন্দির।

যে অরণ্যের মধ্যে ভগ্নাবশেষগুলি নিহিত, সেখান হইতে বাহির হইয়া, জঙ্গলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। এইখানকার শৈল-মন্দিরে পূর্ব্বতন দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি অক্ষত রহিয়াছে। এই পরিত্যক্ত বন-ভূমির দূর দিগন্তে, এই শৈল-মন্দিরের ন্যায়, আরও অনেক শৈলপিণ্ড ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়। না জানি, পুরাকালের কোন্ প্রলয়-প্লাবনের প্রভাবে এইগুলি সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ঠিক্ মনে হয়, যেন ধরণীর মুখ কালো হইয়া স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই গোলাকার মসৃণ শৈলপিণ্ডগুলি কি করিয়া এখানে আসিল, চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে তাহার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মনে হয়, যেন এক-একটা প্রকাণ্ড পশু যূথ-ভ্রষ্ট হইয়া তৃণভূমির উপর একাকী বসিয়া আছে।

বৃহদাকার কোন জন্তু-বিশেষ ও বৌদ্ধমন্দিরের "দাগোবা"—এই দুয়ের সম্মিলনে যেন এই মন্দিরটি নির্ম্মিত;—শ্যামল স্তূপের উপর সৌধ-ধবল ক্ষুদ্র একটি "দাগোবা" যেন স্থাপিত হইয়াছে। যেন হাতী তাহার কালো পিঠের উপর চূড়াকার একটা হাওদা বহন করিতেছে।

আমরা পৌঁছিয়া দেখিলাম, জঙ্গলটি অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণতলে প্রসারিত; চারি দিক নিস্তব্ধ; মন্দিরের সমীপে জন-প্রাণী নাই; ভূমির উপর চামেলী প্রভৃতি এক রাশি ফুল ছড়ানো রহিয়াছে; ফুলগুলি শুখাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও

* সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

তার গন্ধ যায় নাই। এইগুলি পূর্ব্বদিনের পুষ্প। দেবতারা এখানেও যে বিস্মৃত নহেন, এই পুষ্পাঞ্জলিই তাহার সাক্ষী।

কোন বৃহদাকার জন্তুর ন্যায় এই শৈলমণ্ডলের গঠন-ভঙ্গী; উহার পাদ-দেশ সরোবরের জলে বিধৌত; সরোবরটি কুম্ভীরের আবাস ও পঙ্কজ-শোভিত।

নিকটে আসিলে লক্ষ্য করা যায়, উহাদের মসৃণ গাত্রে কতকগুলি অস্পষ্ট উৎকীর্ণ-চিত্র মুদ্রিত রহিয়াছে। এত সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট যে, ছায়ার ন্যায় দৃষ্টিপথ হইতে ক্রমাগত সরিয়া সরিয়া যায়। কিন্তু চিত্রগুলি এরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত যে, প্রকৃত বলিয়া ভ্রম হয়। হস্তীর শুণ্ড, কর্ণ, পদ, অঙ্গাদির গঠন—ইহাই চিত্রের বিষয়। শৈলের প্রস্তরগুলি স্বভাবতই এমন আশ্চর্য্যভাবে বিন্যস্ত ও তাহাদের গায়ের এরূপ স্বাভাবিক রং যে, উহাতে হস্তীর গঠন ও বর্ণ যেন পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল। কেবল, শিল্পী অতি অপূর্ব্ব কৌশলে উহাদিগকে আপন কাজে লাগাইয়াছে, এই মাত্র। স্থানে স্থানে, এই গোলাকার শৈলের ফাটলে ফাটলে ছোট-ছোট গাছের চারা বাহির হইয়াছে। পুরাতন চামড়ার রংএর মত এই শৈল-প্রস্তরের রং—এই রংএর গায়ে এই চারাগুলি এত পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে যে, সত্যকার উদ্ভিজ্জ বলিয়া মনে হয় না। 'পেরিউয়িঙ্কল্'এর গাছ খুব লাল, 'হিবিস্‌কাস'ও খুব লাল, সুপারীর চারাগুলি অত্যন্ত সবুজ। মনে হয়, যেন খাগড়ার ডাঁটার উপর পালকের পোপনা ঝুলিতেছে।

শৈলমণ্ডলের পশ্চাদ্দেশে একটি প্রাচীন ধরণের ছোট বাড়ী প্রচ্ছন্ন। উহার মধ্যে মন্দির-রক্ষক বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা বাস করে। উহাদিগের মধ্যে এক জন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন;—যুবা পুরুষ, বৌদ্ধ পুরোহিতের অনুরূপ পীত রংএর বহির্ব্বাসে গাত্র আচ্ছাদিত, কেবল একটি স্কন্ধ ও একটি বাহু অনাবৃত। দেবালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য এক ফুটের অধিক লম্বা, কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত একটি চাবি তাঁহার সঙ্গে। ইহার মুখ সুন্দর ও গম্ভীর, ইহার চোখ দুটিতে যোগিজন-সুলভ রহস্যময় ধ্যানের ভাব যেন পরিব্যক্ত। হস্তে চাবিটি লইয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন সূর্য্যের কনক-কিরণ তাঁহার উপর পতিত হওয়ায় মনে হইল, যেন আমাদের 'পিটার'-মুনির তাম্রপ্রতিমাটি রক্ত বর্ণে রঞ্জিত না হইয়া, পীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। লাল 'পেরিউইঙ্কলে'র ঝোপের মধ্য দিয়া শৈল-খোদিত একটা সিঁড়ি বাহিয়া, আমরা উপরে উঠিলাম। চতুর্দ্দিকের জঙ্গল-পরিধিটি যেন আরও বর্দ্ধিত হইল।

মুখ্য-শৈলখণ্ডের মধ্য-পথে, কঠোর শৈল-গর্ভ ভেদ করিয়া, পাথর কাটিয়া দেবালয়টি নির্ম্মিত। প্রথমে একটি গহ্বর; সেখানে প্রস্তর-বেদিকার উপর, যুথী জাতি-মল্লিকা প্রভৃতি ছোট্‌কা-ফুল বিকীর্ণ রহিয়াছে। গহ্বরের শেষ সীমায় দেবালয়ের প্রবেশ-দ্বার। দুইটি তাম্রকবাটে দ্বারটি রুদ্ধ। উহাতে, কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড তালা লাগানো আছে।

ঝনৎকার-সহকারে ধাতব কবাটদ্বয় উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র, রং-করা কতকগুলি বড়-বড় পুতুল বাহির হইয়া পড়িল। বহুমূল্য সুগন্ধি-নির্য্যাসের চৌবাচ্চা যেন সহসা অনাবৃত হইল। প্রতিদিন, গোলাপ-নির্য্যাসে ও চন্দন-রসে ভূমি পরিসিক্ত ও যূথী-জাতি-মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধি শুভ্র পুষ্প-স্তবকে সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, অত্রস্থ বায়ু সুরভিত ও কুট্টিম-তল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। যে দেবতারা এই সুড়ঙ্গ-গর্ভের অন্ধকারে বাস করেন, তাঁহারা এই সুরম্য সুমধুর সৌরভের মধ্যে নিত্য নিমগ্ন।

এই দেবালয়ে অনেকগুলি পুত্তলিকা; কক্ষটি আলনারীর ন্যায় সংকীর্ণ, কষ্টে-সৃষ্টে ৪।৫ জনের দাঁড়াইবার স্থান হয়। দেবীগুলি ১২ ফুট উচ্চ, শৈলপ্রস্তরের মধ্য হইতেই খুদিয়া বাহির করা, এবং বিবিধ সাজসজ্জায় বিভূষিত। বৌদ্ধ-পুরোহিতের পরিচ্ছদের ন্যায় ইহাদের মুখ পীতবর্ণ, এবং ইহাদের মুকুটগুলি খিলানে গিয়া ঠেকিয়াছে। মধ্যস্থলে অতিমানুষ-বিরাট-আকারের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি সেই পরিচিত চিরধ্যানের ভঙ্গীতে আসনস্থ। পুত্তলিকার আকারে ছোট ছোট দেবতারা ইহার সমীপে ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া আছেন। আর যে বিরাট দেবীমূর্ত্তিগুলি গণ্ডলাকারে চারি দিকে অবস্থিত, উহারা যেন এই পুতুলগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। উহাদের অলঙ্কারগুলি খুব উজ্জ্বল, রং এখনও বেশ টাটকা রহিয়াছে, প্রস্তরময় পরিচ্ছদগুলি লাল নীল রংএ রঞ্জিত। এ সব সত্ত্বেও, ঐ আয়ত-নেত্র মহোদয়গণকে পুরাকালের লোক বলিয়াই মনে হয়।

আমি এখানে হঠাৎ আসায়, এই দেবতাদিগের গুহায় আজ একটু আলোক প্রবেশ করিয়াছে; দেবতারা, সম্মুখস্থ বিমুক্ত দালানের মধ্য দিয়া—যেখানে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব শতাব্দীর ভক্তগণ বাস করিতেন—সেই জঙ্গলের দূরদিগন্তদেশ পর্য্যন্ত এক্ষণে অবলোকন করিবার অবসর পাইলেন।

আমি তাঁহাদের মুখ-পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম, পরক্ষণেই মন্দির-রক্ষক পুরোহিতেরা দেবালয়ের সেই পুণ্য-কক্ষটি আবার বন্ধ করিয়া দিল; শৈলগহ্বরবাসী দেবতারা স্বকীয় সুরভিত অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার নিমগ্ন হইলেন।

আমি বিদেশী—আমার নিকটে, বৌদ্ধদিগের এই সকল সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তি, এখনও প্রহেলিকাবৎ দুর্জ্ঞেয়।

আমি চলিলাম। পীতবসনধারী রক্ষকেরাও স্বকীয় আশ্রম-নিবাসে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

—এই অপূর্ব্ব মন্দিরপুরোহিতদিগের আর কোনও পার্থিব চিন্তা নাই। দেবালয়ে ফুল সাজানই উহাদের একমাত্র কাজ। এই বিজন আশ্রমে থাকিয়া, সুখ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া, যাহাতে দীর্ঘকাল জীবনযাপন করিতে পারে, এবং এই নশ্বর জীবনের পরেও, যাহাতে জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্যক্তিত্বহীন ঘোরতমসাচ্ছন্ন অনন্তের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে পারে,—ইহাই তাহাদের একমাত্র আশা।

এই শৈল-মন্দিরের জঙ্গল ত্যাগ করিয়া, যখন আবার সেই অরণ্য-সুপ্ত অনুরাধপুরে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম, তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ। রাত্রিকালে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিচরণ করিয়া, কল্য প্রভাতেই আবার এখান হইতে প্রস্থান করিব।

"'চন্দ্র'-পথ ও 'রাজ'-পথ—এই দুটি রাস্তা সব-চেয়ে বড়। বালুকাচ্ছন্ন রাস্তাটি আয়তনে উহাদের চতুর্থাংশ। 'চন্দ্র'-পথের দুই ধারে এগারো হাজার বাড়ী দৃষ্ট হয়। সদর-দরজা হইতে দক্ষিণের দ্বার পর্য্যন্ত দূরত্ব ৮ ক্রোশ; এবং উত্তর-দ্বার হইতে দক্ষিণ-দ্বার-পর্য্যন্ত ঠিক আর ৮ ক্রোশ।"

অরণ্যের বৃক্ষতলে কত রাশি-রাশি প্রস্তর, প্রাচীন ধরণের কত পাষাণ-প্রতিমা—তার আর শেষ নাই। কিরীট-ভূষিত দেব দেবী; কুম্ভীরের দেহ, হস্তীর শুণ্ড ও পক্ষীর পুচ্ছবিশিষ্ট বিকটাকার বিবিধ মূর্ত্তি। আর, থামের পর থাম চলিয়াছে;—কতকগুলি স্তম্ভ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, কতকগুলি ভগ্ন ও স্বস্থান-ভ্রষ্ট। তা ছাড়া, ভগ্ন-গৃহের কত যে দেহলী, তার আর সংখ্যা নাই। দ্বারদেশের সোপান-ধাপের প্রত্যেক ধারে এক-একটি ক্ষুদ্র স্মিতাননা দেবী-মূর্ত্তি, লতা পাতা শিকড়-জালের মধ্যে আসিবার জন্য যেন ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে। এই সকল গৃহের গৃহস্বামীরা সেই তমসাচ্ছন্ন পুরাকালে অতীব আভিজাত্য ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বহু শতাব্দী হইতে ইহাঁদের ভস্ম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

কনক-রাগ-রঞ্জিত সায়াহ্নে, আমার আবাস-গৃহ হইতে বহু দূরে, রাজাদের প্রাসাদ-অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বৃহৎ ভিত্তি-বেষ্টন ও প্রস্তর-খোদিত সোপান-ধাপ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। চারি দিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। একটি কীটের শব্দ নাই, একটি পাখীর ডাক নাই। এইখানে

একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ পদ্ম-পুষ্করিণীর ধারে আমি বিশ্রাম করিতেছি। পুষ্করিণীর ধার পাথর দিয়া বাঁধানো; ইহা গজরাজদিগের স্নানাগার। অরণ্যের মধ্যে এইটুকুই তরুশূন্য মুক্ত পরিসর।

এই পুষ্করিণীর জলে ক্রমাগত বুদ্‌বুদ উঠিয়া এক একটা চক্র রচনা করিতেছে; এই কলুষিত জলের মধ্যে সর্প কুম্ভীর সহিত যে সকল কুম্ভীর বাস করে, তাহাদের নিশ্বাসবায়ুতে এই জলবুদ্‌বুদগুলি উৎপন্ন হইতেছে।

এই অঞ্চলের মধ্যে ঝোপ-ঝাড় কিছুমাত্র নাই। অরণ্যস্থিত ধ্বংস-রাজ্যের দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত চারি দিকে আমার দৃষ্টি অবাধে সঞ্চরণ করিতেছে। পশ্চিম দিগন্তে হঠাৎ যেন একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গাছের ফাঁকে রশ্মি প্রবেশ করিয়া আমার চক্ষু যেন ঝলসিয়া দিল;—উহা অস্তমান সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবীর যে অক্ষাংশবৃত্তে আমরা অবস্থিত, তাহাতে শীঘ্রই রাত্রি আসিয়া পড়িবে।

আরও বেশী দেখিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি আরও দূরে চলিয়া গেলাম। আজ সন্ধ্যায় যতক্ষণ পারি ভ্রমণ করিব; কেন না, আজ এখানে আমার শেষ দিন।

দিবাবসানে, আমি যে নূতন ভূভাগে প্রবেশ করিলাম, তাহা আমার নিকট অতীব রমণীয় বলিয়া বোধ হইল। ভূমির মৃত্তিকা সুষুমার, একটু শুষ্ক, একটু বালুকাময়, ছোট ছোট তৃণে আচ্ছন্ন; শৈশবে যে অরণ্য-ভূমির সহিত আমি পরিচিত ছিলাম, ইহা কতকটা সেইরূপ। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিস দেখিয়া জন্মভূমি বলিয়া আমার যেন আরও বিভ্রম উপস্থিত হইল। সেই সেখানকারই মত কৃষক ও গোমেষাদির প্রদক্ষিণ-মেঠো পথ; আমাদের দেশের ওক্‌গাছের ন্যায়, ঘন-শ্যামল-ক্ষুদ্র-পল্লব-যুক্ত ও ধূসররর্ণের শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট সেই তরুগণ, সেই মেঠো নিস্তব্ধতা, সেই সন্ধ্যার বিষণ্ণতা * * কিন্তু এই ভগ্নাবশেষগুলি, এই বৃহৎ প্রস্তরগুলি, নিত্য নিয়ত আমার নেত্র-সমক্ষে থাকায়, বিশেষতঃ এই পাষাণ-প্রতিমাগুলির রহস্যময় মুখশ্রী আমার মনে সতত জাগরূক থাকায়, এই স্বদেশসম্বন্ধীয় বিভ্রমটি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। যে সকল নিঃসঙ্গ বুদ্ধ-মূর্ত্তি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্মিতমুখে শূন্যের দিকে চাহিয়া আছে, তাহাদের ছায়াও যেন এই অন্ধকারে ভয়-বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এখান হইতে ফিরিয়া, কুক্কুর ও নেকড়েবাঘদিগের মধ্য দিয়া এক্ষণে যে প্রদেশে প্রবেশ করিতেছি, উহা যেন আরও বিষাদ-মধুর—একেবারেই যেন আমাদের দেশের মত। এই চতুর্দ্দিকস্থ ভারতীয় অরণ্যের ভাবটি যদিও আমার অন্তরের অন্তস্তলে

গূঢ়ভাবে জাগিতেছে, তবু যেন আমার মনে হইতেছে, আমি Saintonge কিংবা Aunisএর ওকবৃক্ষের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি; তাই আমি এই অরণ্যের মধ্য দিয়া বিশ্রব্ধভাবে চলিতেছি।

আমার বিশ্বাস ছিল, আমি এখানে সম্পূর্ণ-রূপে একাকী, তাই হঠাৎ আমার পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার হস্তদ্বয় কটিদেশে লগ্ন ও মস্তক আনত ঃ—বুদ্ধের এই পাষাণ-প্রতিমাটি দুই সহস্র বৎসর হইতে এইখানেই বসিয়া আছে!

তাহার মুখের কাছে আসিয়া, অন্ধকারের মধ্যে দেখিলাম, সেই তার চির-নত দৃষ্টি, সেই তার চিরন্তন স্মিত-হাস্য!

এই সময়ে বিশেষতঃ এই চন্দ্রালোকে, যখন মন্দিরের চূড়াগুলি জঙ্গলের সুদূরপ্রান্ত পর্য্যন্ত, স্বকীয় ছায়া প্রসারিত করে, তখন কি এক পবিত্র ধর্ম্মভাব-রঞ্জিত শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। আজ এই সন্ধ্যাকালে চন্দ্রমা সুনীলকিরণ বর্ষণ করিতেছেন। আজ একটি রাত্রি আমি এই অরণ্যে যাপন করিলাম, আর সৌভাগ্যক্রমে আজিকার রাত্রিতেই দিগ্বিদিক স্বর্গীয় আলোকে প্লাবিত হইল। আমাদের জুলাই মাসের তরল-স্বচ্ছ উষ্ণরাত্রির কথা মনে পড়িতেছে। কেবল প্রভেদ এইমাত্র ঃ—মনে হয়, এখানে গ্রীষ্মকালের যেন অন্ত নাই। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে, পদক্ষুণ্ণ-পথবিশিষ্ট সুন্দর শাদ্বল-ভূমির উপরে—আকাশের যে অংশ তরুশাখায় ঢাকা পড়ে নাই, সেই নভোদেশে—এমন কি সর্ব্বত্রই এখন আলোকে আলোকময়!

এই সময় কীটদিগের সুতীব্র নৈশ সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক অনুরণিত হইলেও, যতই আমি অরণ্য-গভীরে প্রবেশ করিতেছি, ততই যেন নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্রমশঃ মগ্ন হইয়া যাইতেছি।

আমি এখানে একাকীই বিচরণ করিতেছি। জ্যোস্নালোকে যে ছায়া দেখিয়া এখানকার লোকেরা ভয় পায়, আমি সেই মন্দির-চূড়ার প্রকাণ্ড ছায়ার অভিমুখে একাকীই অগ্রসর হইতেছি। পুরোহিত ও রাজাদিগের অপছায়ায় ভয়ে, আমার পথ-নেতা সঙ্গে আসে নাই। কিন্তু যখন আমি এখানকার একটি মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন উহার প্রকাণ্ড দাগোবার নিকট যাইবার জন্য, যে পার্শ্বে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসে,—আমি সেই অংশটিই আগনা হইতেই বাছিয়া লইলাম।

—এই পরিসর-স্থানটুকু প্রেতাত্মার বিচরণভূমি বলিয়াই যেন বোধ হয়! চারি দিকেই সারি সারি স্তম্ভ। এইখানে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি পাথারের

টালির উপর পা পড়ায়, সেই শব্দে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন দেখিলাম, ভগ্নাবয়ব দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে, বেদিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমি আসিয়া পড়িয়াছি;—সমস্তই নীল আলোকে প্লাবিত।

নিস্তব্ধ অসুরাধপুরের মধ্যে, এখানকার নিস্তব্ধতায় কি যেন একটু বিশেষত্ব আছে; এখানকার লোকদিগের ন্যায় ভয়গ্রস্ত হইয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম; দাগোবার চারি দিকে ঘুড়িয়া বেড়াইতে—সেই ভীতিজনক ছায়াময় প্রদেশে প্রবেশ করিতে আমার আর সাহস হইল না।

যাহা হউক, যে সকল রাজা—যে সকল পুরোহিত এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়?—কোন্ নির্ব্বাণের মধ্যে, কোন্ ধূলিরাশির মধ্যে তাঁহারা এখন অবস্থিত? তবে সেই দূর দেশ হইতে তাঁহাদের অপছায়া এখানে আসিবে কি করিয়া?

তা ছাড়া আমার মনে হইতেছে, যে ধর্ম্মে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, সেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখন মৃত,—এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে—পুত্তলিকাদিগের পুরাতন ভস্মের মধ্যে উহা বিলীন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিষ্ঠা।

১

শয়নমন্দিরের দ্বার সশব্দে উদ্ঘাটিত করিয়া আরক্তনেত্রে সুরেন্দ্র বাবু বাহিরে আসিলেন। তীব্রকণ্ঠে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, "আমার ছেলেকে মারিয়াছ কেন?—তুমি মারিবার কে?"

দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, হরেন্দ্র তখন সবে বাসায় ফিরিয়াছে, সুতরাং দাদার অকারণ তীব্র ভৎর্সনা নীরবে হজম করিবার শক্তি সে সময় তাহার ছিল না। সে বলিয়া ফেলিল, "আপনি যখন বলিতেছেন, তখন সত্যই আমি কেহ নহি, আমার কোনও অধিকার নাই; কিন্তু আপনার অতটুকু ছেলে, আমাদের আশ্রিত পিতৃমাতৃহীন অত বড় ভাগিনেয়কে অকারণ চোর বলিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল, কই সে জন্য ত আপনার পুত্রকে শাসন করিলেন না?"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। একটা দুরন্ত রাক্ষস-প্রকৃতি তাঁহার বুকের ভিতরটা নাড়া দিয়া চোখ মুখ দিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কি, যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমার খেয়ে আবার আমার মুখের উপর জবাব! বেশ করিয়াছে, আমার ছেলে কাহারও অন্ন-দাস নহে।"

হরেন্দ্রের ব্রহ্মতালুতে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল, রক্তস্রোত তাহার শিরায় শিরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি ছেলের পক্ষ লইয়া ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিতে চাহেন? আমিও কাহারও গ্রাসাদের কাঙ্গাল নই। আপনার অন্যায় সহ্য করিব কেন?"

দ্বারদেশে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যাও, এখনই আমার বাড়ী হইতে দূর হও।"

দীপকে ঝঙ্কার দিয়া বধূঠাকুরাণী বলিলেন, "ও বাবা! এত তেজ? ভবু যদি বাপের ভাত খেয়ে হ'ত। আমার বাবা ভাগ্যিস্ দয়া ক'রে টাকা দিয়েছিলেন, তাই এখন ব্যবসা করে পেটের ভাত জুটছে। পরের খেয়ে যে মানুষ, তার এত তেজ, এত দম্ভ কেন গা বাপু? সহ্য না হয়, সোজা পথ আছে, চলে যাও।"

"ক্ষমা করুন, দোহাই আপনার বৌঠাকরুণ। আপনার বাক্যযন্ত্রণা অসহ্য। আমি এখনই যাইতেছি।"

হরেন্দ্র দ্রুতপদে স্বীয় শয়নকক্ষের অভিমুখে গমন করিল।

"ও ঘরে যেও না, ও সব জিনিসে হাত দিবার তোমার কোনও অধিকার নাই। সব আমার বাপের বাড়ীর।"

ঘৃণায় অপমানে হরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "কেন, আমার কি কিছুই নাই?"

হরেন্দ্রের ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "তোমার বাবা ত কিছু রেখে যান নি যে থাকবে? সব আমার নিজের। এমন পোড়া বাপও দেখিনি বাপু, পেটের জন্য সর্ব্বস্ব নষ্ট করে গেছে।"

উত্তেজিতস্বরে হরেন্দ্র বলিল, "আমায় যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, কিন্তু সাবধান, বাবার পবিত্র নাম অমন করিয়া উচ্চারণ করিবেন না, আপনি স্ত্রীলোক—"

মুষ্টি উদ্যত করিয়া দাদা এক লম্ফে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "বেশ করিবে, লক্ষবার বলিবে। তোর কি, পাজী, বদমাস! আমার স্ত্রীকে অপমান! বেরো—দূর হয়ে যা।"

হায়! এই কি তাহার চিরজীবনের আদর্শ—সহোদর! অলক্ষ্যে হরেন্দ্রের হস্তও মুষ্টিবদ্ধ হইল।

ভ্রাতৃজায়া সভয়ে ডাকিলেন,—"দরোয়ান!"

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "শূয়ারকো আবি নিকালো।"

মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া হরেন্দ্র বিদ্রূপহাস্যে বলিল, "থাক, আর বীর রসের প্রয়োজন নাই, আমি আপনই যাইতেছি।"

তিন বৎসরের খোকা ডাকিল, "কাকা বাবু, কাকা বাবু!"

দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া শিশু তাহার কাকা বাবুর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ছুটিয়া আসিল। অর্দ্ধপথে শিশুর জননী পুত্রকে কোলে টানিয়া লইলেন। শিশু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরেন্দ্র দ্রুতপদে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনও তাহার কর্ণে ভ্রাতৃজায়ার শাসনবাণী ও শিশুর পৃষ্ঠদেশে তাঁহার কঠিন পাণির নিদারুণ তাড়নার শব্দ ধ্বনিত হইতেছিল।

দ্বাদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে, চলে গেছে, গেট বন্ধ করে দে।"

২

বন্যার ন্যায় নয়নপথে অশ্রুর স্রোত প্রবাহিত হইতে চাহিল। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া উদাস হরেন্দ্র শূন্যহৃদয়ে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। সংসারের পথে সকলেই চলিয়াছে। তাহাকেও এই বক্র, বন্ধুর, সীমাহীন পথ অতিবাহিত করিতে হইবে। বিশ্বের এই চিরন্তন শাসননীতি এড়াইবার উপায় নাই। কিন্তু সে কোথায় যাইবে? এই বিপুল সংসারের মাঝে মাথা রাখিবার স্থান ত তাহার নাই!

দীপ্ত মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র হরেন্দ্রের আবরণহীন মস্তকের উপর অগ্নিতেছিল। তদপেক্ষা রুদ্র তেজে তাহার উদর দগ্ধ হইতেছিল। হায়! সংসারে কে এই অভুক্ত, নিরাশ্রয়ের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে? যাহার কিছু আছে, তাহার সেবার জন্য সংসার সকল প্রকার আয়োজন করিয়া রাখে। অনাথের জন্য কেহ নাই, কিছু নাই! সে পথের ধূলির মত চরণতলে চিরদিন পিষ্ট হইতে থাকে।

দুঃখের সময় পরলোকগতা জননীর স্নেহকুল্ল প্রসন্ন মূর্ত্তি, মমতাস্নিগ্ধ সহস্র বাণী তাহার মনে পড়িতে লাগিল। যে দিন আহারে এতটুকু বিলম্ব হইত, করুণারূপিণী মাতা অন্নের থালা সাজাইয়া পাখা হস্তে আসনের সম্মুখে বসিয়া থাকিতেন।

আজ ক্ষুৎপিপাসাতুর গৃহহীন অভাগার পানে চাহিবার কেহ নাই। তাহার মাতা বলিয়াছিলেন, "বাবা! অন্য স্থানে কাজ কর্ম্মের যোগাড় কর। তোমার দাদা আর সে দাদা নাই।" কিন্তু সে তখন জননীর অনুরোধ আদেশ উপেক্ষা করিয়া দাদার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তাহার যৌবন, শক্তি ও উদ্যম নিয়োজিত করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ব্যবসার উন্নতি হইলে তীর্থবাসিনী জননীকে পুনরায় সংসারে ফিরাইয়া আনিবে, অতীতের সহস্র অশান্তির অপ্রীতিকর স্মৃতি মনের মধ্য হইতে দূর করিয়া দিবে। হায় মানব! বিধাতার অলঙ্ঘনীয় শাসননীতির উপর তোমার দুর্ব্বল শক্তিপ্রয়োগের অভিলাষ বাতুলতা নহে কি? সংসারের শ্রী ত ফিরিয়াছিল, অর্থের স্বচ্ছলতা হইয়াছিল, কিন্তু মাকে তাঁহার ত্যক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বেই তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

"কোথায় যাইতেছ হরেন?"

চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে হরেন্দ্র ফিরিয়া চাহিল। তাহার প্রিয় বন্ধু সতীশচন্দ্র শামলা-মাথায় কোর্টে যাইতেছিলেন।

"তোমার কি এখনও স্নানাহার হয় নাই?"

মেঘস্তম্ভিত আকাশ বায়ুর স্পন্দনমাত্রেই প্রবল ধারায় ধরণী ভাসাইয়া দেয়। বন্ধুর সস্নেহ প্রশ্নে বহু চেষ্টাতেও হরেন্দ্রের চক্ষে অশ্রুধারা বাধা মানিল না। সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বন্ধুর হাত ধরিয়া সতীশচন্দ্র তাঁহার গৃহে ফিরিলেন।

বিশ্রামান্তে সকল ঘটনা শুনিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "রেঙ্গুনে যাবে? আমার বিশেষ পরিচিত একটি সাহেব রেঙ্গুনে চাউলের কারবার করিতেছেন। তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত বাঙ্গালী সহকারী প্রয়োজন। যাবে?"

রেঙ্গুন! অর্থের জন্য এখন ল্যাপল্যাণ্ডে, এমন কি পৃথিবীর প্রান্ত সীমায় যাইতে সে প্রস্তুত। সে টাকাকে আয়ত্ত করিতে চায়। যে অর্থের গৌরবে মানুষ মনুষ্যকে অবহেলায় চরণে দলিত করিয়া চলিয়া যায়, সে সেই চক্রাকার রজতখণ্ডসমূহের সম্রাট হইতে চায়!

হরেন্দ্র বলিল, "তুমি ত জান, কাজের মধ্যে দাদার ব্যবসার কার্য্যটাই জানি, আর এত কাল কেবল কাব্যের আলোচনাই করিয়াছি। কিন্তু কাব্যবৃক্ষের ফল যতই সুধাসিক্ত হউক না কেন, তাহাতে উদরের জ্বালা জুড়াইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। আমি রেঙ্গুনে যাইতে এখনই প্রস্তুত। এ দেশে আর আসিব না, আমি চাকরী করিব।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "তবে বিলম্বে কাজ নাই। তুমি রেঙ্গুনে যাইবার উদ্যোগ করুন।—আমি সাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়া দিতেছি।"

বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধু হরেন্দ্রের হস্তে দুই শত টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "কিছু মনে করিও না ভাই! তোমার এখন অনেক টাকার দরকার। যখন সুবিধা হইবে, শোধ করিও।"

সতীশচন্দ্রের উদারতায় হরেন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বাক্য বহির্গত হইল না। হায়, বন্ধু ত তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নহে!

৩

হরেন্দ্র কর্ম্মসমুদ্রের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করিয়াছিল। দিবানিশি তাহার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছিল; স্মৃতির অঙ্কুশতাড়না,—তীব্র যন্ত্রণার জ্বালা বিস্মৃত হইবার জন্য সে কর্ম্মের কোলাহলে ডুবিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, সে কেবল কাজের সন্ধানে ফিরিত। আর কোনও চিন্তা নাই, আর কোনও বাসনা নাই। অল্পদিনের মধ্যে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া হরেন্দ্র নিজেই চমকিয়া উঠিত। কিন্তু অর্থ চাই, টাকার রাজা হওয়া চাই।

এস হে চক্রাকার টাকা! তুমি মুষ্টিমধ্যে আবির্ভূত হও। তোমার বিশ্ববিমোহন রূপে একবার ভাল করিয়া দেখা দাও। গৃহ উজ্জ্বল করিয়া তোল। তোমার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মায়ালোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, তোমার বিচিত্র নিক্কণে গৃহ ধ্বনিত হউক। হে অখণ্ডমণ্ডলাকার! লৌহসিন্ধুকের গর্ভে ব্যাপ্ত হও, শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া ফেল।

দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, হরেন্দ্র এইরূপে অর্থের ধ্যানে কাটাইয়া দিল।

শাস্ত্রে বলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। একাগ্রমনে ধ্যান করিলে ভগবান্ ভক্তের মানসমন্দিরে আবির্ভূত হন। হরেন্দ্রের একাগ্র কামনা, সকল সাধনার ধন ক্রমশঃ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাহার লৌহসিন্ধুকে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হরেন্দ্র সাহেবের সুনজরে পড়িয়াছিল।

প্রসন্নসলিলা ইরাবতীর পূর্ব্বপারে, নদীর উপরেই তাহার বাঙ্গলো। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সে নির্জ্জন কক্ষে আশ্রয়গ্রহণ করিত। কাহারও সহিত মিশিত না। টাকাকড়ির হিসাব ও কাজ-কর্ম্মের কথা ছাড়া অন্য কোনও প্রসঙ্গের আলোচনা কাহারও সহিত করিত না। আপনাকে সে মনুষ্যসমাজ হইতে সর্ব্বদা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত। মনুষ্যজাতির প্রতি তাহার

একটা তীব্র বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীরা এজন্য তাহাকে অর্থপিশাচ, অহঙ্কারী, ভণ্ড ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিত। তাহাদের এইরূপ সমালোচনায় হরেন্দ্র গৃহকোণের অন্ধকারকে আরও গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত।

কিন্তু চিরপ্রসারিত আকাশের বক্ষে সন্ধ্যার বিচিত্র চিত্র, শ্যামা মেদিনীর হৃদয়োত্থিত অপূর্ব্ব রাগিণী, তটপ্লাবিনী ইরাবতীর উদ্দাম উচ্ছ্বাস তাহার কঠোর শুষ্ক হৃদয়কে এক একবার পূর্ব্বপরিচিত সুরে, নবীনছন্দে জাগাইয়া তুলিত। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কুটীর-অঙ্গনে উপবিষ্টা নগবালিকার কোমলকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত, নদীবক্ষোবিহারী মগধীবরের তানলয়হীন হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যাকুলভাবে তাহার পাষাণ-হৃদয়দ্বারে আসিয়া আঘাত করিত। দুঃস্বপ্নের মোহজাল ছিন্ন করিয়া তাহার প্রাণটাও যেন এক একবার বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিত। কিন্তু প্রভাতের আলোকস্পর্শে জাগরিত পাখীর প্রথম গানে নিদ্রোত্থিত জগৎ বদ্ধপরিকর হইয়া আবার যখন কর্ম্মের সন্ধানে ফিরিত, তাহার হৃদয়ও তখন অর্থোপার্জ্জন ও কর্ম্মস্রোতে আবার ভাসিয়া যাইত। স্বপ্নালসা রজনীর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে হৃদয়ের তারে যে রাগিণীর ঝঙ্কার উঠিত, প্রখর দীপালোকে, কর্ম্মচক্রের ঘর্ঘর রবে তাহার ক্ষীণ-ধ্বনি মিলাইয়া যাইত। প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি এইরূপ জাগরণে ও স্বপ্নে কাটিয়া যাইত। বসন্ত দশবার তাহার বিচিত্র হেমসাজি পুষ্পভারে পূর্ণ করিয়া হরেন্দ্রের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া মৃদুগুঞ্জনে কাণে কাণে বলিয়া গেল, "হে প্রিয়, আমায় লহ, আমায় গ্রহণ কর। আমি চলিয়া গেলে এমন ভাবে আর আমায় পাইবে না।" কিন্তু তাহার ব্যর্থ চেষ্টার দীর্ঘশ্বাস হরেন্দ্রের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রতিহত হইয়া প্রতিবারই ফিরিয়া গেল।

৪

হরেন্দ্র অর্থকে বাঁধিয়াছিল সত্য; কিন্তু হায়! তৃপ্তি কোথায়? প্রথম জীবনে যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিল, যৌবনের প্রথম উন্মেষে, কল্পনার স্বপ্নালোকে, হৃদয়ের মণিমন্দিরে যে আদর্শমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, আজ সে কোথায়? দেউল ভগ্ন, মূর্ত্তি অন্তর্হিত! অবশিষ্ট জীবনটুকু কি অর্থের চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়াই সমাপ্ত করিতে হইবে?

বিনিদ্রনয়নে শয্যার উপর বসিয়া হরেন্দ্র যুক্তকরে ডাকিল, "জননী! তোমার পুত্রকে আবার কোলে টানিয়া লও। যে পথে চলিতে চলিতে পথভ্রান্ত হইয়াছি, তোমার শুভ অঙ্গুলিসঙ্কেতে সেই পুণ্যময় শোভন পথে তোমার সন্তানকে আবার ফিরিয়া যাইতে আদেশ কর। তোমার স্বর্ণবীণার ঊর্দ্ধগামময় বিচিত্র ঝঙ্কারে

বিশুষ্কপ্রায় হৃদয়কুঞ্জ আবার চিরপরিচিত সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠুক। জননী! তোমার করুণ স্নিগ্ধদৃষ্টির উজ্জ্বল আলোকে লক্ষ্যভ্রষ্ট পথে আবার চলিতে আরম্ভ করি।"

তখন উষার অমল দীপ্তি প্রাচীর ললাটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

হরেন্দ্র-সংকল্প দৃঢ় করিয়া সাহেবকে জানাইল, "আমায় বিদায় দিন, দেশে যাইব।"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কবে আসিবে?"

"আর আসিব না সাহেব, একেবারে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

সাহেব বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, "কেন যাইতেছ বাবু? আমি তোমার মাহিনা বাড়াইয়া দিব, তুমি যাইও না।"

আবার অর্থের প্রলোভন!

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "টাকার জন্য আমি যাইতেছি না। আমার জীবনের যথেষ্ট কার্য্য এখনও বাকি আছে। এত কাল আপনার ও অর্থের সেবা করিয়াছি, এখন একবার জননীর সেবা করিবার চেষ্টা করিব।"

সাহেব হয় ত তাহার কথাটা ঠিক বুঝিলেন না। তিনি বলিলেন, "বাবু, তোমার বড় সেণ্টিমেণ্ট্যাল। পৃথিবীতে অর্থোপার্জ্জন ছাড়া আর কি কাজ আছে?"

হরেন্দ্র সে কথার কোনও উত্তর দিল না।

৫

দশ বৎসর পরে কল্যাণদায়িনী জন্মভূমির চিরশান্তিময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে হরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! যাহারা প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া আইসে, পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহারা একটা তৃপ্তি, একটা শান্তি, আত্মীয় পরিজনের অযাচিত প্রীতি, প্রেম ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া প্রবাসের ক্লেশ বিস্মৃত হয়। কিন্তু হরেন্দ্রের গৃহ নাই; সুখ দুঃখের সমভাগী হয়, এমন একটি প্রাণীও ইহসংসারে নাই। তাহার আগমনপ্রতীক্ষায় কাহারও প্রীতি-উৎফুল্ল নয়ন পথের পানে চাহিয়া উদ্বেগাকুল হয় না, সঞ্চিত স্নেহরাশি লইয়া শঙ্কিতহৃদয়ে কেহ প্রবেশদ্বারের পথে সহস্রবার যাতায়াত করে না!

তাহার পুরাতন বন্ধুগণের অনেকেই ইহলোক হইতে অকালে হিসাব মিটাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও হরেন্দ্রের বিপুল শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল ও স্থূল কলেবর দেখিয়া প্রথমে চিনিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কলিকাতার মধ্যে দেখিয়া শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমে একটি অট্টালিকা ক্রয় করিল। তাহার পর মনের মত করিয়া গৃহগুলি সাজাইয়া সে মাতৃভাষার সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

দশ বৎসরে সে অর্থের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল, সুতরাং টাকাগুলি বসাইয়া না রাখিয়া একটা ব্যবসায়ে খাটাইবার সংকল্প করিল।

বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিল।

তখন বন্ধুবর্গ তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, এখন একটি গৃহলক্ষ্মী আনিয়া স্থায়ী গৃহী হইতে হইবে।

হরেন্দ্র বন্ধুগণকে বুঝাইল, "দিল্লীর বিচিত্র লাড্ডুটির তোমরাই সম্পূর্ণরূপে ভোগ দখল করিতে থাক। 'ও রসে বঞ্চিত' আমাকে আর দলে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিও না। আমি বেশ আছি।"

কিন্তু বন্ধুবর্গ এত সহজে রণে ভঙ্গ দিলেন না। দুই এক জন তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তখন হরেন্দ্র স্পষ্ট বলিল, "ভাই, তোমাদের বৃথা চেষ্টা, আমি বিবাহ করিব না। যে দশ বৎসর পরের শোণিতসম অর্থরাশি শোষণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার হৃদয় এত কোমল নহে যে, কথার প্রলোভনে সহসা মুগ্ধ হইবে। বিবাহ না করিলে যদি মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই।"

হরেন্দ্রকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বন্ধুগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। কেহ কেহ তাহার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণও হইলেন।

হরেন্দ্র ভাবিল, অদৃষ্ট!

৬

কাব্য-সাহিত্য-আলোচনায় বিক্ষিপ্ত মনটাকে নিবিষ্ট করিবার জন্য হরেন্দ্র চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! ভাবস্রোত আর পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের কূলে উছলিয়া উঠে না কেন? যেন একটা বিরাট পাষাণতলে অবরুদ্ধ হইয়া কল্পনার খরপ্রবাহ ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, পাষাণে প্রতিহত হইয়া ব্যর্থমনোরথে আবার ফিরিয়া যাইতেছে।

সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর একটা তীব্র বিদ্বেষ, ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস তাহার হৃদয়ের মধ্যে দশ বৎসর ধরিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহারই অভিশাপস্বরূপ কি এই নির্ম্মম শাস্তি? তাহার প্রাণটা যেন সঙ্কীর্ণ-গণ্ডীর মধ্যে আর রুদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিল না। অভ্যাসের মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া উদার বিশ্বের পানে ছুটিয়া বাহিতে উদ্যত হইল।

বিচিত্রবেশভূষায় হরেন্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কাগজ কলম টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল। সে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ছাপাখানার দিকে অগ্রসর হইল।

তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। চারি দিকে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ছাপাখানার পার্শ্বের বাড়ী হইতে বাদল্লা-হাওয়ার সঙ্গে হারমোনিয়ম ও সঙ্গীতের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

হরেন্দ্র ছাপাখানার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রিণ্টার কম্পোজিটার সকলেই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। হরেন্দ্র ফিরিতেছিল, কিন্তু কক্ষমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে দেখিয়া সে ছাপাখানার মধ্যে প্রবেশ করিল। একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক সেই উজ্জ্বল আলোকে বসিয়া তখনও নিবিষ্টমনে কাজ করিতেছিল।

হরেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। বালকের সুন্দর মুখমণ্ডলে আলোকরশ্মি পড়িয়াছিল। তাহার কর্ম্মপ্রিয়তা ও একাগ্রতা দর্শনে হরেন্দ্র মুগ্ধ, আকৃষ্ট হইল। সে নিঃশব্দচরণে বালকের পশ্চাতে গমন করিল।

বহুক্ষণপরে বালক তাহার ক্লিষ্ট নয়নদ্বয় তুলিয়া পশ্চাতে চাহিল। হরেন্দ্রকে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বালকের পৃষ্ঠে হাত দিয়া স্নেহবিগলিতকণ্ঠে হরেন্দ্র বলিল, "তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিতেছ কেন?"

অবনতমস্তকে বালক মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "ম্যানেজার বাবু বলেছেন, বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিলে একট্রা পাওয়া যাইবে।"

হরেন্দ্র বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, রাত্রি জাগিয়া প্রত্যহ পরিশ্রম করিলে মারা পড়িবে। তুমি আর কখনও রাত্রি জাগিয়া কাজ করিও না।"

বালকের বিনয়নম্র ব্যবহার দর্শনে হরেন্দ্রের হৃদয় আরও আকৃষ্ট হইল।

বালকের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে আবার হরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিল। যেন একটা তীব্র বেদনা তাহার উজ্জ্বলদৃষ্টি ভেদ করিয়া বহির্গত হইতেছিল।

হরেন্দ্র তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছেন?"

ছলছলনেত্রে বালক বলিল, "মা, বাবা, দাদা—সবাই আছেন, কিন্তু—"

বালকের কণ্ঠরোধ হইল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার মুখমণ্ডলে যে নীরব দুঃখের কাহিনী, দারিদ্র্যের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে, হরেন্দ্র যেন তাহা স্পষ্ট পাঠ করিল।

পাশের বাড়ী হইতে হারমোনিয়মের সুরের সহিত সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই—
চির দিন কেন পাই না।"

হরেন্দ্র বালককে বলিল, "তুমি বাড়ী যাও। আর এখন কাজ করিতে হইবে না।"

বালক চলিয়া গেল।

হরেন্দ্র ধীরে ধীরে একখানি আসনে বসিয়া পড়িল। উন্মুক্ত বাতায়নপথে সঙ্গীতের ধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল—

"কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে—"

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার হৃদয়মধ্যে কি বিপ্লব বাধিয়াছে!

ম্যানেজারের বহিতে হরেন্দ্র লিখিল, বালকের মাহিনা যেন দ্বিগুণিত করা হয়। তাহার প্রেসে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ যেন পরিশ্রম না করে।

৭

ভবানীপুরে বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ ছিল; হরেন্দ্র ভোজনান্তে গৃহে ফিরিতেছিল।

আকাশে ছিদ্রশূন্য মেঘ। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধতাভারে আচ্ছন্ন। হরেন্দ্র দ্রুতগতিতে ট্রামের রাস্তায় আসিল। বাতাসটা যেন ক্রমে আর্দ্র, শীতল হইয়া আসিল। বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা দেখিয়া পথিপার্শ্বস্থ একটা খোলার ঘরের ছাঁচের নীচে সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ট্রাম তখনও আসিল না।

কিন্তু বৃষ্টি দেখা দিল।

হরেন্দ্র যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই গৃহের অভ্যন্তরে কাহারা যেন গোলমাল করিতেছিল। ঝড়বৃষ্টির শব্দে স্পষ্ট কিছু শোনা যাইতেছিল না।

কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চে উঠিল। এক জন বলিল, "তোর জন্য আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, পথের ভিখারী হইয়াছি, তবু তুই এ কুঅভ্যাস ত্যাগ করিবি না?"

আর এক জন বলিল, "বেশ করিব, তোমরা—"

বৃষ্টি আরও প্রবলবেগে নামিয়া আসিল। বাতাসের শব্দ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

ঝড় বৃষ্টির শব্দ অতিক্রম করিয়া ভিতর হইতে উচ্চক্রন্দনের শব্দ উত্থিত হইল—"তুই আমায় মারলি?"

সেই আর্ত্ত চীৎকারে, বেদনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে হরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল।

গর্জ্জন করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "ফের যদি অমন ক'রে চীৎকার কর, তা হ'লে এখনি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহৎ গুরু পদার্থের পতনশব্দ হরেন্দ্রর কাণে গেল।

হরেন্দ্রের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় যেন অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে সে বাড়ীর দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

অস্ফুট বিদ্যুদালোকে হরেন্দ্র দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি ভিজিতে ভিজিতে অঙ্গন অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে আসিতেছে।

তাহার পশ্চাৎ হইতে রমণীকণ্ঠে কেহ বলিল, "রাগ ক'রে কোথায় চল্‌লে? উপযুক্ত ছেলে না হয় দু' কথা বলেছে, একটা চড়ই না হয় মেরেছে, তা ঘর ছেড়ে কোন্ চুলোয় যাচ্চ?"

ক্রুদ্ধস্বরে গৃহমধ্য হইতে প্রহারকারী বলিল, "যাক্ না, বুড়ো যাবে কোথায়? তুমি শুয়ে থাক, ঠাণ্ডা লাগিও না মা। পেটের জ্বালায় এখনি ফিরে আস্‌বে।"

পথিপার্শ্বস্থ গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক লাঞ্ছিত বৃদ্ধের মুখের উপর পড়িল। তাহার মলিন, ছিন্নপ্রায় পরিধেয় বৃষ্টিসিক্ত, কর্দ্দমাক্ত! জীর্ণ মুখমণ্ডল রক্তশূন্য।

হরেন্দ্রের হৃৎপিণ্ডটা যেন অজ্ঞাত বেদনাভরে সহসা আকুল হইয়া উঠিল।

"বাবা, বাবা, রাগ করে যেও না, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, ফিরে এসো!" বলিতে বলিতে একটি বালক ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধের মস্তকে একটা ছাতি খুলিয়া ধরিল; একখানা ছিন্ন কম্বল সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া দিল। তার পর পিতার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বালক কহিল, "এই সে দিন জ্বর থেকে উঠেছ, বাবা! এখনি আবার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আস্‌বে। ফিরে এস বাবা!"

হরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। এ যে তাহার প্রেসের সেই কম্পোজিটার বালকের কণ্ঠস্বর!

অন্ধকারের দিকে হরেন্দ্র সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত দেহ এরূপ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে কেন?

রোরুদ্যমান বৃদ্ধ পুত্রের হাত ধরিয়া বলিল, "না বাবা, আর আমি ফিরে যাব না। তুমি বৃষ্টিতে ভিজো না, যাও, ঘরে যাও। তোমার দাদা জানিতে পারিলে এখনই তোমায় মারিবে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। একদিন তাহাকে নিরপরাধে তাড়াইয়া—"

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। বিকট বজ্রনাদে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।

"দেবা, তুই বৃষ্টিতে বাহিরে গিয়াছিস্? এখনো এলি না? মার খাবি বল্‌ছি।"

বালক একবার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলিয়া গেল।

হরেন্দ্র বৃদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমি সব শুনিয়াছি। আসুন, আজ আপনি আমার অতিথি।"

বৃদ্ধ বিহ্বলনেত্রে হরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

হরেন্দ্র বলিল, "কোনও সঙ্কোচ বা ভয় করিবেন না; আসুন।"

বৃদ্ধকে একরূপ টানিয়া লইয়া হরেন্দ্র ট্রামে উঠিল।

৮

ঝড় ও বৃষ্টি মাতামাতি করিতেছিল।

পার্শ্বের কক্ষে অতিথি নিদ্রিত। শয্যার উপর বিনিদ্রনয়নে হরেন্দ্র আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল। দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া গেল, তথাপি তাহার নিদ্রা আসিল না। অতীতের সহস্র স্মৃতি বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। তাহার শরীর ও মনের মধ্যেও যেন একটা বিপ্লব বাধিয়াছিল। হরেন্দ্র তাহার হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিল।

বাতাস আর্ত্তচীৎকার করিয়া রুদ্ধ জানালা দরজায় আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি—পৃথিবীতে কি প্রলয়কাল উপস্থিত!

ক্রমে হরেন্দ্রের বোধ হইল, তাহার সমস্ত দেহে যেন বেদনা সঞ্চারিত হইতেছে। শয্যার উপর পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এ কি? তাহার কি হইল?

দরজা খুলিয়া হরেন্দ্র বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। আর্দ্র বাতাস বহিয়া গেল, অন্ধকারপূর্ণ আকাশ মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎপ্রভায় উদ্ভাসিত হইল।

শীতল বাতাসে তাহার দেহ সুস্থ হইল না, বরং হাত পা যেন ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সমস্ত বিশ্বটা যেন শূন্য বলিয়া মনে হইল। কি যেন ঘটিবে, কি যেন শেষ হইয়া আসিতেছে, যেন একখানা অন্ধকার যবনিকা তাহার চক্ষুর উপর পড়িয়া সমগ্র পৃথিবীটাকে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।—এমনই একটা অমূর্ত্ত আশঙ্কায় হরেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ একটা দুর্দ্দমনীয় বমনেচ্ছা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

* * * *

অতিকষ্টে হরেন্দ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হস্ত পদ অবশ, শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ভৃত্যগণকে ডাকিবে, এমন শক্তিও যেন নাই।

সহসা তাহার মনে হইল, এই পীড়া কি তাহার জীবনগ্রন্থি শিথিল করিতে আসিয়াছে?—একটা অব্যক্ত আতঙ্কে হরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

সত্যই কি ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ! হায়! সংসারের সব কাজ কি এখনই শেষ হইয়া যাইবে? এই সুন্দর পৃথিবী হইতে এত শীঘ্র দোকানপাট তুলিতে হইবে? হৃদয়ের মধ্যে যে মহাবাণী ধ্বনিত হইতেছে, ইহা কি সেই মহাকালের আহ্বানসূচক?

কিন্তু হায়! এখনও যে তাহার পাথেয় সঞ্চিত হয় নাই! তাহার বহু কার্য্য এখনও যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে!

একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা, সীমাহীন স্তব্ধতা তাহার বুকের উপর, হৃৎপিণ্ডের উপর যেন পাষাণের মত চাপিয়া ধরিল।

* * * *

যখন হরেন্দ্র চক্ষু চাহিল, তখন দিবার আলোক কক্ষমধ্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ডাক্তার বাবু গম্ভীরমুখে হাত টিপিয়া নাড়ী দেখিতেছেন।

অদূরে তাহার বন্ধু ও গত রজনীর অতিথি দণ্ডায়মান।

তবে কি সে মরে নাই?

ক্ষীণস্বরে হরেন্দ্র ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন বুঝিতেছেন?"

উৎফুল্লভাব দেখাইয়া ডাক্তার বলিলেন, "ভয় কি, সারিয়া উঠিবেন।"

কিন্তু চিকিৎসকের বাহ্য প্রফুল্লতার মধ্য হইতে প্রচ্ছন্ন সংশয় আপনি ফুটিয়া উঠিল।

হরেন্দ্র ম্লানহাস্যে বন্ধুকে বলিল, "এটর্ণি—বাবুকে আনিতে পাঠাও।"

বন্ধু অশ্রুসিক্তনয়নে চলিয়া গেলেন।

৯

অতি কষ্টে কাগজখানিতে সহি করিয়া হরেন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে এটর্ণি বাবুকে বলিল, "পাশের ঘরে যে বৃদ্ধ অতিথি আছেন, কাগজখানি তাঁহাকে দিবেন, বুঝাইয়া বলিবেন।"

এটর্ণি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার সকলকে গৃহত্যাগ করিতে বলিলেন। রোগীর নিদ্রার প্রয়োজন।

হৃদয়ের মধ্যে যে গুরুভার পাষাণের মত চাপিয়া ছিল, তাহা যেন অনেকটা নামিয়া গেল। হরেন্দ্র যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। হে মৃত্যু! হে অমৃত!

এখন এস, এক আঘাতে হরেন্দ্রের জীবনগ্রন্থি শিথিল করিয়া দাও, তাহার আর বিশেষ আক্ষেপ নাই।

সহসা দরজা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। হরেন্দ্র ফিরিয়া চাহিল। কে তুমি বালক? করুণ-ব্যাকুল-নয়নে কেন তাহার পানে চাহিতেছ? ঐ সুন্দর মুখে কালিমা মাখা, নয়নে উদ্বেগ ও শ্রান্তির চিহ্ন! বালক, পিতার সন্ধানে আসিয়াছ? যাও, ঐ ঘরে তোমার পিতা আছেন।

বিবর্ণমুখে বালক নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেল। হরেন্দ্রের চক্ষের নীরব ভাষা কি সে বুঝিতে পারে নাই?

আবার তীব্র বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণায় হরেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িল।

দরজা আবার মুক্ত হইল। গত রাত্রির বৃদ্ধ অতিথি রোগীর শয্যাপ্রান্তে উন্মত্তের মত আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ হরেন্দ্রের শোণিতশূন্য শীতল হস্ত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল, "আমার প্রাণের ভাই, হারানিধি তুই! আজ তোর এই দশা! পিশাচ আমি, পাষণ্ড আমি, তোকে নিরপরাধে তাড়াইয়া দিয়া কি যন্ত্রণা—কি শাস্তিই পাইয়াছি, কিন্তু তবু আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই। আমি তোর সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলাম, আজ তুই তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিয়াছিস। তোর সর্ব্বস্ব দিয়া এখন আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবি! ডাক্তার! ডাক্তার! শীঘ্র এস।"

"কাকা বাবু! কাকা বাবু!"

আকুল আহ্বান হরেন্দ্রের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। দশ বৎসর পূর্ব্বের সেই স্নেহব্যাকুল আহ্বান কি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আজ তাহাকে ধরা দিতে আসিয়াছে? সে কৃপণের মত এতদিন সেই স্নেহসম্বোধনটি বুকের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল যে!

কিন্তু পৃথিবীর আলোক আর যে চক্ষে পড়িতেছে না। কোনও স্নেহসম্বোধন কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। কোথায় সেই স্নেহব্যাকুল নয়নদ্বয়?

হরেন্দ্র দাদার হস্ত সবলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। মৃত্যু! আসিতেছ কি?

বৃদ্ধের হাত সরাইয়া লইতে বলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনারা দেখ্‌ছি রোগীকে বাঁচিতে দিবেন না। এরূপ উত্তেজনায় সহসা মৃত্যু হইতে পারে। অত ব্যস্ত হইবেন না। দেখিতেছেন না, ইহার মূর্চ্ছা হইয়াছে?"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

রেডিয়ম্।

আধুনিক প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ প্রায় পঞ্চাধিক সপ্ততি মূলবস্তুর অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বশেষে আবিষ্কৃত পদার্থের নাম দিয়াছেন—রেডিয়ম্ (Radium)। এক জন ফরাসী পণ্ডিত এই অভিনব পদার্থের আবিষ্কারক। তাঁহার নাম কুরী (M. Curie)। এই আবিষ্কার বিষয়ে অধ্যাপক কুরীর পত্নী তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। পত্নীর অসাধারণ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে অধ্যাপক কুরী হয় ত রেডিয়ম্ আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এই নূতন পদার্থের নানাপ্রকার গুণের পরীক্ষা, ইহার দুরূহ পরিশোধনপ্রক্রিয়া বিষয়ে ও নানাপ্রকার যন্ত্রাদির ব্যবহারে, মিসেস্ কুরী অকাতরে পতির সাহায্য করিয়া, তাঁহাকে বিবিধ যুক্তি ও পরামর্শ দিয়া, প্রকৃতপক্ষে সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর হইল, রেডিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বেকারেল (Becquerel) য়ুরেনিয়ম্ (Uranium) নামক একটি মূল পদার্থের আবিষ্কার করিবার পর রেডিয়ম্ আবিষ্কারের পথ সুগম হইয়াছিল। হয় ত য়ুরেনিয়ম্ আবিষ্কৃত না হইলে রেডিয়মের অস্তিত্ব মানবসমাজে আরও বহুকাল অজ্ঞাত থাকিত।

রেডিয়ম্ একপ্রকার খনিজ পদার্থ। ইহা প্রস্তরাদির সহিত মিশ্রিত থাকে। স্বর্ণাদি ধাতুকে যেমন খনি হইতে তুলিবার পর পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ ইহাকেও পরিষ্কৃত করিতে হয়। ইহা অনেক সময়ে বেরিয়ম্ (Barium) নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে। য়ুরেনিয়মের খনি হইতে য়ুরেনিয়ম্ বাহির করিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইবার পর যে রাশি রাশি লালবর্ণ পদার্থ পড়িয়া থাকে, তাহাতেই এই দুর্লভ রেডিয়ম্ লুক্কায়িত থাকে। এক সময়ে এই লালবর্ণ পদার্থ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে, পাংশুবৎ পরিত্যক্ত হইত। কিন্তু এক্ষণে রেডিয়মের একটি আকর বলিয়া উহার বিশেষ আদর হইয়াছে। বাজারে মূল্যও হইয়াছে। ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরের বহির্ভাগে আচার্য্য কুরীর রেডিয়ম্ বাহির ও পরিশোধন করিবার এক কারখানা আছে। এই কারখানায় পূর্ব্বোক্ত রাশি রাশি লালবর্ণ রাবিশ হইতে বহুচেষ্টায় বহুকষ্টে ও বহুব্যয়ে অতিসামান্যপরিমাণ রেডিয়ম্ সঞ্চিত হয়। বিস্তর জ্বালান গালাই ঢালাই, ছাঁকাছাঁকি, দানাবাঁধাই ইত্যাদি করিয়া এক

গুঁড়া অতি অল্প পাওয়া যায়। ইহাই বিশুদ্ধ রেডিয়ম্। তবে ইহা প্রকৃত মূল পদার্থ নহে। ইহা রেডিয়ম্ ধাতু ও ক্লোরিন্ নামক গ্যাসের একটি যৌগিক পদার্থ। এই ধাতু-ক্লোরাইড্ বা ব্রোমাইড্ রূপেই থাকে। ইচ্ছা করিলে এই যৌগিক পদার্থ হইতে মূল ধাতুটি পৃথক করা যাইতে পারেও কিন্তু তাহাতে কোনও ফল নাই। কারণ, ইহার মৌলিক অবস্থা অত্যন্ত অস্থায়ী। অবিলম্বে বায়ুর অম্লজান গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া রূপান্তরিত ও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ক্লোরাইড্ বা ব্রোমাইড্ অবস্থায় ইহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। অস্মদ্দেশীয় কবিরাজগণের যেমন ধাতুর মারণ শোধনাদি প্রক্রিয়া আছে, এবং এক এক ধাতুকে যেমন শত সহস্রবার মারণ করিবার বিধি আছে, সেইরূপ অতি বিশুদ্ধ রেডিয়ম্ পাইবার জন্য প্রকৃতই লক্ষাধিকবার শোধন করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় প্রক্রিয়ার ন্যায় ইহাতেও অত্যন্ত সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হয়। নতুবা এই দুর্লভ ধাতুর বহু আয়াসলব্ধ সামান্য পরিমাণের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। শুনা যায়, আচার্য্য কুরী ও তাঁহার পত্নী আপনারাই এই শোধন কার্য্যের শেষাংশ সম্পন্ন করেন। সামান্য কর্ম্মচারী বা অন্যের হস্তে দিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। রেডিয়মের প্রাপ্তি বহুব্যয়সাধ্য। অধ্যাপক কুরীর গণনানুসারে এক হাজার গ্র্যাম—প্রায় এক সের রেডিয়ম্ বর্ত্তমান প্রথানুসারে বিশুদ্ধ অবস্থায় বাহির করিতে গেলে প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ আজকালের হিসাবে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় এক রতি রেডিয়মের মূল্য তিন হাজার রতি সুবর্ণের মূল্যের সমান। সুতরাং ইহা শুধু দুর্লভ নহে, দুর্মূল্যও বটে। অথবা জগতে দুর্মূল্যতা দুর্লভতার প্রতিশব্দমাত্র। যাহা হউক, যদি কোন নরকুবের এক মণ কি দুই মণ রেডিয়ম্-সংগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তবে তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইতে হইবে। কেন না, এই রত্নগর্ভা ধরণীতে রেডিয়মের পরিমাণ অতি অল্প বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। অন্ততঃ তাহার সন্ধান বর্ত্তমান সময়ে খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক কুরী বলেন, সমস্ত পৃথিবীতে এখন বড় বেশী ধরিলে ৬০ গ্রেন্ রেডিয়মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ফ্রান্সে ১৫ গ্রেন্, জর্ম্মনি দেশে ১৫ গ্রেন্, আমেরিকা মহাদেশে কিছু কম ১৫ গ্রেন্, আর পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশে গ্রেন্ আট রেডিয়ম্ বিদ্যমান আছে। যদি কি মণ মণ রেডিয়ম্ পৃথিবীতে থাকে, তাহা আজও মনুষ্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তি রেডিয়মের অস্তিত্ব উপস্থিত জানা গিয়াছে। তাহাও প্রস্তরগর্ভে সহিত মিশ্রিত থাকিয়া এরূপ সূক্ষ্মভাবে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া

রহিয়াছে যে, ইহারই উদ্ধার করিতে সমগ্র মানবজাতির সমস্ত ব্যাঙ্ককে লালবাতি জ্বালিতে হয়। কলিকাতার দুই তিনটি বড় কলেজে ও ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভায় রেডিয়মের কিঞ্চিৎ নমুনা সম্প্রতি আনীত হইয়াছে।

যে পদার্থ এত দুর্লভ দুর্মূল্য, তাহার কি বিশেষ বা অসাধারণ গুণ আছে, তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। এই অদ্ভুত পদার্থ হইতে অবিরাম তাপ ও আলোক বহির্গত হয়। অথচ তজ্জন্য ইহার কিছুমাত্র শক্তির হ্রাস বা আয়তনের ক্ষয় লক্ষিত হয় না। জগতের দিবাকর মহাদ্যুতি সূর্য্য তাপ ও রৌদ্র বিকীরণ করিয়া ক্রমশঃ হীন হইতেছেন, কিন্তু এই রেডিয়ম্-কণার তেজ অক্ষয়। যদি ইহার কিছু হ্রাস হয়, তাহা অতি সূক্ষ্ম উৎকৃষ্টতম যন্ত্রের সাহায্যেও জানিতে পারা যায় না। তাপ ও আলোক ব্যতীত এই ধাতু হইতে তিন প্রকার অদৃশ্য কিরণ সতত বহির্গত হয়। ইহাদের গতি আলোকের গতির সমতুল্য। এই কিরণমালার ক্রিয়া অতি বিস্ময়কর। ইহাতে উপকার ও অপকার উভয়ই সাধিত হয়। ইহা জীবনীশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। জীবের আকার পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। অনেক প্রকার জীবাণু (Bacteria) নষ্ট করিতে পারে। বিবিধপ্রকার রোগ ও ক্ষতাদি আরোগ্য করিতে পারে। বিশুদ্ধ অবস্থায় রেডিয়ম্ শ্বেতবর্ণ গুটিকা (Crystal) রূপে থাকে। এই গুটিকাগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে পারা যায়। তখন ইহা দেখিতে ঠিক লবণের মত। ছোট একটি নল বা কাচের শিশির ভিতর একটুখানি এই সাদা গুঁড়া রাখিয়া পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইয়া থাকেন। এই কাচের শিশির কতকটা সীসার আবরণে আবৃত থাকে। কারণ, রেডিয়ম্ হইতে যে কিরণমালা বহির্গত হয়, তাহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী। সীসা ভেদ করিয়া এই রৌদ্র বাহির হইতে পারে না। ইহার অদ্ভুত রৌদ্র যদি কয়েক মিনিট শরীরের কোন স্থানে লাগে, তবে সেখানে কিছুদিন পরে এক ভয়ানক ক্ষত দেখা দেয়। সে ক্ষত সহজে সারে না। রেডিয়মের কিরণ দেহের কোনও স্থলে লাগিলে প্রথমতঃ কিছুই হয় না। কিন্তু কিছু দিন পরে, প্রায় এক পক্ষ পরে, সেই স্থান লাল হইয়া চর্ম্মক্ষয় হইতে হইতে পরে এক গভীর ক্ষতে পরিণত হয়। এ জন্য রেডিয়ম্ লইয়া পরীক্ষাদি অনেক সময়ে নিরাপদ নহে। অধ্যাপক কুরী ও বেকারেল এই রুদ্র পদার্থের রৌদ্র আক্রমণে অনেক ভুগিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র শিশিতে যে পরিমাণ রেডিয়ম্ থাকে, তাহার উষ্ণতা চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু অপেক্ষা প্রায় তিন ডিগ্রি (ফারেনহাইট) অধিক। এই নির্গত তাপের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। এক ছটাক রেডিয়ম্ প্রতিঘণ্টায় সমপরিমাণ অর্থাৎ এক

ছটাক বরফ গলাইতে পারে। এবং বহুকাল ধরিয়াই এইরূপ করিতে পারিবে। এক সের পাথুরে কয়লা সম্পূর্ণরূপে পুড়িলে এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ তাপ দিতে পারে, এক সের রেডিয়ম্ ৮০ ঘণ্টায় সেই তাপ দিতে সমর্থ। কিন্তু কয়লা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাপ বজায় রাখিতে গেলে পুনঃপুনঃ নূতন কয়লা দিতে হইবে। কিন্তু রেডিয়মের নিজেরও ক্ষয় বুঝিতে পারা যায় না, আর তাহার তাপেরও হ্রাস দেখা যায় না। আপাততঃ মনে হইতে পারে, উহা যেন চিরকাল সমভাবে তাপ দিতে থাকিবে। প্রকৃতই কি রেডিয়মের কিছুমাত্র ক্ষয় নাই? এক জন ফরাসী অধ্যাপক গণনা করিয়াছেন যে, কোন নির্দ্দিষ্টপরিমাণ রেডিয়ম্ চূর্ণ বা গুটিকা এক শত কোটী বৎসর সমভাবে তাপ বিকীরণ করিবার পর দশ লক্ষ ভাগের একভাগমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। অন্ধকার ঘরে ইহার রৌদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। আন্দাজ এক গ্রেন্ কি আধ রতি রেডিয়ম্ হইতে যে আলোক বাহির হয়, তাহা কোনও ছাপান কাগজের কাছে ধরিলে, লেখা বেশ পড়িতে পারা যায়। অধ্যাপক কুরী গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৫০ গ্রেন্ রেডিয়ম্ ১৫ বর্গইঞ্চি স্থানে পাঠোপযোগী আলোক দান করিতে পারে। এক সের রেডিয়ম্ ২০ হাত দীর্ঘ ২০ হাত প্রস্থ একটি ঘর মৃদুভাবে আলোকিত করিতে পারে। যদি এই রেডিয়মের নিকট জিঙ্ক সল্‌ফাইডের (Zinc Sulphide) পর্দ্দা রাখা যায়, তাহা হইলে এই পর্দ্দাগুলি ইহার রৌদ্রে প্রস্ফুরিত (Phosphorescent) হইয়া ঘরটিকে বেশ আলোকিত করিতে পারে। আচার্য্যের এই কথায় আশা হয়, দূর ভবিষ্যতে রেডিয়ম্ সৌদামনীকে বিদূরিত করিয়া মানবগৃহ নাট্যশালাদি আলোকিত করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কারণ, কুরীই বলেন যে, রেডিয়মের দুষ্প্রাপ্যতা ও অগ্নিমূল্যতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহার আলোকে মানুষের অন্ধতা, পক্ষাঘাত ও অনেক প্রকার স্নায়বীয় রোগ জন্মিতে পারে। এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভবিষ্যতে যদি কোনপ্রকার কৌশলময় আবরণ উদ্ভাবিত হয়, তবে আশা কতকটা সফল হইতে পারে।

চক্ষু বুজিয়া, চক্ষুর পাতার উপর রেডিয়মের শিশি চাপিয়া ধরিলে চক্ষুর ভিতর একপ্রকার আলো দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুগোলকের তরলাংশকে এইরূপে প্রস্ফুরিত করিবার রেডিয়ম্ কিরণের শক্তি আছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ললাটের প্রান্তভাগের অস্থির উপরে রেডিয়ম্-শিশি ধরিলেও চক্ষুর মধ্যে ক্ষীণালোক আবির্ভূত হয়। অস্থির ভিতর দিয়া রেডিয়মের কিরণ কার্য্য করিতে পারে। এই

প্রকারের নানা পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক কুরী অনুমান করেন যে, চক্ষুর কতকগুলি রোগে রেডিয়মের কিরণ উপকারে লাগিতে পারে। কোনও কোনও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, যে ব্যক্তি চক্ষে ছানি পড়াতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সে যদি উক্ত প্রকারে রেডিয়মের আলোক দেখিতে পায়, তবে ছানি সরাইয়া দিলে সে দৃষ্টি পাইতে পারে। কিন্তু যদি আলোক দেখিতে না পায়, তবে তাহার চক্ষু সারিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

রেডিয়ম্ হইতে তাপ আলোক ও বিবিধ কিরণ ব্যতীত এক প্রকার বাষ্পীয় পদার্থ নিরন্তর বহির্গত হয়। জল কিংবা কর্পূর হইতে উত্থিত বাষ্পের ন্যায় ইহা রেডিয়মের সূক্ষ্মতর বাষ্পমাত্র। এই বাষ্প ইহার নিকটবর্ত্তী পদার্থের উপর সঞ্চিত হইয়া, কিছু সময়ের জন্য সেই পদার্থকে রেডিয়মের গুণবিশিষ্ট করিয়া তোলে। এই তথ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধ্যাপক কুরী অতি কৌশলপূর্ণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, রেডিয়মের কিরণ কাচ ভেদ করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা হইতে নির্গত বাষ্প কাচভেদ করিয়া যাইতে পারে না। এই পরীক্ষা তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভাতে (Royal Institutionএ) তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে অতি সুখ্যাতির সহিত করিয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—থ্যালিয়ম্ নামক মূল পদার্থের আবিষ্কর্ত্তা ও সুপ্রথিত প্রেততত্ত্ববিৎ-উইলিয়ম ক্রুক্স্ (Sir William Crookes) রেডিয়মের উক্ত বাষ্পনির্গমন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রে রেডিয়ম্-কণার বাষ্পবিকীরণ সহস্র সহস্র উল্কাপাতের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। রেডিয়ম্ হইতে নির্গত এই বাষ্পসঙ্ঘাতে যে কোনও দ্রব্য ইহার গুণ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য অতি অল্পপরিমাণ ধাতু সঞ্চিত থাকিলেও তাহার বাষ্প দ্বারা একখণ্ড লৌহ কি কাচ রেডিয়মের ধর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া নানারূপ পরীক্ষাদি করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিককাল এই কৃত্রিম রেডিয়মের শক্তি থাকে না। কৃত্রিম ধাতুর এই শক্তির স্থিতিকাল (তাম্র, সীসক, রবার, মোম্, এলুমিনিয়ম্, প্যারাফিন্ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া,) আচার্য্য কুরী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী যথার্থরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। পরীক্ষার ফলে তাঁহারা নিম্নলিখিত দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, (১) সকল প্রকার পদার্থকেই রেডিয়মের বাষ্পসংযোগে রেডিয়মের ধর্ম্মবিশিষ্ট করিতে পারা যায়। (২) রেডিয়মের বাষ্প কাচভেদ করিয়া যাইতে পারে না বলিয়া কোন সেই ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুকে কাচের অথবা তদ্রূপ কোনও পদার্থের নল বা শিশির ভিতর রাখিয়া দিলে তাহার শক্তি অধিক দিন পর্য্যন্ত থাকে। এইরূপে সুরক্ষিত

হইলে তাহার শক্তি চারি দিন অন্তর অর্দ্ধেক করিয়া কমিয়া যায়। আর যদি ওরূপ করিয়া না রাখা যায়, তবে সেই অরক্ষিত কৃত্রিম বস্তুর শক্তি আধ ঘণ্টা অন্তর (কুরি দম্পতির কড়াকড়ি হিসাবে ২৮ মিনিট অন্তর) অর্দ্ধেক কমিতে থাকে।

রেডিয়ম্ সম্বন্ধে প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহা পীতাভ ফস্‌ফরাস্‌কে লালবর্ণে পরিণত করে। ইহার কিরণে অনেক সময়ে বায়ুতে ওজন (Ozone) নামক পদার্থের বৃদ্ধি হয়। জলে অল্পপরিমাণ রেডিয়ম্ ফেলিয়া দিলে, জল বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির হয়। কোন কাচপাত্রে দ্রবীভূত রেডিয়ম্ রাখিলে সেই কাচের বর্ণ বেগুনিয়া বা বাদামে হইয়া যায়। কাচকে অত্যন্ত উত্তপ্ত না করিলে এই রঙ্গ কিছুতেই যায় না। কাচ ও রত্নাদির বর্ণপরিবর্ত্তনে রেডিয়মের এই গুণ ব্যবহারে আসিতে পারে। রেডিয়ম্ দ্বারা আসল ও নকল হীরক চিনিয়া লওয়া যায়। কোনও অন্ধকার ঘরে আসল হীরকের নিকট রেডিয়ম্ ধরিলে প্রস্তরখানি অতিশয় প্রস্ফুরিত হইয়া আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকে। কিন্তু নকল বা ঝুটো পাথরের উপর তাহার এরূপ কোনও ক্রিয়া দেখা যায় না।

জান্তব-জীবনে রেডিয়মের প্রভাব অতি বিস্ময়কর। ফ্রান্সের Pasteur Institute নামক সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাগারে জীবজন্তুর উপর রেডিয়মের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইতেছে। তথাকার এক জন অধ্যাপক বলেন, দুই পাউণ্ড অর্থাৎ এক সের রেডিয়মের প্রভাবে প্যারিস্ নগরীর সমুদয় লোককে বিনষ্ট করা যাইতে পারে। রেডিয়মের রৌদ্র যখন এই লক্ষ লক্ষ নরনারীর গাত্রে লাগিবে, তখন তাহারা কোনও প্রকার ক্লেশই অনুভব করিবে না। অথচ এক মাসের মধ্যে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বাহির হইয়া ত্বক্ খসিয়া পড়িতে থাকিবে। অবশেষে অন্ধ হইয়া পক্ষাঘাতে সকলেই প্রাণত্যাগ করিবে। অধ্যাপকের মুখে রেডিয়মের এই ভয়ঙ্কর রুদ্র প্রভাবের কথা শুনিয়া গা শিহরিয়া উঠে। এই রেডিয়ম্ হয় ত ভবিষ্যৎ যুদ্ধপুরাণের অগ্নিবাণ হইয়া উঠিবে। ইহার এরূপ ভয়ঙ্কর শক্তি থাকিলেও জীবের উপর ইহার শুভ ফলও আছে। ইহার বিস্ময়কর শক্তি দেখিয়া নানা পণ্ডিতে নানা কথা বলিতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত কোন্ কথা টিকিবে না টিকিবে, এখন বলা যায় না। Pasteur Instituteএর উক্ত অধ্যাপক ও অন্য কোন কোন পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, রেডিয়মের প্রভাবে জীবদেহের বৃদ্ধি বা বার্দ্ধক্য স্থগিত হইতে পারে; জীবন দীর্ঘ হইতে পারে; ভেকাদির অস্ফুট বা অপরিণত অণ্ড হইতে জীবের সৃষ্টি করা যাইতে পারে; নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ, ক্ষত, কাশ ও স্নায়বীয় পীড়া আরোগ্য

হইতে পারে। তাঁহাদের বিশ্বাস, রেডিয়মের প্রভাবে কালে তাঁহারা অভিনব প্রকারের কীট পতঙ্গ প্রজাপতি মৎস্য প্রভৃতির সৃষ্টি করিতে পারিবেন, এবং অধিকপরিমাণে এই ধাতু প্রাপ্ত হইলে ইন্দুর শশকাদি বৃহত্তর জন্তুরও নূতন প্রকার সৃষ্টি করিতে পারিবেন। রেডিয়মের প্রভাবে তাঁহারা জীবের বিকৃতিসাধন করিতে পারেন। প্রকৃতির একজাতীয় জীবকে অন্য প্রকারের করিয়া দিতে পারেন। গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা হয় ত কালে সম্ভব হইবে। এই সকল অনুমান তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের উপর—অনেক রকম পোকামাকড় ও ব্যাঙাচি ইত্যাদির উপর নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া লব্ধ ফলসমূহের ভবিষ্যৎ স্ফূর্ত্তিরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এ সম্বন্ধে অতিবিস্ময়কর পরীক্ষাগুলির কথা এখানে উল্লিখিত হইল না। তাঁহাদের অনুমান সত্য হইলে রেডিয়মের সাহায্যে ভবিষ্যতে মানুষ চিরযৌবন লাভ করিবে। প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, এই চিরযৌবন সম্বন্ধে সম্প্রতি আর এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত আর এক দিক হইতে আভাষ দিতেছেন। তিনি বলেন, জরা বার্দ্ধক্য মনুষ্যদেহের একপ্রকার রোগমাত্র। এই রোগের প্রতিষেধক ঔষধ বা উপায়ের আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন। সে যাহা হউক, এই অভিনব পদার্থ রেডিয়মের যে সকল গুণ ইতিমধ্যে জানিতে পারা গিয়াছে, সেগুলি এতই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যে, বোধ হইতেছে, রেডিয়ম্ বিদ্যুৎবিজ্ঞানাদির সাহচর্য্যে মানবজগতে অচিরে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যায়।

ঐ ডুবে গেল বেলা অকূল নীরে,
রাঙ্গিয়া ঈষৎ আভা বালুর তীরে।
লইয়া ধূসর সন্ধ্যা তিমির-ডালি,
সাগরে অম্বরে দিল লেপিয়া কালি।
ধীবর গুটায়ে জাল ফেলিয়া কাঁধে,
ফিরিছে আবাসমুখে ত্বরিতপাদে।
ওরে! তুই কত-র'বি বসিয়া তীরে?
গুটায়ে তুলিয়া জাল চল্ না ফিরে।

সারাটা দিবস ধ'রে অকূল-কূলে,
কি ছাই বাঁধিলি জালে দেখ্ না খুলে!
সকালে বুনিলি জাল শতেক-ফাঁসি,
দুপুরে ফেলিলি জলে ঘুরায়ে হাসি'।
কূলে কূলে ঘুরে ঘুরে কাটালি বেলা,
সাঁঝেতে গুটায়ে লও, ভাঙ্গিল খেলা।
উদিয়াছে কাল মেঘ আকাশ ঘিরে,
আর কেন—আর কেন বসিয়া তীরে?

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

দেশীয় চুল্লী।

গ্রামের কোন কোন প্রবীণা গৃহিণী রান্নাঘরের নিত্যব্যবহার্য্য উনন গড়িতে এমন গুণপনা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নিকোন, পুছন, গুবান, খট্‌খটে ত বটেই; গড়নে ভাল, কাজে আরও ভাল। বাস্তবিক, আমরা শৈশবাবধি এইরূপ উনন দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া ইহার গঠন-সৌন্দর্য্য কিংবা উপযোগিতা তত বুঝিতে পারি না। কিন্তু এইরূপ উননের সহিত তীর্থ-যাত্রী মাড়োয়ারীর পথি-পার্শ্বের তিনখানা পাথর, ইট বা মাটির ঢেলার তুলনা করিলেই প্রভেদ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কোন গ্রামে উদ্‌ধ্মাননির্ম্মাণদক্ষা গৃহিণীও কি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়? সৌন্দর্য্য ও উপযোগের সম্মিলন চিরকালই দুর্লভ।

যাঁহারা কলিকাতার ন্যায় সহরে বাস করেন, এবং গ্রাম্য জ্বালানি খড়, বাশ, তালপাতা, ঘুঁটে প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আধ্‌পোড়া পাথুরে কয়লা (কোক) ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত উক্ত বিবরণে গ্রাম্য উদ্‌ধ্মানের অযথা প্রশংসা কল্পনা করিতেছেন। বস্তুতঃ অযথা প্রশংসা একটুও নাই, বরং উদ্‌ধ্মানের অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রশংসা করিবার ভাষা পাইতেছি না। কিন্তু কেবল অঙ্গসৌষ্ঠব কেন? অনেকে সৌন্দর্য্য চান না, উপযোগ চান। এখানে যে উদ্‌ধ্মানের উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহাতে দুই গুণই বর্ত্তমান।

দেশের সৌভাগ্য যে, কেবল উদ্‌ধ্মাননির্ম্মাণে নহে, শিল্পজাত প্রায় অধিকাংশ দ্রব্যে খুঁত ধরিবার কিছুই পাওয়া যায় না। বরং শিল্পীর গুণপনার চূড়ান্ত নিদর্শনই পাওয়া যায়। যে সে লোক দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের দোষগুণ বুঝিতে পারে না। যে মূল্যে যে দ্রব্যটি বিক্রীত, কিংবা যে সামান্য উপকরণে তাহা নির্ম্মিত হয়, তাহা অল্পদর্শী সমালোচকেরা ভুলিয়া যান। যৎসামান্য উপকরণে সুন্দর দ্রব্য যিনি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান নিশ্চিত বর্ত্তমান।

কলিকাতার মত সহরে গ্যাস পোড়াইয়া কিংবা তড়িৎ লাগাইয়া আগুন করা যাইতে পারে। তাহা এখানে আলোচ্য নহে। গ্রামে কাঠ, কাঠের কয়লা এবং কোন কোন ব্যাপারে পাথুরে কয়লা জ্বালানিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুষ, খড়, ঘুঁটে, লতাপাতা ও কাঠ ঘরকন্নার রাঁধাবাড়া করিতে ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য কামার, সেকরা, পিতলকার, কাংস্যকার কাঠের কয়লা পোড়ায়। গ্রাম্য কুমর গ্রামের জঙ্গলী

লতা, কাঁটাগাছ কাটিয়া লইয়া এক দিকে গ্রামের বন পরিষ্কার করে, অন্য দিকে তদ্দ্বারা মাটীর বাসন পোড়াইয়া থাকে। বৎসরের এক এক সময় আখের ও খেজুরের রস শুকাইয়া গুড় তৈয়ারি করিতে কাশ, শর, আক ও খেজুরপাতা আবশ্যক হইয়া থাকে। গ্রাম্য ধনী পাকাবাড়ী করিবার সময় ইট ও চুণ পোড়াইতে কখন কখন পাথুরে কয়লার যোগাড় করেন। তবে মোটের উপর, জ্বালানিকে তিন ভাগ করা যাইতে পারে। (১) কাঠ (২) কাঠের কয়লা, (৩) পাথুরে কয়লা।

কাঠ, গাছের প্রায় অকর্ম্মণ্য জীবনহীন অংশ। গাছের শৈশবাবস্থায় কাঠ থাকে না, কিন্তু ভাবী কাঠের আধারকলা (Tissue) বর্ত্তমান থাকে। সেই কোমল আধারকলায় পদার্থবিশেষ ব্যাপ্ত হয়, পরে তাহা দারুকলায় পরিণত হয়। দারুর প্রধান উপাদান, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এতদ্ভিন্ন কাঠমাত্রেই জল থাকে। বায়ুতে শুষ্ক কাঠেও মণকরা ৬।৭ সের জল থাকে। মোটামুটি, এরূপ শুষ্ক কাঠে মণকরা ৬।৭ সের জল, ১৭ সের কার্ব্বন, ২ সের হাইড্রোজেন, ১৫ সের অক্সিজেন (নাইট্রোজেন) থাকে। মৃত্তিকার (বা খনিজ পদার্থের) পরিমাণ দেড় পোয়া কি দুই পোয়া ধরা যাইতে পারে। কাঠ পুড়িলে ঐ মৃত্তিকা ভস্মের আকারে পড়িয়া থাকে। ভস্ম অদাহ্য। অন্য উপাদানের মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোজেন দাহ্য, অর্থাৎ উহারা অক্সিজেনের সহিত উত্তপ্ত হইলে পুড়িয়া যথাক্রমে কার্বন-ডাইঅক্সাইড নামক গ্যাসে এবং জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। স্থলবিশেষে অক্সিজেন অল্প হইলে কার্বন পুড়িয়া কার্বন-মনক্সাইড নামক গ্যাসে পরিণত হয়। হাইড্রোজেন পুড়িলে জল হয়; জল অদাহ্য। সাধারণতঃ কার্বন পুড়িয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড হয়; ইহাও অদাহ্য। কিন্তু কার্বন-মনক্সাইডকে পোড়াইতে পারা যায়। পুড়িয়া উহা কার্বন-ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। কাঠ পোড়াইলে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে প্রধান তিনটি এই—জলীয় বাষ্প, কার্বন-মনক্সাইড, কার্বন-ডাইঅক্সাইড। কাঠে যে হাইড্রোজেন থাকে, তাহা সাধারণ চুলীতে প্রায় পোড়ে না। সুতরাং যখন আমরা কাঠ পোড়াইয়া আগুন করি, তখন কাঠের কার্ব্বনের ভরসাই করিয়া থাকি। এই হিসাবে, এক মণ কাঠ পোড়াইলে যত তাপ পাই, কাঠের ১৭ সের কার্বন পোড়াইলেও তত তাপ পাই। বস্তুতঃ এত তাপ পাওয়া যায় না। কারণ, কাঠের সমস্ত কার্বন সাধারণ চুলীতে পোড়ে না, এবং কাঠে বর্ত্তমান জলকে বাষ্প করিয়া উড়াইয়া দিতে উৎপন্ন তাপের কিয়দংশ লুপ্ত হয়। ফলে এক মণ কাঠ পোড়াইলে যত তাপ পাই, প্রায় ১৩।১৪ সের কাঠের কয়লা পোড়াইলেও তত তাপ পাই। এক মণ শুষ্ক কাঠ হইতে প্রায় দশ সের

কয়লা পাওয়া যায়। কারণ কাঠ হইতে কয়লা করিবার সময় কিয়দংশ কয়লা পুড়িয়া যায়।

অন্যপ্রকারে কাঠের ও কয়লার তাপ-উৎপ্রাদক গুণের তুলনা করা যাইতে পারে। কাঠের এক সের কয়লা পোড়াইয়া ৮০০০ সের জলের উষ্ণতা শতাংশিক উষ্ণতামানের এক অংশ বাড়াইতে পারা যায়। কিন্তু বাতাসে শুকন এক-সের কাঠ পোড়াইয়া ২৮০০ সেরের অধিক জলের উষ্ণতা এক অংশ বাড়াইতে পারা যায় না। অর্থাৎ, কাঠ ও কাঠের কয়লায় তাপ-উৎপাদিকা শক্তির তুলনা করিলে দেখা যায়, ২০ সের কাঠ ৭ সের কয়লার সমান।

পাথুরে কয়লাও প্রথমে কাঠ ছিল। মাটীর নীচে বহুকাল জল খাইয়া এবং উপরের মাটীর চাপ ও ভিতরের মাটীর তাপ পাইয়া পুরাতন কাঠ পাথরের মত শক্ত কয়লায় পরিণত হইয়াছে। পাঁশ বাদে পাথুরে কয়লায় মণকরা ৩৪ সের কার্বণ, ২ সের হাইড্রোজেন, এবং অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও গন্ধক মিলিয়া প্রায় ৪ সের থাকে। ইহা মোটামুটী হিসাব। পাঁশের হিসাব দেওয়া দুষ্কর। কারণ ইহা কোনও কয়লায় খুব বেশী, কোনও কয়লায় খুব কম থাকে। মোটের উপর ২ সের ধরা যাইতে পারে। পাথুরে কয়লাতেও জল থাকে; কিন্তু মণকরা ৪ সেরের অধিক প্রায় থাকে না। কোন কোন পাথুরে কয়লা স্নিগ্ধ—যেন তেল মাখান; কোন কোন পাথুরে কয়লা রুক্ষ—যেন তেল নাই। শেষোক্ত প্রকার কয়লা পোড়াইলে আগুনের শিখা হয় না। এই কয়লা বহু পূর্ব্বকালের; বঙ্গদেশের কয়লা তত পুরাতন নহে। যেমন কাঠ আধপোড়া করিলে কয়লা হয়, তেমনই স্নিগ্ধ পাথুরে কয়লা আধপোড়া করিলে পোড়া পাথুরে কয়লা বা কোক হয়। উৎকৃষ্ট পাথুরে কয়লা হইতে মণকরা ২৫।২৬ সের কোক পাওয়া যায়। বাকী অংশ কোল-গ্যাস, আলকাতরা, আমোনিক-কার্ব্বনেট প্রভৃতি দ্রব্যে পরিণত হয়। তাপোৎপাদক গুণ দেখিতে গেলে, এক সের পাথুরে কয়লা পোড়াইয়া ৬০০০ হইতে ৮০০০ সের জলের উষ্ণতা এক অংশ বাড়াইতে পারা যায়। এবং এক সের আধপোড়া পাথুরে কয়লা পোড়াইয়া প্রায় ৭০০০ সের জলের উষ্ণতা এক অংশ বাড়াইতে পারা যায়।

আগুন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় জানা আবশ্যক হয়,—সেটি আগুনের আঁচ। খড় পোড়াইয়া সোনা গলাইবার চেষ্টা বৃথা। কাঠের কয়লা কিংবা গ্যাস-কোক ব্যতীত লোহা গলাইবার চেষ্টা নিষ্ফল। লোহা সোনা গলাইতে আগুনের সমধিক আঁচ আবশ্যক হয়। প্রাচীনদিগের ভাষায় আঁচের নাম অগ্নিমাত্রা, আধুনিক

বিজ্ঞানের ভাষায় দহনের উষ্ণতা। তবে, ইন্ধনসমূহের কেবল তাপোৎপাদক গুণ দেখিলে চলে না, কার্য্যবিশেষে দহনের উষ্ণতা দেখিতে হয়। এই দুই হিসাবে সকল কাঠ সমান নহে। ভারী কাঠ ও হাল্‌কা কাঠে অনেক প্রভেদ। তেঁতুল ও বাব্‌লার আগুন সকলেই জানে। আমড়া ও আমকাঠের আগুন অন্য প্রকার। খড়ের ও তুষের আগুনের আঁচ আরও কম। ঘুঁটের আগুন ভারী কাঠের আগুনের মত নহে। কিন্তু উহার একটা গুণ আছে। কোন দ্রব্য ঘুঁটের মধ্যে রাখিয়া পোড়াইলে তাপ তাহাকে যেন বেষ্টন করিয়া থাকে। এই জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা ঘুঁটের আগুনে নানাবিধ পুটপাক করিয়া থাকেন। চুলীবিশেষ নির্ম্মাণ দ্বারা প্রায় সকল প্রকার ইন্ধন হইতে প্রখর তাপ পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চুলী বা অত্যন্ত প্রখর তাপ আমাদের নিত্যকর্ম্মে আবশ্যক হয় না। এ জন্য এখানে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। গ্যাস-কোক দিয়া ভাত রাঁধিতে গেলে মাটীর হাঁড়ি ফাটিয়া যায়, হাঁড়ির তলার ভাত পুড়িয়া যায়। গ্যাস-কোক ত দূরের কথা, বাজারের আধ্‌পোড়া কয়লার আগুনে রাঁধা ভাত খাইতে অনেকে ভয় করেন।

শ্রেষ্ঠ ইন্ধনের কতকগুলি লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। (১) যে ইন্ধন শুষ্ক, আর্দ্র নহে, তাহা শ্রেষ্ঠ। কারণ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, ইন্ধনের জলকে বাষ্পীভূত করিতে তাপ ব্যয় হয়। ফলে, কষ্টকর ধূম লাভ, এবং ভিজা কাঠ ফুঁকিতে ফুঁকিতে রাঁধুনীর চোখ মুখ লাল হয়, মেজাজ গরম হয়, এবং ভক্ষ্য দ্রব্যও সুস্বাদ ও সুসিদ্ধ হয় না। (২) যে ইন্ধন পোড়াইলে পাঁশ বেশী হয় না, তাহা শ্রেষ্ঠ। মাটী বালি মিশাইয়া গোবরের ঘুঁটে দিলে, গোবরের পাঁশের সহিত সেই মাটী বালি থাকে। ফলে দশ সের ঘুঁটের জায়গায় হয় ত পনর সের ঘুঁটে লাগে। মাটী বালি উত্তপ্ত করিতে তাপ লাগে, চুলী পাঁশে পূর্ণ হইয়া যায়। পূর্ণ হইলে পাঁশ বাহির করিতে হয়, নতুবা চুলী ভাল জ্বলে না। পাঁশ বাহির করিতে চুলীর আগুন নিবাইতে বা কমাইতে হয়। ইহার অর্থ চুলীকে শীতল হইতে দেওয়া, কাজেই অতিরিক্ত তাপ-ব্যয় ঘটে। (৩) ইন্ধন এমন হইবে যে, চুলীতে পোড়াইবার সময় তাহার দাহ্য অংশ অদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ থাকিবে না। চুলী-নির্ম্মাণ দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইতে পারে।

চুলীতে তাপ-উৎপাদনের নিমিত্ত চুলীর কয়েকটি অঙ্গ আবশ্যক হয়। যথা, (১) মুখ বা যে পথে ইন্ধন প্রবেশিত করা যায়; (২) চুলীতে বায়ুপ্রবেশপথ, কারণ বায়ু (বস্তুতঃ অক্সিজেন) না পাইলে ইন্ধন জ্বলে না; (৩) কাষ্ঠাদি ইন্ধনের

বিশ্লেষণস্থান ; এখানে ইন্ধন দাহ্য গ্যাসে পরিণত হয় ; (৪) দাহ্য গ্যাসের দহনস্থান, দাহ্য গ্যাস পুড়িলে অর্থাৎ অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইলে তাপ জন্মে ; (৫)-ভস্মপতনস্থান ; (৬) দগ্ধ গ্যাস ও ধূমের নির্গমনপথ। তবে উদ্ধানকে ষড়ঙ্গ বলা যাইতে পারে। চুলীর নির্ম্মাণভেদে ছয়টি অঙ্গই পৃথক্ পৃথক্ থাকে না।

এখন আমাদের রান্নাঘরের উনন লইয়া এই কয়েক অঙ্গের নির্দ্দেশ করা যাউক। সকলেই এই চুলী দেখিয়াছেন, সুতরাং উহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। উহার মুখ প্রায়ই গোলাকার হইয়া থাকে। তাহাই ইন্ধন ও বায়ুপ্রবেশের পথ। রান্না-ঘরের মেজে খুঁড়িয়া কটাহাকার গর্ত্ত করা হইয়া থাকে, এবং গর্ত্তের উপরে এবং মেজে হইতে অল্প উচ্চে প্রাচীর থাকে। এই প্রাচীরমধ্যস্থ গর্ত্তে কাষ্ঠ বিশ্লিষ্ট ও উৎপন্ন দাহ্য গ্যাস দগ্ধ হয়। গর্ত্তের তলে অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গার ও ভস্ম সঞ্চিত হয়। চুলীর প্রাচীরের উপরিভাগে তিন স্থানে তিনটি মৃৎপিণ্ড থাকে। দেশভেদে তাহাদিগকে ঝিঁক বলে। এই তিন ঝিঁকের উপরে হাঁড়ী বসে। তাহাতে হাঁড়ীর দুই পাশে ও সম্মুখে ও চুলীর প্রাচীরের উপরে তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার পথ হয়। তাহারাই ধূমনির্গমনপথ। চুলীর মুখ দিয়া কাঠের ভিতর ও পাশ দিয়া বাহির হইতে চুলীর ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে। ভিতরে বায়ুর কিয়দংশ অক্সিজেন, অঙ্গারাদির সহিত সংযুক্ত হয়। ইহাতে যে তাপ জন্মে, সেই তাপে দগ্ধ গ্যাস ও অবশিষ্ট বায়ু উষ্ণ হয়। উষ্ণ বায়ু, শীতল বায়ু অপেক্ষা লঘু। এ জন্য তাহা ঊর্দ্ধগামী হয়। তাহার সহিত অদগ্ধ অঙ্গারকণা ও দগ্ধ ভস্মকণা ধূমের আকারে বহির্গত হয়। চুলীর ভিতরে উষ্ণ বায়ু ও দগ্ধগ্যাস সমায়তন শীতল বায়ু অপেক্ষা লঘু। উহা যে পরিমাণে লঘু, সেই পরিমাণে ধূমনির্গমনের বেগ ঘটে। এই বেগ-বৃদ্ধির নিমিত্ত বাষ্পীয় যন্ত্রাদির ধূমনালী (বা চিমনী) থাকে। কেরোসিন বিলাতী-দীপের চিমনীর উদ্দেশ্য তাই। চিমনীর উচ্চতা অনুসারে বেগবৃদ্ধি হয়, এবং তদনুসারে দহনস্থানে বায়ু প্রবেশ করে।

এখন আদর্শ চুলীর লক্ষণ দেখা যাউক। (১) চুলীতে দাহ্যবস্তু অর্দ্ধদগ্ধ বা অদগ্ধ থাকিবে না ; অর্থাৎ, তাহাতে অদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গার পড়িয়া থাকিবে না। কারণ, যে পরিমাণে অঙ্গার পড়িয়া থাকিবে, সেই পরিমাণে তাপ পাওয়া যাইবে না ; কাজেই ইন্ধনব্যয় অধিক হইবে। (২) চুলী হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূম বহির্গত হইবে না। কারণ, কৃষ্ণবর্ণ ধূম অপর কিছু নহে, অদগ্ধ অঙ্গারকণা। সেই অঙ্গারকণা সকল পোড়াইলে যে পরিমাণ তাপ পাওয়া যাইত, তাহা পাওয়া যায় না, কাজেই ইন্ধনব্যয় অধিক হয়। (৩) যে পরিমাণ বায়ু পাইলে দহন সম্পূর্ণ হয়, সেই

পরিমাণ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিবে, তাহার অধিক বায়ু প্রবেশ করিবে না। কারণ, বাহিরের বায়ু শীতল। সেই শীতল বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিয়দংশ তাপ লইয়া বাহিরে চলিয়া যায়। কাজেই ইন্ধনব্যয় অধিক হয়। (৪) যে পরিমাণ উষ্ণবায়ু ধূমনির্গমনপথে বহির্গত না হইলে ভিতরে বায়ুপ্রবেশ এবং দাহ্য পদার্থের সম্যক্ দহন হয় না, তাহার অধিক বায়ু বহির্গত হইবে না। কারণ, বায়ু উষ্ণ হইয়া বৃথা বহির্গত হইয়া গেলে তাপ চলিয়া যায়, ইন্ধনব্যয় অধিক হয়। (৫) চুলীর প্রাচীর অধিক হইবে না। কারণ, অধিক হইলে তাহাকে উত্তপ্ত করিতে অধিকপরিমাণে তাপ লাগিবে, ইন্ধনব্যয়ও অধিক হইবে। (৬) চুলীর আকার এমন হইবে যে, পাত্রের যেখানে তাপপ্রয়োগ আবশ্যক, কেবল সেইখানেই-তাপ লাগিবে। কারণ, অন্য স্থানে লাগিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিঘ্ন হইতে পারে, এবং ইন্ধনব্যয়ও অধিক হইতে পারে। (৭) যে উষ্ণতার তাপ আবশ্যক, তাহার ন্যূনাধিক হইবে না। কারণ, অল্প হইলেও কার্য্যহানি, অধিক হইলেও কার্য্যহানি। সোনা গলাইতে যে উষ্ণতা লাগে, ভাত রাঁধিতে সে উষ্ণতা লাগে না। (৮) চুলী এমন পদার্থে নির্ম্মিত হইবে যে, তাহার প্রাচীর দিয়া ভিতরের তাপ বাহিরে চলিয়া না যায়। কারণ, প্রাচীরকে তাপ-চালনীস্বরূপ করিলে ভিতরে তাপ থাকিবে না।

এতগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চুলী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কার্য্যকালে সকল দোষের যথোচিত প্রতিবিধান করিতে পারা যায় না। তখন মধ্যপথ গ্রহণ করিতে হয়। কোনও দোষ ছাড়িয়া, কোনও দোষ কমাইয়া, কোনও গুণ বাড়াইয়া, দেশকাল পাত্র দেখিয়া একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। চুলীর প্রাচীর থাকিবেই। কিন্তু অল্প প্রাচীর দ্বারা অধিক স্থান বেষ্টন করিতে হইলে, চুলীর আকার গোল করা আবশ্যক। তৎপরিবর্ত্তে চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ করিলে প্রাচীর-প্রমাণ অধিক হয়। এই জন্য আমাদের নিপুণ গৃহিণীরা রান্নাঘরের চুলীর ভিতরের আকার হাঁড়ীর ন্যায় করিয়া থাকেন। এই আকারে বিশেষ সুবিধা হয়। ভিতরে বায়ু খেলিতে পায়, কোনও কোণ না থাকাতে সেখানে উষ্ণ বায়ু ও অগ্নিশিখা যায় না। চুলী ভাঙ্গিয়া যাইবার তত আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যহ চুলী নিকোনও স্বচ্ছন্দে হয়। চুলীর প্রাচীর থাকিবেই, অথচ তাহা তাপ অধিক শোষণ বা চালন করিবে না। বিকিরণ-নিবারণের নিমিত্ত আমাদের চুলীর অধিকাংশ মেজের নীচে থাকে। এখানে বিকিরণ নিবারিত হয় বটে, কিন্তু শোষণ নিবারিত হয় না। ভাল মাটী দিয়া চুলীর প্রাচীর গড়িলে, এবং তাহাকে কাটিতে না দিলে,

শোষণ কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হয়। ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কায় চুলী প্রত্যহ মাটী ও গোবর দিয়া লেপা হইয়া থাকে। গোবর পুড়িয়া গেলে তাহার ভস্ম থাকে। চুলীর প্রাচীরে সেই ভস্মের এক পাতলা স্তর রহিয়া যায়। মাটী অপেক্ষা ভস্ম তাপের অপরিচালক। কিন্তু কেবল গোবর পুরু করিয়া লেপিলে চলে না। কারণ, শুধু গোবরের পাঁশের আটা নাই, সহজে খসিয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। চুলীর প্রাচীর কেবল পাঁশের করিলেও চলে না; কারণ, তাহা দৃঢ় হয় না। ভাল চুলীর অন্যান্য গুণ নিপুণ গৃহিণীরা তাঁহাদের চুলীতে কি প্রকারে দিয়া থাকেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাঁহারা চুলীর উপরের প্রাচীর উচ্চ করেন না; এমন কি, কোন কোন চুলীর প্রায় সমুদয় অংশ মেজের নীচে থাকে, উপরে কেবল তিনটি ঝিঁক দেখা যায়, এবং চুলীটি দেখিতে পানিফলের মত হয়। তাঁহারা চুলীর মুখ বড় কিংবা ঝিঁক উচ্চ করেন না। যাঁহাদের অল্প রান্না আবশ্যক, তাঁহারা চুলী ছোট করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই ছোট চুলীতে বেশী রান্না চলে না। অনেক কাঠ পোড়াইলে চুলীর ভস্মস্থান অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গারে পূর্ণ হয়। চুলীর মধ্যভাগ ভস্ম ও অঙ্গারে পূর্ণ হইয়া গেলে, কাঠ ভাল জ্বলে না। কারণ, কাঠের বিশ্লেষণস্থান কম পড়িয়া যায়, এবং আবশ্যকপরিমাণ বায়ুর অভাবে কাঠ অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গারে পরিণত হয়। যদি সেই অঙ্গার পুড়িতে পারিত, তাহা হইলে উহাতে ক্ষতি থাকিত না। এই অসুবিধা-নিবারণের নিমিত্ত, বেশী রান্না আবশ্যক হইলে, দু,-আখা * উনন জ্বালা হইয়া থাকে। ইহার দোষ গুণ পরে বিবেচনা করা যাইবে।

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, প্রথম জ্বালিবার সময় চুলী হইতে যত ধূম নির্গত হয়, চুলী গরম হইয়া গেলে তত ধূম নির্গত হয় না। ইহার কারণ এই যে, কাঠ হউক, কয়লা হউক, তাহাকে পোড়াইবার অর্থাৎ তাহার কার্ব্বন হাইড্রোজেন প্রভৃতি দাহ্য অংশ পুড়িবার এক এক নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা আবশ্যক। আঁচ কম হইলে দাহ্য পদার্থের অল্পাধিক অদগ্ধ থাকিয়া যায়। ইহা অবশ্য ক্ষতি। অতএব সুগৃহিণী প্রথমেই অনেক কাঠ উননে প্রবেশিত করেন না; প্রথমেই উননের ভিতরে প্রবেশিত না করিয়া তাহার মুখের কাছে জ্বালিয়া থাকেন। উননের মধ্যভাগ অল্পে অল্পে গরম হয়, ধূম বাহিরে না গিয়া প্রথমে প্রাচীরগাত্রে লাগিতে থাকে। পরে আঁচ বাড়িলে সে ধূমও পুড়িয়া তাপ বর্দ্ধিত

* 'পাখা' না 'আখা'? কোন কোন স্থানে 'চোখ' বলে। আখা, অক্ষি শব্দের অপভ্রংশ? পক্ষ হইতে পাখা? না, পাক হইতে, 'পাকা'?

করে। এইরূপ, জ্বালিতে জ্বালিতে একবারে একগোছা কাঠ ভিতরে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তদুপযুক্তপরিমাণ বায়ুর অভাবে ধূম বহির্গত হয়, কাঠের গোছা উত্তপ্ত করিতে আঁচ কমিয়া যায়। চুলীর মুখে ও ভিতরে কাঠ সাজানতেও গুণপনা আবশ্যক। সুগৃহিণী রাঁধিতে রাঁধিতে উনন নিবিতে দেন না, উননের আঁচ কম হইতে দেন না, কাঠের উপর কাঠ চাপাইয়া রাখেন না। জ্বলন্ত কাঠের বা অঙ্গারের উপর দিয়া বায়ু বহিয়া গেলে, কেবল উপরের দাহ্য পদার্থ পুড়িতে পারে, নীচের ও পাশের পদার্থ পুড়িতে পারে না। ফলে, অদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গারস্তূপ, অর্থাৎ ক্ষতি। কিন্তু যদি এমন ভাবে কাঠ সাজান যায় যে, জ্বলন্ত কাঠের বা কয়লার নীচে হইতে তাহাদের পাশ দিয়া উপরে বায়ু উঠিতে পারে, তাহা হইলে অঙ্গার অদগ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, এইরূপে বায়ু পাওয়াতে নীচের ও পাশের কাঠ জ্বলিতে পায়। কাঠের পাঁশমাত্র অবশিষ্ট থাকে, উননের ভিতরে অঙ্গারস্তূপ হয় না, উনন নিবাইয়া সে অঙ্গার বাহির করিতে হয় না, উননের আঁচ কমিতে দেওয়া হয় না। এ সকল কম লাভ নহে। বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে যখন বহুলোকের ভোজনের নিমিত্ত ভাত রাঁধিবার বা লুচী ছাঁকিবার চুলী গড়িতে হয়, গ্রাম্য পাঠকমাত্রই দেখিয়া থাকিবেন, তখন চুল্লী অত্যন্ত গভীর করা হইয়া থাকে। তথাপি তিন চারি মণ ময়দার লুচী ছাঁকা হইতে না হইতে চুলীর ভস্মস্থান অঙ্গাররাশিতে পূর্ণ হয়। সেই প্রথম জ্বলন্ত চুলীর ভিতর হইতে অঙ্গার বাহির করা কষ্টকর। গৃহস্থ সেই কয়লা কোন কাজেও লাগাইতে পারেন না। যিনি সমারোহে অর্থব্যয় করিতেছেন, তিনি অতিরিক্ত কাষ্ঠব্যয় অকিঞ্চিৎকর মনে করিতে পারেন। কিন্তু গ্রামের ময়রা লাভের আশা করে। তাহার পক্ষে অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গার অর্থে ক্ষতি। সে গ্রামের কামারকে অঙ্গার বিক্রয় করিলেও, কম মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যে গৃহস্থকে বহুপরিজনের নিমিত্ত বিস্তর কাঠ পোড়াইতে হয়, তাঁহারও কাঠের বাবদে মাসিক খরচ বর্দ্ধিত হয়। কাঠের বা কয়লার নীচে দিয়া বায়ু উঠিবার ব্যবস্থা থাকিলে, এই ক্ষতি হয় না।

আর এক লাভ আছে। কাঠ বা কয়লা হইতে কেবল তাপ পাইলেই সকল কাজ হয় না। সেকরা সোনা গলাইবার সময়, কামার লোহা নরম করিবার সময় আঁচ চায়। উভয়েই কয়লা পোড়ায়। গ্রাম্য সেকরা চোঙ্গা ফুঁকিয়া আগুনের উপরে বাতাস দেয়, কামার ভস্ত্রা দ্বারা আগুনের নীচে বাতাস চালায়। সোনার খাদ মারিতে উপরে ফুঁকা আবশ্যক। সোনা কেবল গলাইতে হইলে

নীচে দিয়া বাতাস চালনাই কর্ত্তব্য। সহরের সেকরা অনেক সোনা রূপা গলাইয়া থাকে, ভস্ত্রাও চালায়। অর্থাৎ, সেকরা ও কামার জ্বলন্ত অঙ্গারের নীচে দ্রুতবেগে ও অধিকপরিমাণে বায়ু চালনা করে। বায়ুর পরিমাণ অত্যধিক হইলে ক্ষতি, বায়ুর বেগ অত্যধিক হইলেও ক্ষতি। প্রথম স্থলে অনাবশ্যক বায়ুকে অনর্থক উত্তপ্ত করা হয়; দ্বিতীয় স্থলে উত্তপ্ত বায়ু তাপমোচন করিতে না করিতে বাহিরে চলিয়া যায়। তথাপি উভয়ই আবশ্যক, এবং উষ্ণতা বাড়াইতে হইলে বায়ুর পরিমাণ অপেক্ষা বেগ অধিক আবশ্যক। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করা এখানে অনাবশ্যক। ভাবিলে, দেখা যায়, জ্বালানি যাহাই হউক, যেমনই হউক, তাহাকে প্রথমে দাহ্য গ্যাসে পরিণত করিয়া পরে পোড়াইলে অধিক উষ্ণতা পাওয়া যায়। যে উত্তপ্ত বায়ু ধূমের আকারে বাহিরে চলিয়া যায়, তাহার তাপে বায়ু উষ্ণ করিয়া চুলীর ভিতর চালিত করিলে, এক দিকে তাপের অপব্যয় কমে, অন্য দিকে উষ্ণতা বাড়ে। এই রূপে গ্যাস পোড়াইবার চুলীতে কাচরা কাচ গলাইয়া থাকে।

এ বিষয় এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রচলিত গ্রাম্য চুলীর দোষ গুণ এখন আলোচ্য। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, গ্রাম্য গৃহস্থের একআখা চুলীর নির্ম্মাণপ্রণালী প্রায় নির্দ্দোষ। এই প্রকার চুলী অল্প রান্নার পক্ষে উত্তম বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে বেশী রান্নার সুবিধা হয় না, চুলীর ভিতরে অঙ্গার জমে। তখন কাঠ ভাল জ্বলে না, কাজেই অঙ্গার দ্রুতবেগে জমিতে থাকে। কাঠের পৃষ্ঠভাগ পুড়িতে থাকে, এমন কি, চুলীর মুখ দিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতে থাকে। এই দোষের নিবারণ করিতে হইলে চুলীর মধ্যভাগে জাল (grating) পাতা আবশ্যক। এই জালের উপরে কাঠ পুড়িতে থাকিবে, নীচে হইতে বায়ু জ্বলন্ত কাঠ ও অঙ্গারের পাশ দিয়া উপরে উঠিবে। এইরূপ নির্ম্মাণে অদগ্ধ অঙ্গার থাকে না; সুতরাং বিশেষ লাভ বলিতে হইবে।

কলিকাতার সহরে যেখানে কোক-কয়লা পোড়ান হইয়া থাকে, সেখানে চুলীতে লোহার শিক পাতা হইয়া থাকে। ইহাই জাল। জালের উপরে ইন্ধন-বিশ্লেষণ ও দহনস্থান, নীচে বায়ুপ্রবেশপথ ও ভস্মস্থান। ভস্মের সহিত জ্বলন্ত কয়লার যে সকল টুক্‌রা নীচে পড়ে, তদ্দ্বারা বাহিরের বায়ু উষ্ণ হইয়া জালের উপরিস্থ কয়লাকে পোড়াইয়া দেয়। সুতরাং কয়লা হইতে যত তাপ পাইবার কথা, সমুদয়ই পাওয়া যায়। এই চুলী গোলাকার হইয়া থাকে, সুতরাং ধূম-নির্গমনের বেগ মন্দ হয় না, প্রাচীরপ্রমাণও অধিক হয় না। একটি দোষ এই যে, এরূপ চুলী প্রায়ই মেজের উপরে থাকে, কাজেই প্রাচীর দিয়া তাপ-বিকিরণ

চলিতে থাকে। মেজের নীচে চুল্লী নির্ম্মিত হইলে এই দোষ কতকটা নিবারিত হইতে পারে। কয়লার উননের মত কাঠের উনন করা যাইতে পারে। প্রভেদ এই, কয়লার উননে মুখ রাখিতে হয় না, কাঠের উননে মুখ রাখিতে হয়। এক-আখা উননের উপর কেবল একটি পাত্র বসিতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে রান্না শেষ করিবার নিমিত্ত দু'-আখা চারি-আখা উনন করা হইয়া থাকে। সহজেই বুঝা যাইবে, এক-আখা উনন জ্বালিয়া সব রান্না শেষ করিতে যে পরিমাণ কাঠ লাগে, দু'-আখা উননে সেই রান্না করিতে অধিক কাঠ লাগে। কারণ, মুখ একটি হইলেও বড় হয়, বায়ু অধিক প্রবেশ করে, উত্তপ্ত বায়ু অধিক বহির্গত হয়। প্রাচীরপ্রমাণ অধিক হয়, তাহাতে তাপের শোষণ ও বিকিরণ অধিক হয়। প্রচলিত দু'-আখা উননের উন্নতি করিতে হইলে উননের মাঝখানে ও সম্মুখে মুখ না করিয়া এক পাশে করা কর্ত্তব্য। একটি এক-আখা উননের পশ্চাতে আর একটা জুড়িয়া দিলে যেমন হয়, দু'-আখা উনন তেমন করিলে লাভ আছে। যে উননে মুখ থাকিবে, তাহার উপরে ঝিঁক থাকিবে না, অন্য উননের পশ্চাদ্‌ভাগে ঝিঁক থাকিবে। এইরূপে, প্রথম উননের ভিতরের উত্তপ্ত বায়ু দ্বিতীয় উননে গিয়া তাহার উপরিস্থ পাত্রকে গরম করিতে থাকিবে। এই পাত্র গরম হইতে প্রথমে অবশ্য কালবিলম্ব হইবে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সে প্রভেদ তত লক্ষ্য হইবে না। যাহা হউক, সকল দিক্ রক্ষা করা চলে না। যদি কালব্যয়ে কাতর হও, ইন্ধনব্যয় কর; যদি ইন্ধনব্যয়ে কাতর হও, কালব্যয় কর। লোক-বিশেষে ইন্ধনের মূল্য অপেক্ষা কালের মূল্য অল্প। অবশ্য এরূপ উননেও জ্বাল পাতা এবং উননের অধিকাংশ মেজের নীচে করা ভাল।

চার-আখা উনন গড়িতেও সেই কথা। পরে পরে উনন গড়াই ভাল। এইরূপ উননে আখের রস হইতে গুড় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পনর ষোলটা উনন পশ্চাতে পশ্চাতে গড়িয়া শেষে ধূমপথ রাখা হয়। সকল দিক্ দেখিতে গেলে এরূপ উননের উন্নতিকল্পনা করা কঠিন। কোন্ উননের ঝিঁক থাকে না, সকলের পশ্চাতে ধূমপথ থাকে। ফলে তাপের অপব্যয় হয় না। সম্মুখের উননে যে উননের পাশে মুখ থাকে, সে উননের তাপ অপেক্ষা তাহার পরের উননে তাপ বেশী হয়। এবং দূরের উননে তাপ কম হইলেও আখের রস অল্পে অল্পে শুকাইতে থাকে। নাদের বা বাইনের (যে গামলায় রস পাক করা হয়) গঠনও চমৎকার। জল শুকাইতে হইলে জলের অল্প স্থানে তাপপ্রয়োগ না করিয়া অধিক স্থানে করাই ভাল। নাদ দীর্ঘ, মোচার আকার। উহার কানাটুকু

চুলীর উপরে থাকে, অপর সমুদয় অংশ ভিতরে থাকে। মোচার আকার বলিয়া নাদ দৃঢ় হয়। সুতরাং নাদের আর কি ভাল আকার হইতে পারে? ইন্ধনও উৎকৃষ্ট। আখের পাতা, শর, খেজুরপাতা ইত্যাদি। অর্থাৎ, ভারী কাঠ নহে। ভারী কাঠের আগুনের শিখা দীর্ঘ হয় না, লতা পাতা ঘাসের শিখা দীর্ঘ হয়। এ জন্য দীর্ঘ চুলীর এক প্রান্তে পাতা পোড়াইলে তাহার শিখা অন্য প্রান্তে চলিয়া যায়। দেশ-কাল-পাত্র দেখিলে এইরূপ চুলী সকল দিকেই ভাল। তবে, একটা উন্নতি মনে হইতে পারে। চুলী প্রত্যহ জ্বালা হয়, প্রত্যহ নিবান হয়। ফলে তাপের প্রচুর অপব্যয়। কিন্তু আখের রসও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে না, রস পাক করিবার লোকও অধিক পাওয়া যায় না।

সবিরাম চুলী অপেক্ষা অবিরাম চুলীতে যে কম জ্বালানি লাগে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। গ্রামের কুমর সকল একজোট হইয়া অবিরাম চুলী জ্বালিতে পারিত। কিন্তু এ দেশের কোন্ ব্যবসায়ে একতা আছে, কোন্ ব্যবসায়ে ঈর্ষ্যা নাই? যাহা হউক, অবিরাম চুলী একটা নহে, দুইটা বা অধিক চুলী পরস্পর যুক্ত থাকে। পৃথক্ পৃথক্ ইটের পাঁজার অপেক্ষা অবিরাম পাঁজায় (যেমন Bull's patent Brick Kiln) পোড়াইলে কাঠ কম লাগে, এবং ইটও পোড়ে ভাল। গ্রাম্য কুমারের দুই রকম চুলী বা পোয়ান দেখা যায়। কোন কোন পোয়ান দুতলা; জাল থাকাতে পোয়ান দুতলা হয়। জালের উপরে বাসন রাখিয়া খড় কাদা দিয়া উপরিভাগ লেপা হইয়া থাকে। কোন কোন পোয়ান একতলা, অর্থাৎ পোয়ানের মেজের উপরে বাসন থাকে, এবং বাসনের উপরে খড় কাদা লেপিয়া উপরিভাগ গোল করা হইয়া থাকে, তাপ ও শিখা উপরে উঠিয়া পশ্চাতের ধূমপথে নির্গত হয়। বাসন সাজাইতে পারিলে উভয়বিধ পোয়ানেই ফল এক হয়।

গ্রাম্য ইটের পাঁজা ভাল নহে। ইহাতে বহু ইট পোড়ে না, আবার অনেক ইট গলিয়া ঝামা হয়। বিশেষতঃ, পাঁজায় আগুন লাগাইবার পর কোনও দিকে বাতাস বহিতে থাকিলে, সে দিকের ইট পোড়ান দুষ্কর হয়। পূর্ব্বকালে ইন্ধন সুলভ ছিল কি না, সে তর্কে প্রয়োজন নাই। এখন যে সুলভ নহে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন।

গ্রাম্য কর্ম্মকার কাংস্যকার প্রভৃতির চুলী উৎকৃষ্ট। কামারের চুলীর প্রাচীর নাই, অন্ততঃ তিন পাশে থাকে না; থাকিলে কাজ করা চলে না। গ্রাম্য কর্ম্মকারকে নানা আকারের লোহা পোড়াইতে হয়, সুতরাং অনেক স্থলে অগ্নিকুণ্ডের

উপরে ছাদ করা চলে না। কিন্তু স্বর্ণকার তাহার অগ্নিকুণ্ডের উপরে ছাদ করিতে পারে; ছাদ থাকিলে কয়লা খরচ কম হয়। গ্রাম্য পিত্তলকার ও কাংস্যকারের চুলী বেশ; কাঠের কয়লায় যথেষ্ট তাপ ও উষ্ণতা হয়, চুলী কূপাকার বলিয়া ভস্ত্রা-সাহায্যে বায়ুপ্রেরণ আবশ্যক হয় না।

শেষে পুরীর মন্দিরের চুলীর উল্লেখ করা যাইতেছে। বঙ্গদেশের অনেকের ধারণা আছে, সে চুলীতে হাঁড়ীর উপর হাঁড়ী বসাইয়া অন্নাদি পাক করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা হয় না। সেবকদিগের উনন করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই পরিমিত স্থানে যে যতগুলি উনন করিতে পারে, সে তত লাভ মনে করে। এই উননের সহিত বঙ্গদেশের চারি-আখা উননের তুলনা করা যাইতে পারে। কিংবা ঐ উননকে নবদ্বীপ বা যশোরের খেজুর-রস পাক করিবার উনন মনে করা যাইতে পারে। চারি পাঁচ হাত ব্যাসের বৃত্তকার স্থানে একটি কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার বৃহৎ মৌচাক করিলে তাহা দেখিতে যেমন হয়, পুরীর মন্দিরের চুলী সকলের আকার সেইরূপ। একমুখে জ্বাল দেওয়া হয়, পশ্চাতের এক ধূমপথে ধূম নির্গত হয়। কোন উননের ঝিঁক থাকে না। সুতরাং তপ্তবায়ু ও অগ্নিশিখা উপরে উঠিয়া উননের উপরিস্থ পাত্রে প্রতিহত, এবং শেষে ধূমপথে বহির্গত হয়। পরিধি হইতে মধ্যভাগের উনন ক্রমশঃ উচ্চ। ফলে, ভিতরের আগুন বেশ খেলিতে পায়, এবং পশ্চাতে ধূমপথ থাকাতে সকল উননই প্রায় সমান তাপ পায়। উনন সকল ক্রমশঃ উচ্চ না করিলে ভিতরে আগুন খেলিত না। তথাপি মুখের দুই পাশের উননে তাপ কম হইবার কথা। পাচক অন্নব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া নূতন হাঁড়ীতে তৎসমুদয় ঢালিয়া রাখে। এ জন্য বিদেশী যাত্রী সে হাঁড়ীর ভলার কালী দেখিতে পায় না।

পুরীর মন্দিরের উননের বিষয় বলিতে গিয়া সেকালের যজ্ঞকুণ্ডের বিবরণ মনে হইতেছে। সেকালের ঋষিগণ অগ্নিকুণ্ডরচনার বহুবিধ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে বিষয় আরম্ভ করিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। হয় ত কেহ কেহ মনে করিতেছেন, সামান্য উনন লইয়া এত পৃষ্ঠা পূর্ণ করিবার আবশ্যক ছিল না। আমরা গ্রীষ্মদেশে বাস করি বলিয়া, আমাদিগকে গৃহে গৃহে অঙ্গারধানিকায় অগ্নিরক্ষা করিতে হয় না। শীতের দেশে বাস হইলে আমাদিগকে সাগ্নিক হইতে হইত। এদেশেও শীতকালে কেহ কেহ হসন্তীর উত্তাপ উপভোগ করিয়া থাকেন। শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই অগ্নির তাপে স্বাস্থ্য অনুভব করে। কিন্তু এদেশের সূতিকাগৃহের প্রায় শ্বাসরোধক ধূমের কষ্ট কে না অনুভব করিয়াছেন!

আমরা নানাবিধ আকারে প্রত্যহ অগ্নিপূজা করিয়া থাকি। দেবপূজক সর্জ-রস-নিক্ষেপ ও ধূমপায়ী তাম্রকূটবীর্য্যনিষ্কাশনের নিমিত্ত অগ্নিরক্ষার আয়োজন করিয়া থাকেন। এমন নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণে শিখিবার জানিবার অনেক আছে। যিনি উদ্‌গ্নানের ধূমনির্গমনিবারণের উপায় আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তিনি জনাকীর্ণ নগরের স্বাস্থ্যের বহু কল্যাণ সাধন করিবেন। গ্রাম্য গৃহস্থ লতা পাতা কাঠ প্রভৃতি পোড়াইয়া যে ভস্ম পায়, তাহার ক্ষারে কখনও বা মলিন বস্ত্র ধৌত করে, কখনও বা তাহা শস্যক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়া শস্যের অত্যাবশ্যক পটাসি-রূপ উপাদান তথায় সঞ্চিত করে। অতএব, চুলীর পাঁশ ফেলিয়া দিবার জিনিস নহে। কোন্ জিনিসই বা ফেলিয়া দিবার আছে? আর, কত জিনিস আমরা ফেলিয়া দি, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

খনিজ বা ধাতুর জীবনীশক্তি।

বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত অভিনব আবিষ্ক্রিয়া সৃষ্টিরহস্যের উদ্ভেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রাণের পরিধিবিস্তার তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। বিজ্ঞানের শৈশবে প্রাণিগণই একমাত্র প্রাণের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইত। তখনও উদ্ভিজ্জরাজ্য একেবারে চেতনার গণ্ডীর বহির্ভূত ছিল না। কিন্তু প্রদার্থের ক্রমবিভাগস্থলে—উদ্ভিদ্ অচেতন না হইলেও, চেতনারাজ্যে স্থান পাইত না। কেবল জীববিজ্ঞানে জীবনীশক্তির সূক্ষ্মতম বিকাশের দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ভিদ্‌গণ উদাহৃত হইত। কিন্তু এক্ষণে প্রাণের পরিধি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়া ধাতুদ্রব্য পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতেছে। যাহা কিছু দিন পূর্ব্বে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ লতার সাধারণ স্বত্ব বলিয়া নির্ণীত ছিল, আজি বিজ্ঞান অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিতেছে যে, ধাতু পদার্থও সেই প্রাণশক্তির সাধারণ স্বত্বাধিকারী। আর্য্য মনীষীগণ? বিশ্বের সর্ব্বত্রই প্রাণের লীলা দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা অচেতনকেও সচেতন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জড়ের জীবন সপ্রমাণ করিয়া তাহার পুরুষক্রমাগত জড়াপবাদমোচনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নবোদ্ভাবিত পরীক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া ধাতুর জীবনীশক্তি সপ্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্যাক্টিস নগরের ডাক্তার Sephane Ledus এবং নেপল্‌স নগরের সিয়র ভন্ সিয়ন (Signore Von Schion) উক্ত বিষয়ের শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহাদের গবেষণা-প্রণালী বিবৃত হইতেছে

যদি এক খণ্ড দ্রবণীয় ধাতুজ দানাদার (Crystal) লবণ,—যেমন Sulphate of Soda,—অল্পপরিমাণ পরিস্রুত জলে নিক্ষেপ করা যায়, উহা তৎক্ষণেই জলে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহা সকলেই জানেন। যদিও সহজদৃষ্টিতে জলে সোডার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, তথাপি পরীক্ষা দ্বারা উক্ত ধাতুজ লবণের সত্তা প্রমাণিত হইতে পারে। এইরূপ লবণনিশ্রিত জলে পুনঃপুনঃ লবণ নিক্ষেপ করিলে এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন উক্ত জলে আর লবণ মিশিবে না। সেই সময়ে লবণনিক্ষেপ বন্ধ করিতে হইবে। তখন যদি ঐ লবণমিশ্রিত জলের উত্তাপ কমান যায়, তাহা হইলে সহজদৃষ্টিতে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইবে। পাত্রের মধ্যে সূচীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট রেখা সকল ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। যদি পাত্রটি কোনও মতে কম্পিত না হয়, তবে অবিলম্বেই দুই চারিটি ক্রিষ্ট্যাল (দানাদার লবণ) দৃষ্টিগোচর হইবে, এবং সেইগুলি জ্যামিতিক নির্দ্দিষ্ট সরল রৈখিক ক্ষেত্রের ন্যায় নানা আকারে বিভক্ত হইতে থাকিবে। দানাগুলি অষ্টকোণ, দশকোণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে। সাধারণ লবণ ও ফটকিরি দ্বারা উক্ত বিষয়ের পরীক্ষা হইতে পারে। যে সমস্ত ধাতু দ্রবীভূত হয় না, তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

হীরক দানাদার অঙ্গার (Crystal of Carbon) ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা ঘনক্ষেত্রের (Cube) আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দানাদার প্রস্তর সকল (Rock Crystal) ষট্‌কোণী প্রিজ্‌মের (Prism) বা পরকলার ন্যায় আকারযুক্ত। প্রত্যেক ধাতুর ও ধাতুজ দানাদার লবণের এক-একটি নির্দ্দিষ্ট আকার আছে। হীরক কখনও প্রিজ্‌মের আকারে দৃষ্ট হয় না, বা দানাদার প্রস্তর (Rock Crystal) কখনও Cubeএর আকার ধারণ করে না। প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট আকার আছে।

ক্রিষ্ট্যাল সকল সজীব।

ক্রিষ্ট্যাল-ঘটিত উক্ত তত্ত্ব সকল রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তিকাল হইতে ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত সকলে বিদিত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে অণুবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তি বহু সহস্রগুণ পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় অনেক অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বলিতে পারিতাম যে, তরল বস্তু হইতে কঠিন বস্তু ধীরে ধীরে উৎপন্ন হইতেছে;—কিন্তু কি প্রকারে উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইত, আমাদের ভদ্বিষয়ের ধারণাও ছিল না। কিন্তু অধুনা ভন্ সিয়নের (Dr Von Schion) উদ্ভাবনীশক্তিবলে অণুবীক্ষণের শক্তি ৮০০০০০ গুণ পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় তরল পদার্থের কঠিনীকরণবিষয়ক সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। তিনি বলেন যে, প্রথমে একটি জলবিন্দু জলাধার হইতে সঞ্চালিত হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। উক্ত জলবিন্দু ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গ্রন্থিবৎ Cellএ পূর্ণ। এইগুলি আদিম উদ্ভিজ্জ অথবা জান্তব শরীরের (Organism) অনুরূপ। ডাক্তার এই গ্রন্থিযুক্ত পদার্থের পেট্রোগ্র্যাফ্ট (ক্রিষ্ট্যালের অঙ্কুর ?) নাম দিয়াছেন। উক্ত পেট্রোগ্র্যাফ্টের চতুর্দ্দিকে সূত্রাকার পদার্থ সকল সমষ্টিবদ্ধ হইয়া ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে উক্ত জলবিন্দুর বৃত্তাকার অন্তর্হিত হইতে থাকে, এবং পেট্রোগ্র্যাফ্ট সকল উপরিভাগে কোণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। উক্ত কোণকে ডাক্তার আদিম dominant angle নাম দিয়াছেন। তৎপরে এই কোণের বিপরীত দিকে আর একটি কোণ উৎপন্ন হয়। ইহাকে তিনি কর্ণকোণ বলেন (diagonal angle)। এই প্রক্রিয়া

সম্পন্ন হইলে পরে কৃষ্ট্যালের ধ্রুবরেখা বা অক্ষরেখা (axis) সংগঠিত হয়। ডন নিয়ন বলেন, এই স্থলে প্রাণপ্রবাহের প্রথম ক্রিয়া নয়নগোচর হয়। ইহার সহিত উন্নত জীবশরীরের প্রাথমিক জীবনসঞ্চারের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কখনও বা কৃষ্ট্যাল-গঠন-সময়ে একটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি কৃষ্ট্যালের উৎপাদন করে; দুইটিই পরস্পর ভিন্ন দিকে ছুটিতে থাকে। কোন কোন সময়ে পেটোট্র্যাষ্টগুলি জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। পেটোট্র্যাষ্টকেই কৃষ্ট্যাল-জননী বলা যাইতে পারে। ইহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হইতে থাকে, এবং কৃষ্ট্যালখণ্ডগুলি যেন লাফাইয়া লাফাইয়া জননীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটি কৃষ্ট্যাল সন্নিহিত হইলে, ক্ষুদ্রটি বৃহৎটির শরীরে সংলগ্ন হইয়া এক হইয়া যায়। সজীব পদার্থের প্রধান তিনটি ধর্ম্মই এই কৃষ্ট্যাল-জননে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উৎপত্তি, গতি ও বৃদ্ধি, এই তিনটি সজীবের ধর্ম্ম; কৃষ্ট্যালের ক্রম-বিকাশে ইহাই পুনঃপুনঃ লক্ষিত হইতে থাকে। সুতরাং কৃষ্ট্যালের জীবনীশক্তিতে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। তবে সূর্য্যকিরণে যে স্বল্পায়ু কীটাণুপুঞ্জ নৃত্য করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, কৃষ্ট্যালের প্রাণশক্তি তাহাদের জীবনীশক্তি অপেক্ষাও ক্ষীণ। সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হইবামাত্র কৃষ্ট্যালের গতির লোপ হয়। দ্রবণীয় ধাতু পদার্থের মধ্যে সজাতীয় কৃষ্ট্যাল বৃদ্ধি পাইতে পারে, এবং ঐ সমস্ত কৃষ্ট্যাল দ্রবীভূত হইলে পুনরায় সজাতীয় কৃষ্ট্যালের সৃষ্টি করে। কিন্তু অদ্রবণীয় ধাতুর (Minerals) জীবনীশক্তি প্রমাণিত করিবার সুযোগ আজিও উপস্থিত হয় নাই। এক কালে সম্পূর্ণ কৃষ্ট্যাল থাকিয়াও ইহা তখন নির্জ্জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়; পরে ইহাকে দগ্ধ করিলে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিলে, ইহার কৃষ্ট্যাল-জীবনের অবসান হইয়া থাকে।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু।

কৃষ্ট্যালের সহিত প্রাণীর সাদৃশ্যের আরও প্রমাণ বিদ্যমান। কলিকাতার জগদীশচন্দ্র ৪ বৎসর পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ধাতুদ্রব্য সকলের প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তি আছে। প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা তাহাদের সজীব ও নির্জ্জীব ভাব পরীক্ষিত হইতে পারে। বিষপ্রয়োগে যেমন সজীব পদার্থের রূপান্তর হয়, ধাতুদ্রব্যেরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। এক মাস পূর্ব্বে M. Jean Becquerel বসুর পরীক্ষার সমর্থনকল্পে বলিয়াছেন যে, ধাতু ও অন্যান্য খনিজদ্রব্য ক্লোরোফর্ম্, ইথর, লাফিং গ্যাস্ (হাস্যোৎপাদক বাষ্প), কিংবা আল্কোহল বাষ্প দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে—তৎকালে সেই খনিজ পদার্থের ভিতর দিয়া Blondlof কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। সম্প্রতি জ্যালী নগরের M. Bichat সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, খনিজপদার্থের শরীর প্রাণিশরীরের ন্যায় উক্ত কিরণসমূহের উৎপত্তিস্থানমাত্র। অধ্যাপক বসু সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বৈদ্যুতিকপ্রবাহপ্রয়োগে, জান্তব শরীরের ন্যায় ধাতুশরীরেও সজীব-নির্জ্জীবভেদে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া (response) উৎপন্ন হয়। ধাতুদ্রব্যও প্রাণিগণের ন্যায় সময়বিশেষে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। আবার বিশ্রামসুখ-উপভোগান্তে তাহারা সুস্থ হইয়া উঠে।

জীবনের উৎপত্তি।

উল্লিখিত পরীক্ষা-প্রণালী দ্বারা কি প্রাণরহস্যের কোনও নূতন তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?—যে তত্ত্ব-আবিষ্কারে আজ বৈজ্ঞানিক জগৎ বদ্ধপরিকর? আমি বলিতে চাই যে, প্রাণের পরিধি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। জীবনীশক্তি যখন প্রাচীন গণ্ডীরেখা অতিক্রম করিয়াছে,

তখন কোথায় যে ইহা আবার সীমাবদ্ধ হইবে, তাহা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এক্ষণে স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তরাদির প্রাণের স্বত্ব 'সাব্যস্ত' করিবার চেষ্টা হইতেছে, অনেকে তাহাদের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন; বিচারফল অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ আজিও প্রাণপ্রবাহের উৎপত্তিকেন্দ্রের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যদ্যপি সকল জড়পদার্থই জীবনীশক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, কবিচূড়ামণি টেনিসনের উক্তি সত্যবোধে বলিতে হয়—"সকল পদার্থেরই জন্ম মৃত্যু আছে। কিন্তুকাল শান্তিভোগান্তে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" যাহা হউক, এ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব আজিও নিরূপিত হয় নাই। ডাক্তার লেডুকের (Dr. Leduc) গবেষণাফলে উল্লিখিত রহস্যাবগুণ্ঠনের এক প্রান্ত ঈষদুন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, এই কৃষ্ট্যালীকরণ প্রক্রিয়া Colloid or blue like শিরীষের ন্যায় এক প্রকার পদার্থসংযোগে দ্রুত সম্পন্ন হয়। তাঁহার পরীক্ষা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, Gelatineএর দ্রব পদার্থে Ferrocyanide of Potash সংযোগে লাভব tissueতে যে প্রকার cells দৃষ্ট হয়, কৃষ্ট্যাল-শরীরেও ঠিক সেই রূপ cell উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ট্যাল যেমন জ্যামিতিক সরলরৈখিক ক্ষেত্রের ন্যায় নির্দ্দিষ্টপরিমাণবিশিষ্ট, কৃষ্ট্যাল-শরীরের গতিও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট পথে (জ্যামিতিক রেখা বা ক্ষেত্র অনুসারে) নিয়মিত হইয়া থাকে। স্বর্ণ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু বৈদ্যুতিক শক্তিতে কৃষ্ট্যালাবস্থ হইয়া 'আটা'র ন্যায় তরল অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই বিষয়ের পরীক্ষা দ্বারা আরও অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে পারে। ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ যে ধাতুসমূহ সমুদ্রমধ্যে colloid অবস্থায় অবস্থান করে। জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বসুন্ধরার বক্ষে জীবলীলার প্রথম অভিনয় যেরূপেই আরব্ধ হউক না কেন, সাগরের গর্ভেই জীবলীলার দুর্ব্বল প্রারম্ভের প্রথম প্রাদুর্ভাব।

জাপানী বালিকা ও রমণীর প্রকৃতি।

সেণ্টজেমস্ পত্রিকায় এক জন লেখক লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্যদেশসমূহের বালকবালিকাগণ পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত। প্রতীচ্য পরিদর্শকগণের নয়নে এ দৃশ্য যে বিশেষ বিস্ময়কর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক বলেন যে, জাপানই উক্ত বিষয়ের আদর্শস্থানীয়। যে দেশে নচিকেতা, দেবব্রত ও রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, এবং উপমন্যু ও আরুণির গুরুভক্তি দৃষ্টান্তস্থানীয়, লেখক বোধ হয় সেই ভারতের বিষয় বিশেষ অবগত নহেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘর্ষে পিতৃভক্তি প্রভৃতি সনাতন ধর্ম্মনিচয় ক্রমেই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে।

জাপানী বালিকাগণ সর্ব্বপ্রথমেই বয়োজ্যেষ্ঠগণের আদেশপালন করিতে অভ্যস্ত হয়। আদেশের যুক্তাযুক্ততা বা হেতুজিজ্ঞাসা করিবার তাহাদের অধিকার নাই। অগ্রজা ভগিনীই কনিষ্ঠাগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। অনুজাগণও বিশেষ সম্ভ্রম ও সম্মানের সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে।

সকল প্রকার গৃহকার্য্যে অভ্যস্ত হওয়াই বালিকাগণের শিক্ষার দ্বিতীয় সোপান। প্রত্যেক বালিকাকেই পরিচারিকার সর্ব্ববিধ কার্য্যই শিক্ষা করিতে হয়। গৃহমার্জ্জন, তৈজসপাত্রাদির পরিষ্করণ, গৃহাগত বিক্রেতৃগণের নিকট দ্রব্যাদিক্রয় ও রন্ধনাদি সমস্তই বালিকাগণের কর্ত্তব্যতালিকার প্রধান অঙ্গ। অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনাহরণ ও পরিচর্য্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই বালিকাগণ

অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে সম্পাদন করে, এবং তজ্জন্য আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা ঐ সমস্ত কার্য্য পরম আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করে। ইহাতে অভিমান বা লজ্জা তাহাদের মনে কখনও স্থান পায় না।

বালিকারা রজকের কার্য্যও করিতে বাধ্য। এই কার্য্যে তাহারা সাবানের পরিবর্ত্তে শীতল জল ব্যবহার করে, এবং 'ইস্ত্রি' করিবার পরিবর্ত্তে মসৃণ কাষ্ঠফলকে রেশমীবস্ত্রাদি সংস্থাপিত করিয়া যষ্টির আঘাতে সমান ও মসৃণ করিয়া লয়। ফলতঃ, গৃহসজ্জার যাবতীয় কার্য্যই বালিকাগণের কর্ত্তব্যতালিকার অন্তর্ভূত। প্রদোষে পরিবারবর্গের শয্যারচন তাহাদের অন্যতর প্রধান কার্য্য। এ বিষয়ে ধনী ও দরিদ্রে কোনও তারতম্য নাই। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককেই গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হয়।

পাশ্চাত্যযুবতীগণ যেরূপ বিলাসবিভ্রমে যুবজনের চিত্তহরণ করেন, জাপানী যুবতী সেরূপ বিভ্রমলীলার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে। কারণ, তাহাদিগকে প্রলোভনকাল বিস্তার করিয়া প্রণয়ী সংগ্রহ করিতে হয় না। জাপানী বালিকা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, তাহার পিতা উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। বালিকা পিতার মনোনীত পতিতেই সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। এই পরিণয়ে জাপানী যুবতী কিছুমাত্র বিরাগ প্রদর্শন করে না। কিন্তু সে স্বামীকে ভালবাসিতে জানে—সে ভালবাসা উদ্দাম নহে।

পরিণয়ের পরে বালিকাগণ পতিগৃহে গমন করিয়া শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করিতে আরম্ভ করে। জাপানে অত্যন্ত শিক্ষাভিমানী নব্যযুবকও স্বাধীনভাবে নিভৃতনিবাসের প্রমোদপ্রকোষ্ঠে 'মধুচান্দ্রমাস' যাপন করিতে পারে না। বধূ শ্বশ্রূর সম্পূর্ণ শাসনাধীন। বালিকা বধূর উপর পতির সর্ব্বতোমুখ আধিপত্য নাই। নবোঢ়া বধূ তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ক্রীতা কিঙ্করী ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

জাপানে পত্নী কোনও অংশে পতির সমকক্ষ নহেন। শ্বশুর শাশুড়ী পরলোকগত হইলেও পত্নী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইতে পারেন না। তিনি গৃহকর্ম্মনিপুণা পরিচারিকা মাত্র। পতিসেবাই তাঁহার জীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য ব্রত। স্ত্রী স্বামীর সহিত প্রকাশ্য স্থলে বাহির হন না—যদিও কোনও স্থলে পত্নী পতির সহিত প্রকাশ্যভাবে বহির্গত হন, সে কেবল পতির পরিচারিকা ভাবেই—সমকক্ষা প্রণয়িণীর বেশে তিনি বাহির হইতে পারেন না। এমন কি, সম্রাটের মহিষীও সম্রাটের পরিচারিকার কার্য্যসম্পাদন হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পান না।

প্রত্যূষে স্ত্রী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দীপনির্ব্বাণ করেন—পরে রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া দিবসোচিত বেশভূষা সম্পন্ন করিয়া পরিচারকদিগকে জাগরিত করেন, প্রাতরাশ প্রস্তুত করেন, এবং সমস্ত প্রস্তুত হইলে পতিকে জাগরিত করেন। ভোজনান্তে পতি যখন কর্ম্মস্থানে গমন করেন, স্ত্রী তখনও পাদুকা, পুস্তক ও ছত্রাদি লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকেন।

জাপানী রমণী অল্পবয়সেই যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৩৫ বৎসর বয়সে তাহার গোলাপী গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং দেহযষ্টির যৌবনলাবণ্য অপগত হয়। কিন্তু তাহাতে জাপানী রমণী বিষণ্ণ হন না। কৃত্রিম উপায়ে আর তিনি নষ্টপ্রায় যৌবনসৌন্দর্য্যরক্ষায় যত্ন করেন না। তখন তিনি প্রৌঢ়োচিত বেশভূষায় সজ্জিত থাকেন। কারণ, তিনি বেশ জানেন যে বয়োগতে বিলাস বিভ্রমের কোনও প্রয়োজন হয় না। তিনি এক্ষণে শাশুড়ীর পদে সমাসীন

হইয়া পুত্রবধূকে পরিবারসেবায় নিযুক্ত করিয়া নিজে কিছুদিন শান্তিভোগ করেন। এই সময়ে তিনি গৃহকর্ম্ম হইতে অল্পে অল্পে অবসর গ্রহণ করেন। গৃহকর্ত্রীর বৃদ্ধাবস্থায় সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ক্ষুদ্র "গান"। আমরা ভাবগ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধ করি, রচয়িতা ভিন্ন আর কেহ এই শ্লোকদুর্গের ব্যূহভেদ করিতে পারিবেন না।—

"আজি যত তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।"

বাঙ্গালায় লিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে 'গ্রীক্'।

"দিকে দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,"

অত্যন্ত মৌলিক, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন। "আনন্দের গভীর গন্ধ" বোধ করি আকাশকুসুমের সৌরভের মত,—প্রতিভাশালী কবি ভিন্ন অন্য কাহারও 'নাগ্রাগম্য' নহে। রবীন্দ্র বাবু অনেক লিখিয়াছেন, অনেক ছাপিয়াছেন, অনেক গাহিয়াছেন,—এখনও যে তিনি যা' তা' ছাপাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, ইহা আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। নাবালক-কবি-সুলভ কবিত্ব-কণ্ডূতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে নিতান্ত অশোভন—সে দৃষ্টান্ত সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী, রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকও যদি তাহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "বাপ্পাদিত্য" নামক আখ্যানটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। লেখক যে নিপুণ চিত্রকর ও ভাবুক কবি, "মোহ", "বাপ্পাদিত্য" প্রভৃতি রচনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আলোচ্য গল্পেও একাধারে চিত্রসৌন্দর্য্য ও কাব্যসৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়া অবনীন্দ্র বাবু প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ছোট ছোট 'চলিত কথা'র উপকরণে তিনি যে শব্দ-চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধ্য বলিয়া মনে হয়। রাজস্থানের পুরাতন কাহিনী স্বপ্নলোকের মায়ালোকে রঞ্জিত করিয়া ও নূতন ছাঁচে ঢালিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি" নামক প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন কথা শিখিলাম, কেবল বঙ্গভাষার "ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি"র পরিচয় পাইলাম না। আরম্ভেই "বর্দ্ধিষ্ণু-বস্তুর একটা জঠরাবস্থা থাকে" দেখিয়া ভীত হইবেন না, যত অগ্রসর হইবেন, ততই "ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি" দেখিয়া পুলকিত হইবেন। অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার 'বানান' বদলাইবার চেষ্টা হইতেছে। 'ঙ' বেচারা বহুকাল 'মাথায় পাগড়ী' বাঁধিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ক-বর্গের একপ্রান্তে সুপ্তিসুখে মগ্ন ছিল। রবিবাবু এই নিরীহ ব্যঞ্জনবর্ণটিকে কলমের তীক্ষ্ণ খোঁচায় জাগাইয়া তুলিয়া তাহার আলস্য অপরাধের শাস্তিবিধান করিয়াছেন।—এখন 'ঙ' বেচারা বঙ্গদর্শনের দরবারে 'ঙ' 'ং' প্রভৃতি

অনেকের 'বেগার' একাকী খাটিয়া দিয়া নিজের ধার সুদ সমেত পরিশোধ করিতেছে। এ সংবাদ নূতন নহে। দীনেশ বাবুও সম্প্রতি "অণু পরমাণু"র 'ণ'-টিকে ছুটী দিয়াছেন। দীনেশ বাবুর কল্যাণে "ধ্বংসের" 'স' 'শ'-কারের স্কন্ধে কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়া বহুকাল পেন্সন ভোগ করিতেছে। দণ্ডীরা যেমন 'পৈতা পুড়াইয়া' দণ্ড গ্রহণ করেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক ব্রাহ্মণ যেমন পৈতা ফেলিয়া চশমা লইয়া থাকেন, বোধ করি "অনুসন্ধিৎসু"র "অনু"ও সেই পথের-পথিক হইয়া চিরাশ্রিত উকারকে ভারতীর কুঞ্জে বিসর্জ্জন দিয়া ই-কারকে কাঁধে করিয়া বঙ্গভাষার "ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি"র পরিচয় দিতেছে। দীনেশ বাবু "অনিবার্য্যের" উপর অত্যন্ত প্রসন্ন—তাহাকে আর একটি রেফ বথ্ শিস্ দিয়া "অনির্ব্বার্য্য" করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি হয় নাই, আর এক পৃষ্ঠায় তাহার যফলাটির পেট কাটিয়া "অনিবার্য্য" করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। "কাহিনী" "বানিজ্য", "বাধ্যার প্রতিক্ষা", "সংস্কৃত" "পদার্পন" প্রভৃতি ত অনর্ঘ্য। "ঘৃণার ফাব" কি "ঘৃণার ভাব"? না, দীনেশ বাবুর প্রতিভার কোনও নূতন সৃষ্টি? সব না হয় সহ্য করিলাম, দীনেশ বাবুর "পাণ্ডিত্যের" আবদার যে অসহ্য! আবার যেমন দীনেশ বাবুর "মৌলিভিয়া দরবারে আসিয়া দীর্ঘ 'শ্রু' দোলাইয়া বসিলেন", অমনই সেই দোলার ফলে "শ্রু"র মকার-পসিয়া পড়িল! দেখিতেছি, দীনেশ বাবু সম্প্রতি দার্শনিক হইয়াছেন,—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই,—কিন্তু এক লাইনে "সোহং" ও অন্য লাইনে "স্বোহং" লিখিয়া জরাজীর্ণ "সোহহং"এর গঙ্গাযাত্রা করিবার তিনি কে? বাঙ্গালাই না হয় বেওয়ারিশ, সেই ক্ষেত্রেই তিনি লীলা করিতে থাকুন, সংস্কৃত শাস্ত্রের তপোবন চর্ষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন কেন? পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ভুলের রাশি কি মুদ্রাকরপ্রমাদ? অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণের আদ্যশ্রাদ্ধ, অপরূপ দার্শনিক তত্ত্ব, বিবিধ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত প্রভৃতির পরিচয় দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। সে পণ্ডশ্রমে আজ আর প্রবৃত্তি হইতেছে না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভাষার ইঙ্গিত" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "নারায়ণী" উপন্যাসের প্রথমার্দ্ধ এই সংখ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে,—অবশিষ্ট আর ভারতীতে প্রকাশিত হইবে না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসী।—শ্রাবণ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পরীক্ষা-বিভ্রাট্" নামক সুচিন্তিত নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞের উপদেশ ও পরামর্শ এ দেশে দুর্ল্লভ। সচরাচর বাঙ্গালা সাহিত্যে কর্ম্মকারই কুম্ভকারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। স্থানাভাবে ললিত বাবুর প্রবন্ধের সারসঙ্কলন করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর "সাতারা" প্রবন্ধটি নিতান্ত নীরস। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঋণশোধ" নামক গল্পটির আখ্যানবস্তু মন্দ নহে, কিন্তু লেখক তাহার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই;—ইন্দুর মৃত্যুতেই 'ছোট গল্পে'র সমাপ্তি হইয়াছে,—লেখক তাহার পর যে জের টানিয়াছেন, তাহা উপন্যাসের সীমায় উপনীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "আমাদের নক্ষত্রচক্র ও রাশি" আমাদের অনধিগম্য,—বিশেষজ্ঞের বিচার্য্য। "ওরায়ণের" প্রণেতার নাম "টিলক" নয়, তিলক। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের "স্বদেশী সমাজ—ব্যাধি ও চিকিৎসা" রবীন্দ্র বাবুর "স্বদেশী সমাজে"র-সহিত আলোচিত হইবে।

বিবিধ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্প্রতি আর একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এখনও উহা মুদ্রিত হয় নাই। আপাততঃ তিনি প্রাচীন ভারতের শিল্প সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন। তাহার ফল ইংরাজী প্রবন্ধে "কলিকাতা রিভিউ" ও "ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বৈজ্ঞানিক লেখক শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের বেদ-বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি "সাহিত্যে" বেদ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে সকল একত্র সঙ্কলিত ও "বেদ-প্রকাশিকা" নামে প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে "বেদ" নামক তাঁহার একটি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর "দেশের কথা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজীর Poverty and Un-British Rule in India, মিষ্টার ডিগ্‌বীর Prosperous British India, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History ও ভগান ষ্যালের ভারতীয় দুর্ভিক্ষসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে ভারতের আর্থিক অবনতির প্রমাণ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। সখারাম বাবু নিপুণতার সহিত সেই সকল পুস্তক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বৃদ্ধ বয়সে বরোদার 'কাউন্‌সিলার' হইয়া গিয়াছেন। বেতন মাসিক তিন সহস্র টাকা। বরোদার লাভ, দেশের ক্ষতি। দত্ত মহাশয় এই বয়সে মাতৃভূমির সেবাব্রত পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে গেলেন, ইহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে গিরিডিতে গিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু, তাঁহার শ্বশুর, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

সুকবি শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর "প্রবাহ" নামক একখানি কবিতা-পুস্তক শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের "নারায়ণী" উপন্যাসের প্রথম ভাগ খণ্ডাকারে "ভারতী"তে প্রকাশিত হইতেছিল। সম্পূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের কতকগুলি গল্প পূজার পূর্ব্বেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে। বইখানির নাম হইয়াছে,—"ছোটকাকী ও অন্যান্য গল্প।"

এক বন্ধু পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—'চিকিৎসক' ও 'হিন্দুরসায়নিকা'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, জেলা রাজসাহীর অধীন তালন্দ নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় নবেন্দ্র অবলম্বনে সৃষ্টি ও তৎপরবর্ত্তী মনু প্রভৃতির সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল সত্বর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।"

ওয়াল্‌টেয়ার হইতে সাহিত্যের এক জন পাঠক আমাদের একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি আলোচনার যোগ্য। আমরা আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"কিছু দিন পূর্ব্বে আমি বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোনও সমালোচক কর্ত্তৃক সমালোচিত এক জন প্রসিদ্ধ লেখকের রচিত একখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করি। দুঃখের বিষয়, পুস্তকখানি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। ইহাই যে আমার এ বিষয়ে প্রথম অভিজ্ঞতা, তাহা নহে; ইতিপূর্ব্বে আরও দুই তিন-বার এরূপভাবে প্রতারিত হইয়াছি। এবং সাহিত্যসেবী বন্ধুদের মধ্যেও সময়ে সময়ে এরূপ অভিযোগের কথা শুনিয়াছি; তাঁহারাও আমার মত সমালোচক মহাশয়দের মধুর বংশীরবে প্রতারিত হইয়াছেন। তাই মনে হয়, এখন সমালোচনার উপর নির্ভর করিয়া পুস্তকাদি পাঠ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। সে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় আর নাই, সে নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন সমালোচনার কোনও মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

"গ্রন্থকার যদি সামান্য লেখক হন, তবে তিনি সমালোচক মহাশয়ের বাড়ী দু'বেলা উমেদারী ও খোসামোদ করিয়া যে কোনও উপায়ে একটা অনুকূল সমালোচনা যোগাড় করিয়া লন। আর গ্রন্থকারের যদি উহারই মধ্যে একটু স্থলেখক বলিয়া সুনাম থাকে, বা তাঁহার প্রতি কমলার কৃপাকটাক্ষ থাকে, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই!

"সমালোচক মহাশয়েরা চক্ষু বুজিয়াই নির্ব্বিচারে লেখনী চালাইয়া থাকেন, তা গ্রন্থের মধ্যে যাই থাকুক। কিন্তু সমালোচকগণের পুস্তকাদি সমালোচনা করিবার সময় একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের সমালোচনার উপর কত পাঠকের অর্থ ও সময়ের সৎব্যবহার নির্ভর করে।

"আমাদের দেশে অর্থব্যয় করিয়া পুস্তক পাঠ করা প্রায় সাড়ে পনর আনা লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; পেটে খাইতেই কুলায় না, তা বই কেনা ত দূরের কথা। তাহার উপর সময় কোথায়? সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জীবিকার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয় (এখন রবিবারেও অনেক আপিস খোলা থাকে।) জমিদারী, ওকালতী, কেরাণীগিরি, মাষ্টারী প্রভৃতি করিয়া, সভা সমিতি সামাজিকতা রক্ষা করিয়া যদি অবসর পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যের আলোচনা। এমন স্থলে যদি অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যে অর্থ, সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা ছাড়া আমাদের এখন দেশ বিদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতির রীতিমত খবর রাখিতে হয়।

"তাই বলিতেছিলাম, সমালোচক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া নিরীহ পাঠকবর্গের প্রতি যদি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করেন, তাহা হইলে গ্রন্থকার ও পাঠক উভয়েই অনর্থক অর্থনাশ ও সময়ের অপব্যবহার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন।

"আজকাল কোনও কোনও মাসিকপত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তাহা সেরূপ বিশদ বলিয়া বোধ হয় না। আমার মনে হয়, "সাহিত্যপরিষৎ" পত্রে কেবলমাত্র পুরাতন পুঁথির বিবরণাদি প্রকাশিত না করিয়া প্রতিমাসে স্বদেশীয় সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা হইলে ভাল হয়।"

চাঁদ রায় ও কেদার রায়।

সুবর্ণগ্রাম হইতে ৯ ক্রোশ দূরে পদ্মাতীরে শ্রীপুর নামে নগর অবস্থিত ছিল। এই শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত। নিম রায় নামে এক জন পরাক্রমশালী ব্যক্তি কর্ণাট হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া শ্রীপুরে অবস্থিতি করেন। তিনি শ্রীপুরের প্রথম ভুঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। সম্ভবতঃ সেনরাজগণের সময়ে তাঁহার আগমন হইয়াছিল। কারণ, সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্যবাসী হওয়ায়, তাঁহাদের অনুগ্রহলাভার্থ নিম রায় দাক্ষিণাত্য হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিতে পারেন। নিম রায়ের পর শ্রীপুরে আর কোনও ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু মোগলবিজয়ের সময় শ্রীপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায় নামে দুই ভ্রাতা (১) প্রবলপরাক্রমশালী ভুঁইয়া ছিলেন। তাঁহারা দে-উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ। ইঁহারা পাঠানরাজত্বকালে ভুঁইয়াশ্রেণীভুক্ত হওয়ায় মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। মোগলেরা বিক্রমপুরকে সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাকে আপনাদের অধীনস্থ-ভূভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেও, চাঁদ রায় কদাচ আপনার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। মোগলেরা তাঁহাদের বহুনদীবিশিষ্ট ও দ্বীপসঙ্কুল রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেন; মোগল অশ্বারোহীরা সেই জন্য সহজে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিত না। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ্ ফিচ্ শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে ঐ সমস্ত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। (২) ইশা খাঁর সহিত তাঁহাদের মিত্রতা ছিল, এবং তাঁহারা ইশা খাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। কিন্তু ইশা খাঁ বলপূর্ব্বক চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ীকে লইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের

(১) শ্রীযুক্ত আনন্দলাল রায় বলেন যে, কেদার রায় চাঁদ রায়ের পুত্র। কিন্তু তাঁহারা দুই ভ্রাতা বলিয়া চিরদিনই কথিত হইয়া থাকেন। ওয়াইজও তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) "From Bacala I went to Serrepore which standeth upon the river Ganges. The king is called Chandry. They be all hereabouts rebels against their king Zebaldim Echebar, for here are so many rivers and ilands that they flee from one to another, where by his horsemen cannot prevaile against them. Great store of cotten cloth is made here".

সহিত ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়; ইশা খাঁর মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত সেই বিবাদ গুরুতররূপেই চলিয়াছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, ইশা খাঁ কর্ত্তৃক স্বর্ণময়ী অপহৃত হইলে, চাঁদ রায় লজ্জায় ও অপমানে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ক্রমে তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হয়। শ্রীমন্ত খাঁ নামে তাঁহাদের কোনও ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বর্ণময়ীকে ইশা খাঁর হস্তে অর্পণ করে। চাঁদ রায়ের মৃত্যু হইলে, কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেবল ইশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কেদার রায় একেবারে মোগলের অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। জেসুইট পরিব্রাজকদিগের বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি নৌযুদ্ধে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য-মধ্যে বহুসংখ্যক রণতরী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। শ্রীপুরের সম্মুখস্থিত সনদ্বীপ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গজয়ের সহিত সনদ্বীপ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়, এবং তাহা সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃত-সংকল্প হন। সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙ্গালী, মগ, ফিরিঙ্গী ও মোগলের মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার জন্য সনদ্বীপের ইতিবৃত্ত বাঙ্গলার ইতিহাসে উজ্জ্বলরূপে লিখিত থাকিবে। এই সনদ্বীপ অধিকারের জন্য কেদার রায় কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। কেদার রায় নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন; তিনি নৌযুদ্ধ পরিচালনের জন্য কতকগুলি ফিরিঙ্গী বা পর্টুগীজকে নিযুক্ত করেন। তাহাদের মধ্যে কার্ভালিয়স বা কার্ভালো প্রধান। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে কেদার রায় অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কার্ভোলোর সাহায্যে সনদ্বীপ মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। মাটস নামে আর এক জন ফিরিঙ্গীও কার্ভালোর সহিত যোগদান করিয়াছিল। কেদার রায় তাহাদের হস্তে সনদ্বীপের শাসনভার প্রদান করেন। সেই সময়ে আরাকান-রাজ মেং রাজাগি

—Harton Ryley's Ralph Fitch pp 118—119. অনেকে Chandryকে Choudry পড়িয়াছেন; কিন্তু হটন রাইলির গ্রন্থে স্পষ্টতঃ Chandry লিখিত আছে। হটন রাইলি আবার শ্রীপুরকে শ্রীরামপুর বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। রাল্‌ফ ফিচের সময় যে চাঁদ রায় বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বা সেলিম সা ৩) পর্টুগীজদিগের প্রাধান্যবিস্তার দেখিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে প্রস্তুত হন। ফিলিপ্ ডি ব্রিট্টো বা নিকোটি নামে এক জন পর্টুগীজ আরাকাণ-রাজের অধীনে ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিত। ক্রমে সে আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে প্রবল হইয়া উঠিলে, আরাকাণ-রাজ তাহাকে পেগুর সাইরাম বন্দরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ব্রিট্টো ক্রমে আরাকাণ-রাজের অধীনতা-ত্যাগের প্রয়াসী হয়। আরাকাণ-রাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রিট্টোর দমনে প্রস্তুত হন। সেই সময়ে কার্ভালো কর্ত্তৃক সনদ্বীপ অধিকৃত হইলে, বঙ্গোপসাগরে পর্টুগীজ প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে মনে করিয়া, তিনি প্রথমে সনদ্বীপ-অধিকারের সঙ্কল্প করেন। আরাকাণ-রাজ সনদ্বীপকে নিজের অধিকারভুক্ত প্রচার করিয়া, তাঁহার বিনানুমতিতে কার্ভালো তাহা অধিকার করিয়াছে বলিয়া, সনদ্বীপ-অধিকারের উদ্যোগ করেন। তিনি ১৫০ শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামানসজ্জিত বৃহৎ রণতরী প্রেরণ করেন। কেদার রায় তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীপুর হইতে এক শতখানি কোষ নৌকা কার্ভালোর সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধে পর্টুগীজেরা জয়ী হইয়া বিপক্ষের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করে। (৪) এই সময়ে ব্রিট্টোও সাইরাম অধিকার করিয়া গোয়ার পর্টুগীজ প্রতিনিধিকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া পাঠায়। আরাকাণাধিপতি পর্টুগীজগণের জয়লাভে ক্রোধান্ধ হইয়া সনদ্বীপ অধিকারের

(৩) সেলিম সাকে পর্টুগীজগণ Xilimxa বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরাকান রাজ মেং রাজগি 'সেলিম সা' এই মুসলমান উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

(৪) The Mogals with the conquest of Bengala had possessed Sundiva. Cada raji still continuing his Title. Under colour whereof Carvalius and Matees, two Portugals conquered it an 1602, Heereat the king of Arachan was angry, that without his leave they had made themselves Lords of that which is challenged to belong to his protection. Fearing that by his meanes, and the fortification of Siriam he should finde the Portugals un neighbourly Neighbours. He sent therefore a fleet of a hundred and fiftie Frigates or little Galleys, with fifteene Oares on a side and other greater furnished with ordanance. and Cadry (which they say was true Lord of it) sent a hundred cosse from Siripur to helpe him. The Portugals prevailed and became Masters of hundred and nine and fortie of enemies Vessels.—Purcha's Pilgrimes, Fourth part, Book V. P 515, 1625

জন্য পুনর্ব্বার সহস্রখানি রণতরী প্রেরণ করেন। সেবারেও কার্ভালো জয়লাভ করে। বিপক্ষগণের প্রায় দুই সহস্র সৈন্য হত হয়, এবং তাহাদের ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়। পর্টুগীজদিগের দুই জন মাত্র নিহত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে আরাকাণ-রাজ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সেনাপতিগণের কাপুরুষতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পর্টুগীজগণ জয়লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের রণতরীগুলি ভগ্ন হওয়ায় তাহারা ত্রিপুর, বাকলা ও চন্দ্রিকান বা সাগর দ্বীপে আশ্রয় লয়। কার্ভালো ৩০খানি রণতরীর সহিত শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট গমন করে। অগত্যা সন্দীপ আরাকান-রাজের অধিকারভুক্ত হয়। সেই সময়ে মানসিংহ পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য এক শতখানি কোষ নৌকার সহিত মন্সা রামকে প্রেরণ করেন। কেদার রায়ের সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে মন্সা রায় হত হয়, এবং কার্ভালো জয়লাভ করে। তাহার পর কার্ভালো তথা হইতে গলিন বন্দরে উপস্থিত হইয়া তথাকার দুর্গ অধিকার করে। কার্ভালোর নামে লোকে এরূপ শঙ্কিত হইত যে, কথিত আছে, এক জন আরাকানী সেনাপতি স্বপ্নে কার্ভালো কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া আপনার অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া তুলে, এবং তাহাদিগকে নদীর জলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। আরাকাণ রাজ তৎশ্রবণে তাহার প্রাণদণ্ডের নিদেশ করিয়াছিলেন। (৫) ইহার পর কার্ভালো প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য

(৫) "The king of Arracan foreseeing such a storme, provided a Navie of a thousand sails, the most Frigates some greater catures and cosses, and assailed the Portugal Fleet in Sundiva under Carvalius, who had but sixteene of divers forts or shipping which staid by him, and yet got the victorie, neere two thousand of the Enemies being slaine, a hundred and thirtie of their vessels burnt with the loss but six Portugals which vexed the king of Arracan, that he put many of the captaines in woman's habit, upbraiding their effiminate courges, which had not brought one Portugall with them alive or dead, yet were the Portugall ships so torne, that they were forced for feare of another tempest to forsake the land, and to transport that which there they had to Sirpur, Bacola, and Chandecan in the continent, and thus Sundiva became subject to Arracan, Car-

হয়। প্রতাপাদিত্য পরিশেষে তাহাকে কৌশলপূর্ব্বক হত্যা করেন। প্রতাপাদিত্য প্রবন্ধে তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে। দেখা যায়, তাহার পর কেদার রায় আরাকাণ-রাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আরাকাণ-রাজ যে-সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সোনারগাঁ প্রদেশ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে কেদার রায় তাঁহার পক্ষভুক্ত ছিলেন। (৬) মান সিং ১৬০৩ খৃঃষ্টাব্দে প্রথমে আরাকাণ-রাজকে দমন করিয়া, তৎপরবৎসর কেদার রায়কে আক্রমণ করেন। সেই সময়ে কেদার রায়ের অধীনে ৫০০ শত রণতরী ছিল। মোগল সেনাপতি কিল্‌মক্ কেদার রায় কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া শ্রীনগরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। অবশেষে মানসিং তাঁহার সাহায্যের জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর অগ্নি-ক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া মোগলহস্তে বন্দী হন, এবং মান সিংহের নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। (৭)

valius staid at Siripur (where he had thirtie fusts or frigates) with Cadury lord of the place, where he was suddenly assaulted with one hundred cosses, sent by Manasinga, Governor under the Mogal, who having subjected that tract to his master, sent forth this Navie against Cadury. Mandary a man famous in those parts being Admiral: where after a bloudie fight Mandary was slain, De carvalius carried away the honor. From thence recovering of a wound in the late fight, he went to Galin or Gullum, a Portugall colony up the streame from Porto Pequino, where he own a castle of the Mogors kept by foure hundred men one of that company only escaping. These exploits made Carvalius his name terrible to the Bengalans in so much that one of the Arracans Commander of fiftie Arracan ships dreaming in the night that he was assaulted by Carvalius, terrified his fellows, and made them flie into the river which when the king heard cost him his head !! (Parchas Pilgrims Pt IV. BK. V P 513)

(৬) "He (the Mogh Raja) succeeded by his wiles in bringing over Kaid Rai, the zemindar of Bikrampur, who had been forcibly reduced by Man singh." (Elleots History of India Vol VI.)

(৭) "Raja Mansingh after defeating the Magh Raja, turned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who had collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to Kilmak the imperial commander in-Srinagar. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja". (Elliots History of, India Vol vi Inayatullas Takmilla-i-Akbarnama)

এইরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া কেদার রায় চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যে এককালে বাহুবলে অজেয় ছিল, কেদার রায় প্রভৃতির বিবরণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাম রাম বসু বলেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায়কে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, চাঁদ রায় ও কেদার রায় দে-উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা কুলীন না হইলেও, বিক্রমপুর সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ের ন্যায় সামাজিক বিষয়েও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। বিক্রমপুরে তাঁহাদিগের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। কেদারপুর নামক গ্রামে কোনও কোনও চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। (৮) তাঁহাদের রাজধানী শ্রীপুর অনেক দিন কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তিনাশক সলিলে বিধৌত হইয়া গিয়াছে (৯) চাঁদ রায় ও কেদার রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনার স্থান নাই। যাঁহারা বাঙ্গালী নামের দুর্নাম মোচন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। (১০)

---

(৮) "At Kedderpore there are the remains of residence, which is said to have belonged to a Rajah of the name of chande Roy, of the vace of the Boongahs, who appear to have extended their authority to several parts of the country west and south of the Booti Ganga, during the decline of the kingdom of Bangoz" (Taylors Topography of Dacca. P, 101.)
টেলার চাঁদ রায়কে প্রাচীন ভুঁইয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত চাঁদ রায় যে ষোড়শ শতাব্দীর চাঁদ রায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেদারপুর নগরের নাম হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কেদার রায়ের নামানুসারে উহা অভিহিত হইয়াছিল।

(৯) "The city on the opposite side of the Megna was not Sunergong, but Seripore which stood in Bickrompore, and was destroyed by the Kirtinasa (Taylor's Topography of Dacca p. 108)

(১০) তন্মধ্যে একটি প্রবাদ এই যে, মানসিংহ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে কেদার রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল :—

ত্রিপুর মধ বাঙ্গালী কাককুলী চাকানী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগি যাও পালায়ী,
হয় গজ নর নৌকা কম্পিতা বসুভূমি
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি॥

কেদার রায় তদুত্তরে মানসিংহকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাভিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

তাল নারিকেলের দেশে।

১। তাঞ্জোরের অদ্ভুত শৈল।

তাঞ্জোর প্রদেশের অনন্তপ্রসারিত সমভূমির ঊর্দ্ধে, নারিকেলাদিতরু-সমাচ্ছন্ন বনভূমির ঊর্দ্ধে, একটি শৈলস্তূপ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—নিঃশব্দ, বিরাটাকৃতি; উহা যুগযুগান্তর হইতে এই প্রদেশটিকে নিরীক্ষণ করিতেছে; কালক্রমে কত বন গজাইয়া উঠিল, কত নগর সমুত্থিত হইল, কত দেবালয় নির্ম্মিত হইল—সমস্তই দেখিয়াছে। ভূতত্ত্বের হিসাবে ইহা একটি অদ্ভুত ব্যাপার;—আদিযুগের প্রলয়-প্লাবন-সম্ভূত যেন একটা আজগুবি খেয়াল-কল্পনা; দেখিতে মুকুটের চূড়ার মত; অথবা যেন দৈত্যদিগের জাহাজের অগ্রভাগ, উদ্ভিজ্জের হরিৎ-সাগরে অর্দ্ধ-মজ্জিত। প্রায় পাঁচ শত হাত উচ্চ। চারিদিককার বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্যে উহা কিরূপে সমুদ্ভূত হইল, আশপাশের কোন লক্ষণ দেখিয়া তাহা বুঝা যায় না। উহার গাত্র এরূপ মসৃণ যে, এই উদ্ভিজ্জ-প্রবল দেশেও, উহাতে কোনও গাছের চারা লগ্ন হইতে পারে নাই। এই হেতু, স্বভাবতই পুরাকালের ভারতবাসী সেই মহাযোগী ঋষিগণ এই শৈলটিকে স্বকীয় আরাধনার স্থান করিয়া লইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া, ধৈর্য্যসহকারে তাঁহারা এই শৈল-প্রস্তর কাটিয়া, অলিন্দ-সোপানাদি-সমন্বিত দেবালয়-নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার শীর্ষদেশে কনক-মণ্ডিত চূড়া ঝক্‌মক্ করিতেছে। যুগযুগান্তর-কাল হইতে, প্রতিরাত্রে ঐ চূড়ার উপর পূত অগ্নি জ্বালানো হইয়া থাকে। সাগরস্থ দীপ-স্তম্ভের ন্যায়, তাঞ্জোরের দূর দিগন্ত হইতেও উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

আজ প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ে শৈলের পদপ্রান্তস্থ নগরটি, অন্য দিন অপেক্ষা আজ যেন একটু বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আগামী কল্য ব্রাহ্মণদিগের একটা মহাপূজা-পার্ব্বণের দিন। গত কল্য হইতে উহারা বিষ্ণুপূজার জন্য অসংখ্য হল্‌দে ফুলের মালা প্রস্তুত করিতেছে। রমণীরা, বালিকারা, উৎসবের সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া, যাহার যাহা-কিছু উত্তম অলঙ্কার ছিল—বলয়, নথ, কান্-বালা—সমস্ত পরিধান করিয়া, তাম্র-কলসে জল ভরিবার জন্য, উৎসের

* ত্রিচিনাপল্লির শৈল।

চারিধারে আসিয়া মণ্ডলীবদ্ধ হইয়াছে। শকটের বলদদিগের সিং রং-করা—সোনার-গিল্‌টি-করা। তাহাদের কণ্ঠহার, ছোট ছোট ঘণ্টা ও কাচের গুটিকায় বিভূষিত। মালার দোকানদারেরা, দোকানে রাশি রাশি মালা সাজাইয়া রাখিয়াছে—এক প্রকার ছোট ছোট লাল ফুল, বঙ্গীয় গোলাপ, গাঁদা—এই সকল পুষ্প মুক্তার মত গাঁথিয়া, কতিপয়-হার-বিশিষ্ট মালা রচিত হইয়াছে। এই মালাগুলি অজাগর অপেক্ষাও স্থূল। ইহার ঝুলনগুলিও ফুলের, জড়ি দিয়া জড়ানো। কল্য, যাহারা পূজা-উপলক্ষে আসিবে, এবং মন্দিরস্থ দেবতারা—সকলেই এই হলদে ও গোলাপী রঙের মালাগুলি কণ্ঠে ধারণ করিবে। এই উৎসবের কর্ম্মকর্ত্তারা, আজ প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিয়া, স্বকীয় আবাস-গৃহের সম্মুখে ও সযত্নসম্মার্জ্জিত কুট্টিম-ভূমির উপরে, ফুলের ও নানাপ্রকার রেখার নক্‌সা চিত্র করিবার জন্য ব্যস্ত; একটা ছোট সাদা গুঁড়ার পাত্র হস্তে লইয়া, চিত্র বিচিত্র নক্‌সার আকারে সেই গুঁড়া ছড়াইয়া দিতেছে। এই সাদা নক্‌সাগুলি এমন সুন্দর, এবং নক্‌সার প্রত্যেক সন্নিস্থলে, হলদে ফুল এমন সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত যে, রাস্তায় চলিতে আর সাহস হয় না। কিন্তু এই-বার বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে; তাহার সঙ্গে লাল ধূলাও উড়িয়াছে। ভারতের এই দক্ষিণপ্রদেশে এই ধূলায় সব জিনিস লাল হইয়া যায়। লোকেরা যে এত ধৈর্য্য ধরিয়া চিত্র বিচিত্র রঙে ভূমি রঞ্জিত করিল, এখন ইহার আর কিছুই থাকিবে না।

নগরের বাড়ীগুলিতে লাল ইঁটের রং। ত্রিশূল-চিহ্ন গৃহ-দ্বারের উপর অঙ্কিত—সমস্তই খুব নীচু। মোটা-মোটা খাটো দেওয়াল, পোস্তা-গাঁথুনি, খিলান-গাঁথুনি,—এই সমস্ত, 'ফ্যারোয়া'দিগের মিসর-দেশকে মনে করাইয়া দেয়। এখানে মনুষ্যালয় অপেক্ষা দেবালয়ই অধিক। প্রত্যেক দেবালয়ের সম্মুখস্থ ত্রিকোণাকার গাঁথুনির উপর ছোট ছোট লালচে রঙের বিকটাকার মূর্ত্তি সন্নিবেশিত, এবং তাহাদিগের সঙ্গে এক ঝাঁক দাঁড়কাক বসিয়া আছে। তাহারা পান্থদিগের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছে;—কিরূপ শীকার জোটে, পচা-ধসা কিরূপ জিনিস মেলে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই চির-অবারিত-দ্বার প্রত্যেক দেবালয়ের অভ্যন্তরে এক একটি ভীষণ মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত;—গজমুণ্ডধারী গণেশের মূর্ত্তিই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। টাট্‌কা হলদে ফুলের রাশি-রাশি মালা তাঁহার কণ্ঠে ঝুলিতেছে;—এই সকল মালায় তাঁহার চারিটি বাহু ও লম্বমান শুণ্ডটি ঢাকিয়া গিয়াছে।

মন্দিরের পর মন্দির; ব্রাহ্মণদিগের স্নানার্থ পুণ্য পুষ্করিণী; প্রাসাদ; বাজার।

মুসলমানের মস্‌জিদ্‌ও এই তাল-নারিকেলের দেশে অল্প-স্বল্প প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। এক সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-দেশে মুসলমান-ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল—ইহাই বোধ হয় তাহার কারণ। মস্‌জিদ্‌গুলি সাদাসিধা; গায়ে, আরবীয় শিল্পরীতির অনুযায়ী নক্‌সা-কাটা, সরু-সরু খিলানের মাঝখান হইতে উহা আকাশ ফুঁড়িয়া সোজা উঠিয়াছে। যে ধূলা এখানকার সব জিনিস লাল করিয়া দেয়, সেই লাল ধূলা-সত্ত্বেও, এই মস্‌জিদ্‌গুলি, 'হেজাজে'র মস্‌জিদের মত, কোন উপায়ে স্বকীয় তুষার-শুভ্রতা রক্ষা করিয়াছে।

পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় লোকের গতিবিধি—লোকের প্রবাহ চলিয়াছে। কাল উৎসবের দিন। আমি শৈল-মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগটি নগর ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তিন চারিটি প্রকাণ্ড শৈলস্তূপে মন্দিরটি গঠিত; উহাতে একটুও চীড় নাই, ফাটল নাই; জীর্ণতার রেখামাত্রও নাই। এই স্তূপগুলি পরস্পর-উপর্য্যুপরি-নিক্ষিপ্ত জন্তুর পার্শ্ব-দেশের ন্যায় ইষৎ-বর্ত্তুল, বৃষ্টির জলধারায় মসৃণীকৃত; উহাদের গাত্র—এত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে, দেখিলে ভয় হয়। দাঁড়কাকের মেঘে চারি দিক্ আচ্ছন্ন;—উহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘোর-পাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। গোল্‌মেলে-নক্‌সা-কাটা উচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভের মধ্যে, ছোট-ছোট মন্দির-চূড়ার মধ্যে, (সমস্তই ক্ষয়গ্রস্ত ও বহুপুরাতন) একটা প্রকাণ্ড-উচ্চ সিঁড়ি শৈলের নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। কতকগুলি স্থূলকৃষ্ণাক্রান্ত আরাধ্য হস্তি-শাবক (আরাধ্য হস্তিবংশ-প্রসূত) প্রবেশ-পথটি প্রায় রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছোট-ছোট ঘণ্টা-গাঁথা মালায় উহাদের দেহ আচ্ছাদিত। সেই প্রবেশ-পথে উহারা শিশু-সুলভ ক্রীড়াচ্ছলে, আমার গায়ে শুঁড় বুলাইয়া দিল। এইবার আমার আরোহণ আরম্ভ হইল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। সেই সঙ্গে চারি দিক হইতে বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল;—শৈল-গহ্বরের মধ্যে সেই ধ্বনির গম্ভীরতা যেন আরও বৃদ্ধি হইল;—মনে হইতে লাগিল, যেন উহা পাতাল-গর্ভ হইতে নির্গত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, আমি এক্ষণে মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। কত গুপ্ত কক্ষ, কত অলিন্দ, কত প্রবেশ-দালান, কত সিঁড়ি;—ইহার মধ্যে

কতকগুলি কেবলমাত্র পুরোহিতদিগের ব্যবহার্য্য;—এই সিঁড়িগুলি রহস্যময় অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। প্রত্যেক গুপ্তস্থানে, প্রত্যেক কোণে, এক একটি প্রতিমা অধিষ্ঠিত; কোনটা বা বামনের ন্যায় ক্ষুদ্র, কোনটা বা দৈত্যের ন্যায় বিরাটাকার, কিন্তু সবগুলিই কাল-বশে লুপ্তাঙ্গ; কাহারও বা বাহুর অংশমাত্র—কাহারও বা আধখানা মুখ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

আমি অদীক্ষিত দর্শক—আমি মাঝের বৃহৎ পথটি দিয়া উপরে উঠিতেছি—সে পথটি সকলেরই নিকট অবারিত। চারিধারে, এক একটি অখণ্ড প্রস্তরে গঠিত চমৎকার স্তম্ভশ্রেণী—নক্‌সা ও আকৃতিচিত্রে সমাচ্ছন্ন; উহাদের তলদেশ এক-মানুষ-সমান উচ্চ—পদঘর্ষণে তেলা ও চিক্‌চিকে হইয়া উঠিয়াছে। কত কত শতাব্দী হইতে, এই সকল সংকীর্ণ পথের ছায়ান্ধকারে, কত অগণ্য ঘর্ম্মাক্ত নগ্নগাত্র মনুষ্য অবিরাম চলিয়াছে; তাহাদেরই স্বেদজল এই সকল শৈল-কুট্টিম গভীররূপে শোষণ করিয়াছে। শৈল-মন্দিরের গায়ে—এমন কি, উহার সোপান-ধাপ ও টালিতে পর্য্যন্ত—কতকাল পূর্ব্বে, লেখাক্ষর ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল ক্ষোদিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সমস্ত এখন দুর্ব্বোধ ও দুর্নিরূপ্য হইয়া পড়িয়াছে;—বিচরণকারী লোকদিগের পাণিতল ও নগ্ন পদের ঘর্ষণে অতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রথমেই কতকগুলি ভজন-মণ্ডপ; এত জনতা যে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। এইখানে ভক্তজন অন্ধকারে মধ্যে বন্দনা গান করিতেছে। আর একটু উচ্চে একটি দেবালয়, 'ক্যাথিড্রাল' গির্জার ন্যায় বিশাল; অরণ্যবৎ স্তম্ভশ্রেণী উপরকার ভীষণ পাষাণ-ভার ধারণ করিয়া আছে। এই মন্দিরে বিধর্ম্মীদিগের প্রবেশাধিকার আছে, কেবল এই নিয়ম যে, আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই দেবালয়টি কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, দেখা যায় না। দূর-প্রান্তের বর্ণবিন্যাস ও জ্যোদ্রিত গুহাগুলি শৈলের নৈশ-অন্ধকারে বিলীনপ্রায়। শুভ্র লোমশ বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি বৃদ্ধের নিকট, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-শিশু বেদ পুরাণাদি পাঠ করিতেছে। শৈল-মণ্ডপের সুঁড়িপথ-গুলিতে, ব্রাহ্মণদিগের আনুষঙ্গিক পূজা-সামগ্রী সকল সংরক্ষিত:—মহাপুরুষ, রথ, ঘোড়া, হাতী, (প্রকৃত অপেক্ষা বড়) অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত কত খুঁটিনাটি জিনিস, জমাট্-কাগজের উপর—রঙ্গিন কাগজের উপর আঁকা—দেয়ালের গায়ে, ভঙ্গুর বংশদণ্ডের উপর লট্‌কানো রহিয়াছে। এখানকার জীবকুল উন্মত্তভাবে বংশবর্দ্ধনে ব্যাপৃত। ছোট-ছোট পাখী—চাতক কিংবা

চড়াই—মন্দিরের সুঁড়ি-পথগুলিতে নীড়নির্ম্মাণ করিয়া, চিত্রবিচিত্র রঙ্গের অণ্ডে তাহা পূর্ণ করিতেছে। এই সুঁড়িপথগুলিতে লোকজন যাতায়াত করিতেছে, পক্ষিশাবকগুলি চিঁচিঁ শব্দ করিতেছে, এবং এই লঘু প্রাণীদিগের পরিত্যক্ত পুরীষ, কুট্টিম-প্রস্তরের উপর শিলাবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে :—এই সমস্ত জীবন-উদ্যমের বিকাশে, বিচিত্র বিকটাকার জীবের প্রাচীর-বিলম্বিত চিত্রগুলিও যেন একটু সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

এখনও আরও উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে,-এই সকল অখণ্ড-প্রস্তরময় মসৃণ প্রাচীরের মধ্যে, মনে হয়, যেন কোন ভূগর্ভস্থ-সমাধি-মন্দিরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সময়ে, হঠাৎ একটি বাতায়নের মধ্য দিয়া সূর্য্যের কিরণচ্ছটা প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিল, তখন নিম্নদেশের দূরস্থ বৃক্ষ ও মন্দিরাদি দেখিতে পাইলাম। আমি আকাশের খুব উচ্চদেশে উঠিয়াছি। কতকগুলি শৈলস্তূপ—শৈলযুগের প্রস্তরবৎ প্রকাণ্ড, পরস্পর উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত, বিশ্লিষ্ট ও এক-কোঁকা, শুধু বর্ব্বর পরমাণু-রাশির ভারেই, প্রায় অনাদি কাল হইতে এক স্থানে দণ্ডায়মান।

আবার একটি দেবালয়; কিন্তু উহাতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি উহা দ্বারদেশ হইতেই দেখিলাম। এইমাত্র আমি যে স্থানটি ছাড়িয়া আসিলাম, সেখানকার শৈলস্তূপগুলির ন্যায় এই শৈলস্তূপগুলিও পরস্পর উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত, কিন্তু তদপেক্ষা আরও প্রকাণ্ড ও চমৎকারজনক। তা ছাড়া এইগুলি অধিকতর আলোকিত; কেন না, ইহার বিমানের গায়ে, স্থানে স্থানে চতুষ্কোণাকার ফাঁক আছে,—যেখান হইতে নীল-আকাশ পরিলক্ষিত হয়, এবং সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া, বিচিত্র রঙ্গের অলঙ্কারে বিভূষিত, সোনালি-গিল্টির কাজ-করা, মন্দিরের অংশ-বিশেষের উপর নিপতিত হয়। এই দেবালয়টি—যাহা গগনবিজয়ী বলিলেও হয়—ইহার উপরে কতকগুলি ছাদ আছে; এই ছাদের উপর হইতে দেখা যায়—তাঞ্জোরের সমভূমি দূরদিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত, এবং তন্মধ্যে অসংখ্য মন্দির, হরিদ্বর্ণ নারিকেল-কুঞ্জের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে।

এখন কেবল সেই সর্ব্বোপরিস্থ শৈলস্তূপটি আমার দেখিতে বাকি!—একটি অখণ্ড প্রস্তরের সেই স্তূপটি, যাহা আদিকালের প্রলয়বিপ্লবে, অত উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হই ঁকিয়া রহিয়াছে। নিম্নদেশ হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন উহা যেন জাহাজ-"গোলুই"এর অগ্রভাগ, অথবা 'হেল্‌মেট'-শিরস্ত্রাণের চূড়া-

প্রান্ত। এই শৈলের গা বাহিয়া একটা অপরিস্ফুট সিঁড়ি উঠিয়াছে, তাহার ১৪০টা ধাপ—সঙ্কীর্ণ, ক্ষয়গ্রস্ত ও এরূপ ঝোঁকা যে দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়।

উল্লিখিত কনক-কলস-ভূষিত ছাদের উপরেই, প্রতিরাত্রে পুণ্য-অগ্নি জ্বালানো হয়, এবং সেইখানেই মন্দিরের মুখ্য পুত্তলিকাটি, একটা প্রকাণ্ড তমসাচ্ছন্ন মণ্ডপের মধ্যে স্থাপিত। যেন কোনও বন্য পশুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, এইভাবে মণ্ডপের চারিধার মজবুৎ লোহার গরাদে দিয়া ঘেরা। বিগ্রহটি কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ গণেশ—স্বকীয় পিঞ্জরের দূরপ্রান্তে, অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছেন।—একেবারে গরাদের ধারে না আসিলে স্পষ্ট দেখা যায় না। ইঁহার গজকর্ণ ও গজশুণ্ড স্বকীয় লম্বোদরের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং ইঁহার প্রস্তরময় দেহটি, ঈষৎ ছাই-রঙ্গের ছিন্ন মলিন চীরবস্ত্রে আচ্ছাদিত। এই উত্তুঙ্গ ব্যোমমার্গস্থ কারাগৃহে বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ থাকিয়াও, ইনি একাকী সেই সর্ব্বোপরিস্থ মন্দিরের মধ্যে রাজত্ব করিতেছেন,—যেখান হইতে, দ্বিসহস্র বৎসর যাবৎ, বাদ্যধ্বনি ও বন্দনা-গান অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

আমি এখন মনুষ্য ও পাখীর রাজ্য ছাড়াইয়া বহু ঊর্দ্ধে আসিয়াছি। নীচে কাকেরা ঘোরপাক দিয়া উড়িতেছে, চীলেরা উধাও হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—মনে হইতেছে, যেন নিঃস্পন্দ হইয়া স্থিরভাবে আকাশে ঝুলিতেছে। এই মন্দিরস্থ গণপতি যে প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতেছেন, ঐ প্রদেশটি পূর্ত্ত-অর্চ্চনায় যেরূপ উন্মত্ত, সমস্ত ভূমণ্ডলে এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। দেবালয়-সমূহ যেন বৃক্ষের ন্যায় চারি দিক হইতে গজাইয়া উঠিয়াছে; চারি দিকেই দেব-মন্দিররূপ লোহিত কুসুম-রাশি যেন হঠাৎ বনভূমি হইতে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাল নারিকেলের বন হইতে এত মন্দির উঠিয়াছে যে, এই উচ্চস্থান হইতে মনে হয়, যেন তৃণক্ষেত্রের মধ্যে, শৃগালের কতকগুলি আবাসগর্ত্ত রহিয়াছে।

ঐ অদূরে, ২০টা ত্রিকোণাকৃতি প্রকাণ্ড মন্দির-চূড়া—যেন কোন ছাঁউনিতে কতকগুলি তাঁবু একত্র সাজানো রহিয়াছে। উহা 'শ্রীরাগমে'র মন্দির। যতগুলি বিষ্ণুমন্দির আছে, তন্মধ্যে ঐটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাল ওখানে মন্দিরের উৎসব-উপলক্ষে, লোকেরা ঠাকুর লইয়া মহাসমারোহে রাস্তায় বাহির হইবে—আমি দেখিতে যাইব।

শৈলের ঠিক তলদেশে একটি নগর অধিষ্ঠিত—এখান হইতে ঝুঁকিয়া যেন একেবারে উহার উপরে গিয়া পড়া যায়; মনে হয়, যেন কোন-একটা রং-চং-করা

মানচিত্রে রাস্তাসমূহের জটিল নক্সা-জাল অঙ্কিত ; বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত মন্দিরের ছড়াছড়ি ; কতকগুলি মন্দির খুব সাদা ধব্‌ধবে—তাহাতে একটু নীলের আভা স্ফুরিত হইতেছে। সূর্য্যকিরণদীপ্ত দর্পণের ন্যায় পুণ্যতীর্থ-পুষ্করিণীগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আর সেই পুষ্করিণী-জলে ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতেছে —মনে হয়, যেন কালো-কালো অসংখ্য মাছি ভাসিতেছে।

ম্যালাবার প্রদেশের ন্যায় এখানেও নারিকেলের রাজত্ব। তথাপি, অনিল-আন্দোলিত এই শাখা-পক্ষময় অরণ্যের মধ্যে—যাহা চতুর্দ্দিকে দিগন্তে গিয়া শেষ হইয়াছে—এক একটা বড়-বড় ফাঁক্, হল্‌দে দাগের মত দেখা যাইতেছে। এইগুলি শুষ্ক তৃণক্ষেত্র, বর্ষণের অভাবে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শুষ্কতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং আরও দূর প্রদেশে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। তাঞ্জোরেও এই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

সুতীব্র জীবন-উদ্যম-পূর্ণ বিচিত্র কোলাহল, এইখানে পৌঁছিবামাত্র সব একত্র মিশিয়া যাইতেছে। উৎসবময় নগরের প্রমোদ-কল্লোল, গরুর গাড়ীর চাকার শব্দ, রাস্তার ঢাক্ ঢোল ও শানাইয়ের বাদ্যনির্ঘোষ, চিরন্তন বায়স-দিগের কা-কা-রব, চীলদিগের তীব্র চীৎকার, উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত মন্দির-সমূহের স্তবগান, তূরী ও শঙ্খধ্বনি,—এই সমস্ত শৈলদেহে প্রতিহত হইয়া অবিরাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৃত্যু-ভয়।

"স্নিগ্ধ-শোভন, হৃদিরঞ্জন জ্যোৎস্নাযামিনী তুমি ;
শিশির-অন্তে নব বসন্তে উজ্জ্বল বনভূমি ;
অরুণ-কিরণে সরসী-জীবনে বিকশিত শতদল ;
মলয়-বীজনে বিকশিত বনে পিকের প্রণয়-কল ;
বরষার শেষে শরৎ-আকাশে উষার কনক কর ;
গন্ধ-মোদিত, কোকিল-কূজিত নিশীথে বাঁশরী-স্বর ;
নব-বিকশিত কুসুম শোভিত শিশির অরুণ করে ;
সুখদ-পরশ মলয় সরস নীরস শীতের ঘরে ;

শিশিরের শেষে অভিনব বেশে প্রকৃতির নব শোভা ;
বাত্যা-বিগত গগনে উদিত চন্দ্র লোচন-লোভা।
পূর্ণ হৃদয় শুধু তোমাময় তোমা ছাড়া নাই আর ;
তোমার বিহনে শূন্য জীবনে উঠে শুধু হাহাকার ;
তোমার নয়নে প্রেমের কিরণে নিবিড় আঁধার টুটে ;
শুষ্ক এ বুকে সীমাহীন সুখে আকুল পুলক ফুটে।"—

"নীরস-শীতের ঘরে"—"নীরস-শীতের পরে" কোন্‌টি ভাল, কবিতা লিখিয়া সতীন্দ্রনাথ তাহাই ভাবিতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। শয়নকক্ষে প্রশস্ত পালঙ্কে অতি কোমল শুভ্র শয্যা রচিত রহিয়াছে। তাহারই নিকটে—জরীর কাজ করা আস্তরণে আবৃত টেবিলে রিডিংল্যাম্প হইতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক উদ্গিরিত হইয়া কক্ষ আলোকিত করিতেছে। সেই টেবিলের সম্মুখে মরক্কো-চর্ম্মমণ্ডিত চেয়ারে বসিয়া সতীন্দ্রনাথ ভাবিতেছে। তখনও কলম হাতেই রহিয়াছে।

এমন সময় তাহার "তুমি" কক্ষে প্রবেশ করিল। পত্নীর পদশব্দে সতীন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিল। পত্নী শৈলবালা গ্রীবা একটু বাড়াইয়া, নয়ন-দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া দেখিল,—স্বামী কবিতা লিখিয়াছেন। সে কিছু না বলিয়া শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল।

সতীন্দ্র জানিত, শৈল কবিতা বড় ভালবাসে ; সে ভাবিয়াছিল, শৈল নিশ্চয়ই কবিতা শুনিতে চাহিবে, এবং তাহারই উদ্দেশে লিখিত কবিতা শুনিয়া প্রীতা হইবে। তাই সে প্রথমেই বলে নাই, "শৈল, আজ একটা কবিতা লিখিয়াছি।"

প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। সতীন্দ্রের বোধ হইল, অনেকক্ষণ হইয়াছে। সে সতর্ক হইয়া একবার শয্যায় পত্নীর দিকে চাহিল। বোধ হইল, যেন শৈল ঘুমাইয়াছে। তখন আর "ঘরে" ও "পরে"র শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারে তাহার মন রহিল না। সে দুইবার মৃদুস্বরে ডাকিল,—"শৈল!" শৈল উত্তর দিল না। সতীন্দ্র অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে ডাকিল। তবুও উত্তর নাই। তখন আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া সতীন্দ্রনাথ যাইয়া পত্নীর কপোলে করতল স্পর্শ করিল। শৈল উঠিল না। যে সত্য সত্যই ঘুমায়, সে সহজে জাগে ; কিন্তু যে কপটনিদ্রায় অভিভূত, তাহার নিদ্রাভঙ্গ সহজে হয় না। শৈল উঠিল না। সতীন্দ্রের মন ভারাক্রান্ত হইল।

পত্নীর কপালের কয় গুচ্ছ কেশ তাহার সযত্ন-রচিত কবরীতে বদ্ধ হইত না। শৈলবালার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা সত্বর আবশ্যক দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয় নাই। সতীন্দ্র সেগুলিকে সরাইয়া পত্নীর কর্ণের পশ্চাতে দিল; তাহার পর কপোল চুম্বন করিল।

আলোক নিবাইয়া আসিয়া সতীন্দ্র শয়ন করিল। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বামীর গভীর ও নিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দে শৈল বুঝিল, সতীন্দ্র ঘুমাইয়াছে। সে ধীরে ধীরে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল; দেখিল, সত্যই সতীন্দ্র ঘুমাইয়াছে! সে ভাবিল, এত শীঘ্র এত নিদ্রা! কৈ, সে ত এখনও ঘুমায় নাই!

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়াই সতীন্দ্র পত্নীকে জাগাইল; বলিল, "শৈল, কাল একটা কবিতা লিখিয়াছি।"

শৈল কিছু বলিল না। সে উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে ভাবিল, গত রাত্রিতে সে আনিবামাত্র সতীন্দ্রের সে কথা বলা উচিত ছিল।

সমস্ত দিন সতীন্দ্রের মনে যেন ভার চাপিয়া রহিল।

সতীন্দ্রনাথের মনে কেবল যে একটা ভারই চাপিয়া রহিল, এমন নহে। বর্ষার আকাশে যেমন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাময়ী বিদ্যুল্লতাও থাকে, তেমনই তাহার হৃদয়ে আশঙ্কাও রহিল। মনের সে ভার প্রণয়পাত্রীর মনোবেদনা হেতু। সতীন্দ্রনাথ পত্নীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তখনও তাহাদের সন্তান হয় নাই। সতীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পত্নী ব্যতীত আর কাহারও স্থান ছিল না। সতীন্দ্রনাথের সকল আশা ও সকল কল্পনার কেন্দ্র, সেই পত্নী। কিন্তু আশঙ্কার কারণ অন্যবিধ।

সতীন্দ্রনাথ জানিত, তাহাকে লইয়া শৈল সুখী নহে। কেন? তাহা সে জানিত না; জানিলে হয় ত কারণ দূর করিতেও পারিত। শৈল যে তাহাকে ভালবাসে নাই এমন নহে। বিবাহের পর প্রথম প্রণয়বিকাশকালে সতীন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিল, সে পত্নীর নিকট যে প্রেম পাইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সেই প্রেমস্মৃতিই বহুদিন তাহার সর্ব্বসুখের আকর ছিল। কিন্তু তাহার পর সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে শৈল তাহা স্বীকার করে না। কিন্তু যে সত্য সত্যই ভালবাসে, তাহার হৃদয়ে প্রেমাস্পদের হৃদয় প্রতিবিম্বিত হয়; তাই শৈল তাহা স্বীকার না করিলেও, সতীন্দ্রনাথ তাহা অনুভব করিত।

সতীন্দ্র প্রথমে মনে করিত, সংসারে পত্নীর মন বসিলে তাহার এ ভাব যাইবে। শৈল সংসারের সব কাজ নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিত। কিন্তু সে সংসারের কাজ লইয়া থাকিত না। সে সব কাজ যেন সখ করিয়া করা। সন্তান হইলে হয় ত শৈলবালার এ ভাব দূর হইত। কিন্তু শিশুর হাসিমুখে স্বামিস্ত্রীর দাম্পত্যজীবন সুখসমুজ্জ্বল হয় নাই।

সাধারণতঃ স্ত্রী স্বামীর সকল খুঁটিনাটি যেমন করিয়া লক্ষ্য করে, স্বামী স্ত্রীর সকল খুঁটিনাটি তেমন করিয়া লক্ষ্য করে না। তাহার কারণ, স্বামীর অনেক কাজই গৃহের বাহিরে। স্ত্রী তাহাকে যে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহার কার্য্য তাহাকে সর্ব্বদাই সেই সীমার বাহিরে লইয়া যায়। স্ত্রীর সর্ব্বদাই মনে হয়, স্বামীকে পর্য্যাপ্তপরিমাণে পাইলাম না। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে হারাইবার ভয় থাকে—তাই স্ত্রীর এত চেষ্টা। স্বামীর পক্ষে তাহা নিতান্ত অনাবশ্যক। কারণ, তাহার পক্ষে হারাইবার কোন আশঙ্কাই নাই। বিশেষ, চিরাগত অটল বিশ্বাসে স্বামী নিশ্চিন্ত থাকে, সেই তাহার পত্নীর সর্ব্বস্ব। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। শৈল স্বামীর প্রেমে অটল বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত ছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সতীন্দ্র যে নিশ্চিন্ত ছিল না, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তাহার প্রধান কারণ, দুর্ল্লভ মানবজীবনে মানবমাত্রেরই স্বভাবতঃ যে আকর্ষণ থাকে, সতীন্দ্র ভাবিত, তাহার পত্নীর তাহা নাই। কেন নাই—কেন সে পত্নীর প্রতি তাহার সকল কর্ত্তব্য পালন করা সত্ত্বেও, সে পত্নীকে হৃদয়ের প্রেম দিয়া তাহাকে হৃদয়সর্ব্বস্ব করিলেও, শৈল সুখী হয় নাই, সতীন্দ্র সর্ব্বদাই তাহা ভাবিত। সে ভাবিত, আর শঙ্কিত হইত,—না জানি তাহার অদৃষ্টে দুঃখ-দুর্দ্দশার কি দুরন্ত দাবানল জ্বলিবে!

পত্নীর কথায় ও কার্য্যে সতীন্দ্র কেবল এইটুকুই বুঝিয়াছিল, শৈলবালার বিশ্বাস,—সে স্বামীর সমস্ত প্রেম পায় নাই! ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সতীন্দ্র ভাবিত, সে পত্নীকেই জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়াছে, তবুও তাহার মনে এ সন্দেহ কেন? কেমন করিয়া—আর কি করিয়া সে পত্নীর সন্দেহ ঘুচাইবে? তাহার স্বভাবে বা কার্য্যে, ব্যবহারে বা আচরণে, কিসে পত্নীর হৃদয়ে এ সন্দেহ জন্মিয়াছে? কিন্তু ইহার জন্যও সে পত্নীকে দোষী করিত না; বরং ভাবিত, তাহার অবশ্যই কোনও দোষ আছে। প্রেম এমনই বটে!

আজও সতীন্দ্র আপনাকেই দোষী স্থির করিল। চপলতা, কৌতুকপ্রিয়তা

যৌবনের সহচর। কিন্তু একের পক্ষে যাহা পথ্য, অপরের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর যে না হয়, এমন নহে। যাহার যাহা সহে না, তাহার তাহা না করাই কর্ত্তব্য। সে পত্নীকে জানিয়াও কেন পূর্ব্বেই তাহাকে কবিতারচনার কথা বলে নাই? সে আপনাকেই দোষী মনে করিল।

ইহার পর সতীন্দ্র আরও একবার শৈলকে কবিতার কথা বলিল; শৈল সে কথায় কানই দিল না।

এই অতিতুচ্ছ ঘটনা হইতেও অঘটন ঘটিয়া গেল। স্বামীর মনে দুঃখ ও আশঙ্কা জন্মিল; স্ত্রীর আহত চিত্তও অভিমানে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। অদৃষ্টের এমনই উপহাস।

—৩—

যেরূপ তুচ্ছ ঘটনায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই মনোমালিন্যের সঞ্চার হইল, এরূপ তুচ্ছ ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সচরাচর তাহাতে দম্পতিকলহে বস্তুবারম্ভ লঘুক্রিয়া হয়; স্নেহের আদরে, সোহাগের বিদ্রূপে, প্রেমের চুম্বনে আঘাত ভাসিয়া যায়—কুজ্ঝটিকার পর সমুদিত সূর্য্যের মত প্রেম যেন সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। বরং মান অভিমান প্রেমের পক্ষে স্বাভাবিক—তাহাতে প্রেমের মাধুরী বর্দ্ধিত হয়।—কিন্তু নদীর স্রোতে একবার পালি জমিয়া যদি চর পড়িতে আরম্ভ হয়, তবে প্রতিহতবেগ প্রবাহে বাহিত সামান্য পলিও তাহাকে ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন করিতে আরম্ভ করে। একবার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইলে বিপদের আর অন্ত থাকে না। এ স্থলেও তাহাই হইয়াছিল। কথায় কথায় শৈলবালার মন ভারি হইত; মুখ চিন্তায় অন্ধকার হইত; জীবনে বিতৃষ্ণার কথা প্রকাশ পাইত; সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় ও আশঙ্কায় সতীন্দ্রনাথের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। প্রথমে সে বিপদের অন্ধকারে আশার যে কিরণরেখা দেখিতে পাইত, ক্রমে তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। শেষে বুঝি জীবন অন্ধকার করিয়া তাহার জ্যোতি নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। কিন্তু তখনও শৈলবালার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমে সতীন্দ্রনাথের ব্যথিত হৃদয় পূর্ণ। সেই ভবযন্ত্রণার কারণ। সতীন্দ্র সর্ব্বদাই ভাবিত,—কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না;—কেবল ভাবিত। তাহার হৃদয়ে কেবল আশঙ্কার দারুণ চাঞ্চল্য। জীবনে সুখ কোথায়?

যে সুখের আশায় মানুষ আর সব সুখ ত্যাগ করিতে পারে, সে সুখের আশায় হতাশ হইলে মানুষের বড় বেদনা, বড় যাতনা। মানুষ পত্নীর নিকট

যত আশা করে, তত আর কাহারও নিকট করে না। পত্নীর প্রেমে যাহার হৃদয় সুখ-সুরভিত হয় নাই, তাহার জীবন বড় দুঃখের। পত্নীর প্রেমে যাহার হৃদয় পূর্ণ হয় নাই, তাহার শূন্য হৃদয়ে কেবল যাতনা। যে পত্নীর প্রেমে সব কষ্ট ভুলিতে না পারে, সে বাঁচিয়া থাকে কেন? পত্নীর প্রেমে যদি দুঃখ থাকে, তবুও সুখের তুলনায় সে দুঃখ নিতান্তই নগণ্য। দাম্পত্য জীবনে যদি বেদনা—যাতনা থাকে, তবুও সুখের কুসুমে সে মরুভূমি চিরপ্রফুল্ল হইয়া থাকে। পত্নীর প্রেম জীবনে অনন্ত সুখের আকর। যে তাহা পায় না, তাহার বড় দুঃখ। যে তাহা পাইয়াও পায় না, তাহার আরও দুঃখ। সতীন্দ্র-নাথের তাহাই হইয়াছিল। সে যে প্রেম হৃদয়ের সুখ ও জীবনের নির্ভররূপে গ্রহণ করিয়াছিল,—সে প্রেমে এত দুঃখ কেন? যে পত্নীকে সে হৃদয়-সর্ব্বস্ব করিয়াছিল, তাহার মনে এ দারুণ সন্দেহ কি জন্য?

কবিতার চর্চ্চায় ও কবিতার রচনায় সতীন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ হৃদয় আরও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। পত্নীর এইরূপ ব্যবহারে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইত।

পত্নীর এইরূপ ব্যবহারে প্রথমে তাহার হৃদয়ে বেদনাই প্রবল হইত—তাহাতে আশঙ্কা তত প্রবল ও প্রদীপ্ত হইত না। কিন্তু ক্রমে বেদনা ও আশঙ্কা সমান হইতে লাগিল। শেষে বুঝি আশঙ্কা বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া গেল—আশঙ্কা ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সত্যই কি তাহার জীবনে অতি দারুণ, কল্পনারও অতীত দুর্ঘটনা ঘটিবে? সত্যই কি পত্নীর এ ভাব—এ বিশ্বাস দূর হইবে না; সত্যই কি শৈলবালার জীবনে বিতৃষ্ণা অপনীত হইয়া জীবনে আকর্ষণ জন্মিবে না?

সতীন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ সুস্থ শরীরে কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না বটে, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল না সত্য, কিন্তু সর্ব্বদা শঙ্কিত অবস্থায় অবস্থান করিয়া তাহার স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সে সামান্য কারণে অতিরিক্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িতে লাগিল; সামান্য বেদনা একান্ত অসহনীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

ইহার বিষময় ফলের কথা শৈল বুঝিতে পারিত না। স্বামীর অকারণ ব্যস্ততায় সে যদি বা কৌতুক-বোধ না করিত, বিচলিত হইত না। ভাবনায় ভাবনা বর্দ্ধিত হয়। এক বিষয় একভাবে ভাবিতে থাকিলে, শেষে তাহার ভাবান্তরের কথা আর কল্পনাতেও আসিতে চাহে না। আপনার কল্পিত

দুঃখকে সত্য ভাবিতে ভাবিতে শেষে শৈলবালার নিকট তাহা একান্ত দুঃসহ বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। সে সত্য সত্যই ভাবিতে লাগিল, সে তাহার প্রাপ্য পায় নাই; সুতরাং তাহার জীবন কেবল দুর্ব্বহ যাতনামাত্র এ জীবনের, এ যাতনার ভার বহিয়া লাভ কি? কেন সে জীবন রাখিবে?

৪

ক্রমাগত আপনার কল্পিত দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া শৈলবালার সে দুঃখ যে পরিমাণ দুঃসহ বোধ হইতেছিল, তাহার জীবনের প্রতি আকর্ষণও সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সহস্র দুঃখ দুর্দ্দশাতেও জীবনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে! সাময়িক উন্মত্ততার উত্তেজনাই আত্মনাশের কারণ। ভ্রান্ত বিশ্বাসের কুজ্ঝটিকায় শৈল আর সে আকর্ষণ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

শৈল যদি একবার ভাল করিয়া স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিত, তবে তাহার কল্পিত দুঃখকে অসার বুঝিতে না পারিলেও, সহনীয় মনে করিত। জগতে কল্পিত সুখলাভ কাহার ভাগ্যে ঘটে? যাহা পাই না, তাহার জন্য সব ত্যাগ না করিয়া, জীবনের কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া, যাহা পাইয়াছি, তাহারই সম্যক সদ্ব্যবহার করিয়া, আপনাকে ও আপনার জনকে সুখী করিবার চেষ্টাতেই মনুষ্যত্ব। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে শৈল এ কথা বুঝিতে পারিত; আরও বুঝিত, জগতে অনেক রমণীর অপেক্ষা সে সুখী। নিষ্কলঙ্ক পূতচরিত্র স্বামীর প্রেম সে পাইয়াছিল,—ভ্রান্তিবশতঃ শৈল তাহা লক্ষ্য করে নাই। লক্ষ্য করিলে সে আপনাকে দুঃখী না ভাবিয়া সুখী ভাবিত। সে কেন তাহা লক্ষ্য করে না, সতীন্দ্র তাহাই ভাবিত।

সময় সময় পত্নীর জীবনে বিতৃষ্ণা এমনই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিত যে, তাহাকে শান্ত করিবার জন্য অবলম্বিত উপায়ে সতীন্দ্র আপনি সঙ্কুচিত হইত; তাহার আত্মসম্মান আহত হইত; সম্ভবতঃ তাহাতে শৈলবালার বিরক্তি ও ঘৃণা বর্দ্ধিত হইত।

এক এক দিন সতীন্দ্রনাথ পত্নীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত। বিষয়গুণে গাম্ভীর্য্য আপনি আসিত—বিশেষ তাহার হৃদয়াবেগ প্রত্যেক কথায় ফুটিয়া উঠিত। সতীন্দ্রনাথ এরূপ উপদেশ দিলে শৈল কখন কখন স্থির হইয়া তাহার সকল কথা শুনিত; কিন্তু এক এক দিন উপেক্ষার হাসিও হাসিত। সে হাসিতে সতীন্দ্রনাথের ব্যথিত হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তাহার

হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখ জ্বালাই কি যথেষ্ট ছিল না? আবার কেন সে ইচ্ছা করিয়া এ উপহাসের ভাগী হইতেছে? সে আপনাকে ধিক্কার দিত—জগৎকে ধিক্কার দিত। সে কি করিবে, স্থির করিতে পারিত না। কিন্তু হৃদয়ের সে অবস্থায় যে কোন কার্য্য করা সম্ভব। এক এক দিন যেন পত্নীর জীবনে বিতৃষ্ণা—জীবনদীপনির্ব্বাপনের বাসনা স্বামীতেও সংক্রান্ত হইত।

এক এক দিন উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে সতীন্দ্রনাথ পত্নীকে কত কথা বলিবে, স্থির করিয়া রাখিত। কিন্তু সাক্ষাতে পত্নীর উপহাসদীপ্ত দৃষ্টি ও আবেগহীন কথার ফলে তাহার কথা আর ফুটিত না। মনের কথা মনেই রহিয়া যাইত—কেবল তাহাকেই যন্ত্রণা দিত। সে আপনার জ্বালায় আপনি জ্বলিত।

এমনই ভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

ইহার মধ্যে এক এক দিন আসন্ন বিপদের নিবিড় ছায়ায় সতীন্দ্রনাথের হৃদয় অন্ধকার হইয়াছে। যদি বা কখনও সে অন্ধকারে বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, অন্ধকারাবসানে ঊষালোকবিকাশের শেষ সম্ভাবনাও আর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় নাই।

সতীন্দ্রনাথ কোনরূপে পত্নীর জীবন রাখিয়াছে—তাহাকে আত্মঘাতিনী হইতে দেয় নাই। কিন্তু সে তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া ফিরাইতে পারে নাই—কাজেই কোনও স্থায়ী ফললাভ হয় নাই। কেন এমন হইয়াছিল, সতীন্দ্রনাথ তাহা ভাবিয়া পাইত না। প্রথমে সে আশা করিত, একদিন পত্নী স্বীয় প্রেম বুঝিতে পারিবে—কিন্তু হায়!—সে একদিন আর আসিল কৈ? সে একদিনের আগমনসম্ভাবনা ক্রমে সুদূরপরাহত হইয়া শেষে অসম্ভবেই পরিণত হইয়াছিল। তাহার জীবন আশার শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। তাহার মত দুঃখ কাহার?

আশা যখন নিবিয়া যায়, তখন জীবনে কেবল দুঃখ—কেবল যাতনা। সতীন্দ্রনাথের জীবনে তাহাই হইয়াছিল। সে নির্দ্দোষ হইয়াও দোষী, সে প্রেম দিয়াই অপরাধী, সে ভালবাসিয়াই লাঞ্ছিত। তবুও ভালবাসা যায় না—প্রেম অমর। তাই সতীন্দ্রনাথের যাতনা।

৫

পুরুষের নানা জ্বালা। সংসারের ভাবনাই তাহার একমাত্র ভাবনা নহে—যাহারা তাহার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের চিন্তাই তাহার একমাত্র চিন্তা নহে। কর্ত্তব্যের কঠোর শাসন অনেক সময় অপ্রীতিকর, দুঃসহ। কিন্তু

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা,—তাহাকে বড় দুঃখেও হাসিতে হয়, হৃদয়ভাব গোপন করিয়া সমাজে মিশিতে হয়, লোকের সঙ্গে সহজ সামাজিক ব্যবহার করিতে হয়, লজ্জা রাখিতে হয়;—সে দুঃখ, সে কষ্ট কেবল তাহারই আপনার, অপরে তাহা জানিতেও না পারে। এই প্রকৃত মনোভাবগোপনের দারুণ কষ্ট পুরুষকে পদে পদে সহ্য করিতে হয়। হায়!—কত দুঃখের—কত কষ্টের অংশ পুরুষ পত্নীকে—পুত্রকেও দিতে পারে না; হয় ত তাহাতেও তাহার আত্মাভিমান আহত হয়,—হয় ত সে তাহাদের হৃদয়ে বেদনাসঞ্চারের আশঙ্কাতেই সমস্ত দুঃখ, সকল কষ্ট আপনি সহ্য করে,—কাহাকেও সে সকলের অংশ দেয় না। যখন শত দুঃখ কষ্টের দারুণ শরশয্যায় জীবন নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আইসে—যন্ত্রণার সহ্য থাকে না, তখনও পুরুষকে স্বজনগণের সহায়তা হইতে স্বেচ্ছায় আপনাকে বঞ্চিত করিতে হয়। ইহাই পুরুষের জীবন।

সতীন্দ্রকে এই জীবন যাপন করিতে হইত। হৃদয়ে দুঃসহ দুঃখজ্বালা, কিন্তু সংসারের ও সমাজের সব কর্ত্তব্যই সম্পন্ন করিতে হইত। হাসির মিথ্যা আবরণে অশ্রু আবৃত করিতে হইত। আবার সেই জন্যই শৈল বিশ্বাস করিত না যে, তাহার স্বামী সত্য সত্যই দুঃখিত—সত্য সত্যই চিন্তিত, সত্যই তাহার জন্য স্বামীর চিন্তার অবধি নাই। বরং সে মনে করিত, সতীন্দ্রনাথ তাহার নিকট প্রকৃত কথা কহে না; যে প্রেম জানায়, তাহা সত্য নহে;—যে দুঃখের কথা বলে, তাহার মূল নাই। সে পুরুষের শতজ্বালার কথা বুঝিত না; তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারিত না; প্রকৃত ও অপ্রকৃত চিনিতে পারিত না।

অবিরত দারুণ দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কায় সতীন্দ্রনাথের স্নায়বিক বিকার ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সামান্য চিন্তায় চিত্ত একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে; সমস্ত দিবস মন চঞ্চল থাকে—কিছুতেই শান্ত হয় না। সামান্য কারণে আশঙ্কার আর অবধি থাকে না। অকারণেও আশঙ্কা জন্মে। বিশেষ শৈলবালার সামান্য চাঞ্চল্যে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে—তাহার সকল ব্যবহারেই যেন আশঙ্কার কারণ উপলব্ধি করে। দিবসে দুশ্চিন্তা—নিশায় দুঃস্বপ্ন। সে রাত্রিকালে উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া দেখে,—শৈল জাগিয়া, কি ঘুমাইয়া,—সে কি করিতেছে।

তাহার এইরূপ ব্যবহারে শৈল হাসিত। সতীন্দ্রনাথ মনে করিত, এই হাসির আবরণে শৈল তাহার মনোভাব—চাঞ্চল্য গোপন করিতেছে, তাহাকে

প্রতারিত করিতেছে। তখনই মনে পড়িত, পত্নীর সরস ওষ্ঠাধরে হাস্যে তাহার কি আনন্দ ছিল; সে ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটাইবার তাহার কত আগ্রহ ছিল! হৃদয় ব্যথিত হইত—নয়নে অশ্রু আসিত। হায়!—সব যায়, তবু প্রেম যায় না। আজও তাহার ব্যথিত হৃদয় হইতে সে আগ্রহ যায় নাই; কিন্তু তাহা ফুটিতে না ফুটিতে আশঙ্কার দারুণ তাপে ম্লান হইয়া যায়।

সহসা পত্নীর পদশব্দ শুনিলে সতীন্দ্র চমকিয়া উঠিত—অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার কাতর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত।

এমনই ভাবে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। দারুণ দুর্দ্দশা প্রশমিত হইল না, বরং বাড়িতে লাগিল। আর মনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক নিস্তেজতাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

৬

রজনীর প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইয়াছে। সতীন্দ্রনাথ শয়নকক্ষে বসিয়া আছে। এক জন আত্মীয় পূজার ছুটীতে পশ্চিম গিয়াছেন। তাঁহার দ্রব্যাদি গুছাইতে—ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে সমস্ত দিন গিয়াছে। শ্রান্তদেহে সে সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়াছে। কিন্তু আসিয়া দেখিয়াছে, পত্নীর মুখ অন্ধকার। সে কারণানুসন্ধান করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। তাই আজ শ্রান্তিহেতু নয়ন নিদ্রাজড়িত হইয়া আসিলেও সে শয়ন করে নাই; জাগিয়া বসিয়া আছে—কি জানি কি ঘটে!

শৈল শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। সতীন্দ্র বলিল, "দীনেশ দাদাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছি। এত জিনিস লইয়া লোক বেড়াইতে যায়!"

শৈল কোনও কথা কহিল না।

সতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি তোমার শরীর ভাল নাই?"

শৈল বলিল, "কেন?"

"মনে করিতেছি, কল্য তোমাকে শিবপুরের বাগানে বেড়াইতে লইয়া যাইব। যাইবে ত?"

"তোমার যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে—যাইও। আমি ত কোন দিন তোমাকে কোন কার্য্য হইতে নিবারিত করি নাই। আমাকে লইয়া যাওয়া কেন?" স্বরে কেমন একটু তীব্রতা ছিল।

সতীন্দ্র যেন আর সহ্য করিতে পারিল না; বলিল, "শৈল, অনেকবার

তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—আজও আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর কেন?"

"আমি কি মন্দ ব্যবহার করিয়াছি?"

"সকল স্ত্রীই কি স্বামীর সঙ্গে এমনই ব্যবহার করে?"

"আমি ত অনেক দিনই বুঝাইতে চাহিয়াছি—তুমিই বুঝাইতে দাও নাই। আজই জানিতে পারিবে।"—বলিয়া শৈল শয্যা ত্যাগ করিল, দ্বার মুক্ত করিয়া কক্ষের দক্ষিণের খোলা ছাতে গেল।

ছাতে যাইয়া শৈল আকাশের দিকে চাহিল—গ্রহতারাপূর্ণ নীলাম্বরে অসম্পূর্ণগোলক-চন্দ্র জ্যোৎস্না ছড়াইতেছে। শৈল কি ভাবিল। সে কি অন্য দিনেরই মত আশা করিতেছিল, সতীন্দ্র এখনই আসিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে? সে কি রমণীসুলভ কৌতূহলবশে আজ সতীন্দ্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল?

বিদ্যুতের স্পর্শে শরীরের শিরা উপশিরায় যেমন সহসা বিষম আঘাত লাগে, তেমনই দারুণ আশঙ্কায় সতীন্দ্রনাথের দুর্ব্বল স্নায়ুতে বিষম আঘাত লাগিল। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। উন্মাদের মত সেও কক্ষের বাহিরে আসিল।

শৈল স্বামীর দিকে চাহিল—জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, স্বামীর নয়নে অন্য দিনের মত আশঙ্কা ও অনুনয়ে বিগলিত দৃষ্টি নাই—নয়নদ্বয় যেন জ্বলিতেছে। সে দৃষ্টি দেখিয়া আজ তাহারই হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হইল।

সতীন্দ্রনাথ দ্রুত অপ্রশস্ত ছাত পার হইল; মুহূর্ত্তে ছাতের আলিসাও অতিক্রম করিল।

ভয়ে শৈলবালার চরণদ্বয় কম্পিত হইতেছিল। সে দ্রুত যাইয়া স্বামীকে নিবারিত করিবার চেষ্টা করিল। পারিল না।

সে আলিসায় বুক দিয়া নিম্নে রাজপথে চাহিয়া দেখিল—সতীন্দ্রনাথের কপাল-মস্তকচ্যুত—মস্তিষ্ক চূর্ণ বিচূর্ণ—স্বামীর গতপ্রাণ দেহের কি বিকৃতি! কেবল নয়ন তেমনই জ্বলিতেছে।

শৈলের শরীরে রক্ত যেন শীতল হইয়া গেল—সমস্ত শরীর অবসন্ন—চারি দিক তাহার স্বামিরহিত জীবনেরই মত শূন্য—অন্ধকার। সে সেই শূন্য ছাতে বসিয়া পড়িল—মরিতে পারিল না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভুবনেশ্বর।

পাষাণ করেছে মোরে পাষাণের মত—
গতিহীন, স্তব্ধ মূক, স্পন্দনবিহীন!
কোথা লাগে হায়, মণি মুক্তা মরকত—
পাষাণের এত রূপ সৌন্দর্য্য বিভব!
বিন্দুসরসীর তীরে, একাম্রকাননে,
স্তরে স্তরে বিস্তারিয়া শিল্প মায়াজাল—
দাঁড়ায়ে দেউল ওই বিরাট বিশাল!
এ কি এ দেউল,—না, পাষাণের ফুল—
পার্ব্বতীর তনু ঘেরা লাবণ্য দুকূল!
ত্রিভুবনেশ্বর রাজে অন্তরের মাঝে!
ধ্বনিয়া প্রান্তর আরতির ঘণ্টা বাজে—
বায়ু সনে ভেসে যায় বন হ'তে বনে।
ধন্য তুমি দেবভূমি উড়িষ্যা প্রাচীন!
ধন্য হে কেশরি-কুল নৃপতি বল্লভ!

কাঠজুড়ি।

অয়ি নদী, শুনি, ক্ষীণ কটিকাঞ্চীসমা
ছিলে তুমি হাস্যময়ী মুগ্ধ মনোরমা!
তটতরুছায়াযুত অযুত মাধুরী
তব ওই বক্ষপরি দু'টি কাঠ জুড়ি'
পার হ'য়ে যেত চলে' ওড্র নরনারী।
এবে তুমি স্ফীততনু যৌবন উষারি'
ঝলকি' ছলকি' চলে' যাও গরবিনী—
ভূতলে উজলে যেন স্থিরা সৌদামিনী!
এত রূপ মরি, মরি!—রূপের বন্যায়
ভেসে যায় দুই কূল,—কেঁদে হায়, হায়!
স্বর্ণশস্য ঝরে' পড়ে চরণতলায়!
তুমি চলিয়াছ শুধু আপনার মনে—
ভাবে ভোর, আত্মহারা, ছাড়ি' সর্ব্বজনে
ফিরিতেছ অভিসারে রাজার নন্দিনী!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি।

১৩ই ভাদ্র। অনেক দিন এই ডায়েরিতে পঞ্চুরামের কথা লিখি নাই। কাজটা অন্যায় হইয়াছে। তবে, এতদিন আমি তাহার শিশু-হৃদয়ের নিয়ত-বিকাশোন্মুখ শোভার পর্য্যবেক্ষণ করি নাই, এমন নহে। * * * আজ-কাল সে আমার সহিত কেমন পরিচিত হইয়াছে। আমাকে দেখিলে, আর কাহারও কোলে থাকিবে না। আমি তাহার হাসি দেখিয়া, তাহার অর্দ্ধোচ্চারিত দুই একটি কথা শুনিয়া কত আনন্দপ্রকাশ করি, ইহা সে যেন বুঝিতে পারিয়াছে। তাই, পাখীর মত, সে যে দুই চারিটি অর্থপূর্ণ কথা উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে, মাঝে মাঝে কেবল তাহাই বলিয়া উঠে। আমাকে আনন্দিত করিবার জন্যই যেন তাহার সেই সকল শৈশবলীলার অভিনয় করে। হায়! যে অসহায় শিশুটি আমার আশ্রয়কে নিরাপদ ভাবিয়া, তাহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছে, আমি ত সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেছি না। তাহাকে ভুলাইয়া, ফাঁকি দিয়া, কত কৌশলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছি। সে বোধ হয় মনে মনে তাহার আলোচনা করিয়া কত ক্লেশানুভব করে। পৃথিবীর ভাষা এখনও তাহাকে আপনার অধীন করিতে পারে নাই; কেবল সেই কারণেই তাহার অভিমান ও দুঃখ প্রকাশ করে না।

১৪ই ভাদ্র। স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ টাকা পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিতেছেন। সম্প্রতি খরচটা এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, এই সামান্য সীমাবদ্ধ বেতনের উপরে নির্ভর করিয়া কিছুতেই কুলাইয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছি না। * * * শ্রীযুক্ত * * * মহাশয় বোধ হয় নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই কয়েকটি টাকা ধার চাহিয়াছেন। তাঁহাকে কোনও প্রকারে দিতে না পারিলে বড় অন্যায় হইবে। আমার ন্যায় সামান্য জনের সাহায্যের উপর যাঁহারা এরূপে নির্ভর করেন, যদি সেই দুই এক জনের সামান্য অসুবিধাও ঘুচাইতে না পারিলাম, তবে বৃথায় এ জীবন। হায় ভগবান! মূর্খতা ও অধর্ম্মের অবতার কত অপদার্থ লোক অর্থের স্তূপ সাজাইয়া, তাহারই উপর বসিয়া রহিয়াছে, আর আমার বন্ধুর ন্যায় সজ্জন সামান্য উদরান্নের জন্যও বিব্রত।

১৫ই ভাদ্র। কেহ কেহ মনে করেন, এবং প্রকাশ্যে বলিতেও ছাড়েন না যে, কোমলতা ও লালিত্যবিহীন কবিতা কবিতাই নহে। তাঁহাদের বিশ্বাস এই, যাহা কিছু তেজোময়, ওজস্বী, উদ্দীপনা-পরিপূর্ণ, তাহা গদ্যের অন্তর্ভূত; আর যাহা কবিতা, তাহা

"শুধু ভালবাসা, শুধু মধুর মধুর,
শতরূপ ভঙ্গিমায়, পলকে পলকে
লুটায়ে, জড়ায়ে, বেঁকে, বেঁধে, হেসে, কেঁদে,
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা!"

কবিতার এই সংকীর্ণ সংজ্ঞানির্দ্দেশ বড় রহস্যময়, সন্দেহ নাই। আমি প্রেম ভালবাসার বিরোধী নহি; লাবণ্য-লালিত্যের সহিত আমার কোনও শত্রুতা নাই। কিন্তু যে প্রেমের ব্যাখ্যা উপরি-উদ্ধৃত চারি ছত্রের ভিতর নিবদ্ধ রহিয়াছে, আমি তাহাকে প্রকৃত প্রেম বলিয়া স্বীকার করি না। আমার মতে, প্রকৃত প্রেম

"—সরল উন্নত
বীর্য্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্ব্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মত
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত।"

তাই যাঁহারা কোমলতার সহিত "কমল বিলাসিতা"কে এক করিয়া ফেলেন, আমি তাঁহাদের বুদ্ধি ও সমালোচনশক্তির আদৌ প্রশংসা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, যাহা প্রকৃত, অকৃত্রিম কোমলতা, তাহাও সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় নহে। বাঙ্গলা-সাহিত্য এই আত্যন্তিক কোমলতার জ্বালায় মাটী হইতে বসিয়াছে। বাঙ্গলার প্রতিভাশালী কবি রবীন্দ্রনাথ এত দিনে এই কথা বুঝিয়া প্রকৃত পন্থার অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

১৬ই ভাদ্র। "সমুদ্রের প্রতি" সম্বোধনে কবি বলিতেছেন,—

"যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ-মাঝে"—

আত্মা অবিনশ্বর; চিরদিন বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং চিরদিন থাকিবে, এ বিশ্বাস অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক নহে। পৃথিবী যে এক কালে জলময়ী ছিল, ইহাও বিজ্ঞানের একটা মত বটে। কিন্তু, অবিনশ্বর আত্মা যে বিলীনভাবে জলময়ী

পৃথিবীরই ভিতর নিবদ্ধ ছিল, এ কথা নিতান্ত জড়বাদী ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। দেহবন্ধনবিমুক্ত আত্মার গতি স্বাধীন; সর্ব্বত্র তাহার অস্তিত্ব কল্পিত হইতে পারে, তাহার সীমাবদ্ধ অবস্থান আমরা অনুভবই করিতে পারি না। রবীন্দ্র বাবু যে জড়বাদী নহেন, তাহা তাঁহার যে কোনও কবিতা পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারা যায়। তবে, এ স্থলে তিনি এরূপ বিষয় ভ্রমে কেন পড়িলেন, সহজে বুঝা যায় না। যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে, কোনও সময়ে এই বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বত্র সলিল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহা হইলে সেই সলিলের অভ্যন্তরে আত্মার অবস্থান অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু, কবি অতঃপর আবার সন্ধ্যা, উষা, নক্ষত্র প্রভৃতির বর্ণনা করিতেছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি যখন সকলই জলময় আকাশে বিলীন ছিল, তখন সন্ধ্যা বা উষা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? একমাত্র জড়বাদ ভিন্ন উপরি-উদ্ধৃত বাক্যের অন্য অর্থ অসম্ভব। কবি ভ্রমবশতঃই উহার প্রশ্রয় দিয়াছেন।

১৭ই ভাদ্র। বিধাতা এই জীবনের উপর কি অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। পরিণাম ভাবিতে গেলে প্রাণে-ত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শিশুটির জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া রহিয়াছি, তথাপি অদৃষ্টের সেই অশুভ দৃষ্টি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না। মানব কীটের দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া সে যেন মাথার উপর দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে বিকট হাসি হাসিতেছে; আর সেই ভীষণ পরিণামের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে। দেখিতেছি, দিন দিন যেন সেই পরিণামের ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে; বুঝি ক্রমশঃ তাহার অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছি। কিন্তু, তথাপি আমি জীবনে নিরাশ্বাস হই নাই; হৃদয়ের সাহস প্রাণপণে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। ভাবিতেছি, জ্বালা-যন্ত্রণা যা কিছু, কেবল মৃত্যু পর্য্যন্ত। মরিলেই সব ফুরাইল। বিশ্বাস আছে, সেই শেষ মুহূর্ত্তে জগজ্জননী আমাকে কদাপি ভুলিতে পারিবেন না। আমি মহাপাপী বটে; জীবনের এই স্বল্পমাত্র সময়ে বহু ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়াছি। কিন্তু যিনি অনন্ত করুণাময়, তাঁহার করুণার অতীত অপরাধে দুর্ব্বল মানুষ কখনই ত অপরাধী হইতে পারে না। তিনি জন্ম দিয়াছেন, তাই সাহসের সহিত জীবন রক্ষা করিতেছি; তিনি দুঃখ দিতেছেন, তাই নীরবে সহ্য করিতেছি;—রোদন যে না করি, এমন নহে। আর যদিই তিনি এই অধম সন্তানকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেও দুঃখ নাই। নিশ্চয়

তাহাতেই আমার মঙ্গল। আমি তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গল ভাবিতে একেবারে অসমর্থ।

১৮ই ভাদ্র। ভাদ্র সংখ্যা সাহিত্যে এক জন লেখক প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যসমূহের তুলনা করিয়া শেষোক্তের স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীদাসের মহাভারত, ইহারাই বাঙ্গালার স্থায়ী মহাকাব্য; কিন্তু বৃত্রসংহার বা মেঘনাদ-বধ সহস্র সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। কৃত্তিবাস বা কাশীদাসের তুলনায় মাইকেল বা হেমচন্দ্র যে এখনও এক প্রকার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু, চিরদিনই কি এই অবস্থা থাকিবে? বাঙ্গালী সাধারণ কি দিন দিন উচ্চশিক্ষায় উন্নত হইতেছেন না? তাঁহারা কি কোনও কালে এই সব আধুনিক কাব্যের উচ্চভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিবেন না? ইতিমধ্যেই ত মাইকেলের যথেষ্ট প্রতিপত্তি লক্ষিত হইয়াছে; ইহা কি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে না? মাইকেল যে কখনও কৃত্তিবাস বা কাশীদাসকে অতিক্রম করিতে পারিবেন, এমন কথা বলিতেছি না। কারণ, ইহাঁদের যে সুবিধা, মাইকেলের তাহা নাই। ভাষা ও ভাবের যে সারল্য থাকিলে, বিষয়ের যেরূপ সর্ব্বজনমনোহারিত্ব থাকিলে, কাব্য সাধারণের নিকট পঁহুছিতে পারে, তাহা আধুনিক কাব্যে নাই। কিন্তু সমাজের আদর্শ ও চূড়াস্বরূপ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের যদি কখনও একান্ত অভাব না হয়, তবে মাইকেল যে মরিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

* * * *

২০শে ভাদ্র। এতদিনের পর "বর্ষার বোধন" শেষ করিতে পারিয়াছি। কবিতাটি আমার নিজের তত সুন্দর বলিয়া মনে লাগিতেছে না। তবে, প্রকাশের অনুপযোগী, বোধ হয়, হয় নাই।

* * *

২১শে ভাদ্র কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার Peele Castle সম্পর্কীয় কবিতার শেষে বলিয়াছেন:—

"But welcome fortitude, and patient cheer,
And frequent sights of what is to be borne!
Such sights, or worse, as are before me here,
Not without hope we suffer and mourn"

আজ এই অপরাহ্ণে নিতান্ত বিষণ্ণ অন্তরে সেই আশা, সাহস ও সহিষ্ণুতার কথাই

ভাবিতেছি। হায়! কবিবর! আমি চিরদিন তোমার এই অবিচল সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়া আসিতেছি; এই জগৎ-সংসার সম্বন্ধে তোমার যে আদর্শ ছিল, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেছি; কিন্তু কি করিলে, কোন সাধনায় জীবন ঢালিয়া দিলে, তোমার ন্যায় গভীর বীরতা লাভ করিতে পারা যায়? আজ এই সান্ধ্য অন্ধকারের সহিত আমার হৃদয়ে যে গাঢ় তমসরাশি ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা ত কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না। আমি আপনাকে সংসার-সংগ্রামে এক জন অগাধবলশালী বীরপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাই; কিন্তু মনে হয়, যদি একবার স্বভাবকোমলা স্ত্রীজাতির মত উচ্চকণ্ঠে করুণরবে রোদন করিতে পারিতাম, তবে বুঝি এই সন্তপ্ত হৃদয় কতকটা শান্তিলাভ করিতে পারিত। তোমার মত মহাজনের নিকট আমি আজ সহিষ্ণুতা-শিক্ষার্থ আসিয়াছি; তোমার সাহস-পরিপূর্ণ কবিতাগুলির আলোচনা করিতেছি; আজ যদি তুমি একবার তোমার সেই সদা-প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখের হাসি লইয়া আমার সমক্ষে দাঁড়াইতে, তবেই বুঝি সেই বীরধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিতাম।

২২শে ভাদ্র। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, গাম্ভীর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলে নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" মহাকাব্য মাইকেলের "মেঘনাদকে" অতিক্রম করিয়াছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। হীরেন্দ্রনাথের সমালোচন-ক্ষমতার উপর যথেষ্ট আস্থা সত্ত্বেও আমি তাঁহার এই মতে সায় দিতে পারিলাম না। নবীনচন্দ্রের গ্রন্থে দুই একটি সুন্দর চরিত্র ও কয়েকটি উদ্দীপনাপরিপূর্ণ, ওজস্বিনী বক্তৃতা ভিন্ন তাঁহার কাব্যের বিষয়গত মহত্ত্ব ও একতা পাঠকের মনে তাদৃশ প্রতিভাত হয় না। তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন। কিন্তু, সেই ধর্ম্মরাজ্যটা কি প্রকার, তাহা আমরা আদৌ অনুধাবন করিতে পারি না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে একটা ধর্ম্মযুদ্ধ বলিতেও আমি প্রস্তুত নহি। শুধু এক পাণ্ডবদিগের প্রতি কতকটা অবিচার ভিন্ন দুর্য্যোধনের রাজ্যশাসনে আমি তাদৃশ কোনও দোষ দেখিতে পাই না। রাজ্য কাহারও স্থায়ী সম্পত্তি নহে; যিনি সুশাসন করেন, রাজ্য তাঁহারই। সুতরাং, পাণ্ডবেরা নিজের ন্যায্য-স্বত্ব-রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এ কথা বলা যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনে কেবল কতকগুলা নরহত্যা করা হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনার্থ যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা অধর্ম্মের অন্তর্গত। আর ভারতবর্ষ

বাস্তবিক কখনও একছত্রাধীনে হইয়াছিল কি না, তাহাও ভাবিবার কথা। যদিই বা হইয়া থাকে, তাহা যে বহুদিনস্থায়ী হয় নাই, ইহা নিশ্চয়। কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বরাবতার, একটা অস্থায়ি-কার্য্য-সম্পাদনার্থ তিনি যে তাদৃশ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

২৩শে ভাদ্র। আজ আমি মৃত্যুর সর্ব্বজনভয়াবহ ভীষণ মূর্ত্তির কথা ভাবিতেছি। এই সুবর্ণোজ্জ্বল প্রভাতকিরণরাশি, সন্ধ্যাকাশের এই প্রশান্ত রক্তিমাভা, পত্রপুষ্পগ্রহতারাসমন্বিত বিশ্বের এই বিচিত্র আনন্দলীলা, মৃত্যুর করাল গহ্বরে—সেই অন্ধকার গুহার প্রবেশ করিলে, এই সকলই ত অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার দয়া মায়া মমতা কিছুই নাই; সে সৌন্দর্য্যের মহত্ত্ব বুঝে না, সৌকুমার্য্যের সেবা করিতে জানে না; অসহায়, নিরাশ্রয় শিশুর স্বভাব-সরল মুখমণ্ডল দেখিয়া, তাহার প্রাণ পবিত্র স্নেহরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না। তাহার কাছে দুর্ব্বল সরল, পবিত্র অপবিত্র, সুন্দর অসুন্দর, প্রীতি অপ্রীতি, সকলেরই সমান গতি। হে যৃত্যু! তাই আজ নিতান্ত ব্যথিত-হৃদয়ে তোমায় সুধাইতেছি, সংসারের চিরসুকুমার, অনন্তসৌন্দর্য্যাধার পদার্থগুলি লইয়া গিয়া তুমি কোথায় রাখিয়া দাও? আমার এই হৃদয়-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া তুমি কত রত্নই অপহরণ করিয়া লইয়াছ। আমার সেই আজন্মস্নেহময়ী জননী, দ্বিতীয়জীবনসদৃশ সহোদর, নিত্য-আকাঙ্ক্ষিত সেই সব প্রিয়জন, তাঁহাদিগকে তুমি কোথায় রাখিয়া দিয়াছ? আমার প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা সেই প্রণয়িনী, আমার প্রেম, প্রাণ, জগৎ—সকলের অধিক সেই অতি সুকোমল প্রশান্ত শিশুটিকে, তুমি কোন শিরীষপুষ্পপেলব শুভ্র শয্যায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছ? পাছে সে কোনও প্রকার ক্লেশানুভব করে, এই ভয়ে আমি তাহাকে এই বুকের উপর রাখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম না। তুমি তাহাকেও কাড়িয়া লইলে; আমি পাষাণহৃদয়ে তাহাও সহ্য করিয়াছি। হে অসীমপ্রভাবশালী, সর্ব্বদমন মরণ-দেব! আমি তোমার চরণে আমার এই প্রাণ পর্য্যন্ত "মানসিক" করিতেছি, সে যেন আমার এই অপরি স্নেহের অভাব কখনও অনুভব করিতে না পায়। অন্ততঃ তাহার চক্ষে যেন তোমার প্রশান্ত স্নেহময় সৌম্যমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়। নহিলে সে ভয় পাইয়া হয় ত আবার আমারই জন্য কাঁদিয়া উঠিবে।

২৪শে ভাদ্র। পঞ্চুরামকে দেখিলাম। সপ্তাহব্যাপী জ্বরের আজও বিরাম হয় নাই।—তাহার প্রফুল্লতা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। শুনিলাম,

গতকল্য দিনরাত্রি কেবল কাঁদিয়াছে।—মুহূর্ত্তেরও জন্য শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাহার শরীরের অভ্যন্তরে কি যন্ত্রণা হইতেছে, স্বয়ং ভগবান ভিন্ন আর ত কেহই জানিতে পারিবে না। আমরা কেবল অন্ধকারে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে পারি। * * * * *

২৫শে ভাদ্র। শিশুটি আমাকে ছাড়িতে চাহে না। তাহার ঝোঁক হইল, রাস্তার ধারে বসিয়া হামাগুড়ি দিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া আমার হাতে "নে, নে" বলিয়া তুলিয়া দিবে। তাহাকে সন্তুষ্ট ও শান্ত করিবার জন্য কিছুক্ষণ তাহাই করিতে দিলাম। * * * *

২৬শে ভাদ্র। চিকিৎসক এত চেষ্টা করিয়াও রোগনিবারণ করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তিনি এখন নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই—বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাবে আমি ততটা আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। এবার নূতন ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। সু—কে চিঠি লিখিয়া দিলাম। তিনি যেন শীঘ্র ঔষধগুলি আনাইয়া দেন, এই কথা লিখিলাম। পত্র লিখিতে লিখিতে রোদন সংবরণ করিতে পারি নাই। হায়! আমি কি মহাপাপী; আমার ভাগ্যে কি ক্ষুদ্র বালকটিও সহ্য হইবে না? নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া আজ হৃদয় মনকে আক্রমণ করিতেছে। কি করিব, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। পিতৃদেব মহাশয় পঙ্কুর অসুখের কথা শুনিয়াছেন। তিনি অদ্যকার পত্রে আমাকে চিন্তা করিতে বারণ করিয়াছেন। তিনি অনেক সহ্য করিয়াছেন; তাঁহার বলিবার অধিকার আছে। কিন্তু, আমি যে আপনাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। সংসারে এত লোক নিজ নিজ শিশু লইয়া সুখী হইতেছে; আমার এই একমাত্র অবলম্বন আমাকে কেন ছাড়িয়া যাইবে?

২৭শে ভাদ্র। শিশুটি কেমন আছে, কি করিতেছে, সেই কথাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবিতেছি। আমাকে পাইলে সে আর কাহাকেও চাহে না। আজ আমি তাহার কাছে নাই, আজ কে তাহার শৈশব-হৃদয়কে শান্ত করিবার নিমিত্ত তাহাকে বুকে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছে? আমার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া সে হয় ত আমার উপর মনে মনে কত বিরক্ত হইতেছে। হায়! আমার এই দাসত্বে ধিক্! আমার এই বিষম অর্থোপার্জ্জন-লালসাকে ধিক্! আমি কেন তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম? কি নিদারুণ কর্ত্তব্যের বেড়া আমার চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি

কাহাদের জন্য তাহার প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করিতেছি? সে বোধ হয় আর বেশী দিন আমাদের এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর স্নেহের প্রত্যাশা করিবে না। বিশ্বজননী বুঝি স্বয়ং তাহার ভার লইবার মানস করিয়াছেন। তাই মনে করিতেছি, আমার সর্ব্বস্ব দিয়া, সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কয় দিবস কেবল তাহারই পরিচর্য্যায় এ জীবন নিয়োজিত করিব। কিন্তু আমি কি নিষ্ঠুর, পাষাণপ্রকৃতি! আমি কেন তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি। আমি কেন সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের চরণে তাহার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণে প্রার্থনা করিতে পারিতেছি না। কবি বলিয়াছেন,—"More things are brought by prayer than this world dreams of" আমি কেন এই চিরসত্য অমর বাক্যের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছি না? হায়! আমার সেই অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাস কোথায়? আমি যে নিতান্ত নরাধম।

২৮শে ভাদ্র। কলিকাতায় গিয়া পঙ্কুকে দেখিলাম। শুনিলাম, গত রাত্রে বড় বেশী জ্বর হইয়াছিল। আজ দিনের বেলা একটু ভাল আছে। * * আজ কাল আমার সমুদয় অনুভবশক্তি যেন বহিরিন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। তাহাকে সামান্য একটুকু প্রফুল্ল দেখিলে অমনিই যেন সব বিস্মৃত হইয়া যাই; তাহার বিপদের কথা যেন মনেই থাকে না। আবার কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ দেখিলে হৃদয়টা কেবল শোকে ও বিষাদেই অভিভূত হইয়া পড়ে। ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তির সাক্ষাৎই পাওয়া যায় না। শুনিলাম, আজ দুপুর বেলা শিশুটি কেবল আমাকে ডাকিয়া কাঁদিয়াছে। কেহই তাহাকে শান্ত করিতে পারে নাই। আমি তাহাকে লইয়া, কিছুকাল রাস্তায় এ দিক ও দিক করিয়া বেড়াইলাম। তাহার মনটা যেন বেশ প্রফুল্ল হইয়া আসিল। মুখে হাসি দেখা দিল। কিন্তু, আগেকার লীলা খেলা এখন অধিকাংশই ভুলিয়া গিয়াছে। সেইরূপ কোলের উপর শুইয়া, প্রাণবিমোহন মধুর রবে সেই "তাই, তাই" আর শুনিতে পাই না।

ভারতচন্দ্রের যুগ।

দেশের ও সমাজের অবস্থা।

নদীর আরম্ভ সন্ধান করিলে লক্ষিত হয়, পর্ব্বতাঙ্গে নানা স্থানে উদ্ভূত বহু শীর্ণ জলধারা, কোথাও বা শিলাখণ্ডমধ্যে অদৃশ্য হইয়া, কোথাও বা শিলাখণ্ডপার্শ্ববাহিনী হইয়া,দুর্ব্বল শক্তিতে কোনরূপে উপল-বিষম পথ অতিক্রম করিয়া, এক স্থানে মিলিত হয়। একত্রিত জলরাশি ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করে, এবং অবশেষে কোথাও বা পথরোধকারী শিলাখণ্ড ভাসাইয়া, কোথাও বা শিলার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, মৃত্তিকা খনন করিয়া, স্বীয় পথ প্রস্তুত করে, এবং সেই পথে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়। তখন তাহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য। কেহ প্রবাহমুখে কোনও বাধা সংস্থাপিত করিলে প্রবাহ অল্পকাল স্থির হইয়া দাঁড়ায় সত্য, কিন্তু অচিরে সঞ্চিতশক্তিতে প্রবাহিত হয়; তখন সে বেগ বড় ভয়ানক, তাহার সম্মুখে যাহা থাকে, তাহাই ভাসিয়া যায়,—সে প্রবাহতাণ্ডবতাড়নে প্রলয়প্লাবনেরই মত বহিয়া যায়।

সেইরূপ রাজপ্রাসাদে ও রাজসভায়, রাজকীর্ত্তিতে ও রাজকল্পনায়, বিলাস-বাহুল্য ও সম্পদসৌন্দর্য্যসন্দর্শনপ্রয়াস নানা স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া একত্রিত হয়; তখন তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব। সর্ব্বপ্রকারে শক্তির-পরিচয়ে জনগণের চিত্তে ভীতি ও ভক্তির উৎপাদনই বিলাসবাহুল্যের ও সম্পদসৌন্দর্য্যসন্দর্শনপ্রয়াসের প্রধান কারণ। বহুব্যয়সাধ্য শিল্পদ্রব্য ইহার এক প্রমাণ। তাহাতে ধনবল ও জনবল প্রকাশ পায়। মিশরের ক্ষোদিত সমাধি-সমূহে, আসীরিয়ার শিল্পাবশেষে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচ্যে নানা দেশে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজার মণিমুক্তাখচিত বেশ, সমুচ্চ সৌধ, সুসজ্জিত অশ্বগজাদি বাহন, বহুমূল্যবেশধারী ভৃত্যবর্গ—এ সকলই বলের বিকাশ। য়ুরোপে পূর্ব্বরাজগণের যুদ্ধসজ্জাতে পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। স্বর্ণাদিখচিত বর্ম্ম, কারুকার্য্যবহুল তরবারি ও আগ্নেয়াস্ত্র, এ সকলই ধনবলের পরিচায়ক। ক্রমে ব্যয়বাহুল্যই শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের

পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল।* ভারতবর্ষে ফতেপুর সিক্রী, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর বহুদিনে বহুব্যয়ে সৌধমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন, † যে দেশের শাসন-প্রণালীতে একের অবাধ প্রাধান্য যথেচ্ছাচারিতার সীমাতেও অনায়াসে উপনীত হইতে পারে, সেই দেশেই "বর্ব্বর-শিল্প" রাজায় ও প্রজায় পার্থক্য প্রকাশ করে। কিন্তু যে দেশে রাজার ক্ষমতা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সে দেশেও রাজপ্রাসাদে ও রাজকীর্ত্তিতে এই বাহুল্য ও সম্পদপ্রদর্শনপ্রয়াস লক্ষিত হয়। এমন কি, সাধারণতন্ত্রশাসিত দেশেও সৌধে ও সজ্জায় প্রজার প্রতিনিধিতে ও প্রজায় পার্থক্য প্রকাশ পায়। ইহার কারণ মানবের শিক্ষা ও সভ্যতাদত্ত কৃত্রিম আবরণতলে তাহার শিশু প্রকৃতি লুক্কায়িত থাকে, এবং সুবিধা পাইলে আত্ম-প্রকাশ করে। প্লেটো সাধারণ জনগণকে বহুশির পশু বলিয়াছেন। সাধারণ মানবকে চালিত করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়—ভাব ও আবেগ। সেই জন্যই জনগণের ভয় ও ভীতির উৎপাদনকল্পে বাহুল্য ও সম্পদপ্রদর্শনপ্রয়াস। রাজগণ-সেবিত ধর্ম্মেও বিলাস ও বাহুল্য প্রবেশ করে, এবং প্রবল হইয়া উঠে। ক্যাথলিক য়ুরোপের রাজগণসেবিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের সৌধ, সম্পদ ও শিল্পাগার বহু নৃপতির ঈর্ষ্যার বিষয়। উড়িষ্যার কেশরী রাজবংশের ৬৩ জন নৃপতি দেশে কেবল বহুব্যয়সাধ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। তাঁহারা মন্দিরে দেবসেবার জন্য যথেষ্ট ভূমিদান করেন; দেশে বহু পুরোহিতের বাসের ব্যবস্থা করেন। ‡ মোগল সম্রাটদিগের মস্‌জেদে যে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, সে কি কেবল ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণার জন্য? তাহার মধ্যে ধর্ম্ম-মহিমাঘোষণার প্রয়াস কতটুকু, আপনার ধনবল ও জনবল ব্যক্ত করিবার চেষ্টা কত অধিক? ধর্ম্মবিশ্বাসের কিরণপাতে সে সকল ধর্ম্মমন্দিরের কয়খানি প্রস্তর সমুজ্জ্বল? ধনবল ও জনবলের ব্যঞ্জক বিচিত্র শিল্পকৌশলে সে সকল ধর্ম্ম-মন্দিরের কত চূড়া ও স্তম্ভ রমণীয়? হিন্দুরাজপ্রধান দক্ষিণ ভারতবর্ষে হিন্দু-মন্দিরে বিলাস ব্যভিচার ব্যাবৃত্তির দমনের জন্য আজও বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজার নিকট করুণ আবেদন উপস্থিত হয়।

* বার্নীয়ার বলেন, তাজমহলের স্থপতি, সৌধনির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয়ের উল্লেখ করিলে, সামান্য ব্যয় হইবে বলিয়া, সম্রাট শাহজাহান তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—লেখক।

† Facts and Comments.

‡ Hunter—Orissa.

আবার প্রজার আনন্দসম্ভোগবাসনার তুলনায় রাজপ্রাসাদের বিলাস ও বাহুল্য সাগরের নিকট বারিবিন্দুমাত্র। যে রাজা বা শাসনকর্ত্তা সে সাগরের ঊর্ম্মিলীলারোধের চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই ভ্রান্তবুদ্ধিবশে বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছেন; বারিরাশি দ্বিগুণবেগে তটভূমিতে প্রবাহিত হইয়াছে। সে বারিবেগে ধর্ম্ম ও নীতি, শীলতা ও লজ্জা ভাসিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডে পূতাচারযুগে একবার এই চেষ্টা হইয়াছিল। ঘাতুকের খড়্গমুখে রাজা প্রথম চার্লসের মস্তক দেহচ্যুত হইলে ক্রমওয়েল কৃপাণকরে কলিযুগ উচ্ছিন্ন করিয়া সত্যযুগের সংস্থাপনকল্পনায় "ধর্ম্মরাজ্য" প্রতিষ্ঠিত করেন। বিবেক-ভীতি রাজবিধিতে পরিণত হইল; ব্যক্তিগত কঠোরাচার অত্যাচারের সীমায় আসিল; আনন্দ সুখসম্ভোগ শত্রুর মত ত্যাজ্য বলিয়া প্রচারিত হইল। জুয়ার আড্ডা ও রঙ্গালয় বন্ধ হইল; অধিনেতাদিগকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করা হইল। শপথের জন্য অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইল; সাধারণ জনগণ ভল্লুকের ক্রীড়া দেখিত,—সে সকল ভল্লুক হত হইল। প্রলেপ দিয়া নয় ভাস্করকীর্ত্তি 'শোভন' করা হইল। আনন্দোৎসব বন্ধ হইল; বালকদিগের পক্ষেও নৃত্যগীতাদি দণ্ডার্হ স্থির হইল। ধর্ম্মমন্দিরে চিত্রাদি নষ্ট করা হইল। কেবল ধর্ম্মগীতসংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মকথাশ্রবণই উৎসাহিত হইতে লাগিল। যেন ঘনান্ধকার সেবে মানবজীবনের আলোক নির্ব্বাপিত, সুখ অপসৃত, সৌন্দর্য্য অদৃশ্য হইয়া গেল। * ক্রমওয়েল জনগণের আনন্দ-উপভোগের সকল পথ রুদ্ধ করিলেন; উদ্দেশ্য,—পাপ পলায়ন করিবে, পৃথিবী পুণ্যভূমিতে পরিণত হইবে! ভ্রান্ত মানবের ব্যর্থ চেষ্টা! ক্রমওয়েলের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত না হইতেই জনগণ জয়োল্লাসে নিহত প্রথম চার্লসের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইল। আনন্দসুখসম্ভোগের রুদ্ধ স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। সে বেগে সাধারণ লজ্জার আবরণও ভাসিয়া গেল। রাজসভায় বিলাসিনীদিগের বিভ্রম, রাজকার্য্যে রাজানুগৃহীতা ব্যভিচারিণীদিগের প্রভাব। বেশে লজ্জা নাই, বাক্যে সংযম নাই, ব্যবহারে সুরুচি নাই—রাজসভার এই অবস্থা। † সমাজের অতি নিম্নস্তরের লজ্জাহীনা বিলাসিনীরাও সৌন্দর্য্যবলে রাজানুগ্রহ লাভ করিতে লাগিল। রাজারও লজ্জা নাই—ব্যভিচারিণীদিগের গর্ভসম্ভূত তাঁহার পুত্রগণ অনায়াসে আভিজাত্যে উন্নীত হইতে লাগিল; রাণীর বন্ধ্যাত্বে

* Taine—History of English Literature.

† Court Beauties of Charles II. দ্রষ্টব্য।

বিদ্রূপেও তাঁহার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।* মহিলারা লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া ছদ্মবেশে রাজপথে ফলবিক্রয়ার্থও বাহির হইতে লাগিলেন; রাজা তাঁহার কোনও অনুগৃহীতা ব্যভিচারিণীর গর্ভস্থ সন্তানকে স্বীয় সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে, সে দৃঢ়তাসহকারে তাঁহাকে সম্মত করাইল।† রঙ্গালয় বন্ধ হইয়াছিল, এখন নবোৎসাহে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরব্ধ হইল। রঙ্গালয়ে ও রঙ্গমঞ্চে বিবিধ উন্নতি সাধিত হইল। দৃশ্যপটপরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে বালকগণ মহিলা সাজিয়া অভিনয় করিত; এক্ষণে রমণীরা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে লাগিল;—তাহারা অনেকে রাজার বা অভিজাতবংশীয়দিগের অনুগৃহীতা। নূতন আলোকে, নূতন সজ্জায়, রঙ্গালয় লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিল। আনন্দসুখতৃষ্ণা অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, আর বাধা সহিল না। সকল বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। প্রবৃত্তিপরিচালনে সুখ, নিবৃত্তিতে কেবল দুঃখ। কে স্বেচ্ছায় সুখ ত্যাগ করিয়া, দুঃখভোগ করিবে? মানবের পশুপ্রকৃতি ঘৃতাহুতিপুষ্ট প্লাবকের মত প্রবল হইয়া উঠিল। শিল্পে ও সাহিত্যে ইহার প্রভাব যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ইংলণ্ডের এই অবস্থার সহিত আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালীন ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে।

আওরঙ্গজেবের পূতাচার কপটতার আবরণমাত্র কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার স্থান এ নহে। কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তিনি মুসলমান ধর্ম্মে অতিরিক্ত গোঁড়ামী প্রযুক্ত আকবরের নীতিচ্যুত হইয়াই মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া যান। তিনি জিজিয়া কর পুনঃসংস্থাপিত করিলে কৃপাপ্রার্থী হিন্দুরা যখন মস্‌জেদের পথে তাঁহার নিকট মর্ম্মবেদনা জানাইতে উদ্যত হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে করিপদে নিষ্পিষ্ট করিয়া পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।‡ মোগল সম্রাটগণ প্রত্যহ প্রাসাদবাতায়নে প্রজাবর্গকে দর্শন দিতেন। কোন কোন রাজভক্ত হিন্দু বাতায়নপথে রাজদর্শন না করিয়া আহার করিতেন না।¶ আওরঙ্গজেব সে প্রথার

* Green.

† Pepys' Diary Feb. 20, 1664—1665 and July 30, 1667.

‡ মুতাক্ষরীণ।

¶ কাফী খাঁ; Elliot. Vol VII.

বিলোপ করেন। কাশীতে ও মথুরায় হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জেদ নির্ম্মিত হয়, এবং বিগ্রহ মুসলমানের চরণস্পৃষ্ট হইবার জন্য আগ্রায় মস্‌জেদের সোপান-তলে প্রোথিত হয়। আওরঙ্গজেবের পূতাচার তাঁহার মুসলমান ধর্ম্মে অতিরিক্ত গোঁড়ামীর অঙ্গমাত্র ছিল। তিনি আমিষ আহার করিতেন না, মদ্য স্পর্শ করিতেন না। উপবাসশ্রমে তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইয়াছিল। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে চারি সপ্তাহ কাল আকাশে ধূমকেতু দৃষ্ট হয়। তৎকালে আওরঙ্গজেব অতি অল্প আহার করিতেন, এবং ভূমিতলে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিতেন। ইহাতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হয়, তিনি মৃতবৎ হইয়া পড়েন। সেই সময় হইতে তিনি আর পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইতে পারেন নাই।*

হিন্দুদিগের অধিকাংশ উৎসবই ধর্ম্মসংসৃষ্ট; সে সকল বন্ধ হইয়া গেল। প্রাসাদে নৃত্যগীতাদিও বন্ধ হইল। সম্রাট স্বয়ং বহুমূল্য বস্ত্র ও মণিমুক্তাদির ব্যবহার ত্যাগ করিলেন। সভাসদগণও রাজসভায় আগমনকালে সে সকল পরিহার করিতে আদিষ্ট হইলেন। সম্রাট স্বয়ং শ্বেতবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণের বসন ব্যবহার করিতেন না। কাজেই রাজসভাসংসৃষ্ট সকলকেই তাঁহার অনুকরণে শ্বেতবসন ব্যবহার করিতে হইল। ইহাতে অনেক লোকের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় নষ্ট হয়। গায়ক ও অভিনেতৃগণ এই উপলক্ষে শবাধারে একটি সুসজ্জিত মৃৎপুত্তল বহন করিয়া রাজধানীর পথে ভ্রমণ করে। সম্রাটের বাসকক্ষের বাতায়নতলে তাহাদিগকে দেখিয়া সম্রাট কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, "গীত ও আনন্দ মৃত—তাহাদের শবদেহ এখন সমাহিত করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।" শুনিয়া আওরঙ্গজেব বলেন,—"সাবধান, শব যেন সমাধিমধ্যে নড়িতে, কথা কহিতে, বা গান গাহিতে না পারে। তাহা ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ।" †

পরিবর্ত্তনশীল সমাজ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চালিত হইতে পারে না; সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-নিয়মেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আওরঙ্গজেব ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মুসলমান ধর্ম্মের বিধানে সমাজের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে বিধানে নরহত্যার অপেক্ষা সুরাপান গুরুতর অপরাধ—প্রথম অপরাধ নরদেহসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় অপরাধ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে!

* Tavernier.

† মুতাক্ষরীণ।

আওরঙ্গজেব সাধারণ জনগণের আনন্দসুখসম্ভোগেচ্ছার প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্র সকলকাম হইতে পারিয়াছিলেন, এমন বলিতে পারি না। তিনি সুরাপান রহিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। * কিন্তু প্রচলিত মত, তাঁহার প্রাসাদেই সুরা ব্যবহৃত হইত। বিশেষ প্রতিহত স্রোত ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিতেছিল এবং প্রতিহত অবস্থাতেই সম্রাটের সতর্কদৃষ্টির অন্তরালে সমাজশরীরে, নিম্নে নানা স্তরে, নানা পথে প্রবাহিত হইয়া, গুরুতর আনষ্টই করিতেছিল; স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের কারণ না হইয়া গুরুতর ব্যাধি ও অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিতেছিল। অল্পদিনেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। তখন প্রতিহত স্রোত সঞ্চিতবেগে প্রবাহিত হয়।

আওরঙ্গজেব ইতিহাসরচনা রহিত করিয়া দেন। †

আকবর হইতে শাহজাহান পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটগণ সকলেই স্থাপত্য-শিল্পের অনুরাগী ও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফতেপুর সিক্রীর স্বপ্নপুরী অশেষ যত্নে ও অজস্র অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পরে পরিত্যক্ত হয়। শাহজাহান মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে স্থাপত্যশিল্পের উদারতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার দিল্লীস্থিত প্রাসাদ প্রাচ্য ভূখণ্ডে বা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা জমকাল প্রাসাদ ছিল। ‡ শাহজাহানই 'ইণ্ডো-স্যারাসিনিক' স্থাপত্যের উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তক। ভারতের হিন্দুশিল্প বৌদ্ধ যুগ হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছিল। এই সময় ভারতবর্ষ মুসলমানের করতলগত হয়। আকবর যথাসম্ভব ভারতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া হিন্দু শিল্প ও মুসলমান-শিল্পের সংমিশ্রণ সম্পন্ন করেন। শাহজাহান তাঁহার পিতামহের ও পিতার অনুগৃহীত স্থাপত্যশিল্পপ্রণালী মিশাইয়া গাম্ভীর্য্য, শোভা ও লালিত্যে পূর্ণ 'ইণ্ডো-স্যারাসিনিক' স্থাপত্যের উদ্ভাবন করেন। তিনি সেই প্রণালী স্থায়ী হইবার উপযোগী সম্পূর্ণতার সমুজ্জ্বল করিবার পূর্ব্বেই পুত্র কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েন। আওরঙ্গজেব সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তাই অচিরে অযোধ্যার প্রাসাদমালায় ও ঝুনাগড়ের সমাধিসমূহে শাহজাহানের উদ্ভাবিত স্থাপত্যপ্রণালীর বিকৃতি পরিলক্ষিত

* কাফী খাঁ।

† মহম্মদ হাসিম আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ইতিহাসরচনা করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সম্রাটের আদেশভয়ে স্বীয় রচনা লুকাইয়া রাখেন। এই লুক্কায়িত (কাফী) ইতিহাস পরে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই হাসির সাধারণতঃ কাফী খাঁ নামে পরিচিত।—লেখক।

‡ Fergusson—Indian and Eastern Architecture.

হয়। * আওরঙ্গজেব শিল্প সম্বন্ধে কেবল যে উদাসীন ছিলেন, এমন নহে। অনেক স্থলে তিনি বহুশ্রমবহুল দিবসের ও নিদ্রাহীন রজনীর কীর্ত্তি শিল্পজাত নষ্ট বা বিকৃত করেন। মুসলমানের পক্ষে জীবের যথাযথ অনুকরণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আকবর চিত্রকরদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি বলিতেন, অন্যে চিত্র ঘৃণা করে; আমি তাহাদিগকে ভালবাসি না। চিত্রকরের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার বিশেষ কারণ বিদ্যমান। চিত্রকর চিত্রে লিখিত জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ করে; কিন্তু সে জীবনদান করিতে পারে না। তখন সে ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা না করিয়া পারে না। †

আওরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। মুসলমান-ধর্ম্মের নির্দ্দেশপালন সম্বন্ধে স্থানকালপাত্রবিচার তিনি পাপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, বা বিশ্বাস করিবার ভাব দেখাইতেন। তিনি পটে বা প্রস্তরে জীবপ্রকৃতির অনুকরণ ধর্ম্মবিরোধী বলিতেন। আজও রাজপুতানায় বহু প্রাসাদে শুনিতে পাওয়া যায়, দিল্লীর মূর্ত্তিদ্বেষী সম্রাটের ভয়ে প্রস্তরে ক্ষোদিত শিল্পকীর্ত্তি প্রলেপ দিয়া অদৃশ্য করা হয়। ‡ প্রপিতামহের শিল্পকীর্ত্তি ফতেপুর সিক্রীতেও তাঁহার মূর্ত্তিদ্বেষের প্রমাণ বিদ্যমান।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল রাজসভায় পূর্ব্বতন বাহুল্যের প্রাদুর্ভাব হইল। বাহাদুরের রাজসভা জনগণকে শাহজাহানের রাজসভার কথা স্মরণ করাইতে লাগিল। ইরাদত খাঁ বলেন, সেই সমৃদ্ধি-সমুজ্জ্বল দৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অসম্ভব। ইহাতে জনসাধারণের মনে যে ভাব উদিত হয়, তাহাতে মনে হয়, শাহজাহানের পরই বাহাদুর দিল্লীর সিংহাসন পাইলে সম্ভবতঃ মোগল রাজত্ব আরও দীর্ঘকালস্থায়ী হইত। ¶

অল্পদিনেই বাহাদুরের রাজ্যকাল শেষ হইয়া গেল।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জেহান্দার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অপদার্থতার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সিংহাসন লইয়া যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ, তখন তিনি প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। সেনাপতির কৌশলে তাঁহার জয় হইলে, তিনি

---

* Watt—Indian Art at Delhi, 1903.

† আইন আকবরী।

‡ Lockwood Kipling—Beast and Man in India.

¶ Tod.

বারাঙ্গনা লাল কুয়রকে লইয়া শিবিরাভ্যন্তরে সুরাপানে ও নর্ত্তকীর লাস্যলীলা-দর্শনে রজনী অতিবাহিত করেন। পরদিবস আর এক ভ্রাতা যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলে, সেনাপতি, সুরাপানে হতচেতন, অসংবৃতবেশ জেহান্দারকে করিপৃষ্ঠে তুলিয়া যুদ্ধ করেন, জয়ী হয়েন, এবং তাঁহাকেই সিংহাসন দান করেন।

মোগল বাদশাহদিগের সাম্রাজ্ঞীদিগের মধ্যে কেবল নূরজাহান প্রকাশ্য-ভাবে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা ছিল; তিনি রণক্ষেত্রে, মন্ত্রণায়, শাসনে, স্বামীর সহচরী ও সহকারিণী। তিনি ভিন্ন সপত্নী-বহুল মোগল অন্তঃপুরে মোগল সম্রাটের আর কোন সীমন্তিনী রাজকার্য্যে আপনাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন নাই। আকবরের পত্নীদিগের ব্যক্তিত্ববিচার নিশ্চিত হওয়া যায় না। শাহজাহানের পত্নী-প্রেম ব্রজাঙ্গনার নয়ননীরপুষ্টা কালিন্দীর কূলে শিল্প ও সৌন্দর্য্যের সার সমাধিমন্দির বেষ্টন করিয়া আজও কাঁদিয়া ফিরিতেছে। মমতাজমহলের গর্ভে শাহজাহানের চতুর্দ্দশ সন্তান জন্মে। * কিন্তু মোগল শুদ্ধান্তের কথা এমনই গুপ্ত থাকিত যে, মেনুসী যখন দিল্লীতে আগমন করেন, তখন ইঁহাদিগের মধ্যে ছয় জন জীবিত থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জননীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া মনে করেন। আওরঙ্গজেবের জীবনে তাঁহার পত্নীবর্গের প্রভাব ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদয়পুরীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ কেবল প্রেমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। †

আর জেহান্দারের অনুগৃহীতা বারাঙ্গনার সখীও রাজধানীর রাজপথে সম্মানিত ব্যক্তিকে অপমান করিতে সাহসিনী হইল। ‡ সম্রাট লাল কুয়রের ভ্রাতাকে উচ্চ পদে সমাসীন করিতে উদ্যত হইলে, উজীর তাহার নিকট নজর-স্বরূপ বহু বাদ্যযন্ত্র চাহিলেন। সে অপমানিত হইয়া ভগিনীকে জানাইল। ফলে সম্রাট উজীরকে এরূপ অদ্ভুত নজর চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বে মোগল বাদশাহগণের অধীনে কর্ম্মচারীরা বংশপরম্পরাক্রমে রাজসেবা করিতেন। যাহারা নৃত্যগীতে বাদশাহদিগের চিত্তবিনোদ করিত, তাহারা অর্থ পুরস্কার পাইত। এখন যদি বাদশাহ-

* বাদশানামা।

† ইনি কামবক্সের জননী; জিয়র্জ্জিয়া হইতে আনীতা, খৃষ্টানী। দারা ইঁহাকে ক্রয় করেন। দারার মৃত্যুর পর ইনি আওরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে আনীতা হয়েন।—লেখক।

‡ মুতাক্ষরীণ।

শেষোক্তদিগকে উচ্চ পদ দিতে আরম্ভ করেন, তবে পূর্ব্বোক্তগণের পক্ষে শেষোক্তদিগের ত্যক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করা ব্যতীত আর উপায় কি? আমি বাদ্যযন্ত্রসমূহ তাঁহাদিগকে দিব; তাহা হইলে, তাঁহারা নৃত্যগীতব্যবসায়ী-দিগের ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন।" * সম্রাট কুপ্রবৃত্তি-চরিতার্থকরণেই সময় নষ্ট করিতে লাগিলেন। † ইরাদত্ত বলেন, এই অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে রাজত্বের ধ্বংসকামনা করিতে লাগিল।

ফরোকশিয়ার স্বয়ং অত্যন্ত কুক্রিয়াসক্ত ছিলেন। এদিকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভুত্ব যতই বাড়িতে লাগিল, ক্রমশঃ তুর্ব্বল বাদশাহও ততই অধিক-মাত্রায় কুপ্রবৃত্তিচরিতার্থতায়—সুখসন্ধানের ব্যর্থ চেষ্টায় চেষ্টিত হইলেন।

ফরোকশিয়ার নামে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভু ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাঁহারাই সম্রাটের প্রভু ছিলেন। ফরোকশিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় যখন সম্রাটের ধনরত্ন ও অশ্বগজাদি আত্মসাৎ করেন, সেই সময়ের কথায় মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, কিন্তু জনরব, অঙ্গনাভিলাষী আবদোল্লা খাঁ রাজগুদ্ধান্ত হইতে কয়েক জন সুন্দরীকেও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ‡

মহম্মদ শাহও কুসঙ্গে নিশিয়া রাজকার্য্যে যথোচিত মনোযোগ দিতেন না। জান মহম্মদ নামক এক জন ফকীরের কন্যা তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, কিছুদিন সম্রাটের লেখ্যাধার ও মোহর তাহারই নিকট থাকিত। সে ইচ্ছায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিত। কিন্তু ভারতচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন,—

"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে-দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ॥"

যখন সম্রাটের প্রিয় জাফর খাঁ ও শা আবদুল-গফুর কর্ম্মচ্যুত ও নিগৃহীত হইল, তখন তাহাদের একযোগী বলিয়া কোকীও রাজরোষভাজন হইল। তাহার পক্ষে সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। শ

অন্তিমদশায় দিল্লীর রাজসভায় বিলাস, বাহুল্য ও আতিশয্যের ব্যাপার এইরূপ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

---

* মুতাক্ষরীণ।
† কাফী খাঁ।
‡ মুতাক্ষরীণ।
শ মুতাক্ষরীণ।

ভারতবর্ষের ভূমি অনেক স্থলেই উর্ব্বরা। অনেক স্থানে জনসংখ্যা নিতান্ত সামান্য না হওয়ায় ভূমি যথারীতি কর্ষিত হইত। শিল্পিগণ যে সকল গালিচা, কিংখাব, জরীর কাজ, কৌষেয় ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিত, সে সকল বিদেশে রপ্তানী হইত। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে অর্থ রৌপ্য ভারতে আসিত, এবং ভারতবর্ষেই রহিয়া যাইত। আমেরিকার বহুমূল্য ধাতু, বহুভাগে য়ুরোপের নানা দেশে যাইয়া, অবশেষে ক্রীত দ্রব্যের মূল্যরূপে তুরস্কে ও পারস্যে আসিত। বাণিজ্যের স্রোতে তাহারও অধিকাংশ আবার ভারতবর্ষে আসিত। যখন বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হইত, তৎকালে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল জাহাজ পণ্যদ্রব্য লইয়া মোকায়, বসোরায় ও বন্দর আব্বাসে যাইত, সেই সকল জাহাজে বাহিত পণ্যদ্রব্যের মূল্যরূপে ভারতে অর্থাগম হইত। ভারতীয়, ডচ্ ও ইংরাজ বণিকদিগের বহু বাণিজ্যপোত ভারতের পণ্যদ্রব্য লইয়া পেগু, তেনাসেরিম, শ্যাম, চীন, সুমাত্রা, মালদ্বীপ ও মোজাম্বিকে যাইত; তাহাতেও ভারতে যথেষ্ট ধনাগম হইত। ডচ্‌গণ জাপান হইতেও বহুমূল্য ধাতু আনয়ন করিত। ফ্রান্স ও পর্টুগাল হইতেও ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যরূপে বহু অর্থ আসিত। জাপান, এমন কি, য়ুরোপ হইতেও ভারতে বিবিধ দ্রব্য আসিত। ইংলণ্ড হইতে সীস, ফ্রান্স হইতে বনাত, আরব ও পারস্য হইতে জলপথে ও স্থলপথে অশ্ব, এবং সমরকন্দ, বল্ক, বোখারা ও পারস্য হইতে ফল আসিত। মালদ্বীপ হইতে কড়ী আসিত, এবং বঙ্গদেশে ও অন্যত্র মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। ইথিওপিয়া হইতে গণ্ডারশৃঙ্গ, গজদন্ত ও ক্রীতদাস আসিত। ইহা ভিন্ন চীন হইতে পোর্সিলেন আসিত। তুতি-কোরিন হইতে মুক্তার আমদানি হইত।* এই সকল দ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে অর্থ বাহিরে যাইত না; পরন্তু ভারতের পণ্যদ্রব্যের বিনিময়েই এই সকল দ্রব্য আসিত।†

শাসনরীতিতে অনেক সময় প্রজার কষ্টের একশেষ হইত। দেশে শান্তি-রক্ষার জন্য ও বিপদের আশঙ্কায় যে বিপুল সেনাদল রক্ষিত হইত, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ করাই প্রজার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিত।‡ দেশের উর্ব্বর ভূমিও

* তুতিকোরিণ ভারত সীমায়।

† Bernier.

‡ এই সেনাদলের কথায় হণ্টার বলেন—An enormous ragged army who ate up the industry of the province.—*Annals of Rural Bengal.*

স্থানে-স্থানে লোকাভাবে কর্ষিত হইত না। শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারই লোকাভাবের মুখ্য কারণ ছিল। প্রজা যে কেবল সর্ব্বস্বান্ত হইত, এমন নহে। তাহাতেও তাহার নিস্তার ছিল না। সময় সময় প্রজাবর্গের সন্তানদিগকে ক্রীতদাস করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। এইরূপ অত্যাচারে প্রজারা কেহ বা গ্রামত্যাগ করিয়া নগরে আসিত—ভারবাহী বা জলবাহী বা সেইরূপ অন্য কিছু হইত, কেহ বা অপেক্ষাকৃত সুব্যবহারের আশায় কোন জমীদারের জমীদারীতে পলাইয়া যাইত। শাসনকর্ত্তারা নজরে ও উপঢৌকনে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তবে প্রার্থিত পদ পাইতেন। তাঁহারা প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার না করিলে সে অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারিতেন না। সাধারণ প্রজার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার হইত। প্রজা বা শাসনকর্ত্তা কাহারও অধিকার স্থির ছিল না। শাসনকর্ত্তা ভাবিতেন, যখন মুহূর্ত্তমধ্যে আমি পদচ্যুত হইতে পারি, তখন যে কয়-দিন পারি—যে উপায়েই হউক—অর্থসংগ্রহ করিয়া লই। দেশের বা প্রজার হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। প্রজা ভাবিত, আমি দেহের শোণিত দিয়া যাহা কিছু করিব, হয় ত অচিরেই তাহা অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার হস্তগত হইবে। এ অবস্থায় আমি শ্রম করিয়া মরি কেন? আমার কি স্বার্থ? এরূপ অবস্থায় দেশের বা প্রজার উন্নতি হয় না, হইতে পারে না। *

দরিদ্রে দরিদ্রে বিবাদ উপস্থিত হইলে অনেক সময় সুবিচার হইত; কিন্তু এক পক্ষ প্রতাপশালী বা বিচারককে অর্থদানক্ষম হইলে সুবিচারের আশা সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়াইত। লোকের পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধনোপার্জ্জনও নিরাপদ ছিল না। কাহারও অর্থ আছে, এ কথা প্রচারিত হইলে, অত্যাচারী ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা তাহার সঞ্চিত ধন লুণ্ঠন করিবেন, এই আশঙ্কায় লোক ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর দারিদ্র্যের ভান করিত; ধনবানের সৌধে বা সজ্জায়, ব্যয়ে বা ব্যবহারে, তাহাকে ধনবান বলিয়া বুঝিবার উপায় থাকিত না। ওমরাহগণ কারণে অকারণে লোককে পশুরমত কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেও তাহার শাস্তি ছিল না। দেশের পথ ঘাট ভাল ছিল না; স্থানে স্থানে পথিকদিগের জন্য পান্থশালা ছিল সত্য, কিন্তু সে সকল পান্থশালায় সুবন্দোবস্ত ছিল না। দেশের লোকের এই অবস্থা; কিন্তু রাজসভায় সমৃদ্ধি সৌন্দর্য্যের অন্ত ছিল না। মোগলপ্রাসাদের সমৃদ্ধি সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে

* Bernier.

কবির আবশ্যক। ওমরাহগণেরও জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। সম্রাট প্রভাতে বিচার করিতে বসিতেন; তখন একবার ও অপরাহ্ণে আর একবার ওমরাহদিগকে রাজসভায় আসিতে হইত। সপ্তাহে একদিন প্রত্যেক ওমরাহকে দুর্গে প্রহরীর কার্য্য করিতে হইত। কোথাও গমনকালে সম্রাট আবৃত যানে গমন করিতেন, কিন্তু ওমরাহগণকে অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার অনুসরণ করিতে হইত। এই ওমরাহগণই রাজসভার শোভা ছিলেন। ইঁহারা সুবেশ-সজ্জিত না হইয়া বাহির হইতেন না; অশ্বারোহী রক্ষিদলে বেষ্টিত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে, গজোপরি, বা নরবাহ যানে রাজপথে বাহির হইতেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যবর্গ, কেহ বা ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন মক্ষিকা ও ধূলি দূর করিয়া, কেহ বা পানীয় জল লইয়া, কেহ বা পীকদান ধরিয়া চলিত। ওমরাহ প্রভৃতির অলঙ্কারবাহুল্যের কথা বলাই বাহুল্য। দরিদ্র সৈনিকও পত্নীকে ও সন্তানদিগকে অলঙ্কার সজ্জিত করিবার জন্য স্বয়ং ঋণ স্বীকার করিত। *

বার্ণিয়ার যে সময়ের কথা বলিয়াছেন, তখন মোগলপ্রতাপ নানা কারণে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সম্রাট হিন্দু প্রজার প্রতি সদয় নহেন, স্বয়ং যুদ্ধে বিরত। নহিলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সময় দেশের লোকের এমন দুর্দ্দশা ছিল না। মুলাফরীণ-কার স্পষ্টই বলিয়াছেন, শাহজাহান পর্য্যন্ত বাদশাহগণ হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে স্নেহ দান করিতেন। তাহারা সুখে ছিল। আওরঙ্গজেবের সময় নানা দোষের সূচনা হইল। পূর্ব্বে পথ-ঘাটের অভাবে, শিক্ষার অভাবে, শাসনপ্রণালীর ও শাসকদিগের দোষে, সাধারণ লোকেরা অত্যাচার সহ্য করিত সত্য; কিন্তু সম্রাটের সতর্কদৃষ্টি বহু অমঙ্গল নিবারণ করিত। এখন তাহার অভাবে দেশে ক্ষমতাশালিমাত্রই অত্যাচারী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন।

ভলটেয়ার দেখাইয়াছেন, রাজসভার বিবরণই ইতিহাস নহে। দেশের অবস্থাবর্ণনেও ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। দেশের লোকের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান ও বর্ণন ব্যতীত ইতিহাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের এই প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি রাখেন নাই। রাজা ও রাজসভা, বিগ্রহ ও সন্ধি, এই সকলেই ভারতের ইতিহাস পূর্ণ। দেশের মেরুদণ্ড কৃষকের অবস্থা ও অভ্যাসের বর্ণনে, দেশের সাধারণ লোকের আচার ব্যবহার লিপিবদ্ধ করণে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ মনোযোগ

* Bernier.

দান করেন নাই। তবে নানা গ্রন্থে অবান্তরভাবে সে সকলের উল্লেখ আছে; বিদেশীয় ভ্রমণকারী ও কর্ম্মচারীদিগের বিবরণে অনেক কথা পাওয়া যায়। অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে যোগ্য ঐতিহাসিকের চেষ্টায় সে সকল সংগৃহীত ও সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসে পরিণত হইবে। আলোচ্য কালে দেশের লোকের অবস্থার বিষয়ে ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে এক জন উত্তম সংগ্রাহক যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে যুগপৎ দুঃখের ও হাস্যের উদ্রেক হয়।—গ্রামে গ্রামসমিতি থাকায় প্রভার সুবিধা ছিল; কিন্তু ইহাতে আবার দোষও নিবারিত হইত না—অন্য গ্রামে দস্যুতা বরং ইহাতে পোষিত হইত। কৃষক, শিল্পী প্রভৃতির জীবনে উন্নতির প্রসার ছিল না। রমণীরা ভার বহিত; রৌদ্র পোহাইত; গোময়ের দাহ্য প্রস্তুত করিত। পুরুষগণ কলহ ও গৃহপালিত পশু-অপহরণের অবসরকালে ভূমিকর্ষণ করিত। দেশে দস্যু তস্করের বিষম উপদ্রব ছিল।*

প্রজাগণ কখনও রিক্তহস্তে সম্রাটের বা শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিত না। হিন্দু প্রজাবর্গের আচার ব্যবহার দীর্ঘ কাল হইতে একই পথে প্রবাহিত হইতেছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী সম্রাটের শাসনাধীন হইবার পর হইতে হিন্দু রাজার অভাবে হিন্দুসমাজে কোনরূপ সংস্কার সহজসাধ্য হয় নাই। সুতরাং—তৎকালে বিদেশীয়গণ যে সকল আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন, সে সকল প্রায় আমাদের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, বা আছে। বাল্য-বিবাহ, গ্রহণাদিকালে স্নানদানাদি, জগন্নাথের রথযাত্রা, মন্দিরে নর্ত্তকীর লাস্যলীলা, সতীদাহ, মরণাহতকে তীরস্থকরণ, গোজাতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, সাধু ও অসাধু সন্ন্যাসীর বাহুল্য,—তাঁহারা এই সকলই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। তখনও পুরুষের পরিধান একখানি বস্ত্র, সম্ভ্রান্তের উত্তরীয়, মহিলাদিগের অঙ্গ একখণ্ড বস্ত্রে আবৃত। যাত্রিগণ প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করিত; মধ্যাহ্নে দারুণ রৌদ্রে পথ চলা কষ্টসাধ্য হইত; তখন যাত্রীর দল কোন ঘনচ্ছায় বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করিত। গোজাতির প্রতি হিন্দুর যথেষ্ট ভক্তি ছিল; কারণ, গো ব্যতীত কৃষিকার্য্য চলিত না, আবার দুগ্ধ ও ঘৃত ভারতবাসীর প্রধান আহার্য্য। কিন্তু গোচারণের মাঠের অভাব ছিল। মুসলমান সম্রাটগণ সতীদাহনিবারণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।†

* Keene—The Turks in India.

† বার্ণিয়ার গোচারণের মাঠের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তৎকালে যথেষ্ট ভূমি

মুসলমান সম্রাট ও শাসনকর্ত্তারা হিন্দু-ধর্ম্মগ্রন্থের ও হিন্দুদিগের বিদ্যার আলোচনানুরাগী ছিলেন। দারা পার্শীতে উপনিষদের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শাহজাহান বারাণসীর প্রধান পণ্ডিতকে মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি দিতেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নিবেদন।

[একখানি অভিনন্দনপত্রের উত্তরে লিখিত।]

১

বল, দেব, একি এ করিলে?
যশ-চন্দনের বাটি, বাণীর মন্দির হ'তে
আনি, কেন এ দীনের ললাট মণ্ডিলে?
রক্ত জবা ধুতুরায়, গাঁথিয়ে সামান্য মালা
দিতে চাও, দাও কণ্ঠে (কুসুম সুন্দর
সুকবির কণ্ঠে সাজে, নৃপতির ভালে রাজে!)
কাঙ্গালে সাজালে কেন, আনি নাগেশ্বর?
বাসরের সাজ সজ্জা তরুণ যুবারে সাজে,
বুড়ারে সাজালে কেন নবীন নাগর?

২

বল, দেব, একি এ করিলে?
আনি সিন্দূরের কৌটা, আনি তাম্বূলের বাটা
বিধবার পাণ্ডু হস্তে কেন অরপিলে?
আধ বাঘাম্বর ছাল, আধ কণ্ঠে অহি-মাল,
শ্মশান-বাসিনী যেই হরের ঘরণী,

পতিত থাকিত; ভূমিবাহুল্য হেতু কৃষকও ক্ষেত্রকে বিশ্রাম দিত; দেশে কাননবাহুল্য ছিল—Forest Lowত ছিল না। সেই জন্যই স্বতন্ত্র গোচারণভূমির আবশ্যকতা ছিল না।—লেখক।

একি দেব! পরিহাস, ইন্দু-পীযূষ-ক্ষৌমবাস,
তার তরে?—উমা নহে ব্রজের গোপিনী!
কুলু কুলু গঙ্গা ধায়, অদূরে জ্বলিছে চিতা,
—শ্মশানে ধরিলে কেন মোহিনী বাগিণী?

৩

ভ্রম! ভ্রম! অলীক স্বপন!
কাচ আমি, নহি হীরা, আমি গো সামান্য তাম্র,
নহি আমি, নহি আমি, রজত, কাঞ্চন!
ভক্ত আমি? সর্ব্বনাশ! এ দারুণ পরিহাস
কেন? কেন? আমি, দেব! দীন অভাজন।
সুন্দর হৃদয় তব, সুন্দর নয়ন তব,
ভুবনে হেরিছ তাই সকলি মোহন!
শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী, তাও হয় গৌরাঙ্গিনী
চন্দ্রোদয়ে, দূর্ব্বাঘাস তাহাও কাঞ্চন।

৪

খোলা ভোলা বালকের হিয়া—
সাপের তর্জ্জন শুনি, ঘুরে আনন্দের ধ্বনি;
অহীরে আলিঙ্গি' ধরে, ফণা সাপটিয়া!
কুপতির পদ বন্দি', সতীর সদ্গতি হয়,—
মিটে তার, মিটে তার প্রাণের পিপাসা;
গঙ্গা-জলে পড়ি' জলে, ভক্ত লভে মুক্তিফলে,
কর্ম্মনাশা থাকে কিন্তু সেই কর্ম্মনাশা!

৫

ভক্ত আমি? আহা তাই হোক!
ভক্তির চরণস্পর্শে, হে দেব! ফুটুক হর্ষে
হৃদয়ের কুঞ্জে-কুঞ্জে বাসন্তী অশোক!
ফুল ও চন্দন, দেব, পড়ুক শ্রীমুখে তব,
উৎপ্রেক্ষা সফল হোক্—আহা তাই হোক!
এ হৃদয়-মরুভূমে বহুক প্রেমের ধারা,
হাসুক আঁধার ঘরে চাঁদের আলোক!

৬

হে শ্রীহরি, আসি দাও দেখা।—
হৃদয়-দর্পণখানি মাজিয়া উজ্জ্বল কর,
মুছে ফেল, ধুয়ে ফেল কলঙ্কের রেখা।
লোকে মোরে "ভক্ত" বলে, লাজে হয় মাথা হেঁট,
দারুণ অশান্তি নাথ, সহিতে না পারি।
লজ্জা-নিবারণ হরি, হৃদয়প্রতিমা-মাঝে
ভকতি-প্রতিষ্ঠা কর; দোহাই তোমারি!

৭

হে সুন্দর, বুঝিবারে নারি,
কৌমার, যৌবন গেল, আয়ু প্রায় শেষ হ'ল,
কত কাল থাকিব গো অনূঢ়া কুমারী?
এস বঁধু, এস বর, সাজাইয়া এ বাসর
সারা-রাত্রি আছি বসে', রাত্রি হ'ল শেষ;
দেহ-মালঞ্চের মোর অর্ঘ্য-পুষ্প ঝরে যায়,
প্রাণের দেবতা! এস, এস পরমেশ!

৮

শ্যামাঙ্গিনী চণ্ডিকা কালিকা;—
সেই বেশে চাও যদি, এস হে আঁকালি' অসি,
আমারে করিয়া নিও ভৈরবী সাধিকা।
বলি দিয়া প্রেম-খড়্গে, স্বার্থ—অসুরের রক্ত
নিভৃতে, সাধনমঞ্চে পিয়াব, অম্বিকা!
আমি নর-মুণ্ড-মালে, সন্তানে তুলিয়া কোলে,
নাচিব তাণ্ডব নাচ—অপূর্ব্ব রাধিকা!

৯

রাধা কৃষ্ণ যুগল মূরতি,—
সেই বেশে চাও যদি, এস বঁধু হৃদি-কুঞ্জে,
আমি গোপিনীর বেশে করিব আরতি।
হৃদি-বৃন্দাবন-ধামে, এস হে বিনোদ শ্যামে,
প্রাণ-মন-উন্মাদন বাজাও বাঁশরী;

কাম, লোভ-গোপ-কন্যা, পড়ুক শ্রীপদে আসি',
কুল, মান, ভয়, লজ্জা, সর্ব্বস্ব পাশরি' !

১০

সেই দিন নব বৃন্দাবন
বিরাজিবে হৃদি-কুঞ্জে, হে ব্রজের বংশী-ধারী,
তোমার ও মুখচন্দ্র করি' দরশন !
হইবে গো দোল রাস, বারি মাস সুঘোচ্ছ্বাস,
ছুটিবে রসের উৎস, প্রেমের ফোয়ারা,
প্রেমে গদ গদ বোল, বারে তারে দিব কোল,
মুখে হরি হরি বোল, প্রেমে মাতোয়ারা !

১১

তখন পরায়ে দিও মালা,—
আনি চারু কৃষ্ণচূড়া, কুন্তল সাজায়ে দিও,
পীতাম্বরে করে দিও এ দেহ উজালা !
দেহ-বুদ্ধি না থাকিবে, লাজ ভয় না রহিবে,
আমি শ্রীহরির ধ্যানে হইব তন্ময়।
তুমি দেবে মোর গলে, আমি কিন্তু সেই ছলে,
গোবিন্দের কণ্ঠে দিব, বলি "জয় জয় !"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ইস্‌লামে বৌদ্ধ-প্রভাব।*

পৃথিবীতে বৌদ্ধ প্রভাব।

পৃথিবীতে যুগে যুগে যে সমস্ত মহাপুরুষ বা অবতার জন্মপরিগ্রহ করিয়া পবিত্র পদাঙ্কে বসুন্ধরা ধন্য করিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধদেবের ন্যায় কেহই সার্ব্বভৌম প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ

* রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর বিশিষ্ট সভ্য ও বুদাপেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা সমূহের অধ্যাপক গোল্ডজিহের্ (Gold Giher) ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ হাঙ্গেরীর

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাববিস্তারে কেহই বুদ্ধের সমকক্ষতা লাভ করেন নাই। হিন্দুর কৃষ্ণ, খৃষ্টানের খৃষ্ট, ইস্‌লামের মহম্মদ, প্রাণশূন্য হইয়া অনলে কিংবা ভূগর্ভে মিশিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিতাভস্ম, অস্থি, দন্ত বা কেশগুচ্ছ লইয়া উপাসকমণ্ডলী অম্বরচুম্বী চৈত্যস্তূপাদি নির্ম্মিত করিয়া উপাস্য দেবের কীর্ত্তিকৌমুদী বিস্তার করে নাই। যেদিন কুশীনগরে বুদ্ধদেবের নশ্বর শরীর চন্দনকাষ্ঠের চিতানলে ভস্মীভূত হইল, খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধ পঞ্চ শত বৎসর পূর্ব্বে, সেই স্মরণীয় দিনে, মহাকশ্যপ-প্রমুখ পাঁচ শত ভিক্ষু সেই পূত ভস্মরাশি পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া স্বর্ণপাত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে ভিক্ষুগণ সেই ভস্মরাশি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড, নখ, কেশ ও দন্তাদি লইয়া রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উথদ্বীপ ও কুশীনগর প্রভৃতি স্থানে প্রোথিত করিয়া, তদুপরি অভ্রভেদী মন্দির, স্তূপ ও চৈত্য নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। অদ্ভুতশিল্পমণ্ডিত, কীর্ত্তিস্তম্ভভূষিত ঐ সকল স্থান অদ্যাপি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে।

অনুরাধাপুরের রাজ্ঞী লীলাবতীর রাজত্বকালে ধর্ম্মকীর্ত্তি যে দাতবংশের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের একটি দন্ত বা এক-গাছি কেশের অধিকারী হইবার জন্য তাঁহার ভক্তগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।—কোন ব্রাহ্মণরাজ্ঞীর প্রতিষ্ঠিত কলিঙ্গে দন্তপুরের কাহিনী অনেকেই জানেন। পাটলীপুত্রের হিন্দু-নরপতি পাণ্ডু বুদ্ধদন্তের অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক মহিমায় আত্মবিস্মৃত হইয়া মাণিক্যপাত্রস্থ বুদ্ধদন্তের উপরে প্রকাণ্ড চৈত্য নির্ম্মিত করিয়া কলিঙ্গরাজ গুহসিংহের মুক্তিদান করিয়াছিলেন। ভারতীয় স্থপতিশিল্পের ইতিহাস লেখক ফার্গুসন বিস্মিতহৃদয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পৃথিবীতে বুদ্ধের ন্যায় বিরাটপুরুষ আজিও জন্মগ্রহণ করেন নাই। মোঙ্গোলিয়া হইতে ল্যাপলাণ্ড পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ, জাপান, চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি সমস্ত দেশও বুদ্ধদেবের লীলা-নিকেতন ভারতবর্ষে, সর্ব্বত্রই বুদ্ধের পুণ্য চরণচিহ্ন দেদীপ্যমান। তথাকার

বিজ্ঞান-সভার সাধারণ অধিবেশনে, পরলোকগত তিব্বতীয়-প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতপ্রবর আলেক-জাণ্ডর কস্‌মা ডি কোরসের (Alexander Csoma de Koros) স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া, একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিম্নলিখিত প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ের অনেক তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক গোল্ডজিহের যাহা লিখিয়াছেন,—তাহা ব্যতীত অনেক সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্বের অব-তারণা করিয়াছি।—লেখক।

শিল্প ও সাহিত্য, ভূগর্ভ ও গিরিগহ্বর বুদ্ধের পদাঙ্ক ধারণ করিয়া এখনও তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকের গভীর গবেষণায় ইস্‌লামের ক্রীড়াক্ষেত্র বোখারা হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বৌদ্ধবিহারের স্মৃতিস্তূপ আবিষ্কৃত হইতেছে।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তীর্ণ হইতেছে। আমেরিকা, ইউরোপ ও এসিয়ার প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী বুদ্ধদেবের অতীত মহিমার অনুধ্যানে রত হইয়াছেন। বৌদ্ধভাবানুস্যূত শিল্প ও সাহিত্যসংক্রান্ত পুস্তকাদির উদ্ধার ও মুদ্রণ হইতেছে। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে, ভূগর্ভস্থ প্রস্তরফলকে ও কীটদষ্ট জীর্ণপত্র পুঁথিতে বৌদ্ধ কীর্ত্তির করলেখা পাঠ করিতেছেন। বৌদ্ধ দর্শনেরও বিপুল আলোচনা চলিতেছে। কুম্ভকর্ণ চীনের নিদ্রাভঙ্গের উপক্রম হইয়াছে; প্রাচী-দ্বারে জাপান উষার সুকুমার অরুণপ্রভার ন্যায় উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া শৌর্য্যশিক্ষা ও স্বদেশবাৎসল্যের অপূর্ব্ব প্রভাবে পৃথ্বীবাসী মনুষ্যমাত্রকেই চমকিত করিতেছে;—এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার মনে জগন্নাথের প্রতি উদয়নাচার্য্যের "পুনর্বৌদ্ধে সসারাতে মদধীনা তব স্থিতিঃ" এই ভবিষ্যদ্বাণী জাগরূক হইয়া উঠে।

গোল্ডজিহের প্রবন্ধপ্রারম্ভে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রতীচ্য ধর্ম্মমত ও আধ্যাত্মিক জীবন জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে প্রাচ্য ভাবের দ্বারা অভিভূত ও পরিচালিত হইয়াছে। বিজ্ঞ সমালোচকগণ প্রতীচ্য ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে প্রচ্ছন্ন প্রাচ্যভাবের পরিচয় পাইবেন।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে, জীবজগতে দেশ ও কালের প্রভাব সংক্রমিত হইয়া থাকে। বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু ও জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই দেশ ও কালের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং মনুষ্যের উদ্ভাবিত ধর্ম্মমতেও যে তদানীন্তন প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির ছায়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বয়স নিরূপণ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্কে অর্ব্বাচীন বৌদ্ধমত লালিত পালিত, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? কিন্তু তথাপি বৌদ্ধ শিশু যখন ব্রাহ্মণ্যের ক্ষুণ্ণমার্গে পদক্রম শিক্ষা করিয়া যৌবনের উদ্দাম বলে বলীয়ান্ হইয়া পিতৃকল্প প্রৌঢ় হিন্দুকে দূরে পরিহার করিয়াছিলেন, যখন এসিয়াখণ্ডের

সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ প্রাধান্যের বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত, তখন প্রাচীন হিন্দুও যে উদীয়মান বৌদ্ধমতের তুল্যানুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ কথাও প্রৌঢ় পুরাণকার বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব তৎ।"

যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধ এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার স্থল নহে। বৌদ্ধমতের সর্ব্বতোমুখ প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষমাগুণের অবতার; গুণপক্ষপাতিতা তাঁহার স্বাধর্ম্ম্য। অর্ব্বাচীন বৌদ্ধমত প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মের মূল বেদে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষমাবতার গুণগ্রাহী হিন্দু ঋষি বুদ্ধের প্রতিভার পূজা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না;—অন্য পথগামী শিশুকে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন;—তাঁহাকে ভগবানের অবতারের অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁহার বেদবিরুদ্ধ মত হিন্দুসমাজে গৃহীত হইল না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্মেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৌদ্ধভাব প্রবেশ করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের যৌবনকালে খৃষ্টধর্ম্মের জন্ম হইল। খৃষ্টধর্ম্মে কাহার প্রভাব কতদূর তাহার আলোচনা করিবার স্থল ইহা নহে। আবার খৃষ্টধর্ম্ম যখন পদক্রম শিক্ষা করিতেছেন, তখন ধর্ম্মজগতের সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশু ইস্লামের জন্ম হইল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাব।

প্রতীচ্য বুধমণ্ডলী সূক্ষ্মভাবে ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে, য়ুরোপীয় জাতিসমূহের প্রবাদপরম্পরায়, সাধুগণের জীবনবৃত্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গুহ্যতম অংশসমূহে প্রাচ্য ভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতীচ্য সাহিত্যের মধ্যে বার্লাম ও য়সোফত * (Barlaam and yasophat) কাহিনীতে বুদ্ধের জীবনচরিত কি প্রকার প্রসিদ্ধ, তাহা অনেকেই জানেন। সেণ্ট টমাসের জীবনের অনেক তত্ত্বও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক ব্যতীত নির্ণীত হইতে পারে না।

গোল্ড জিহের বলেন, মুসলমানধর্ম্মের মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইস্লাম দর্শনে গ্রীক দর্শনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, সামাজিক আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপাদিতে পারসীক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ব্যবহারশাস্ত্রে রোমক সভ্যতার ছায়া সুস্পষ্টরূপে

* কথিত আছে, বারলাম নামক জনৈক খৃষ্টীয় সাধু যশোফৎ (বোধ হয় যশোবন্তের অপভ্রংশ) নামক কোনও ভারতীয় যুবরাজকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

পরিলক্ষিত হয়। জায়মান বৃক্ষ যেমন ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ও আলোক উত্তাপের প্রভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ অভ্যুদয়শীল ইস্‌লাম—চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রচলিত ধর্ম্ম ও রীতিনীতির আলোকে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

পরে যখন ইস্‌লাম রাজশক্তিতে পরিণত হইয়া আব্বাসাইড বংশের রাজত্বকালে চতুর্দ্দিকে সাম্রাজ্য-বিস্তার করিতে লাগিল, তখন চতুঃপার্শ্বস্থ উৎকৃষ্টতর সভ্যতার রীতিনীতি ইহাতে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিতে লাগিল। সকলেই জানেন যে, খৃষ্টীয় ও য়ুনানী (Jewish) ধর্ম্মের ভিত্তি অবলম্বনে ইস্‌লামের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন্ সময়ে ইস্‌লামে ভারতীয় সভ্যতার আলোক পতিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। ইস্‌লাম অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে আরব ও ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তৃত বাণিজ্য বিদ্যমান ছিল। * স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির বিবিধপণ্যপরিপূর্ণবাণিজ্য-তরণীসমূহে আরব সাগর পরিব্যাপ্ত থাকিত। কিন্তু যতদিন ইস্‌লামের সহিত ভারতীয় সভ্যতার সাক্ষাৎ সংঘর্ষ হয় নাই, ততদিন প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতীয় আলোক ইস্‌লামে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

ইস্‌লাম বিজয়বাহিনীর দুই শাখা দুইদিকে প্রধাবিত হইল। প্রথম বাহিনী সর্ব্বাগ্রে মধ্য এসিয়ায় প্রবেশ করিল। তৎকালে সমগ্র মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধের অপ্রতিহত ও অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিরাজিত ছিল। এই সময়ে ধর্ম্মান্ধতায় উত্তেজিত নির্ভীক ইস্‌লাম বাহিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিজয়বৈজয়ন্তী লইয়া দিগ্‌দিগন্তে রণদুন্দুভি নিনাদ করিয়া পূর্ব্বে আটলাণ্টিক হইতে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত প্রভাববিস্তার করিতে লাগিল।

আরব দেশে ৩য় শতাব্দীতে বুদ্ধের শামানিজম্ বা শ্রমণধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। আরবী ভাষায় ইহা অল্-সামানিয়ে (Al-Samanyeh) বলিয়া কথিত হইত। তদানীন্তন আরবী ভাষার অভিধানে বুদ্ধ, (Budd) শব্দ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি-বোধক অর্থে ব্যবহৃত হইত। পরবর্ত্তী কালে ইহা কেবল প্রতিমূর্ত্তি-বোধক অর্থেই ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে তদানীন্তন বৌদ্ধ প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আলেক্‌জাণ্ডার পলিহিষ্টর (খৃঃ পূঃ ৮৯—৬০)

* John Yeats L. L. D. প্রণীত "The Growth and Vicissitudes of Commerce" from 1500 B. C. to 1789 A. D. দ্রষ্টব্য। আমার সঙ্কলিত "মুসলমান সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থাবে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

বাক্‌ট্রিয়ার পুরোহিতগণকেও সামানিয়া (শ্রমণ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইস্‌লাম বাহিনীর যে শাখা মধ্য এসিয়ায় প্রবেশ করিল, তাহা সেই স্থানের প্রচলিত রীতিনীতি পরোক্ষভাবে গ্রহণ করিতে লাগিল। যুক্তিবাদী ইস্‌লাম দার্শনিকগণ জন্মান্তরতত্ত্ব ও কর্ম্মবাদের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন আরব সাহিত্যের একাংশ হইতে ইহা প্রমাণীকৃত হইবে। মুসলমান দার্শনিকের উক্তি প্রত্যুক্তি—

প্রশ্ন। পৃথিবীতে অনেক স্থলে ধার্ম্মিক লোকে কেন এত দুঃখভোগ করেন?

উত্তর। কারণ, উক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মা জন্মান্তরে পাপীর দেহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মবাদ।

আব্বাসাইড বংশের রাজত্বকালে আরবগণ ভারতের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অনেক রত্নরাজি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতীয় গল্প-ভাণ্ডারের উপাখ্যান আরবে প্রচলিত ও আরব্যোপন্যাস বা একাধিক-সহস্ররজনী নামে অভিহিত হইয়াছিল। গুণাঢ্যের ভূতভাষাময়ী বৃহৎ-কথা এখন বিস্মৃতির দুর্ভেদ্য তিমিরে আবৃত। কথাসরিৎসাগরে তাহার জীর্ণ কঙ্কালের পরিচয় পাওয়া যায়। কয় জন সংস্কৃতজ্ঞ শুকসপ্ততির সমাচার রাখেন? কিন্তু অনেক মৌলবী তুতিনামার কথা বলিতে সমর্থ,—অনেক য়ুরোপীয় ভাষায় তোতাকাহিনীর অনুবাদ আছে। মদনবিনোদ ও শৃঙ্গারসুন্দরী যে মৈমুন ও খোজিস্তায় পরিণত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ বিস্ময়ের কারণ নাই।

আরব্যোপন্যাসের গল্পগুলিতে অদৃষ্টবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই "বিধিলিপি" বা "ভাগ্যলেখা" হিন্দুর সম্পূর্ণ নিজস্ব। খৃষ্টধর্ম্মের অগ্রজ জ্ঞানবৃদ্ধ বৌদ্ধও ইহা নিজস্ব বলিতে সঙ্কুচিত। ইহা হিন্দু ঋষির প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত। ইস্‌লামের "কিস্‌মেৎ"বাদ এই অদৃষ্টবাদের স্পষ্ট নিদর্শন। মুসলমান বৌদ্ধের নিকট ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই শামানিজম্ বা শ্রমণধর্ম্মের মূলসূত্র। একদিষ্ঠ ভক্ত মুসলমানগণ শ্রমণধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তিপূজা গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু যুক্তিবাদী ইস্‌লাম দার্শনিকগণ ধীরে ধীরে শ্রমণধর্ম্মের নীতি সকল গ্রহণ করিয়াছেন। সারসত্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নাই, তাহা চিরকালই সর্ব্বত্র বিদ্বৎসমাজে সমভাবে সমাদৃত।

পরবর্ত্তী কালের কোনও কোনও মুসলমান লেখক নানা প্রকারে ইহা

অস্বীকার করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ, প্রতীচ্যপ্রত্নতত্ত্ববিৎ রত্নপরীক্ষকগণ প্রভূত গবেষণা সহকারে তাঁহাদের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াছেন। মুসলমানগণ ভারতের অতুল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। কত অগণিত মণি মাণিক্যে গজনীর রাজপ্রাসাদ অলকার ধনভাণ্ডারের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু কালের কঠোর নিয়মে লুণ্ঠিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, কোনও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ তাহার নিদর্শনপ্রদর্শনে সমর্থ নহেন। হয় ত মথুরা কান্যকুব্জ, সোমনাথ অথবা [illegible]গরের রত্নরাজি কোনও খোরাসানবিলাসিনীর বিশাল উরঃস্থলে লম্বিত থাকিতে পারে; অথবা কোনও সারাসেনমহিলার কটিদেশে মেখলারূপে বিরাজিত থাকিতে পারে; হয় ত ময়ূরসিংহাসনের রত্নমালা কোনও তাতার-রমণীর চরণচুম্বনে নিরত আছে! কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? মুসলমান সোমনাথের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি মস্‌জেদের পাদপীঠে পরিণত করিয়াছিল; এখন কে সেই শিলাখণ্ডের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবে? কিন্তু ইস্‌লাম বিদ্বদ্‌বর্গ ভারতীয় অক্ষয় ভাণ্ডারের যে কিছু ভাবরাজি আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বিজাতীয় বেশে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। বহু শতাব্দীর বিভিন্ন বেশেও আজিও সেই সনাতন সূত্রগুলি প্রত্যগ্র পুষ্পের সৌন্দর্য্যে প্রত্যেক পাঠককে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। গোলাপ পুষ্পস্তবক কি তীব্রগন্ধ চম্পকের সুরভি প্রচ্ছন্ন করিতে পারে?

ইস্‌লাম-অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বতন কাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত আরবাদি দেশের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে আব্বাসাইড বংশের রাজত্বকালে আরববাসীরা ভারতের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অনেক রত্নরাজি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই সময়ে আরবী সাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। যখন আব্বাসাইডগণ সর্ব্বপ্রথমে দামস্কস হইতে বোগদাদে রাজধানী সংস্থাপিত করিলেন, তখন তাঁহারা ধর্ম্মান্ধতার জন্যই বিখ্যাত ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতেই ইস্‌লাম সাম্রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা, সর্ব্বত্রই ইস্‌লাম প্রভাব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের অন্ধতা।

[লাইলির অনুকরণ।]

নন্দনে মন্দারমূলে শ্বেত শিলাসনে
সমাচ্ছন্ন শৈবালের শ্যাম আস্তরণে,
পুঞ্জীভূত পুষ্পরাশি—বিচিত্র-বরণ ;
তদুপরি রতি কাম খেলায় মগন—
—পণ রাখি' পাশা খেলা। ঘিরি চারিধারে
উৎসুক অমরবৃন্দ কাতারে কাতারে।
কে হারে কে জিনে রণে—উৎকণ্ঠা বিষম!
পবন বহে না বেগে, মূক বিহঙ্গম।
অদৃষ্ট কামেরে বাম, তাই ছাড়ি' তারে
প্রসন্ন প্রথম হ'তে অনঙ্গ-প্রিয়ারে!
বিশ্বজয়ী পুষ্পধনু হারিল মদন
দুরন্ত পাশার পণে। সংক্ষুব্ধ পবন
গর্জ্জিল শঙ্খের নাদে বিজয় ঘোষিয়া।
একে একে পঞ্চ বাণ পণে ধরি' দিয়া
হৃতসর্ব্ব মনসিজ, লাজে অভিমানে
অনন্ত-যৌবন নিজ বাঁধা দিল দানে।
দশন-মুকুতা দিল, প্রবাল-অধর,
দুটি গণ্ড হ'তে দুটি গোলাপ সুন্দর ;
যুগল নয়ন দিল—খঞ্জন চঞ্চল—
সর্ব্বশেষ পণে। হর্ষে ত্রিদিবের দল
করিল দুন্দুভিধ্বনি ; সাঙ্গ হ'ল রণ।
নেত্রহীন সে অবধি দুর্দ্দান্ত মদন।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল—বিশ্ব চরাচরে
তাই প্রেম সেই হ'তে অন্ধ নাম ধরে।

সহযোগী সাহিত্য।

লাসার পুরোহিত-দেবতা।

দলই লামার অভিব্যক্তি।

"টাইম্‌স্" পত্রিকায় লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ওয়াডেল্ লিখিয়াছেন;—লাসার মহালামা কিপ্রকারে দেবপ্রকৃতিভূষিত-পুরোহিতরাজে অভিব্যক্ত হইলেন—সে বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্বনির্দ্ধারণে প্রতীচ্য কল্পনা-শক্তি বহুদিন যাবৎ ব্যাপৃত। সেই রহস্যতত্ত্ব তিব্বতের আদিম ইতিহাস ও তিব্বতবাসিগণের স্থূলকল্পনাগত প্রবাদপরম্পরার সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিছু আভাষ প্রদত্ত হইল।

তিব্বতীয়গণ এক কালে রণকুশল জাতি বলিয়া খ্যাত ছিল। তৎকালে যিনি শস্ত্রশিক্ষা ও সংগ্রামকৌশলে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিতেন, তিনিই সিংহাসনের অধিকারী নির্ব্বাচিত হইতেন। তখন তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম কিংবা চীনশাসন অজ্ঞাত ছিল। সেই প্রাচীনকালে দুর্দ্দান্ত স্বয়ম্ভুর তিব্বতীয়গণ অদ্রিশৃঙ্গে বা অটবীর অভ্যন্তরে অসভ্যদিগের ন্যায় যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর চীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে ভীষণপ্রকৃতি বর্ব্বর তিব্বতীয় মেষপালকগণ প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। তাহারা প্রতিবৎসর মেষ, কুক্কুর ও বানর বলিদান দিয়া জাতীয় প্রতিনিধির নিকট 'ক্ষুদ্র শপথ' গ্রহণ করিত, এবং তিন বৎসরান্তে 'মহাশপথ' গ্রহণকালে তাহারা মনুষ্য, অশ্ব, বৃষ ও গর্দ্দভাদি বলিপ্রদান করিত। তখন তাহাদের মধ্যে কোনও লিখিত ভাষার উৎপত্তি হয় নাই। তাহারা প্রস্তরখণ্ডে রেখাপাত করিয়া পরস্পর তাহার অর্দ্ধখণ্ডের বিনিময় করিয়া শপথরক্ষা করিত। আজিও তিব্বতে এই প্রথার লুপ্তাবশেষ দৃষ্ট হয়।

তিব্বতীয়গণ গর্ব্বসহকারে বানরজাতিকে তাহাদের আদি পিতা বলিয়া স্বীকার করে। এই গুপ্ত তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া লর্ড মনবড্ডো উল্লাসের সহিত ডারুইনের মানববংশ-কল্পনার পূর্ব্বেও নরজাতিকে অভিব্যক্ত বানর জাতি বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিব্বতীয়গণ বলে যে, এক মহাবানর (কিষ্কিন্ধ্যা হইতে) হিমালয় অতিক্রমপূর্ব্বক ভিব্বতবাসিনী এক কিন্নরীকে (বা রক্ষকন্যাকে) বিবাহ করিয়াছিল। এই আদি দম্পতী হইতে কতকগুলি বানরশিশু যুগপৎ জন্মগ্রহণ করে। পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেব করুণাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে এক অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শস্য ভক্ষণ করিতে দেন। তাহা ভক্ষণ করিবামাত্র বানরশিশুগণের দীর্ঘ লাঙ্গুল ও লোমাবলী ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল, এবং অল্পক্ষণে একেবারেই অন্তর্হিত হইল। তাহার পর বানরশিশুরা কথা কহিতে শিখিল, এবং একেবারেই মনুষ্যে পরিণত হইল। তখন তাহারা বৃক্ষপত্র পরিধান পূর্ব্বক লজ্জানিবারণ করিল। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেবই মহালামায় পরিণত হন। তিব্বতীগণ বলে যে, তাহারা পিতৃপক্ষ হইতে তাহাদের প্রকৃতিসুলভ ভক্তি ও মাতৃপক্ষ হইতে নির্দ্দয়তা ও প্রতারণা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাথমিক ইতিহাস।

৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তিব্বতবাসিগণ বিস্মৃতির যবনিকা উত্তোলন পূর্ব্বক ইতিহাসের রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইল। প্রথমাঙ্কেই তাহারা ভীমবিক্রমে উত্তর ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিম চীন আক্রমণ পূর্ব্বক চীনসম্রাটকে পরাজিত করিয়া অপমানসূচক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে এই সন্ধি হয়। চীনসম্রাট পরাক্রমশালী ত্রয়োবিংশবর্ষদেশীয় তিব্বতরাজ স্রংশান্ গ্যাম্পোর সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিলেন। তৎপরে তিব্বতরাজ নেপাল জয় করিয়া তথাকার রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিব্বতরাজের এই দুই মহিষীই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। অসভ্য তিব্বতরাজ বিদুষী মহিষীদ্বয়ের বিদ্যা ও ধর্ম্মালোকে আলোকিত হইলেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করিল। তিব্বতরাজ পত্নীদ্বয়ের অনুপ্রাণনায় রাজ্যের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তিব্বতে শিক্ষা ও সভ্যতার নবযুগ জাগিয়া উঠিল। তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও পুস্তকাদির জন্য ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করিলেন। ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তকাদি অনুবাদিত করিতে লাগিলেন। চীন দেশ হইতেও বহু বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইল। ধর্ম্মশীলা পত্নীদ্বয়ের প্ররোচনায় তিব্বতরাজ তিব্বতে যে ধর্ম্মবল প্রদান করিলেন, তাহাতে একটি নূতন মহাজাতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা দ্বারা অনেক অশুভেরও আবির্ভাব হইল। দেশের সঞ্জীবনীশক্তির পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম এক অভিনব ব্যাধিতে পরিণত হইল। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম যে বিকৃত অবস্থায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল,—তাহা তিব্বতের আদিম ধর্ম্মের সহযোগে বীভৎস পিশাচপূজার আকার ধারণ করিল। তিব্বতীয় শার্লামেনের উৎসাহের অবসানে লামাগণের প্রতাপ প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী রাজগণের অধিকারকালে লামাগণ বিশিষ্টভাবে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিলেন। রাজগণ তাঁহাদের হস্তে পুত্তলিকার ন্যায় যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরিশেষে লামাগণ প্রবল হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। প্রকৃত রাজশক্তি অন্তর্হিত হইল।

পুরোহিত-রাজত্ব।

কিন্তু তিব্বতে পুরোহিত-তন্ত্র রাজত্বে বিশেষ সুফল ফলিল না। পুরোহিতগণ স্বীয় স্বার্থলাভের সঙ্কীর্ণ নীতির ক্রীতদাস হইয়া জাতীয় উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করিলেন। পৌরোহিত্য-প্রপীড়িত তিব্বতের অধিবাসিগণ কেবল দাসত্বের দৃঢ় নিগড়ে নিবদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জাতীয় গৌরব অন্তর্ধান করিতে লাগিল।

পশ্চিম-তিব্বতের শাক্য নামক স্থানের লোহিতোষ্ণীষধারী লামাই প্রথম পুরোহিতরাজ, বা সহালামা। তিনি মোঙ্গলবংশীয় চীন সম্রাট কুব্‌লাই খাঁর রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করায়, উক্ত চীন সম্রাট, ১২৫২ খৃষ্টাব্দে প্রত্যুপকারচ্ছলে তাঁহাকে তিব্বতের সিংহাসন প্রদান করেন। সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ কুব্‌লাই খাঁর যত্নে ও কর্ম্মচারী মার্কোপোলোর বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, কুব্‌লাই জঙ্গিস্ খাঁর পুত্র ছিলেন। কুব্‌লাই জাতিনির্ব্বিশেষে প্রতিভার পূজা করিতেন। যোগ্যতা দেখিলেই তিনি তাহার পুরস্কার প্রদান করিতেন। তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য, চীনের রাজসভায় লামাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ-বিচারের জন্য তিনি খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বহু আলোচনার

পরে অবশেষে লামাগণের বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার মনঃপূত হয়। তৎকালে চীন ও মোঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষার বিষয় অতীব বিস্ময়জনক। পোপগণের নিকট হইতে যে সকল খৃষ্টান প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, কুব্‌লাই তাঁহাদিগকে কোনও অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে বলেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকগণের ন্যায় খৃষ্টানগণও কোনও অমানুষিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। তখন লামাগণ নানা ইন্দ্রজালের অবতারণা করিলেন। লামাগণের অদ্ভুত যাদুমন্ত্রে ভূতলস্থ মদ্যপূর্ণ চষক শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া কুব্‌লাইর ওষ্ঠলগ্ন হইল। তদ্দর্শনে বিস্মিত কুব্‌লাই খাঁ লামাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। খৃষ্টানগণ উহাকে ভৌতিককাণ্ড বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কুব্‌লাই কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না।

যখন মোঙ্গলবংশীয় সম্রাটগণ চীনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন, তখন কালমুক সম্রাটগণ সাইবীরিয়া প্রান্তরে মোঙ্গোলিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উর্গা নগরে রাজধানী স্থাপিত করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুরোহিত মহালামাও সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অদ্যাপি কোকোনর হ্রদের সান্নিধ্যে উর্গার লামার রাজধানী বিদ্যমান আছে। সেই রাজধানীতে রাজনীতিসূত্রে এক জন রুষীয় 'রেসিডেন্ট' বা রাজপ্রতিনিধি উপস্থিত আছেন।

তিব্বতের শাক্যলামাগণ মোঙ্গল সম্রাটের আশ্রয়লাভে বর্দ্ধিত হইয়াও চারি শত বৎসর অপ্রতিহতপ্রভাবে ধর্ম্মমণ্ডিত রাজদণ্ড পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে তাতার বংশীয় বর্ব্বরসম্প্রদায় তিব্বত জয় করিয়া প্রাচীন লামা-শাসন বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিল।

পীতোষ্ণীষ লামা-শাসন।

পীতোষ্ণীষ লামাগণ এতদিন লোহিতোষ্ণীষ লামাগণের অধীন ছিলেন। তাঁহারা তাতার আক্রমণের সুযোগ বুঝিয়া তাতার-রাজের সাহায্যে প্রাধান্যলাভে অগ্রসর হইলেন। তদনুসারে তাতার-রাজ গুমুরী খাঁ এক দল সৈন্য পাঠাইয়া লোহিতশীর্ষ লামাদিগের প্রাচীন সিংহাসন অধিকার করিয়া পীতোষ্ণীষ লামাগণকে প্রদান করিলেন। লামারাও প্রত্যুপকারস্বরূপ গুমুরী খাঁর পুত্রকে তিব্বতের রাজা ও সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। মোঙ্গলরাজও 'সমুদ্রসদৃশ বিস্তীর্ণ' উপাধিবিশিষ্ট তিব্বতের প্রকৃত রাজাকে 'দলই' লামা বলিয়া অভিহিত করিলেন। মোঙ্গল ভাষায় ঐ শব্দের অর্থ 'সাগরসদৃশ বিস্তীর্ণ'। অদ্যাবধি লামাগণ ইউরোপবাসিগণের নিকট উক্ত নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

সেই প্রথম দলই লামার নাম বাগ্মিপ্রবর 'লাজাং'। প্রথম দলই লামার ন্যায় রাজনীতিকুশল বিচক্ষণ লামা আর তিব্বতের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ইনি আপনাকে দেববংশজাত বলিয়া প্রচার করেন, এবং তদবধি তদ্বংশীয়গণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র তিব্বতবাসিগণের নিকট দেবোচিত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। নিম্নলিখিত কৌশলে তিনি স্বীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

তিনি পীতোষ্ণীষ মহালামাগণের অধস্তন ৫ম উত্তরাধিকারী। ইঁহারা বুদ্ধের 'মৃত্যুঞ্জয়' উপাধি ধারণ করেন। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার নাম গ্যালওয়া। তিব্বতবাসিগণের বিশ্বাস যে, প্রথম মহালামার আত্মা যথাক্রমে পাঁচবার অবতীর্ণ হইয়াছে। মহালামার এক আত্মাই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে। তিব্বতীয়গণের সংস্কার, পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেব, যিনি 'স্পংশান গাম্পো'

রূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম পুরোহিতরাজ হইয়াছিলেন, এবং প্রাথমিক তিব্বতীয় বানরশিশুগণকে ঐন্দ্রজালিক খাদ্যপ্রভাবে মনুষ্যে পরিণত করিয়াছিলেন—তিনিই মহালামারূপে পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ হইতেছেন।

এই দেবতাই পরবর্ত্তী কালে তিব্বতে অবলোকিত চীনরাজা নামে পূজিত হন। ইনিই পূর্ব্বে নির্ব্বাণলাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দলই লামার প্রামাণিকতা।

তিব্বতীয়গণের পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস ও তিব্বতীয় পৌরাণিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দলই লামা এক অলৌকিক বংশলতা প্রস্তুত করেন। তাহার প্রমাণের নিমিত্ত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং প্রশান শ্যাম্পোর লিখিত এক দৈব পুঁথিরও আবিষ্কার করেন।

এবম্প্রকারে অকাট্য প্রমাণের বলে কূটনীতিজ্ঞ দলই লামা তিব্বতীয়গণের নিকট আপনাকে দেববংশসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সময়ে ভূতপূর্ব্ব লোহিতোষ্ণীষ প্রকৃত লামারাজগণ উক্ত দলই লামার অনৈসর্গিক দেববংশে আস্থা স্থাপন করিলেন না। কিন্তু প্রবলপ্রতাপশালী পীতোষ্ণীষ দলই লামা এক ভূত সেনাপতিকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা লোহিতোষ্ণীষ লামাগণকে সংহার করিলেন। তাহাদের বিহার সকলে দলই লামার পীতপতাকা উড্ডীন হইল। এই সময়ে ১৬৫৬ খৃঃ গ্রেম্বইট গ্রুবার লাসা নগরে আগমন করেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে বিধাতৃস্বরূপ লামাকে পূজা না করে, সে অনুষ্ঠাতাই তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। সেই সময় হইতে তিব্বতে পুরোহিত-রাজ লামার প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে।

উক্ত দলই লামা আর এক বাণিজ্যিক সম্বন্ধের বিশেষ অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিম তিব্বতের প্রধান মঠ 'তাসিলুম্পো'র অধিষ্ঠাতা। লাসার পরেই এই নগর উল্লেখযোগ্য। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের বিহার ও মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। তদবধি সর্ব্বত্রই এই স্থান প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে। এই মঠের লামা কিছুকাল পূর্ব্বে লাসালামার উচ্চাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গস্থ অমিতাভ বুদ্ধের পার্থিব অবতার বলিয়া পরিগণিত। তিব্বতের এই দ্বিতীয় লামা 'তাসি লামা' বলিয়া ইউরোপে বিখ্যাত। ইনি মঠের দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন রাজনীতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকেন না; বিদ্যা ও ধর্ম্মের জন্যই ইনি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই কারণে ইঁহার উপাধি 'বিদ্যা মহারত্ন'। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে এই তাসি লামার এক পূর্ব্বাধিকারী ইংরাজদিগের বাণিজ্যদূত বগল্ সাহেবের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। তিনি তাসি লামার চরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতা দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন।

মহালামা।

উক্ত প্রথম দলই লামা তাঁহার বহু দোষ সত্ত্বেও শিল্প ও সাহিত্যের অশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতায় তিব্বত শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল; তিনি রাজধানীর বহির্ভাগে পটল পর্ব্বতের শিখরে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে এই অলৌকিক প্রাসাদ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই পুরোহিতরাজ ৩৫ বৎসর অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজদণ্ড ও ধর্ম্মদণ্ড পরিচালন করিয়া চরমবয়সে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ঔরসজাত পুত্র সাঙ্গ্য গ্যাম্‌ৎসোকে রাজ্যভার দিয়া মহাপ্রস্থান করেন। পুত্র সাঙ্গ্য অন্যান্য উচ্চাভিলাষী ও

কূটনীতিপরায়ণ ছিলেন। তিনি ১৬ বৎসর কাল পিতার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিয়াছিলেন। পরে তিনি এক জন যুবককে মহালামার পদে অভিষিক্ত করেন। এই তরুণ লামার দুশ্চরিত্রতায় লাসাবাসিগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া রাজপ্রতিনিধি সাঙ্ঘ্যের প্রাণসংহার করে। সাঙ্ঘ্যের আশ্রিত তরুণ মহালামাও চীনসম্রাটের আদেশে পদচ্যুত ও নিহত হন। ইতঃপূর্ব্বে তিব্বতে আর কখনও লামা-হত্যা হয় নাই।

উক্ত দলই লামার গুপ্তহত্যায় পুরোহিতের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। তখন লামার আত্মার অবতারত্বে সন্দিহান হইয়া, সকলে লাসার চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের এক জন বর্ষীয়ান্ পুরোহিতকে দলই লামার আসনে বসাইল। সকলেই পূর্ব্বসংস্কারানুসারে বিশ্বাস করিল যে, ভূতপূর্ব্ব দলই লামার নিশ্বাস কিয়দংশে এই নবনির্ব্বাচিত লামার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। চীনসম্রাটের আদেশেই এই দলই লামার নির্ব্বাচন হয়।

কিন্তু তিব্বত বাসী ধর্ম্মযাজকগণ এই নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা অবিলম্বে একটি সদ্যোজাত শিশুকে দলই লামার আত্মজ বা অবতার বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক তাঁহাকেই দলই লামা-পদের প্রকৃত অধিকারী স্থির করিলেন। সাধারণেও ধর্ম্মযাজকদিগের কথা বিশ্বাস করিল। উভয় পক্ষের গোলযোগে জাতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সাধারণ ধর্ম্মযাজকগণ এক দল তাতার সৈন্যের সহায়তায় ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে লাসা অধিকার করিলেন।

চীনসম্রাট কাংশিও প্রকাণ্ড এক দল সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন। চীনসৈন্য তাতার সেনাপতিকে সংহার করিয়া লাসা অধিকার করিল। তখন চীনসম্রাট মহালামার অবতার-তত্ত্বের অনুকূল সাধারণ মতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সাধারণের নির্ব্বাচিত শিশুকেই দলই লামার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু তিনি লামার কার্য্য ধর্ম্মের গণ্ডীবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং রাজকার্য্যাদি পরিচালনের নিমিত্ত এক জন চীনপ্রতিনিধিকে রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইনি নামতঃ লামার অধীন থাকিলেও সর্ব্বতোভাবে তিব্বতের হর্ত্তাকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার অধীনে আর দুই জন চীনরাজ-প্রতিনিধি লাসা ও আম্বান নগরে অবস্থিত হইলেন।

বিপ্লবকাল।

এই দলই লামা ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে চীনরাজপ্রতিনিধিকে হত্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া চীনসম্রাট লাসায় আর এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। দলই লামা বন্দীকৃত ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ নিহত হইলেন। চীনসম্রাট কিম্‌রি নামক এক জন বৃদ্ধ সম্ভ্রান্তভাজন পুরোহিতকে মহালামার আসনে বসাইলেন, এবং তাঁহাকে সমস্ত বৈষয়িক অধিকারচ্যুত করিয়া কেবল ধর্ম্মবিষয়ের গুরুরূপে স্বীকার করিলেন। মিবাং নামক অন্য এক ব্যক্তি শাসনকার্য্যের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। এই বিপ্লবসঙ্কুল কালে লাসা নগরে যে সমস্ত জেসুইট প্রচারক ছিলেন, তাঁহারা স্বচক্ষে উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব দলই লামা তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। নবনির্ব্বাচিত তিব্বতরাজ মিবাং অল্প দিনে আম্বানবাসী চীন 'রেসিডেণ্ট' সকলের বিরাগভাজন হইলেন, এবং ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদিগের দ্বারা নিহত হইলেন। এই ঘটনায় তিব্বতীয়গণ উত্তেজিত হইয়া চীন রেসিডেণ্টগণের বিনাশসাধন করিল। ইহাতে চীনসম্রাট চেনলাং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিব্বতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তিব্বতে আবার চীনশাসন প্রবর্ত্তিত হইল। আম্বানবাসীরা প্রাধান্য লাভ

করিল। তাহারাই 'রাজ'-নির্ব্বাচনে অধিকতর ক্ষমতা লাভ করিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে আম্বানগণের হস্তেই রাজ্যের শাসনভার থাকিল। রাজা তাহাদিগের ক্রীড়াপুত্তলবৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেন। আম্বানগণ দলই-লামা-নির্ব্বাচনেও অধিকারলাভ করিলেন।

এই সময় হইতেই দেবপ্রিয় প্রসিদ্ধ দলই লামা অকালেই স্বর্গযাত্রা করিতে লাগিলেন। তদবধি অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াই দলই লামাগণ নরধাম ত্যাগ করিতেন। এক জন লামার দেহত্যাগ ঘটিলে, পুনর্ব্বার একটি শিশু-লামাপদে আসীন হন। এই প্রকারে লামাগণ কিছুতেই প্রাপ্তবয়স্ক হইতে পারেন না। প্রকৃতপ্রস্তাবে যাবতীয় বৈষয়িক কার্য্য রাজার হস্তে বর্ত্তমান।

ইঁহাদিগের পরবর্ত্তী দলই লামাগণ যথাক্রমে ১১, ১৮, ১৮ ও ১৮ বয়সে লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান দলই লামাই কেবল উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ। চীনগণের নিদারুণ অত্যাচারবহ্নিতে তিনিই কেবল পতঙ্গের অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। সৌভাগ্যক্রমে তিব্বতে যে স্বজাতিবাৎসল্যের উত্তেজনায় জাতীয় জীবনে কথঞ্চিৎ সঞ্জীবনীশক্তির সঞ্চার হইয়াছে—সেই হেতু সনাতন নিয়মানুসারে অষ্টাদশ বর্ষে স্বর্গযাত্রারূপ দারুণ দুর্ঘটনা বর্ত্তমান দলই লামার ভাগ্যে সংঘটিত হয় নাই। কোনও এক অপূর্ব্ব নাটকীয় কৌশলে চীনদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান দলই লামা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইনি অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করেন, তৎকালে তিব্বতের জাতীয় সম্প্রদায় রাজপ্রতিনিধিকে কারারুদ্ধ করিয়া 'শীলমোহর' হস্তগত করিলেন, এবং অবিলম্বে চীনের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া দলই লামাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। আম্বানবাসিগণ চীনসম্রাটকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পিকিন হইতে এক অনুশাসনপত্র বাহির করিল, এবং তাহার বলে পূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধিকে সিংহাসন প্রদান এবং রাজমুদ্রা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য জাতীয় সম্প্রদায়কে আদেশ করিল। ইতিমধ্যে রাজপ্রতিনিধির মৃত্যু হইল, এবং আম্বান দলপতি উৎকোচের বশীভূত হইয়া চীন অনুশাসন প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া চীনসম্রাটকে জ্ঞাপন করিলেন।

বর্ত্তমান কাল।

শুভক্ষণে চীন জাপানে সমর সংঘটিত হইল। এই সুযোগে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজনীতিজ্ঞ দলই লামা চীনশাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় শাসন বদ্ধমূল করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ সিচুয়ান্ নামক পশ্চিমপ্রদেশীয় এক চীনরাজপ্রতিনিধি পিকিনে চীনসম্রাটকে পত্র লিখিলেন যে, তিব্বতে চীনশাসন শিথিলীকৃত হইয়াছে; অতএব এক দল সৈন্য পাঠাইয়া চীনশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা বিধেয়।

বর্ত্তমান যুবক দলই লামা বাগ্মিপ্রবর উদারহৃদয় তুব দান নামে পরিচিত। তিনি সিংহাসনের অধিকারী এবং ধর্ম্মবিষয়ে পিকিন, মোঙ্গোলিয়া, বৈকাল, লাদাক, সমগ্র তিব্বত ও হিমালয়প্রদেশস্থ বৌদ্ধরাজ্যে তাঁহার প্রভাব অব্যাহত। তিনি একটু ক্রোধপ্রবণ।

তাঁহার ধর্ম্মপরিষৎ নানাপ্রকার লামা বা পুরোহিতগণের সমবায়ে গঠিত। তাঁহাদের মধ্যে ক্ষমতানুসারে বিভিন্ন শ্রেণী বর্ত্তমান আছে। তাহা লইয়া অনেক সময়ে কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার সিংহাসন সাধারণের প্রীতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। তাঁহার বয়স ত্রিশ-বৎসর মাত্র। সুতরাং তিনি বিশেষ বহুদর্শী নহেন। আমায় তদুপরি নানাপ্রকার

কুচক্রী লোক স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কল্পে তাঁহাকে কুপরামর্শ দিয়া থাকে। এই কারণেই দলই লামা তিব্বতে বিধাতার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদস্বরূপ (!) ইংরেজ সৈন্যের আগমনে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়াছিলেন। চীনের শাসননিগড় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া রুসিয়ার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, লাসা দর্জ্জিএফ্ নামে দলই লামার এক শিক্ষক আছেন, তিনি রুস গবর্মেণ্টের প্রজা। সেই জন্যই তিনি দলইলামার কর্ণে রুষের শরণগ্রহণরূপ কুমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি রুসিয়ায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ২০ বৎসর পূর্ব্বে ৩৫ বৎসর বয়সে লাসার এক মঠে অবস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি দলই লামার পরিষদে খ্যাতিলাভ করেন। ইনি রুসিয়ার ভৌগোলিক সমিতির সভ্য, এবং নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। ইনি ভারতবর্ষ ও সিংহল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। ভাদ্র। "মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত কবিতাবলী" এবার প্রবাসীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই অসম্পূর্ণ কবিতাগুলিতে মাইকেলের প্রতিভার পরিচয় নাই;—তথাপি, স্বর্গীয় মহাকবির খণ্ডিত রচনাও অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে। অমিত্রাক্ষরে মহাকাব্য লিখিয়া মাইকেল অনেকের বিদ্রূপভাজন হইয়াছিলেন; তাহার লাঞ্ছনা—'ছুছুন্দরী-বধ' স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসেও স্থানলাভ করিয়াছে। অমিত্রাক্ষর নূতন বলিয়াই এই বিদ্রূপের ঢেউ উঠিয়াছিল। মাইকেল নিজেও "সংস্কৃত ছন্দে লিখিত কোনও বাঙ্গলা কাব্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে" "দেবদানবীয়ম্" নামক কাব্য লিখিতেছিলেন! দুইটি কবিতার পর সে রচনা আর অগ্রসর হয় নাই। বাঙ্গলা ভাষার দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য বলিব? প্রথম শ্লোকটি এই;—

"কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে;"

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রহস্যে বিপদ" একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "মহাত্মা বেথুন ও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধটি "প্রবাসী"র অনেকটা স্থান গ্রাস করিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, "আমরা যে নারীগণকে অন্ধ ও খঞ্জ করিয়া বন্দিদশাতে রাখিতেছি, ইহার শাস্তি আমরাই ভোগ করিতেছি।" যাঁহারা নারীগণের চক্ষুর উপর চশমা দিয়া দিব্য দৃষ্টি ও চরণকমলে জুতা পরাইয়া অবাধ গতি দান করিয়াছেন, তাঁহারাই কি কম শাস্তি ভোগ করিতেছেন? আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি;—কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার অপচারকে 'শিক্ষা' বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যে শিক্ষায় গৃহস্থের কন্যার থানার টেবিলে নদিয়া দেখা দেয়, যে শিক্ষায় হিন্দুর মেয়ে নারীধর্ম্ম

ভুলিয়া জোয়ান অফ্ আর্ক' সাজিয়া বখামি ও ভণ্ডামি করে, যে শিক্ষায় যথেচ্ছাচার স্বাধীনতার মুখোস্ পরিয়া প্রচণ্ডতাণ্ডবে সমাজ ও সংসার দলিত করিতে থাকে, যে শিক্ষা ত্যাগকে নির্ব্বাসিত করিয়া ভোগের পূজা করে, আমরা তাহাকে 'শিক্ষা' বলিতে পারি না। তাহা পুরুষের পক্ষেও বিষ, রমণীর পক্ষেও বিষ, হিন্দুরমণীর পক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যু। শিবনাথ বাবু 'লেসে' চাকিয়া, 'সুজ্' লেপিয়া, 'এসেন্স্' মাখাইয়া স্ত্রীশিক্ষার যে পুতুলটি খাড়া করিয়াছেন, তাহা সকলের চিত্ত অধিকার করিতে পারিবে না। অনেকে জানে, তাহার 'উপরেই চাকণচিকণ,' কিন্তু 'ভিতরে খ্যাড়।' শিবনাথ বাবু ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন,—"বঙ্গদেশের সামাজিক উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যেই হইবে।" তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই,—কিন্তু নারী যদি 'নারী' থাকেন, তবেই, নতুবা নহে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ—গুপ্ত "বিদ্যাপতির টীকায়" ভূতপূর্ব্ব টীকাকার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াছেন।—শুনিলাম, কালীপ্রসন্ন বাবু নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ "প্রবাসী"র সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু কি বলেন, দেখা যাক। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জাপান" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের "চীন দেশে চণ্ডুসেবন" চলনসই। "হোলকর রাজবংশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ।

সাহিত্য-সমাজে সুপ্রথিত, ভারতবর্ষের অকৃত্রিম-বন্ধু, দরিদ্রবৎসল উইলিয়ম ডিগ্‌বী লোকান্তরিত হইয়াছেন। আমাদের দুঃখের অবধি নাই। বন্ধুহীন ভারতবর্ষ! তোমার দুর্ভাগ্য শোচনীয়।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর কলেজে শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত পেড্‌লার, কালীপ্রসন্ন বাবুর ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্যকল্পে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ নাটক-কার ও সুলেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ সাহিত্য-শ্রম দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। তিনি এক রাশি নাটক লিখিয়াছেন, এক রাশি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, ফরাসী সাহিত্য হইতে মাতৃভাষায় রত্ন আহরণ করিতেছেন। সংপ্রতি তাঁহার "ফরাসীপ্রসূন" নামক একখানি নূতন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। "ফরাসী-প্রসূন" ফ্রেঞ্চ গল্প, কবিতা ও ক্ষুদ্র নাটিকার মনোজ্ঞ তোড়া।

কোপেনহেগেনের ডাক্তার সোরেনসেন মহাভারতের নামের Index প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বম্বে নগরে মুদ্রিত মহাভারত ও প্রতাপ রায়ের সংস্করণ অবলম্বনে Index রচিত হইয়াছে। নামের সঙ্গে বিবরণও আছে। কিছুদিন হইল, ডাক্তারের মৃত্যু হইয়াছে। পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এ দেশে সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ। সংপ্রতি তিনি ভারতের একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইহাতে খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। আগামী মাসে অক্সফোর্ডের ক্লারেণ্ডন প্রেস হইতে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। বিদেশী ভারতের ইতিহাস রচনা করেন—অনেরা "যে তিমিরে সে তিমিরে।"

মৌলবী আবদুল সালাম ইংরাজীতে "রিয়াজুস্-সালাতিনে"র অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। রিয়াজুস্ বাঙ্গলার ইতিহাসের বিশেষ আবশ্যক উপকরণ।

"বঙ্গবাসী"র কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইতিহাসপাঠকের ধন্যবাদভাজন হইতেছেন। তাঁহার Bernier's Travel, Stewart's Bengal, Memoirs of Jahangir, Memoirs of Humayun, Cunningham's Shiks প্রকাশ করিয়াছেন।